ব্যাপারিক
ও
আর্থনীতিক ভূগোল

(ভারত ও পাকিস্তান)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের ভূগোল-শাস্ত্রের শিক্ষক ও
আশুতোষ কলেজের ভূগোল-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক
শ্রীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., এফ. আর. জি. এস.
প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২
১৯৫২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ (১৯৫২)—ভূ২

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

পূর্ব্বাভাষ

ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোলের ভারত ও পাকিস্তান খণ্ড বাহির হইল। আশা করি, এই পুস্তকখানিও কেহ-কেহ পছন্দ করিবেন।

বলা বাহুল্য, এই পুস্তক-প্রণয়নে ভৌগোলিক, আর্থনীতিক, ব্যাপারিক ও সংখ্যা-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতা ও প্রকাশকগণের নিকট আমি সেজন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞ; একারণ পুস্তকের প্রারম্ভেই আমি তাঁহাদের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তক-সম্পাদনে যে-সকল পুস্তক, বর্ষপঞ্জী, পাকিস্তান ও ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত বার্ষিক ও মাসিক বিবরণী, ও সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছি, পুস্তকের মধ্যে স্থানে-স্থানে তাহাদের ঋণ স্বীকার করিয়াছি। অনবধানতা প্রযুক্ত সর্ব্বত্র এইরূপ ঋণ স্বীকার করা হয় নাই। সেজন্য অন্যত্র এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা দিয়াছি।

এই খণ্ড সম্পাদনেও আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগার-সংস্পৃষ্ট শ্রীসুরথকুমার প্রামাণিকের নিকট বহুভাবে সাহায্য পাইয়াছি। নানা প্রকার প্রয়োজনীয় পুস্তক ও বর্ষপঞ্জী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও নানা তথ্য প্রদান করিয়া নানাভাবে তিনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, টাটাকোম্পানি তাঁহাদের কলিকাতা আফিস হইতে লৌহশিল্প সম্পর্কে তিনখানি ছবি দিয়াছেন। কয়লাখনি-অঞ্চলের আমার এক বন্ধুর পুত্র শ্রীঅমিত চৌধুরীও কয়লাখনি সম্বন্ধে আমাকে কয়েকখানি ছবি পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল ছবি এই পুস্তকে প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিযাছেন। ইতি

২রা আগস্ট, ১৯৫২
কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ব্যাপারিক
ও
আর্থনীতিক ভূগোল

ভারত ও পাকিস্তান

উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষ।—এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে যে-তিনটি উপদ্বীপ আছে, তাহাদের মধ্যেরটির নাম **ভারতবর্ষ**। ইহার উত্তরে—ন্যূনাধিক ১৬০০ মাইল দীর্ঘ হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী,—উত্তর-পূর্ব্বে—পাট্‌কই, নাগা, ও লুসাই প্রভৃতি হিমালয়ের প্রায় ৪০০ মাইল দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা-কণ্টকিত প্রদেশ,—ইহার পরেই ব্রহ্মদেশ;—ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে—বঙ্গোপসাগর,—দক্ষিণে—ভারত মহাসাগর; এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে—ইহা আরব-সাগর-বেষ্টিত,—উত্তর-পশ্চিমে ইহা ৮০০ মাইল দীর্ঘ সুলেমন ও ক্ষীরথর (Kirthar) প্রভৃতি পর্ব্বতাদির পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমানার মধ্যে যে-দেশ আছে তাহাকে ভূগোল-সম্মত ভারতবর্ষ বলা হয়। দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ এই ভৌগোলিক ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত,—ইহা প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের সহিত সম্পূর্ণ সংযুক্ত ছিল। এক্ষণে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতের দক্ষিণ মহীসোপানের উপর অবস্থিত রহিয়াছে।

অবস্থিতি।—বিরলবৃষ্টি, অনুর্ব্বর এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের মরুভূমি ও মরুপ্রায় ভূমি,—এবং বৃষ্টিবহুল ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান্য-উৎপাদক এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ—এই দুইয়ের মিলনক্ষেত্র—ভারতবর্ষ,—তাই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে মরুভূমি এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে প্রচুর ধান্যক্ষেত্র। চারিদিকে প্রাকৃতিক দুর্গের দ্বারা ইহার সীমা এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুরক্ষিত হইয়াছে যে, সমগ্র পৃথিবীতে ইহার তুলনা হয় না। এই প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইহা মহাদেশের অন্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি ভৌগোলিক এককে পরিণত হইয়াছে, এবং উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্ব্বত-প্রাচীরই ইহার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে;—গ্রীষ্মে মরসুমী বায়ু এই পর্ব্বত-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া এই দেশে অজস্র বৃষ্টিপাত করে এবং শীতকালে মধ্য-এশিয়ার অতি শীতল বায়ু এই পর্ব্বতে বাধা পাইয়া ইহাকে বাসের অযোগ্য করিতে পারে না। তাহারই ফলে ইহা শস্যশালিনী, লোক-

-বহুল, ও প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী উন্নতিশীল দেশ। কিন্তু ইহার অধিবাসিবর্গের মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত, ভাষাগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্যহেতু এই দেশে বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার নিতান্ত অভাব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষের সীমা—প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত। এজন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ইহার আশঙ্কার কারণ নিতান্ত কম। ইহার দক্ষিণ-ভাগ সমুদ্র-বেষ্টিত,—সুদৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাচীরের ন্যায় হিমালয় ইহার উত্তরসীমা রক্ষা করিতেছে,—ইহার উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্ব্বতবেষ্টিত ও সুরক্ষিত। তথাপি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার, কুরম, বোলান প্রভৃতি গিরিপথ ও বেলুচিস্তানের উপর দিয়া যুগে-যুগে আর্য্য, পারসিক, গ্রীক, হুন ও মোগল প্রভৃতি জাতি এই দেশ আক্রমণ করিয়া ইহার উপর তাহাদের সংস্কৃতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, এবং ভারতবর্ষ বিভিন্ন যুগে এই বিভিন্ন জাতির রীতি, প্রকৃতি ও সংস্কার এমনভাবে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে যে,—এখনকার ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন যুগের এই বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া এক নূতন আকার গ্রহণ করিয়াছে। হুয়েন সাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণও মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়া আসিয়া এই পথেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্যতঃ, ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথ বিস্তৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহারই উপরে অবস্থিত। সেজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার বাণিজ্য পরিচালিত হইতে পারিয়াছে।

ভারত-সাম্রাজ্য।—এই ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সহিত উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে বেলুচিস্তান যোগ করিলে, ও দক্ষিণের সিংহল দ্বীপ বাদ দিলে, যে-ভূভাগ পাওয়া যায়, তাহার নাম হইয়াছিল বৃটিশ-শাসিত ভারত-সাম্রাজ্য*। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল ব্রহ্মদেশ ভারত-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পৃথক্ দেশরূপে গণ্য হইলে, তখনও অবশিষ্ট অংশ ভারত-সাম্রাজ্য নামে অভিহিত ছিল। অবশেষে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারত-সাম্রাজ্য ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে।

ভারত-সাম্রাজ্য ৮° উঃ অক্ষরেখা হইতে ৩৭° উঃ অক্ষরেখা পর্য্যন্ত এবং ৬১° পূঃ দ্রাঘিমারেখা হইতে ১০১° পূঃ দ্রাঘিমারেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি ইহার মধ্যভাগ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতসাম্রাজ্যের উত্তরস্থিত সিন্ধু-গাঙ্গেয় প্রদেশ উত্তর-নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণ অংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। এই কর্কটক্রান্তি কচ্ছ, বোম্বাই প্রদেশের উত্তরাংশ, মধ্যভারতীয় এজেন্সি, মধ্যপ্রদেশ,

* পর্ত্তুগাল ও ফরাসী-শাসিত কয়েকটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্থান ইহার অঙ্গীভূত আছে।

দক্ষিণ বিহার, বঙ্গদেশ ও আসামের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভারত-সাম্রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে মোটামুটি ২০০০ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৫০০ মাইল বিস্তৃত ছিল। ইহার পরিমাণফল ছিল ১৫,৮১,৪১০ বর্গমাইল। ইহার ৫৫ শতাংশ বৃটিশদিগের দ্বারা এবং ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ পায় ৭,১৫,৯৬৪ বর্গমাইল, প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজার দ্বারা শাসিত হইত।

পূর্ব্বেই বলিযাছি, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ভাবতসাম্রাজ্য দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। ইহারা দুইটিই বৃটিশ-গঠিত সাধারণতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠীতে যোগ দিযাছে। এই সাধারণতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠী (The Commonwealth of Nations) যুক্তরাজ্য (United Kingdom) অর্থাৎ গ্রেটবৃটেন ও উত্তর আয়র্লণ্ড, কতকগুলি ডোমিনিযন, কতকগুলি উপনিবেশ (Colonies), প্রতিভূ-রাজ্য (Protectorate) ও টেরিটরি লইযা গঠিত হইয়াছিল। ডোমিনিয়ন হিসাবে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা,—এই চারিটিমাত্র দেশ ইহাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষণে ভারত, সিংহল ও পাকিস্তান ইহাতে যোগ দেওয়াতে ইহার অন্তর্গত ডোমিনিয়ন--সংখ্যা হইযাছে—সাতটি।

জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ডোমিনিয়নগুলি কোন বিষয়েই অন্য কোন দেশের অধীন নহে,—নিজ দেশ শাসন-বিষয়ে কোন মীমাংসা করিতে হইলে, তাঁহারা স্বাধীনভাবেই করিতে পাবেন,—প্রয়োজন হইলে ব্রিটিশ বিরোধী আইন প্রণয়ন করিতেও তাঁহাদের বাধা নাই,—রাজ্যগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহারা সকলেই সমমর্য্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সকলেই বৃটিশ রাজশক্তির আনুগত্যরূপ সাধারণ সূত্র দিযা পবস্পব ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ, এবং বৃটিশ--রাজের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন গবর্ণর-জেনাবেল প্রত্যেক ডোমিনিযনের শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ডোমিনিয়ন কার্য্যতঃ স্বাধীন এবং বৃটিশরাজ-মনোনীত গবর্ণর-জেনারেল শাসনকার্য্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন না।

ভারত এই রাষ্ট্রগোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত বটে,—এবং ডোমিনিযন বলিযা কল্পিতও বটে, কিন্তু ১৯৪৯ খৃঃ অব্দেব এপ্রিল মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ডোমিনিয়নগুলির প্রধান-মন্ত্রি--সম্মেলনে, ভারতেব সার্ব্বভৌমত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইযাছে, ভারতের গবর্ণর-জেনাবেল বৃটিশরাজশক্তি কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন না—স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র-অনুযাযী ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যবৃন্দকে লইয়া গঠিত এক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দ্বারা 'নির্ব্বাচিত' হইবেন। বৃটিশরাজের নাম ভারত--রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতীকস্বরূপ গৃহীত হইবে বটে, কিন্তু ভারতেব পক্ষে কোন ক্ষেত্রেই তাঁহাকে মানিবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নগুলির মর্য্যাদা যে সমান,—তাহা স্পষ্টীকৃত

করিবার জন্য এক্ষণে এই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নাম আর বৃটিশ-গঠিত বা বৃটিশ-প্রভাবিত জাতি--গোষ্ঠী (British Commonwealth of Nations) নাই—ইহার নাম হইয়াছে কেবল রাষ্ট্রগোষ্ঠী (Commonwealth of Nations).

ভারত ও পাকিস্তান।—ভারত-সাম্রাজ্য (১) ভারত-ইউনিয়ন বা ভারত-ডোমিনিয়ন, ও (২) পাকিস্তান-ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল,—

(১) আয়তন (বর্গমাইল)

নূতন রাষ্ট্র	প্রদেশ সমূহ	অবিভক্ত ভারতের যত শতাংশ	দেশীয় রাজ্য	অবিভক্ত ভারতের যত শতাংশ	মোট	অবিভক্ত ভারতের যত শতাংশ
ভারত-ইউনিয়ন	৬৩২২১১	৪০'০	৫৮৭৮৮৮	৩৭'২	১২২০০৯৯	৭৭'২
পাকিস্তান	২৩৩২৮১	১৪'৭	১২৮০৩০	৮'১	৩৬১৩১১	২২'৮
অবিভক্ত ভারত	৮৬৫৪৯২	৫৪'৭	৭১৫৯১৮	৪৫'৩	১৫৮১৪১০	১০০'০

(২) লোকসংখ্যা

নূতন রাষ্ট্র	প্রদেশসমূহ	অবিভক্ত ভাবতেব যত শতাংশ	দেশীয় রাজ্য	অবিভক্ত ভারতের যত শতাংশ	মোট	অবিভক্ত ভারতের যত শতাংশ
ভারত-ইউনিয়ন	২৩০১০৪০৭২	৫৯'৩	৮৮৮০৮৪৩৪	২২ ৮	৩১৮৯১২৫০৬	৮২'১
পাকিস্তান	৬৫৭০৪৬৫০	১৬'৯	৪৩৮০৭৯৯	১'০	৭০০৮৫৪৪৯	১৭'৯
অবিভক্ত ভারত	২৯৫৮০৮৭২২	৭৬'২	৯৩১৮৯২৩৩	২৩'৮	৩৮৮৯৯৭৯৫৫	১০০'০

ভারত-বিভাগের পর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর যে দেশীয় রাজ্যগুলি ছিল, তাহাদের মধ্যে ছোট-ছোট ২১৬টি রাজ্য যে-প্রদেশের সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার সহিত, বা নিকটস্থ অন্য প্রদেশের সহিত একীভূত হইয়াছে,—৬১টি রাজ্য—হিমালয় প্রদেশ (২১টি), বিন্ধ্যপ্রদেশ (৩৫টি), কচ্ছ, বিলাসপুর, ভূপাল, ত্রিপুরা ও মণিপুর—এই ৫টি স্টেটরূপে গঠিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর বা চিফ-কমিশনার দ্বারা শাসিত হইতেছে. ৩টি বড়-বড় রাজ্য—হায়দারাবাদ, জম্মু ও

কাশ্মীর, ও মহীশূর—রাজপ্রমুখ উপাধিপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইতেছে, এবং অবশিষ্ট ২৭৫টি রাজ্য লইয়া সৌরাষ্ট্র (২২৩টি), রাজস্থান (১৮টি), মধ্যভারত (২৪টি), পে-প্-সু (৮টি), এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—এই ৫টি সাধারণ রাজ্যগোষ্ঠী বা ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে, ও এক-এক জন রাজপ্রমুখ দ্বারা শাসিত হইতেছে।

ভূতপূর্ব্ব ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশগুলি লইয়া ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক্ষণে আসাম, পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-প্রদেশ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ—এই ৯টি গবর্ণর-শাসিত স্টেট,—এবং আজমীর, কুর্গ, দিল্লী, পান্থ পিপ্‌লোডা—এই ৪টি চিফ-কমিশনার-শাসিত স্টেট আছে।

পাকিস্তানে—বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম-পাঞ্জাব, পূর্ব্ববঙ্গ—এই কয়টি প্রদেশ, এবং ১৯টি ইহার সহিত সংযুক্ত স্টেট আছে।

ভারত-বিভাগের ফলাফল।—(১) আয়তন।—সমগ্র ভারতবর্ষের আয়তনের ৭৭.২ শতাংশ ভারত-ডোমিনিয়নের ও ২২.৮ শতাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার ৮২ শতাংশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও ১৮ শতাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে লোক--পালনের ভার গুরুতর হইয়াছে।

পাকিস্তানের ⅐ অংশ,—ইহার অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহস্রাধিক মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছে এবং "পূর্ব্ব-পাকিস্তান" নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই ⅐ অংশে সমগ্র পাকিস্তানের লোকসংখ্যার $\frac{8}{7}$ অংশ বাস করিতেছে। যদিও সমগ্র পাকিস্তানে হিসাবমত লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২২২,—কিন্তু পূর্ব্ব--পাকিস্তানের পৃথক্ হিসাব করিলে সেখানকার লোকবসতির ঘনত্ব ৭৭৪।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা,—বাণিজ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান করা,—এবং একের খাদ্যাভাবে অন্যের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া,—দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অধিক লোকের ভার তাহাকেই বহন করিতে হয়—অথচ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে খাদ্যদ্রব্য সচ্ছল নহে।

(২) বাস্তুপরিবর্ত্তন।—ভারতবর্ষ বিভাগ করিয়া একটি হিন্দুপ্রধান, এবং অপরটি মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র সৃষ্টি করিলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে-আশা সফল হয় নাই। বরং ভারতবিভাগের অব্যবহিত পরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উৎপীড়িত, বাস্তুহারা, স্বজনহারা ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া রাষ্ট্র--পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে এইরূপ ৬০ লক্ষ এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে ৪০ লক্ষ অ-মুসলমান ভারত-রাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছে; এবং

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অংশ হইতে ৬৫ লক্ষ এবং পশ্চিম-বঙ্গ হইতে ১০ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে বাসপরিবর্ত্তন করিয়াছে। স্বভাবতঃ লোকবহুল ও খাদ্যবিরল ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এই হিসাবে আরও ২৫ লক্ষ লোক বেশী হইয়াছে।

(৩) খাদ্য।—ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে গম ও চাউল উদ্বৃত্তও হইত, এবং ভারতের অন্যান্য অংশ তাহার দ্বারা উপকৃতও হইত। এই দুই প্রদেশ পাকিস্তানভুক্ত হওয়াতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যাভাব আরও গুরুতর হইয়াছে। পাকিস্তানে ইক্ষু ও তৈলবীজের পরিমাণ কম হয়। সেজন্য চিনি ও তৈলের জন্য পাকিস্তান অপরের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। আবার ফলের জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল।

পাকিস্তানের নিজ রাষ্ট্রের মধ্যেও গমভোজী পশ্চিম-পাকিস্তানে ধান্য উদ্বৃত্ত হইলে চাউলভোজী অভাবগ্রস্ত পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ধান্য পাঠানো সহজসাধ্য হয় না।

(৪) খনিজ দ্রব্য।—ভারতবিভাগের ফলে খনিজ পদার্থ সম্পর্কে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অসুবিধা হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু পাকিস্তানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি যে-সকল খনিজ দ্রব্যে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের প্রাধান্য ছিল, সে প্রাধান্যের অধিকারী হইয়াছে এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র,—পাকিস্তানে এই সকল খনিজ দ্রব্য আদৌ নাই। প্রধান কয়লাখনিগুলিও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাকিস্তানে যে কয়লা আছে তাহা পরিমাণেও নিতান্ত কম, এবং উৎকর্ষেও হীন;—স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, ইউরেনিয়ম, বক্সাইট, মনাজাইট, চীনামাটি প্রভৃতি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অংশেই পড়িয়াছে—পাকিস্তানে নাই। জিপ্‌সাম ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না,—এখন পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পাকিস্তানের অন্তর্গত বেলুচিস্তানে ইহার ভাল খনি আছে। এণ্টিমনি ও গন্ধক কেবল পাকিস্তানেই পাওয়া যায়;—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নাই।

পাকিস্তানে গন্ধক, জিপ্‌সাম, এণ্টিমনি প্রভৃতি পাওয়া গেলেও তাহার ব্যবহারের কোন উপায় সেখানে নাই। অথচ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উহা দরকার হয়।

পাকিস্তানেব আব এক অসুবিধা এই যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে খনিজ দ্রব্য নাই,—খনিজ দ্রব্য প্রধানতঃ পশ্চিম-পাকিস্তানের পার্ব্বত্য অঞ্চলেই বেশী। কিন্তু সেখান হইতে যানবাহনের অসুবিধা ও অপ্রতুলতা হেতু মাল-রপ্তানিরও বিশেষ অসুবিধা ঘটে।

(৫) শিল্প।—ভারতবর্ষ-বিভাগের ফলে শিল্পোপযোগী কাঁচামাল-উৎপাদক অংশ প্রধানতঃ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে,—কিন্তু শিল্পাঞ্চলগুলি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। যেমন,—

(ক) অবিভক্ত ভারতের উৎপন্ন পাটের মোটামুটি তিন-চতুর্থাংশ **পাট** পাকিস্তানে

উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু সমগ্র পাটের কলগুলি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। সুতরাং পাটদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভারত যেমন পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী, পাট বিক্রয়ের জন্যও পাকিস্তান তদ্রূপ ভারতের মুখাপেক্ষী। আবার, চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ব্ব-পাকিস্তানে অন্য কোন বন্দরই নাই,—ভারত-বিভাগের ফলে ইহার রপ্তানি-ক্ষমতাও বেশী নহে,—পাকিস্তানে উৎপন্ন পাটের মোটামুটি সিকি অংশ এই বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি করা যায়,—আবার পাট-উৎপাদনের প্রধান স্থানগুলি হইতেও এই বন্দর দূরে অবস্থিত। সুতরাং পাট বিদেশে রপ্তানির জন্যও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের পক্ষে কলিকাতার বন্দরের উপর নির্ভর করিতে পারিলে ভাল হয়।

(খ) অবিভক্ত ভারতে ৩৯৪টি **কাপড়ের কল** ছিল। তাহার মধ্যে ১৪টি মাত্র, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৪টি পাকিস্তানে পড়িয়াছে। কিন্তু মোট উৎপন্ন তুলার ৪০ শতাংশ বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট দীর্ঘতন্তু তুলার প্রায় সমস্তই, পশ্চিম-পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস-শিল্পের সমধিক ক্ষতি হইয়াছে;—পাকিস্তানকেও উদ্বৃত্ত তুলার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

(গ) অবিভক্ত ভারতের আর একটি অর্থকরী বাণিজ্যদ্রব্য ছিল,—**চা।** ভারতবর্ষের উৎপন্ন চা-এর ৯৩ শতাংশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, এবং ৭ শতাংশ পাকিস্তানে উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে দুইপ্রকারের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে;—(১) **চা রপ্তানির অসুবিধা,**—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চা-ক্ষেত্র আসাম ও বঙ্গদেশের চা চট্টগ্রাম ও কলিকাতা দিয়া রপ্তানি হইত। কিন্তু ভারতবিভাগের ফলে এই দুইটি বন্দর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে;—ইহাতে চা-রপ্তানির বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। আসামের চা চট্টগ্রাম ও কলিকাতা—এই উভয় বন্দর দিয়া বিদেশে পাঠাইবার পরিবহন সম্পর্কে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। (২) পাকিস্তানের সকল অংশের চা-এরও চট্টগ্রাম দিয়া বিদেশে পাঠানো সুবিধাজনক নহে।

(ঘ) অবিভক্ত ভারতের **কাগজের কল** পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু বাঁশ পূর্ব্ববঙ্গে। পশমের কলের অধিকাংশ পশ্চিম-ভারতে, কিন্তু **পশম** পাওয়া যায় পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি শীতপ্রধান অঞ্চলে। উৎকৃষ্ট ও প্রচুর **চামড়া** পাওয়া যায় পাকিস্তানে, কিন্তু চামড়া-দ্রব্যের কলের অধিকাংশই কানপুর ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ছাগল ও ভেড়ার চামড়া সংস্কৃত (tanned) হয় কলিকাতায়। পশ্চিম-পাকিস্তানের **যব** লইয়া উত্তর-প্রদেশে যবসুরা প্রস্তুত হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহার অসুবিধা ঘটিয়াছে। ভারতবিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশের সহিত শিল্পগত যে যোগাযোগ ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়াছে,—দেশে শিল্পোন্নতির যে স্বাভাবিক সুবিধা ছিল তাহা বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছে।

(ঙ) ভারতবিভাগের পর বহু কর্ম্মচারী রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন করিলে দেখা গেল,— রেলবিভাগের যে-সকল মুসলমান শ্রমিক পাকিস্তানে গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই রেল চালাইবার পক্ষে আবশ্যকীয় ও কর্ম্মদক্ষ। কিন্তু যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই কেরাণী ও হিসাববিদ্। ইহাতে দুই রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হইয়াছে।

(চ) ভারতবর্ষের শিল্পপ্রধান স্থানগুলি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার ফলে পাকিস্তানে টেকনিশিয়ন, ফোরম্যান প্রভৃতির অভাব হইয়াছে, এবং কেরাণী, ম্যানেজার, শিল্পপতি প্রধানতঃ ভারতীয় হিন্দু বলিয়া পাকিস্তানে ইহাদেব অভাব হইয়াছে।

পাকিস্তানের দুই অংশ বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া সেখানেও শিল্পোন্নতির নানা বাধার উৎপত্তি হইয়াছে ;—(১) এক অংশে কোন শিল্পসৃষ্টি হইলে অপর অংশ সহজে তাহার সুবিধা পায় না, (২) কোন শিল্পসৃষ্টির উপযোগী কাঁচামাল হযত এক অংশে পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্প-কারখানা-সৃষ্টির উপযোগী স্থান হয়ত অপর অংশে সুবিধাজনক। এরূপ স্থলে শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা কম ;—আবার (৩) পাকিস্তানের একাংশে যে-শিল্পদ্রব্যের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা হয়ত অন্য অংশে প্রস্তুত হইতে পারে, সে-অংশে পারে না। ইহাতে ঐরূপ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে কোন ফল-লাভ হয় না। যেমন, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে এমোনিয়ম সালফেটের প্রয়োজন আছে। কয়লা ও ক্যালসিয়ম-সালফেটের অভাবে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে উহা প্রস্তুত হইতে পারে না,—পাঞ্জাবে হইতে পারে। কিন্তু পাঞ্জাব হইতে রেলযোগে করাচী পর্য্যন্ত আনিয়া সেখান হইতে জাহাজে চট্টগ্রামে আনিতে যে-খরচ পড়ে, তদপেক্ষা ইউরোপ হইতে আনিতে কম খরচ পড়ে। সেজন্য পাঞ্জাবে ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠাব কল্পনা পরিত্যক্ত হইযাছে।

পাকিস্তানে রাসায়নিক শিল্প সম্প্রসারণের এইরূপ নানা অসুবিধা আছে।

কয়লা, বিদ্যুৎ ও জলের অভাবে পাকিস্তানের অনেক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না। কয়লার অভাবে পাকিস্তানে মধ্যে-মধ্যে রেলগাড়ীব চলাচল ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন বন্ধ রাখিতে হয়। কয়লার অভাবে পাকিস্তানের বর্ত্তমানে জল-বিদ্যুতের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই জলবিদ্যুৎ হইতেই তাহাকে শিল্পোৎপাদন ও শিল্প-সৃষ্টির সাহায্য লইতে হইবে। পশ্চিম-পাকিস্তানের খাল-অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রে জল জমিলে বিদ্যুতের সাহায্যে জল নিকাশ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারতবিভাগের সময় ৪০০ কোটি কিলো-ওয়াট জলশক্তি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অংশে, এবং ১০ হাজার কিলো-ওয়াট মাত্র পাকিস্তানের অংশে পড়িয়াছে। আবার পাকিস্তানের

এই শক্তি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলেই সুলভ। কিন্তু সেখানে শিল্পসৃষ্টি সুবিধাজনক নহে। এখনও এ-রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র জল-বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সুবিধা দেখা যাইতেছে না। পশ্চিম-পাকিস্তানে জল-বিদ্যুৎ-উৎপাদনের স্থানগুলি এতদূরে অবস্থিত যে, তাহা হইতে বিদ্যুৎ লইয়া কাজে লাগানো,—এমন কি রেলরাস্তাগুলি আলোকিত করাও,—সকল স্থলে সম্ভবপর হইতেছে না।

(৬) **পরিবহন—রেলপথ**।—ভারতবর্ষ-বিভাগের ফলে ৬৯৮২ মাইল রেলপথ পাকিস্তানে, এবং ৩৪৯৮৪ মাইল রেলপথ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে। আবার, এই রেলপথ এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে, বাণিজ্যক্ষেত্রে ও লোকচলাচলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিযাছি, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ নাই,—ইহাতে ইহার দুই অংশের মধ্যে আর্থনীতিক আদানপ্রদানের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। আবার, আসাম-বেঙ্গল রেলপথেব কতকাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে, আসাম ও পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশ, দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গ ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযাছিল। এই দুই অংশ হইতে চা, পাট প্রভৃতিব রপ্তানি-স্থান কলিকাতা। সুতরাং বেলপথেব এইরূপ বিভাগের ফলে কলিকাতারও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অতি শীঘ্র আসাম ও দার্জ্জিলিং অঞ্চলের সহিত যোগসাধন করিয়া নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ কবিযাছে বটে, কিন্তু কলিকাতা-বন্দর হইতে ঐ রেলপথে যাতায়াত ও মাল-আমদানি-রপ্তানি সহজ ও সুবিধাজনক হয় নাই।

পশ্চিম-পাকিস্তানে যে-সকল রেলপথ পড়িয়াছে, তাহা বিশেষতঃ সামরিক প্রয়োজনেব উপযোগী,—বিশেষভাবে বাণিজ্যবাহী নহে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রেলপথের প্রধান অংশেব কোন বন্দবেব সহিত সংযোগ নাই। সুতরাং পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে নদীপথের উপর নির্ভব করিতে হয়। কিন্তু এখনও এই নদীপথ বিদেশী কোম্পানির কর্ত্ত্বাধীন।

আকাশ-পথের প্রধান বন্দর—করাচী,—পাকিস্তানে পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় সকল আকাশযান-পরিচালক কোম্পানি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

(৭) **আর্থিক অবস্থা**।—স্বদেশী ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়াছে।

(৮) **ইনসিওরেন্স কোম্পানি**।—ভারত-বিভাগের ফলে যে-সকল ইনসিওরেন্স কোম্পানি পাকিস্তানে পড়িয়াছিল, তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কারণ, তাহাদের বীমাকারীর সংখ্যার অধিকাংশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেরই অধিবাসী হইয়াছে।

(৯) ভাষাবিভ্রাট।—ভারত-বিভাগের ফলে নূতন এক ভাষাবিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজ-আমলে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশী রাজার ভাষা সকলে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তা'ছাড়া, ইংরাজি ভাষা সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বসমাদৃত ভাষা—পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এই ভাষারই প্রভুত্ব। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-সম্পদ এই ভাষার ভিতরই অধিগত। এই ভাষাভাষী জগতে সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে। সেজন্য বিদেশী ভাষা হইলেও সকলে আগ্রহের সহিত ইহা শিখিত। কিন্তু এক্ষণে ভারত ও পাকিস্তান—এই দুই রাষ্ট্রেই যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা সমগ্র দেশে ইংরাজের অনুকরণে তাঁহাদের নিজেদের প্রদেশের ভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশেরই ভাষা বিভিন্ন,—তাহার মধ্যে কোন-কোন ভাষা বিশেষ পরিপুষ্ট ও জগতের মধ্যে নানা কারণে বিশেষ সম্মানিত। স্বাধীন হইয়াও যদি কোন নূতন ভাষাকে জীবন-যাপনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ভাষা বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তবে স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না। আবার, মানুষের হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া এক শক্তিশালী বৃত্তি আছে;—এক প্রদেশের ভাষা সমগ্র দেশের ভাষা হইবে, এবং সেই প্রদেশ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশকে সেই নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে ও রাজভাষা বলিয়া তাহাকে সম্মান করিতে হইবে,—ইহার ভিতর যদি কোন গুরুতর যুক্তিও থাকে, তথাপি মানুষের হৃদয়োচ্ছ্বাসের ইহা পরম বিরোধী। মানুষ ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে না। এইজন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তান যেমন উর্দ্দু-ভাষার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিতেছে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেও তেমনই হিন্দী রাজভাষা বলিয়া প্রচারিত হইলেও ভিতরে-ভিতরে একটি অসন্তোষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে।

ব্যাপারিক

ও

আর্থনীতিক ভূগোল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভৌগোলিক বিবরণ

১। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

সীমা, অবস্থিতি ও আয়তন,—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কি উপমহাদেশ ?—উপকূল ও তটরেখা,—ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি,—স্বাভাবিক বিভাগ।

সীমা।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের **উত্তরে**—হিমালয় পর্ব্বতমালা ;—**উত্তর-পূর্ব্বে**—নাগা, পাটকই প্রভৃতি হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা,—ইহার পরেই ব্রহ্মদেশ ,—**দক্ষিণ-পূর্ব্বে**—বঙ্গোপসাগর ,—**দক্ষিণে**—ভারত মহাসাগর ও তন্মধ্যস্থ সিংহল দ্বীপ ,—**দক্ষিণ-পশ্চিমে** আরব সাগর ,—ও **উত্তর-পশ্চিমে**—পশ্চিম-পাকিস্তান। এই সীমারেখার মধ্যে উত্তরে—নেপাল, উত্তর-পূর্ব্বে—পূর্ব্ব-পাকিস্তান, এবং দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত কয়েকটি পর্ত্তুগীজ-শাসিত এবং কয়েকটি ফরাসী-শাসিত স্থান ভারত--যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নহে।

অবস্থিতি ও আয়তন।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বিষুবরেখার উত্তরে উত্তর--গোলার্দ্ধে ৮° উঃ এবং ৩৭° উঃ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। দুই ডিগ্রি অক্ষরেখার অন্তর মোটামুটি ৬৯ মাইল। সেই হিসাবে উত্তর-দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য—২০০০ মাইল। ইহা ৭০° পূঃ দ্রাঘিমারেখা হইতে ৯৭° পূঃ দ্রাঘিমারেখা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২২০০ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থিত ৮২° ৩০′′ পূঃ মধ্যন্দিন রেখা-অবলম্বনে সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রমাণ-সময় (Standard time) নিরূপিত হয়। এই প্রমাণ-সময় গ্রীনিচ-সময় অপেক্ষা ৫½ ঘণ্টা বেশী।

২৫° উঃ অক্ষরেখার দক্ষিণে প্রায় ১২০০ মাইল দীর্ঘ ইহার উপদ্বীপ অংশ ভারত--মহাসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং কর্কটক্রান্তি দাক্ষিণাত্য অংশের কিছু উত্তর দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, এবং কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নিরক্ষীয় মণ্ডলে, এবং উত্তরে অবস্থিত অংশ উষ্ণ-শীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু হিমালয় ও তাহার শাখা-প্রশাখা-বেষ্টিত সমগ্র ভারত-

-যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু নিরক্ষীয় মরসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেজন্য ইহার জলবায়ু যেমন "নিরক্ষীয়"-পর্য্যায়-ভুক্ত, এই দেশও তেমনি **নিরক্ষীয় দেশ** বলিয়া পরিগণিত।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন,—১২ লক্ষ ২০ হাজার ৯৯ বর্গমাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা অবিভক্ত ভারতের ৭৭·২ শতাংশ, সমগ্র পৃথিবীর $\frac{1}{৪৫}$ অংশ ;—ইহার লোকসংখ্যা—মোটামুটি ৩২ কোটি—সমগ্র পৃথিবীর $\frac{1}{৬}$ অংশ।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কি উপমহাদেশ?—অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশ ছিল কিনা, এ-সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। কেহ-কেহ বলিতেন,—এই দেশের বিভিন্ন অংশে ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, ধর্ম্ম, জাতি, লোক-প্রকৃতি, ভাষা, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি এত বিভিন্ন যে, ইহাকে একটি 'একক' বলা যায় না। সুতরাং ইহা উপমহাদেশ নহে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলিতেন—ইহার নানা বিষয়ে পার্থক্য মানিয়া লইলেও ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যা এত বিপুল যে, উপ-মহাদেশ শব্দ ইহার প্রতি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। বিশেষতঃ, অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও সুগভীর সমুদ্র ইহাকে বেষ্টন করিয়া ইহাকে পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া গঠিত করিয়াছে যে, কেবল সেইজন্যই ইহাকে উপ-মহাদেশ বলা যাইতে পারে। তাহারা আরও বলেন, সুবিস্তৃত মহাদেশের বিভিন্ন অংশে মানুষের জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, রীতিপ্রকৃতি, মৃত্তিকার গঠন ও ভূ-প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়াই থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন অংশে যে এই সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহা তাহাকে উপ-মহাদেশ সংজ্ঞা দিবার পরিপন্থী নহে—ববং অনুপন্থী।

কিন্তু ভারত-বিভাগেব পরে কেবল ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে আর উপ-মহাদেশ বলা সঙ্গত হইবে না। পর্ব্বত-আবেষ্টনে যে ভূ-খণ্ড ছিল, এখন আর তাহা "একক" নহে,—স্বয়ংক্রিয়ও নহে,—তাহার অংশীদার হইয়াছে। এখন তাহাব একত্বের গৌরব ও বিশালত্বের গৌরব ক্ষীণ হইযাছে ,—এখন সে মহাদেশধর্ম্মী নহে—দেশধর্ম্মী।

উপকূল ও তটরেখা।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল জল-বাণিজ্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী নহে। কারণ,

(১) ইহার তটরেখা সবলপ্রায়,—ইহার উপকূলে উপসাগর, উপদ্বীপ প্রভৃতি ইহার আকারের তুলনায় নিতান্ত অল্প। উপসাগর আছে মাত্র তিনটি,—উত্তর-পশ্চিমে—**কচ্ছ** ও **কাম্বে,** এবং দক্ষিণে—**মান্নার** ; উপদ্বীপ মাত্র একটি—উত্তর-পশ্চিমে **কাথিওয়ার।** উপকূল-সন্নিকটে দ্বীপের সংখ্যাও নিতান্ত কম,—ইহার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের সন্নিকটে **বোম্বাই দ্বীপ,**—দক্ষিণ-পশ্চিমে—লাক্ষা ও মাল-দ্বীপপুঞ্জ নামে দুইটি প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ,—দক্ষিণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে

রামেশ্বরম্ বা পাম্বান এবং মান্নার দ্বীপ। সুতরাং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ তীরভূমিতে পোতাশ্রয়ের স্থানের নিতান্ত অভাব।

(২) তটরেখা সরলপ্রায় বলিয়া ইহার উপদ্বীপ অংশে উচ্চশ্রেণীর বন্দরের সংখ্যা নিতান্ত কম। ইহার পশ্চিম উপকূলে,—কান্দলা, বেদি, ওখা, পোরবন্দর, ভবনগর, সুরাট, বোম্বাই, মর্ম্মুগাও, ম্যাঙ্গালোর, তেল্লিচেরী, মাহি, কালিকট্ট, কোচিন,
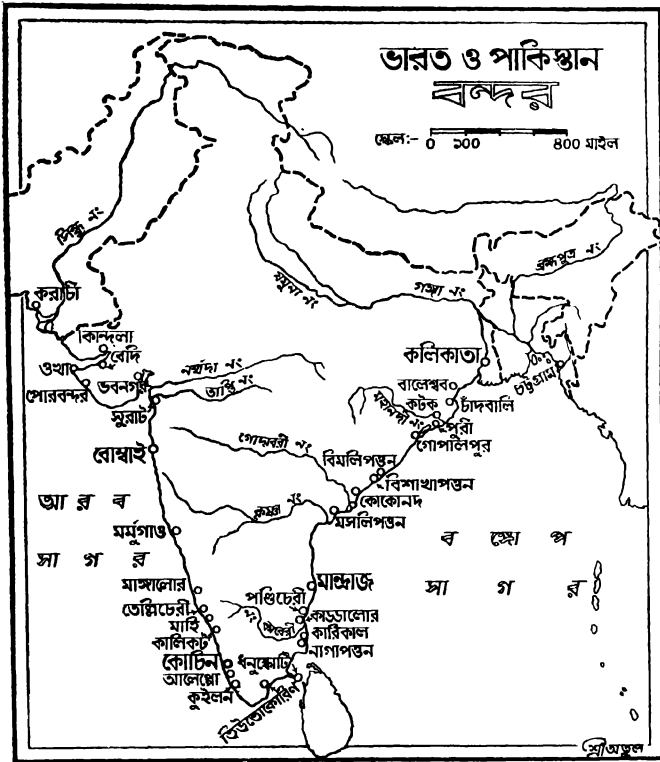
১নং চিত্র

আল্লেপ্পে, কুইলন, তিউতিকোরিন ;—দক্ষিণে,—ধনুস্কোটি ; পূর্ব্বে,—নাগাপট্টম, কারিকাল, কাড্ডালোর, পণ্ডিচেরী, মান্দ্রাজ, মসলিপট্টম, কোকোনদ, বিশাখাপত্তন (Vizagapatam), বিমলিপত্তন, গোপালপুর, বালেশ্বর, চাঁদবালি, কটক, পুরী এবং কলিকাতা—সর্ব্বসমেত এই বত্রিশটি বন্দর আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম উপকূলে মাত্র বোম্বাই ও কোচিন স্বাভাবিক পোতাশ্রয়, এবং পূর্ব্ব উপকূলে স্বাভাবিক-

পোতাশ্রয় না থাকিলেও বহুঅর্থব্যয়ে মান্দ্রাজ ও বিশাখাপত্তন বন্দরদ্বয়কে কৃত্রিম পোতাশ্রয়ে পরিণত করা হইয়াছে।

(৩) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম-ঘাট ও আরব সাগরের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম উপকূল সঙ্কীর্ণ,—তিন-চারি হইতে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল বিস্তৃত। পূর্ব্ব-উপকূল পশ্চিম-উপকূল অপেক্ষা প্রশস্ততর ও নিম্নতর—পঞ্চাশ হইতে দেড়শত মাইল বিস্তৃত। দুই উপকূলেরই বিস্তার দক্ষিণ ভাগে বেশী। প্রায় সর্ব্বত্রই উপকূল সমতল ও বালুকাবৃত,—তাহার পার্শ্বেই অগভীর সমুদ্র,—সমুদ্রতরঙ্গ অনবরত এই অগভীর তটপ্রান্তে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেজন্য ছোট নৌকাও সহজে এরূপ স্থলে আসিতে পারে না। ঝড়ের সময়ে অবস্থা আরও গুরুতর হয়।
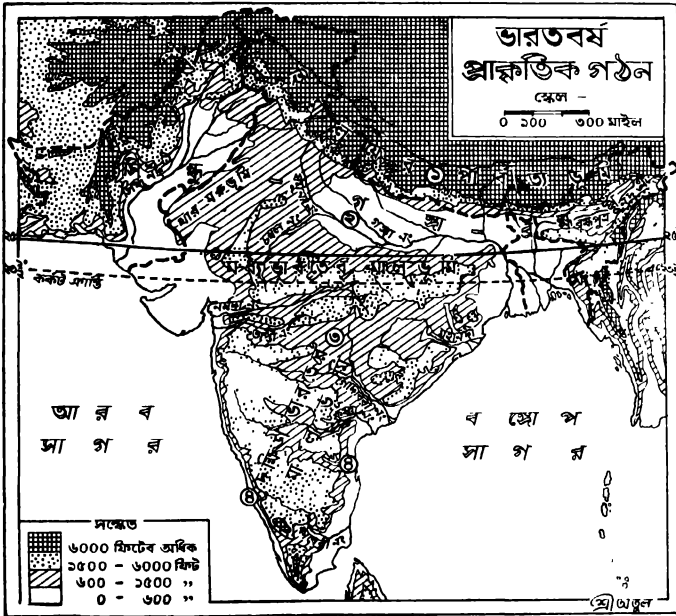
২নং চিত্র

(৪) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের তটরেখা প্রায় ২৫০০ মা. দীর্ঘ। সুতরাং প্রতি ৪৮৮ বর্গমাইল আয়তনের স্থানের লোকে এক মাইল উপকূল ব্যবহার করিতে পারে। ইহা জলবাণিজ্যের সবিশেষ উপযোগী নহে। এশিযার প্রতি ৪৭৩ বর্গমাইল,—ইউরোপের প্রতি ১৪৩ বর্গমাইল—আফ্রিকায় ৯২০ বর্গমাইল—এবং উত্তর-আমেরিকায় ১৩৪ বর্গমাইল—আয়তনে, এক মাইল তটরেখা লোকে উপভোগ করিতে পারে।

ইহাতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও আফ্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা **কম** বাণিজ্য-প্রবণ স্থান হইয়াছে।

ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি (Physical Features)।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই ইহার তিনটি বিভাগ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—(১) **উত্তরে—হিমালয় অঞ্চল,** (২) তাহার **দক্ষিণে—গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা,** ও (৩) **সর্ব্বদক্ষিণে**—ত্রিকোণাকার **দাক্ষিণাত্য মালভূমি।**

১। হিমালয় অঞ্চল।—হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে তিব্বত হইতে পৃথক করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণীর ও তাহাদের শাখা-প্রশাখার সমষ্টি। কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে **পামির** নামে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ মালভূমি অবস্থিত, সেখান হইতে নানাদিকে পর্ব্বতশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। এইজন্য পামিরকে "পামির-গ্রন্থি" বলে। এই গ্রন্থি হইতে কারাকোরম পর্ব্বতশ্রেণী বাহির হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। কারাকোরমের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গডউইন অস্টেন (বা কে$_2$—২৮,২৫০ ফি.)।
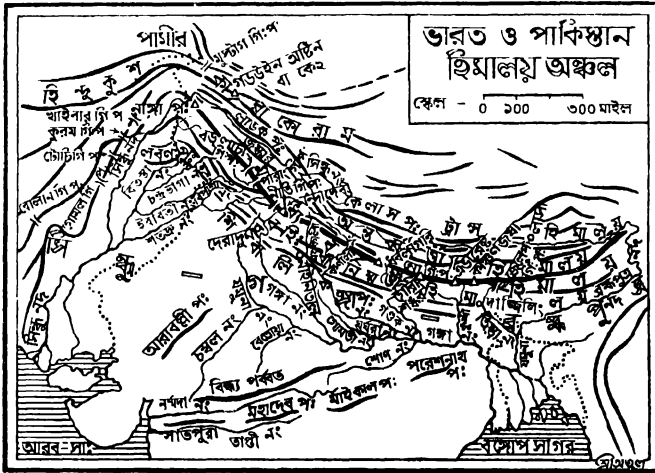
৩নং চিত্র

ইহার দক্ষিণেই হিমালয় পর্ব্বতমালার তিনটি সমান্তরালপ্রায় শাখা—(১) উত্তরে লাডক বা **অন্তর্ব্বর্ত্তী হিমালয়,** (২) তাহার দক্ষিণে মধ্যবর্ত্তী বা জাস্কার বা **মূল হিমালয়,** (৩) তাহার দক্ষিণে **বহিঃ** বা **নিম্ন হিমালয়।** এই হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চল পশ্চিমে পামিরের দক্ষিণ হইতে, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র যেখানে দক্ষিণে বাঁকিয়া

আসাম-রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছে সেই পর্য্যন্ত মোটামুটি ১৫০০ মাইল দীর্ঘ। ইহা বাঁকিয়া অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করিয়াছে—ইহার পৃষ্ঠাংশ ভারতের দিকে।

পশ্চিমভাগে এই হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলের দক্ষিণে চিরপাইন বৃক্ষের বন আছে। তাহার দক্ষিণেই সমান্তরপ্রায় লবণ ও শিবালিক পর্ব্বত দ্বারা গঠিত **নিম্ন হিমালয়** অবস্থিত।

মধ্য-হিমালয়ের উপরেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি অবস্থিত,—নাঙ্গা পর্ব্বত (২৬,৬২০ ফি.), নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফি.), ধবলগিরি (২৬,৭৯৫ ফি.), গোঁসাইস্থান (২৬,২৯১ ফি.), গৌরীশঙ্কর (২৩,৪৪০ ফি.), এভারেষ্ট (২৯,১৪১ ফি.), কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৬ ফি.) ও চমলহরি (২৩,৯৯৭ ফি.)।

পর্ব্বতপথ।—এই হিমালয়-অঞ্চলের অপর পার্শ্বেই তিব্বত। কতকগুলি গিরিপথ দিয়া তিব্বতের সহিত উত্তর-ভারতে বাণিজ্য চলে। কিন্তু এইসকল পথ বড়ই দুরারোহ। সেজন্য এই অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। উত্তর-পূর্ব্ব পাঞ্জাব হইতে **'বড়লচা'** ও **'পাবাং'** গিরিপথ দিয়া কাশ্মীরে যাওয়া যায়, এবং কাশ্মীর হইতে পাংগং হ্রদের পাশ দিয়া লাসা যাওয়া যায়। উত্তর-ভারতের সহিত তিব্বতের বাণিজ্যের ইহাই একটি প্রধান পথ। এই পথে তিব্বত হইতে চমরীপুচ্ছ, মৃগনাভি, পশম, সোরা প্রভৃতি এদেশে আসে। শ্রীনগর হইতে **জোজি** (Zoji la) নামক গিরিপথ দিয়া উত্তর-কাশ্মীরের কারাকোরম পর্ব্বতস্থিত কারাকোরম-পথ মধ্যএশিয়ায় যাইবার অন্যতম বাণিজ্যপথ। নন্দাদেবী পর্ব্বতশৃঙ্গের উত্তরে অবস্থিত **নীতি** গিরিপথ দিয়া গাড়োয়াল হইয়া তিব্বত যাওয়া যায়। নেপালের উত্তরে একটি পথ আছে তাহার নাম **নো**, এবং সিকিমের পূর্ব্বে আরও একটি পথের নাম **জেলেপ**।

হিমালয় অঞ্চলের উপকারিতা।—(১) পশ্চিম-পাকিস্তান ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনকার পর্ব্বতগুলিও দুরারোহ। সেজন্য এদিক্ হইতে শত্রুর ভারত-আক্রমণের ভয় খুব কম। প্রকৃতপক্ষে, এদিক্ হইতে কোন শত্রুই আজও পর্য্যন্ত ভারত আক্রমণ করে নাই। (২) উত্তরের শীতল বায়ু হিমালয়ের জন্য ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না। সেজন্য শীতের প্রবলতা এখানে সম্ভব নহে। (৩) গ্রীষ্মকালে বঙ্গ ও আরব সাগর হইতে আগত জলগর্ভ বায়ু হিমালয়ে-প্রতিহত হইলে ঐ জলকণা বৃষ্টিরূপে প্রধানতঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেই পড়ে। তাহাতে ভারতের বনজ ও কৃষিজ সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হইয়াছে। যদি হিমালয় না থাকিত, তবে ভারতে এত বৃষ্টি কখনও হইত না, ভারতের অধিকাংশ মরুভূমিতে পরিণত হইত এবং শীত-গ্রীষ্ম

প্রখর হইত। (৪) হিমালয় খুব উচ্চ পর্ব্বত বলিয়া ইহার শীর্ষদেশ বারমাসই বরফাচ্ছন্ন থাকে এবং গ্রীষ্মে এই বরফ গলিয়া পশ্চিম-পাঞ্জাবের ও উত্তর-ভারতের নদীগুলি জলপূর্ণ ও নাব্য রাখে। ইহাতে কৃষিকার্য্যেরও সুবিধা হয়। (৫) হিমালয় অঞ্চলের লোক স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু—এজন্য সৈনিকের কার্য্যে বিশেষ উপযোগী।

২। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।—এই নিম্ন সমতলভূমি উত্তরে হিমালয়-অঞ্চল ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিমভাগে উৎপন্ন গঙ্গা ইহার মধ্যভাগে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া অবস্থিত, এবং এই উপত্যকা নিম্নতর বলিয়া হিমালয়-অঞ্চল হইতে যমুনা, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, মহানন্দা প্রভৃতি ইহার উপনদী, ও দক্ষিণ দিক হইতে শোন ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং যমুনার উপনদী চম্বল ও বেতোয়া প্রভৃতি এই উপত্যকায় প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে 'নামচা বারওয়া' নামক শৃঙ্গ বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব-দক্ষিণে আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণে বাঁকিয়া এবং তিস্তা প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া "যমুনা" নামে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত স্রোত বামতটে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা অংশ অতি ধীরে-ধীরে প্রথমে পূর্ব্বে ও পরে পূর্ব্ব-দক্ষিণে নামিয়াছে। সেজন্য এই অংশের নদীগুলি খরস্রোতা নহে—ধীরে-ধীরে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাতে সহজেই পলিমাটি তলায় জমিতে পারে। এই সকল নদী-বাহিত পলিমাটি দিয়াই এই অংশ গঠিত, এবং এই মাটির গভীরতা কোন অংশেই বোধহয় ৬০০ ফিটের কম নহে। উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ ব্রহ্মপুত্র-বাহিত পলিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

এই পলিমাটি উর্ব্বরা, ইহা দ্বারা গঠিত ভূ-ভাগ সমতল, এবং ইহার পূর্ব্বভাগে বৃষ্টিপাতও বেশী। সেজন্য গঙ্গার উপত্যকায় প্রচুর শস্য জন্মে। বৃষ্টির তারতম্য অনুসারে ইহার পূর্ব্বভাগে ধান্য, পাট, এবং পশ্চিমভাগে গম, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে। শস্যশালী বলিয়া এই অংশে লোকবসতি সবিশেষ ঘন এবং সমতলক্ষেত্র বলিয়া এই অংশে রেলপথও বিশেষ বিস্তৃত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও প্রচুর ধান্য জন্মে।

বৃষ্টিপাতের আধিক্যবশতঃ এই অঞ্চল বনাচ্ছন্ন ছিল এবং বৃষ্টির তারতম্যানুসারে নানাস্থানে বিভিন্ন স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বসতিবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল উদ্ভিজ্জ দূরীভূত হইয়াছে এবং এক্ষণে সেখানে নানা শস্য জন্মিতেছে, বা উহা জনকোলাহলে মুখর হইয়াছে। এখনও গঙ্গার ব-দ্বীপে, সমুদ্র-সন্নিকটে সুন্দরবন নামে এক নিবিড় বন রহিয়াছে। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইহারও নানা অংশে বসতিবিস্তার হইতেছে।

সিমলা, দিল্লী ও আরাবলী পর্ব্বত যোগ করিলে যে-রেখা হইবে, ঐ রেখা-ক্রমে

একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি আছে। গঙ্গার উপত্যকা এই রেখার পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থান হইতে গঙ্গার মুখ ৮৫০ মাইল। এই রেখাই সিন্ধু-শতদ্রু ও গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা পৃথক্ করিয়াছে।

৩। দাক্ষিণাত্য মালভূমি।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১১ পৃ.), মোটামুটি ২৫° উ. অক্ষরেখার দক্ষিণে এই মালভূমি অবস্থিত। ইহা ত্রিভুজাকার। ইহার প্রধান বিভাগ দুইটি—(১) মধ্যভারতের মালভূমি, ও (২) দক্ষিণাপথের মালভূমি।
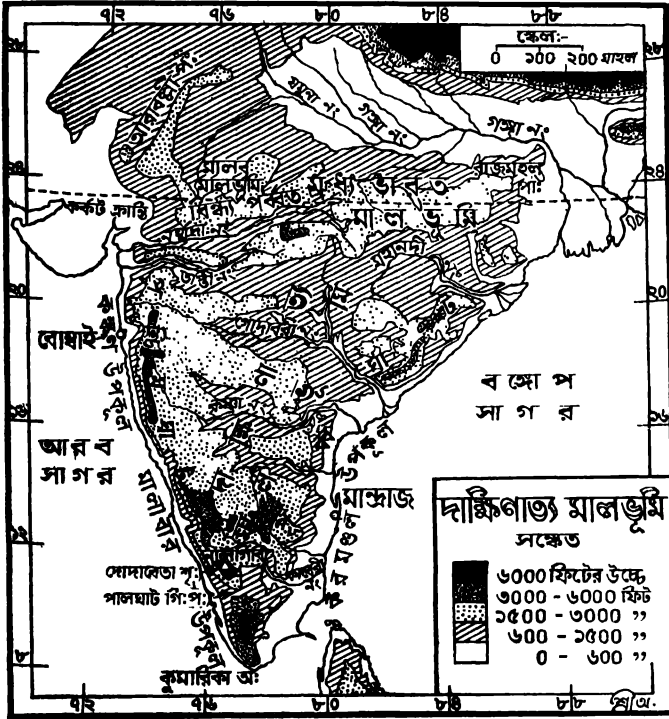
৪নং চিত্র

(১) মধ্যভারতের মালভূমি—পশ্চিমে আরাবলী, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বে রাজমহল পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ;—ইহা, উত্তরে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও দক্ষিণে দক্ষিণাপথ মালভূমির মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে—আরাবলী পর্ব্বত,—ইহার সর্ব্বোচ্চ অংশ আবু পাহাড়, প্রায় ৪০০০ ফিট উচ্চ। ইহার দক্ষিণে মাহী নদীর দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত,—তাহার দক্ষিণে—নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে সাতপুরা পর্ব্বত ;—ইহাদের পূর্ব্বে মহাদেব, মহাকাল ;—আরও পূর্ব্বে ছোটনাগপুরের পরেশনাথ।

এই মালভূমি ভারতবর্ষের এক প্রাচীন অংশ ;—আরাবলী ভারতের পশ্চিমভাগে সর্ব্বপ্রাচীন অংশ। মধ্যভারতীয় এই প্রাচীন মালভূমি কালবশে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। সেজন্য অনেক স্থল সমতল হইয়াছে, পাহাড়গুলিও নিম্নতর হইয়াছে। ইহাতে রেলপথ-বিস্তারের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

এই সুপ্রাচীন মালভূমি খনিজ সম্পদপূর্ণ। যুগযুগান্তের ক্ষয়ের ফলে এখানকার খনিজ দ্রব্য সহজলভ্য হইয়াছে,—ভূতল হইতে অল্প নিম্নেই খনিজ দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়। তাই লৌহ-প্রস্তর, অভ্র, স্বর্ণ, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ সহজেই উত্তোলন করা যায়।

এই অঞ্চল প্রস্তরময়,—যুগযুগান্তের ক্ষয়ের ফলে অনেক স্থলে মৃত্তিকা নাই। এই স্থানে,—বিশেষতঃ পশ্চিমভাগে,—বৃষ্টির অভাব আছে। সেজন্য এখানে ভাল কৃষিকার্য্য হইতে পারে না। তুলা, গম, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্নদ্রব্য। কিন্তু ইহার যে-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত বেশী হয়, সেখানে বনের সৃষ্টি হইয়াছে—এবং শাল ইহার প্রধান বৃক্ষ।

(২) দক্ষিণাপথের মালভূমি—উত্তরে তাপ্তী নদী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত,—ইহা ক্রমশঃ দক্ষিণে সরু হইয়া গিয়াছে। এই মালভূমি মোটামুটি ১৫০০ হইতে ৩০০০ ফি. উচ্চ।

পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে অল্প কিছুদূর পূর্ব্বে তীরের সহিত সমান্তরালপ্রায়--ভাবে পশ্চিম-ঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্ব্বত দক্ষিণে প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বোম্বাই সহরের নিকট ইহার উচ্চতা ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার ফিট। কিন্তু এই মালভূমির সর্ব্বোচ্চ অংশ মহীশূরের দক্ষিণে নীলগিরি পর্ব্বতের দোদাবেতা শৃঙ্গ ৮৭৬০ ফিট উচ্চ। নীলগিরি পশ্চিম-ঘাটেরই অংশ। ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ পালঘাট গিরিপথ—১০০০ ফি. মাত্র উচ্চ এবং ৩০ মা. প্রশস্ত। বোম্বাই সহরের নিকট থলঘাট ও ভোরঘাট নামে দুইটি এবং গোয়ার নিকট কুইসিম (Kwissim) নামে একটি গিরিপথ আছে। পশ্চিম-ঘাটের এই সকল গিরিপথ ভেদ করিয়া রেলপথ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

পালঘাটের দক্ষিণে আনৈমালৈ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আনৈমুদি (৮৮৫০ ফি.) ;—দক্ষিণাপথে ইহাই সর্ব্বোচ্চ স্থান। এখান হইতে পূর্ব্বে পুল্‌নি নামে শাখা গিয়াছে। দক্ষিণে পশ্চিম-ঘাটের নাম হইয়াছে কার্ডামম।

পশ্চিম-ঘাটের পশ্চিমে কতকগুলি ছোট-ছোট নদী এই পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বালুকাময় উপকূলে পড়িয়া পথ হারাইয়া উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। বোম্বাই--সন্নিহিত স্থানে এইরূপ নদী বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে কল চালানো হইতেছে। দক্ষিণে এইরূপ উপহ্রদ খাল দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে।

পশ্চিম হইতে এই মালভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পূর্ব্বে ও উত্তর-পূর্ব্বে গিয়াছে,—ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে পূর্ব্বঘাট ছোটনাগপুরের উচ্চভূমি হইতে আসিয়া ও বঙ্গোপসাগরের তটভূমির সমান্তরপ্রায়ভাবে দক্ষিণে আসিয়া মহীশূরের দক্ষিণে পশ্চিম-ঘাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বঘাট পশ্চিম-ঘাটের মত উচ্চ নহে, এবং ইহা ভেদ করিয়া দক্ষিণাপথের নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে।

দক্ষিণ-ভারতের এই নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট,—বরফ-জলে পুষ্ট নহে,—আবার দক্ষিণাপথ-মালভূমির উপরে বৃষ্টিপাতও খুব বেশী নহে। সেজন্য এখানকার নদীগুলি বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময় শীর্ণ থাকে। তাই কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য এখানে নদীর জল হ্রদাকারে বাঁধিয়া রাখিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়।

এই মালভূমির পশ্চিমভাগে বোম্বাই রাষ্ট্রে দক্ষিণে ধারওয়ার পর্য্যন্ত এবং মান্দ্রাজ রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল। এই মৃত্তিকা জল ধারণ করিয়া রাখে, শুষিতে দেয় না,—তাই ইহা কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী। এইজন্য এখানে তুলা বিশেষভাবে জন্মে। সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ইহাই শ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন-স্থান। অন্য উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য—গম, বাজরা, ডাইল, ইক্ষু, তামাক, কফি ও চা প্রভৃতি।

২। পাকিস্তান

পাকিস্তানের উপকূল ভগ্ন—এখানে তিনটি বন্দর আছে—করাচী, চট্টগ্রাম ও চাল্না। পর্ব্বত পথের জন্য—২ পৃ. ও অন্যান্য বিবরণ—২৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

স্বাভাবিক বিভাগ (Natural Regions)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল, ইহার উত্তর-অংশ পর্ব্বতময়, দক্ষিণাংশ মালভূমি, এবং এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত অংশ নিম্ন সমতলভূমি। কিন্তু জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, উৎপাদন-শক্তি এবং ভূ-প্রকৃতি একত্রে বিচার করিয়া ভূ-পৃষ্ঠের এই বিভাগগুলিকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা যায়। দেশের রীতি-প্রকৃতি, উৎপাদন-শক্তি, বাণিজ্য-ক্ষমতা ও বিবিধ সম্পদ্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে এই বিভাগগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই বিভাগগুলিকে **স্বাভাবিক বিভাগ** বলে।

(ক) হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে—

সমস্ত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীই প্রস্তরময় ও বনাচ্ছন্ন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বভাগে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, এবং ক্রমশঃ পশ্চিমে বৃষ্টির

পরিমাণ ন্যূন হইতে ন্যূনতর। সেজন্য এই পর্ব্বত প্রদেশের সর্ব্বত্র বনের গভীরতা একরূপ বা বনের গাছপালা একজাতীয় নহে। কৃষিদ্রব্যও সর্ব্বত্র সমান উৎপন্ন

৫নং চিত্র
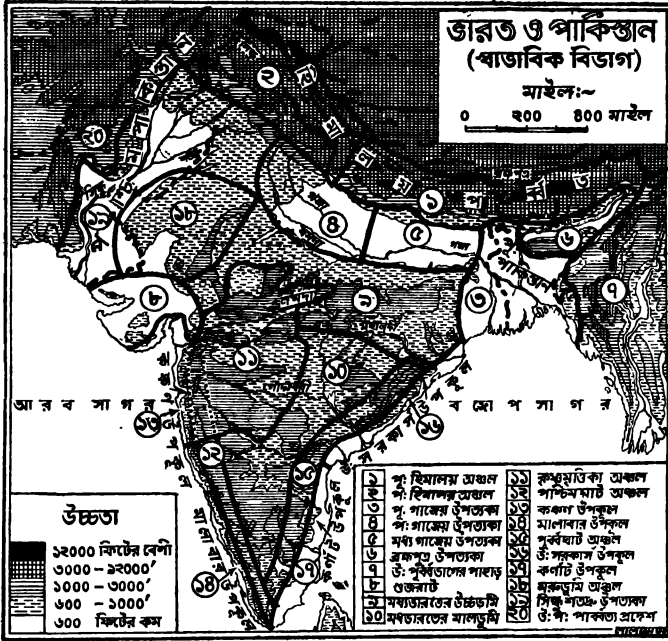
হয় না। এইরূপ পার্থক্য অনুসারে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—

১। **পূর্ব্ব-হিমালয় অঞ্চল**।—নেপালের পশ্চিম-প্রান্ত হইতে আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত নামচা বারওয়া শৃঙ্গ পর্য্যন্ত—**পূর্ব্ব-হিমালয়।** মধ্য- -ভাগের গঙ্গার উপত্যকার উত্তরে ইহা অবস্থিত। উচ্চতা-অনুসারে প্রথমে **(১) তেরাই**—ইহা অস্বাস্থ্যকর, ঘাস ও গুল্মপূর্ণ স্যাঁৎসেঁতে উচ্চভূমি,—উত্তরবঙ্গের উত্তর ভাগে এই তেরাই অঞ্চলে প্রধানতঃ চা-এর বাগানের জন্য লোকবসতি ঘন। এখানে তেরাই অংশকে বলে **দুয়ার** (দ্বার—অর্থাৎ হিমালয়ের প্রবেশ-দ্বার)। উত্তর- -প্রদেশের উত্তরে তেরাই অঞ্চলে শস্য উৎপন্ন হইতেছে,—সেখানে এই অঞ্চল পূর্ব্ব- -দিকের অংশের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর নহে,—প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তরে,—

(২) ছোট-ছোট পাহাড়ময় ভূমি—৫০০০ ফিট্ উচ্চ,—ইহা প্রধানতঃ

শালবনে পূর্ণ,—কোথাও-কোথাও কাঁটাগাছের বন,—আবার যেখানে বৃষ্টির অল্পতা, সেখানেই ঘাস। ইহার উত্তরে,—

(৩) **বহিঃ-হিমালয়**—ও তাহার উত্তরে,—

(৪) **প্রধান হিমালয়**—ইহা ১৮০০০ ফিট্‌ উচ্চ। সুতরাং গঙ্গার উপত্যকা হইতে এই ১৮০০০ ফিট্‌ উচ্চস্থান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য উদ্ভিজ্জের বিশেষ-বিশেষ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। উপত্যকার উত্তরেই চিরহরিৎ বৃক্ষের আবাসভূমি। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইবে।

২। **পশ্চিম হিমালয়**।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৫ পৃ.), এই অঞ্চলে কারাকোরম, লাডক, জাস্কার, প্রধান হিমালয় ও বহিঃ-হিমালয় বা নিম্ন-হিমালয় আছে। নিম্ন-হিমালয়ের উচ্চতা ৫০০০ ফিট্‌। তাহার দক্ষিণে গঙ্গার উপত্যকা পর্য্যন্ত প্রথমে শিবালিক পর্ব্বত—৫০০০ ফি. উচ্চ উপত্যকা,—তাহার দক্ষিণে ৩০০০ ফি. পর্য্যন্ত উচ্চভূমি। তেরাই-এর অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল এদিকে নাই। হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণে যে-উচ্চভূমির কথা বলা হইল, সেখানে এখন শস্য উৎপন্ন হইতেছে,—খাল খনন করিয়া অনেক পতিত জমিতে গম, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করা হইতেছে, এবং অনেক সহরও গড়িয়া উঠিয়াছে।

হিমালয়ের নিম্নভাগে পর্ব্বতগাত্রে পলাশের বন ও বাঁশঝাড় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পর্ব্বতের উচ্চতা অনুসারে যথানিয়মে উদ্ভিজ্জের পার্থক্য হয়। কিন্তু পূর্ব্ব-হিমালয়ে যেমন এক-এক স্থানে একই রকম গাছের বন বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, এই অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে সেরূপ নহে। এখানে অনেক স্থলে পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়—

মোটামুটি দিল্লী হইতে ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং ইহার পূর্ব্ব--ভাগে অত্যধিক বৃষ্টি পাওয়া যায়, এবং বৃষ্টি পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। তদনুসারে এবং অন্যকারণেও, শস্য-উৎপাদন ও জীবনযাপন-প্রণালীও এখানে বিভিন্ন। এই পার্থক্য দেখাইবার জন্য সমগ্র গঙ্গা-উপত্যকা তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

৩। **পূর্ব্ব-গাঙ্গেয় উপত্যকা**—বা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ অংশ :—উত্তরের পার্ব্বত্য ও তেরাই অঞ্চল এবং পূর্ব্বের পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদে মোটামুটি পশ্চিম- ও পূর্ব্ব-বঙ্গ—এই দুই বঙ্গদেশ লইয়া এই বিভাগ কল্পিত। এই অঞ্চল নরম পলিমাটি দিয়া গঠিত ;—বৃষ্টিপাত এখানে অত্যন্ত বেশী,—জলবায়ু আর্দ্র ও উত্তপ্ত। এজন্য এ-অঞ্চলে

সর্ব্বাপেক্ষা **বেশী ধান্য** জন্মে। খুব উত্তাপপ্রিয় শস্য,—হয় এখানে আদৌ জন্মে না, অথবা অল্পই জন্মে।

৪। পশ্চিম-গাঙ্গেয় উপত্যকা।—প্রধানতঃ এলাহাবাদ হইতে উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশ। এই বিভাগে বৃষ্টিপাত মোটামুটি ৪০ ই. ও তদপেক্ষা কম। উত্তাপ গ্রীষ্মে বেশী ও শীতকালে কম,—সুতরাং উত্তাপের প্রখরতা বেশী;—জলবায়ু চরম। সুতরাং ইহা শুষ্ক দেশ। সেজন্য উত্তাপপ্রিয় গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি এখানকার প্রধান শস্য। জলসেচন দ্বারা এখানে শস্যের প্রাচুর্য্য বাড়ানো হয়। অধিবাসীরা প্রধানতঃ গমভোজী।

৫। মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা।—মোটামুটি বিহার-রাষ্ট্র, এবং উত্তর-প্রদেশের এলাহাবাদ হইতে পূর্ব্বাংশ ইহার অন্তর্ভূত। বৃষ্টিপাত এ-অঞ্চলে ৪০ ই. অপেক্ষা বেশী,—মোটামুটি ৬০ ই.। সুতরাং এ-অঞ্চল পশ্চিম-গাঙ্গেয় অঞ্চল অপেক্ষা আর্দ্র। তাই এ-অঞ্চলে ধান্য বেশী জন্মে, এবং যব প্রভৃতি উত্তাপপ্রিয় শস্য কম জন্মে। এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ অন্নভোজী।

গঙ্গা-উপত্যকার উপরি-উক্ত তিন অঞ্চলের মধ্যে বৃষ্টি ও উত্তাপের পার্থক্যের জন্য, কৃষিজমির পরিমাণের ও কৃষিশস্যের কিরূপ পার্থক্য হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

উৎপন্ন শস্য	পশ্চিম-গাঙ্গেয় উপত্যকা (উত্তরপ্রদেশ) মোট কৃষিক্ষেত্র ৩৭৪০৭* সহস্র একর মোট জমির যত শতাংশ	মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা (বিহার) মোট কৃষিক্ষেত্র ১৭৫০৬* সহস্র একর মোট জমির যত শতাংশ	পূর্ব্ব-গাঙ্গেয় উপত্যকা (বঙ্গদেশ) মোট কৃষিক্ষেত্র ২৯৫২৫* সহস্র একর মোট জমির যত শতাংশ
ধান্যের জমি	১৫·৯	৪৩·০	৮০·৫
গমের "	১৭·২	৫·১	০·৫
জোয়ারের "	৪·৫	×	×
বাজরার "	৫·৬	×	×
ভুট্টার "	৫·০	৬·০	×
যবের "	১০·০	৫·২	×
ছোলা ও ডাইলের "	১২·৩	৬·৪	১·৭
তুলার "	০·৩	×	০·৬
ইক্ষুর "	৪·৪	১·৭	×
তৈল বীজের "	১০·০	৬·০	১·৭
পাটের "	×	×	৬·৭

* উত্তর প্রদেশে ৮৯১৮, বিহারে ৫৪১৮ ও বঙ্গদেশে ১৪৭৭ একর জমিতে দুই ফসল হয়।

উপরি-উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে উত্তাপপ্রিয় শস্য ক্রমশঃ বেশী উৎপন্ন হয়। উত্তাপপ্রিয় জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, যব প্রভৃতি বঙ্গদেশে হয় না বলিলেই হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ যব উত্তর-প্রদেশেই জন্মে।

৬। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।—ইহার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী, এবং দক্ষিণে আসামের গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়মালা। আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে গঙ্গার সহিত মিলনস্থান পর্য্যন্ত ইহা ৫০০ মা দীর্ঘ। কিন্তু এই উপত্যকা সঙ্কীর্ণ. —চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল মাত্র বিস্তৃত। গারো পাহাড়শ্রেণীতে মৌসুমি বায়ু প্রতিহত হইলে, তাহার উত্তরে অবস্থিত ইহার উপত্যকাংশে বৃষ্টিপাত কম হয়। নতুবা অন্যত্র বৃষ্টিপাত ৮০—৯০ ই. হইয়া থাকে। সেজন্য এখানে ধান্যের ফসল ভালই হয়। এই অঞ্চলেই পাহাড়ের পাদদেশের ঢালু জমিতে প্রচুর চা জন্মে।

৭। উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব ভাগের পাহাড়-অঞ্চল।—আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত হইতে কতকগুলি নীচু পাহাড বাঁকিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারিত পাটকই, নাগা, লুসাই, চীন প্রভৃতি পর্ব্বত দ্বারা এই পার্ব্বত্য অঞ্চল সৃষ্ট হইযাছে। বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ইহা প্রাচীরেব ন্যায অবস্থিত আছে। নাগা পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে জয়ন্তিয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড় লইয়া গঠিত এক পাহাড়শ্রেণী পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ইহারই উত্তর-পার্শ্ব দিয়া ইহারই সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমে প্রসাবিত হইয়াছে, এবং যেখানেই গারো পাহাড় শেষ হইয়াছে, সেখানেই দক্ষিণমুখী হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখানে প্রধানতঃ দক্ষিণা বায়ুরূপে আসিয়া এই পাহাডশ্রেণীতে প্রতিহত হয়, তাই ইহার দক্ষিণ গাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়,—উত্তর গাত্রে বৃষ্টিপাত কম। খাসিয়া পাহাডের দক্ষিণ ঢালের উপর অবস্থিত চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে প্রায় ৪২৫ ই. বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু পাহাড়ের অপর পার্শ্বে অবস্থিত শিলং সহরে বৃষ্টিপাত মাত্র ৮৪ ইঞ্চি। বৃষ্টির প্রাচুর্য্য হেতু এই অঞ্চলে বনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বনে শাল, গর্জ্জন প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য অঞ্চল বলিয়া কৃষিকার্য্য ভাল হয় না। তবে স্থানে-স্থানে ধান্য জন্মে এবং মালভূমির উপর কমলালেবু উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের গাযে থাক কাটিয়া এখানে শস্য উৎপাদন হইয়া থাকে।

৮। গুজরাট।—ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বৃষ্টিবহুল পশ্চিম-উপকূলের, এবং উত্তর প্রান্ত বৃষ্টিবিরল মরুভূমির সন্নিকটে অবস্থিত। সেজন্য ইহার দক্ষিণ-অংশ আর্দ্র হইলেও, ইহা উত্তরে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহা নিম্ন সমতলভূমি,—মধ্যে-মধ্যে বনাবৃত ছোট-ছোট পাহাড় আছে। পশ্চিমে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ প্রায়শঃ অনুর্ব্বর

ভূমি,—এবং যেখানেই উর্ব্বরা ভূমি আছে, সেখানেই লোকবসতি বেশী হইয়াছে। কাথিয়াবাড়ের মধ্য-ভাগে ঘনবনাবৃত পাহাড় আছে। এই অঞ্চলে যেখানে কৃষ্ণমৃত্তিকা আছে সেখানে প্রচুর ফসল হয়,—বিশেষতঃ তুলা জন্মে এবং স্থানে-স্থানে নদীর উপত্যকায় যেখানে পলিমাটি আছে, সেখানে ধান্য জন্মে। এতদ্ব্যতীত, বাজরা, ইক্ষু প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

(গ) দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে—

৯। মধ্যভারতের মালভূমি।—ইহা ক্রমশঃ উত্তরে ঢালু হইয়া গাঙ্গেয়-উপত্যকায় মিশিয়াছে। তুলা ও বাজরা প্রধান উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য। (১৮ পৃ. দেখ)।

১০। দাক্ষিণাত্য মালভূমি।—ইহা পশ্চিম-ঘাটের প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত,—সেজন্য এখানে বৃষ্টিপাত কম। ২০০০ ফি. উচ্চ মহীশূর, এবং ১০০০ ফি. উচ্চ হায়দারাবাদ এই অংশেই অবস্থিত। পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে বৃষ্টিপাত বেশী। সুতরাং সেখানে বনের সৃষ্টি হইয়াছে। শুষ্ক অংশে মেষপালন হয়। তুলা ও বাজরা প্রধান উৎপন্ন শস্য। বৃষ্টিপাতের অল্পতা-প্রযুক্ত জলসেচ-সাহায্যে এখানে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। ইহা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন অংশ। সেজন্য এখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

১১। কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল।—দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে একটি **কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল**—বোম্বাই রাষ্ট্রের দক্ষিণে অল্পদূর বাদে পশ্চিম-ঘাটের পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত স্থানেই বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা উত্তর-পশ্চিমে গুজরাটের দক্ষিণ ভাগে, উত্তর--পূর্ব্বে ও পূর্ব্বে মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে, এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে হায়দারাবাদের কিয়দংশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। ভূ-নিঃসৃত গলিত লাভা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা বিশেষ উর্ব্বরা। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার উপর সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেও সেই জল একেবারে শুষিয়া যায় না,—মাটির অল্প নীচে জমিয়া থাকে। তাই এই অঞ্চলের কতকাংশ পশ্চিম-ঘাটের প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলেও, এখানে উৎকৃষ্ট ফসল হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলই ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-উৎপাদন-স্থল। গম ও বাজরাও এখানে প্রচুর জন্মে।

১২। পশ্চিম-ঘাট অঞ্চল।—১৯ পৃ. দেখ।

১৩। কঙ্কণ উপকূল।—পশ্চিম উপকূলের গোয়া হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত উত্তরের অংশ **কঙ্কণ উপকূল।** ইহা সঙ্কীর্ণ ও সরল। সেজন্য বন্দরের ও পোতাশ্রয়ের অনুপযোগী। এই উপকূল পর্য্যন্ত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল আসিয়াছে। সেজন্য

এই অঞ্চলে প্রচুর তুলা জন্মে। এই অঞ্চলের সমুদ্রতীরে মৌসুমি-বায়ু-বাহিত বালুকাময় স্থানে প্রচুর নারিকেল গাছ আছে। তাহার পশ্চিমে পলিমাটির জলাভূমি ;—বালুকা-প্রাচীর কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া এখানে জল আবদ্ধ থাকে। আবার, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নদী পশ্চিম-ঘাট হইতে আসিয়া এখানে বালুকাভূমির দ্বারা প্রতিহত হয়, ও জলাভূমির সৃষ্টির সহায়তা করে। এই স্থানে প্রচুর ধান জন্মে, ও সুপারি গাছ হয়। ইহার পূর্ব্বে পশ্চিম-ঘাটের পাদতলে বনাবৃত পাহাড়পূর্ণ স্থান। পশ্চিম-ঘাটের পাদদেশও বনাচ্ছন্ন,—শাল-গাছে পূর্ণ। জঙ্গলে অন্য অনেক প্রকার মূল্যবান বৃক্ষ আছে। এই বনে গাছ কাটিয়া পাহাড়ের নদীতে ভাসাইয়া আনা হয়।

১৪। মালাবার উপকূল।—মালাবার উপকূলের প্রাকৃতিক অবস্থা কঙ্কণ উপকূলেরই মত ; সমুদ্রতীরে বালিয়াড়ী। তাহার পশ্চাতে জলাভূমি,—এবং তাহার পশ্চাতে পার্ব্বত্য অঞ্চল। কিন্তু এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। তাই পার্ব্বত্য নদীগুলি উপকূল ব্যাপিয়া উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল উপহ্রদ খাল দিয়া যোগ করার জন্য, সমগ্র উপকূল ব্যাপিয়া এক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। উপকূলে যে-সকল বন্দর আছে, সেখানে জাহাজ আসিতে পারে না ;—ছোট-ছোট নৌকা মাল বহন করে। বড় নৌকাগুলিও দূরে থাকে। ধান্য, নারিকেল, সুপারি, এবং আদা ও মরিচ প্রভৃতি মশলা, ও রবার এ-অঞ্চলের উৎপন্ন-দ্রব্য, এই সকল অবলম্বন করিয়া এখানে নানা শিল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

১৫। পূর্ব্বঘাট অঞ্চল।—(২০ পৃ. দেখ)।

১৬। উত্তর-সরকারস্ উপকূল।—ইহা কৃষ্ণানদীর উত্তরে অবস্থিত। ইহারও সমুদ্রতীরে বালুকাময় ভূমি,—ও তাহার পশ্চাতে পাহাড়ময় জমি। কিন্তু বালুকাময় ভূমি এখানে সঙ্কীর্ণ ;—ইহার পশ্চাতে ধান্যক্ষেত্র। এই অঞ্চলে তিনটি নদীর ব-দ্বীপ আছে। এই ব-দ্বীপে জলসেচ দ্বারা ধান্য উৎপাদন করা যায়। ধান্য এখানকার প্রধান ফসল,—এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে এখানে ধান্যের উৎপাদন বেশী হয়।

১৭। কর্ণাট উপকূল।—কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কৃষ্ণানদীর মুখ পর্য্যন্ত এই উপকূল অবস্থিত। ইহার উপকূলভাগে বালুকাময় ভূমি,—এবং তীর হইতে দূরে প্রস্তরময় ভূমি। ধান্য ও বাজরা এখানকার উৎপন্ন-শস্য। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পশ্চিম-ঘাটে প্রতিহত হইলে, এই উপকূলে তজ্জনিত বৃষ্টিপাত হয় না। অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অপস্রিয়মান দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি, ও আগচ্ছমান উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয় ;—পরিমাণে ইহা অত্যন্ত অল্প,—মোটামুটি ১০ ই.। এই হেতু বর্ষাকালে এখানে কৃত্রিম জলাশয়ে জলসঞ্চয় করিয়া সেই জলে কৃষিকার্য্য

হয়। এক্ষণে এই অঞ্চলে খালের জলেও সেচকার্য্য হইতেছে। এখানে গাছ খর্ব্বকায় হয়।

(ঘ) ভারতে ও পাকিস্তানে—

১৮। মরুভূমি অঞ্চল।—ইহার অল্প অংশ পাকিস্তানে রহিয়াছে। ইহা বালুকাময় ও বৃষ্টিবিরল। জলাভাবে কোন ফসল হয় না। কোন-কোন স্থলে সামান্য জলের সন্ধান পাইলেই, সেখানে অল্পদিনস্থায়ী বসতি গড়িয়া উঠে। উষ্ট্র এখানকার ভারবাহী পশু। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখানে সমুদ্র হইতে লবণ বহন করিয়া আনে। তাই এই অঞ্চলে স্থানে-স্থানে মাটিতেই লবণ জমিয়া থাকে।

(ঙ) পাকিস্তানে—

১৯। সিন্ধু-শতদ্রু উপত্যকা।—সিন্ধু ও তাহার উপনদী শতদ্রু—ইহার অন্তর্গত অঞ্চল থার মরুর অন্তর্গত। কিন্তু মরুভূমির ন্যায় ইহা একেবারে বৃক্ষ-বিরল নহে,—কাঁটাঝোপ এবং বাবলা প্রভৃতি বহু দূরে-দূরে অবস্থিত বৃক্ষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। শতদ্রু নদীর জলে এখানে জলসেচ হয়, ও সেজন্য কৃষিকার্য্য চলিতেছে।

সিন্ধু ও তাহাব উপনদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত পশ্চিম-পাঞ্জাব প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের জমি উর্ব্বরা। কিন্তু জল অভাবে এখানে কৃষিকার্য্য হইত না। এক্ষণে সিন্ধু ও তাহার উপনদীগুলিতে খাল কাটিযা জলসেচন করা হইতেছে, এবং সেজন্য এই অঞ্চল উৎকৃষ্ট কৃষি-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। গম ও কার্পাস এখানে প্রচুর জন্মে।

পার্ব্বত্য-অঞ্চলের পাদদেশে, এই সমতলভূমির উত্তর-পশ্চিম কোণে **লবণ পর্ব্বত** প্রায় ১০০০ ফিট্ উচ্চ।

২০। উত্তর-পশ্চিম পার্ব্বত্য অঞ্চল ও সন্নিহিত সিন্ধু-উপকূল।—পশ্চিম-পাঞ্জাবের উত্তরে ও কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পামির-গ্রন্থি হইতে **হিন্দুকুশ** পর্ব্বত পশ্চিমে আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুকুশের এক শাখা **সফেদ কো** দক্ষিণে আসিয়াছে। তাহার দক্ষিণে **স্থলেমন পর্ব্বত**।—ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তক্তি-স্থলেমন—কিঞ্চিদধিক ১১ হাজার ফিট্ উচ্চ। স্থলেমন দক্ষিণে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে ও নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। শাখাগুলি পশ্চিমে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে ও আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্ব-পূর্ব্বের শাখার নাম **ক্ষীরথর পর্ব্বত**।

এই পর্ব্বত-প্রাচীরের পশ্চিমে বেলুচিস্তান;—শুষ্ক, সূর্য্যতপ্ত, অনুর্ব্বর পর্ব্বত,—

মধ্যে-মধ্যে ভীষণ খাদ,—মৌসুমি-বায়ু-প্রভাবের বহির্ভূত বলিয়া বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, বৎসরে ৬-৭ ই. মাত্র, শীতকালে অল্প বৃষ্টি পড়ে ও তাহাতে চাষের সাহায্য হয়। জলবায়ু চরম। কোথাও শুষ্ক মরু, কোথাও বা প্রস্তরাকীর্ণ সমতলভূমি। পর্ব্বতের উপত্যকায় "কারেজ" প্রথায় বা ঝর্ণা প্রভৃতির জল লইয়া জলসেচের সাহায্যে চাষ হয়—সেখানে গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য ও ফল প্রচুর জন্মে। পর্ব্বতের গাত্রে থাক কাটিয়াও চাষ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা।—ভারত ও পাকিস্তান একই ভারতবর্ষের অচ্ছেদ্য ভৌগোলিক বন্ধনে বদ্ধ দুইটি অংশ,—দুইটিই একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের দুইটি রাজনৈতিক বিভাগ মাত্র, এবং একই প্রাকৃতিক গঠন দুইয়েরই জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত করে,—সেজন্য এই দুইটি দেশেরই জলবায়ুর আলোচনা একই সঙ্গে করাই যুক্তিসঙ্গত।

ভারতবর্ষের অবস্থিতি ও ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণে ইহাদের প্রভাব এত বেশী যে, ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে পুনরায় স্মরণ করিয়া লইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) ভারতবর্ষ এশিয়ার দক্ষিণ ভাগে ভারত-মহাসাগর-তটে অবস্থিত।

(২) ইহার উত্তরদেশে অভ্রভেদী হিমালয় অঞ্চল ও তাহার শাখা-প্রশাখা উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ দেশগুলি হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের বায়ুপ্রবাহ ইহাতে প্রতিহত হইলে তাহার দ্বারা কতক পরিমাণে জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) হিমাচল অঞ্চলের দক্ষিণেই সিন্ধু-গঙ্গা-ও-ব্রহ্মপুত্র-গঠিত নিম্ন সমতলভূমি।

(৪) তাহার দক্ষিণেই ভারতের উপদ্বীপ অংশ সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও তাহার শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

(৫) দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ ভারত মহাসাগর ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। এই দুই পর্ব্বতের অবস্থিতি,—ইহাদের উচ্চতা ও উচ্চতার পার্থক্য,—এই অঞ্চলের জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

(৬) আরও দুইটি পর্ব্বতের কথা স্মরণ করা দরকার ;—উত্তর-পশ্চিমে **আরাবলী পর্ব্বত** ;—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ইহাতে প্রতিহত হইলে ইহার পশ্চিম দিকেই বৃষ্টিপাত হয়, এবং **গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পর্ব্বতশ্রেণী**—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপথে অবস্থিত ;—ইহার জন্যই ইহার দক্ষিণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
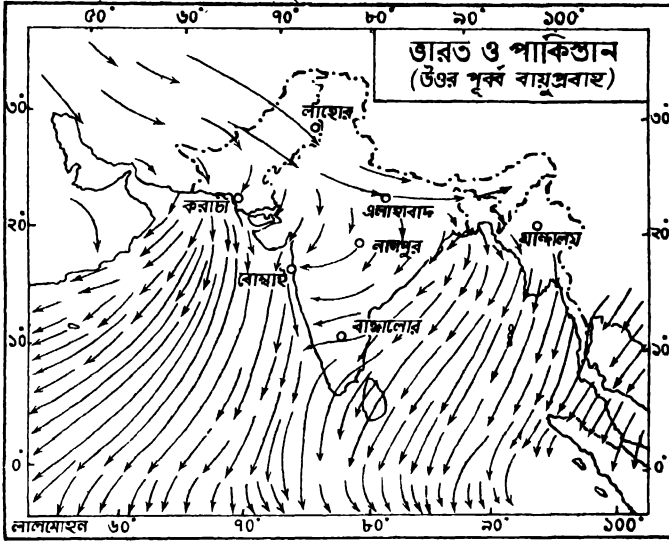
৬নং চিত্র

Courtesy : Indian Meteorological Office, Poona.

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ—মহাদেশ-প্রতীম ;—ইহার ভূ-প্রকৃতি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকার,—তাই ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, এবং জলবায়ুর সে-পার্থক্য স্থানে-স্থানে সম্পূর্ণ বিপরীত ,—উত্তর-পশ্চিমে থার মরুভূমি অবস্থিত—তাহার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৪ ই., আর খাসিয়া-জয়ন্তিয়ার দক্ষিণে চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪২৫ ই. ;—কাশ্মীরে দ্রাস নামক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম উত্তাপ দেখা গিয়াছিল—৪৯° ফা., আর জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, দীশা ও শ্রীগঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে বহুবার উত্তাপ ১২০° ফা. ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোচিন-এর তাপের প্রসর বেশী হয় না, সেখানে উচ্চতাপের গড় কোন মাসেই ৮৯° ফা.-এর বেশী উঠে না, এবং নিম্নতাপের গড় ৭৩° ফা.-এর নীচেই নামে না, কিন্তু বিকানীরে উচ্চ-তাপের গড় জুলাই মাসে ১০৭° ফা.-এর উপরে উঠে এবং জানুয়ারিতে একেবারে ৪০° ফা.-এরও নীচে নামিয়া আসে।

জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণের কারণ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সমস্ত বৎসরটিকে উত্তাপ বা ঋতুভেদে চারিভাগে ভাগ করা যাক ;—

(১) শীতকাল (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি)

(২) গ্রীষ্মকাল (মার্চ্চ হইতে মে)

(৩) মৌসুমকাল বা বর্ষা ও শরৎকাল (জুন হইতে অক্টোবর)

(৪) মৌসুম-পরবর্ত্তী সময় (অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর)
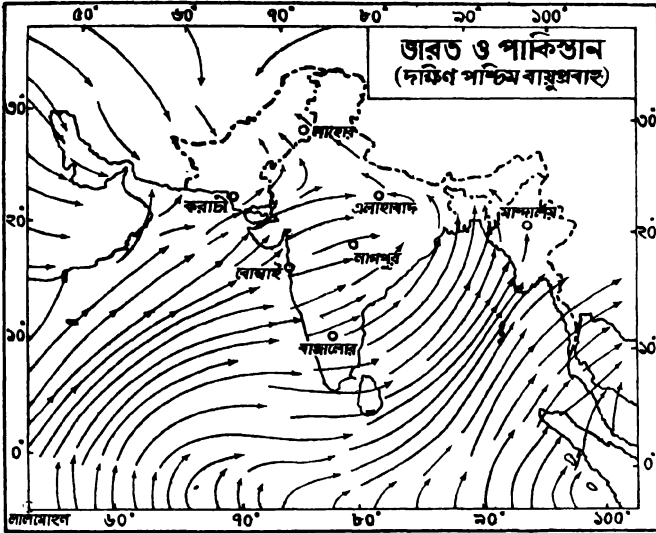
৭নং চিত্র

Courtesy : Indian Meteorological Office, Poona.

এইবার এই কয়েকটি কাল অবলম্বন করিয়া জলবায়ুর আলোচনা করিলে সমস্ত দেশের সারা বৎসরের জলবায়ু অধিগত করা সহজ হইবে।

(১) শীতকাল (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি)।—শীতকালে মধ্য-এশিয়ার উপরে **ঠাণ্ডা বেশী,** সুতরাং মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব্ব চীন হইতে ভারতবর্ষের উপর দিয়া পারস্য ও আরবদেশ পর্য্যন্ত এক **উচ্চচাপ**-বলয়ের সৃষ্টি হয়, এবং ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেও উচ্চচাপ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে দক্ষিণে সমুদ্রের উপর **নিম্নচাপের** সৃষ্টি হয়। বায়ু উচ্চচাপ-স্থলের দিক্ হইতে নিম্নচাপ-স্থলের দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সেজন্য ভারতের উত্তর ভাগে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, বা উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে এক ধীর বায়ুপ্রবাহ বহিতে থাকে ;—কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে **উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু** প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-ভারত উত্তর-পূর্ব্ব আয়নবায়ু-মণ্ডলে অবস্থিত। আয়নবায়ু

নিত্যবহ-বায়ু,—চিরদিন একই মুখে প্রবাহিত হওয়া উচিত। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এখানে সমুদ্র ও দেশের উপরের উত্তাপের পার্থক্যে এখানকার নিত্যবহ উত্তর-পূর্ব্ব বাতাসের গতিমুখ পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হইয়া যায় অথচ, অন্য সময়ে বায়ুর গতি ঠিকই থাকে। এই সময়ে আকাশ থাকে নির্ম্মল, দিনগুলি থাকে পরিষ্কার এবং বাতাসের আর্দ্রতা ও উত্তাপের পরিমাণ থাকে অল্প। কেবল, এই সময়ে পারস্যের দিক্ হইতে **পশ্চিমা বাতাসের** এক **প্রবাহ** উত্তর-ভারতের উপর দিয়া
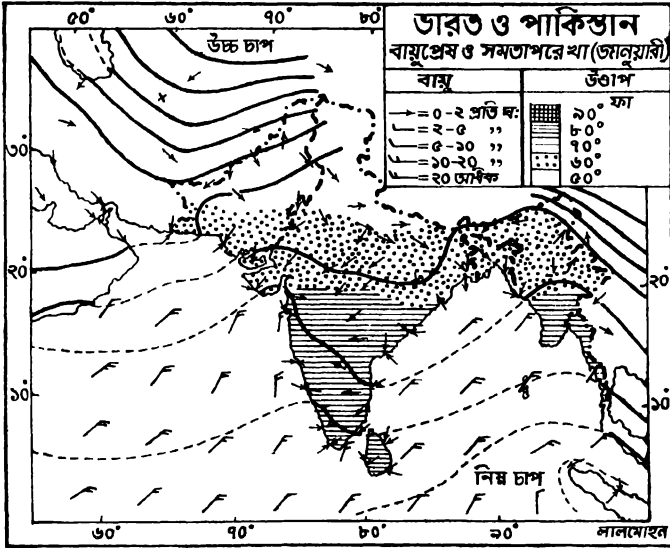
৮নং চিত্র

Courtesy : Indian Meteorological Office, Poona.

প্রবাহিত হয়। ইহার প্রভাবে অল্প বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত অবলম্বন করিয়াই পশ্চিম পাকিস্তানে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। কখনও -কখনও এই পশ্চিমা-আলোড়নের সময়ে শীতল বায়ুতরঙ্গ প্রবাহিত হয়, এবং তখন উত্তাপ স্বাভাবিক মাত্রা (normal) হইতে ১৫° হইতে ২০° পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

(২) গ্রীষ্মকাল (মার্চ্চ হইতে মে)।—এই সময়ে দেশের মধ্যে উত্তাপ বাড়িতে ও চাপ কমিতে থাকে, এবং সমুদ্রের উপর উত্তাপ কমিতে ও চাপ বাড়িতে থাকে। সুতরাং বায়ুর গতিও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুপ্রবাহের তেজ কমিয়া যায়, জলবায়ু ও স্থলবায়ু তীরসন্নিহিত স্থানে বাড়িতে থাকে। এই সময়েই প্রায়ই বৈকালে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ধূলিবর্ষণ হয়। বাতাস এই ঝড়ের

সময়ে পশ্চিমদিক হইতে আসে। তাই ইংরাজিতে ইহাকে বলে নরওয়েষ্টার (Nor--westers),—বাঙ্গালাদেশে ইহাকে বলে **কালবৈশাখী**।

গ্রীষ্মঋতু যতই বাড়িতে থাকে, উত্তাপও ততই বাড়ে, কিন্তু প্রধানতঃ দৈনিক তাপের ঊর্দ্ধসীমার দিকেই বৃদ্ধির মাত্রা বেশী। পশ্চিম রাজস্থানে ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবে
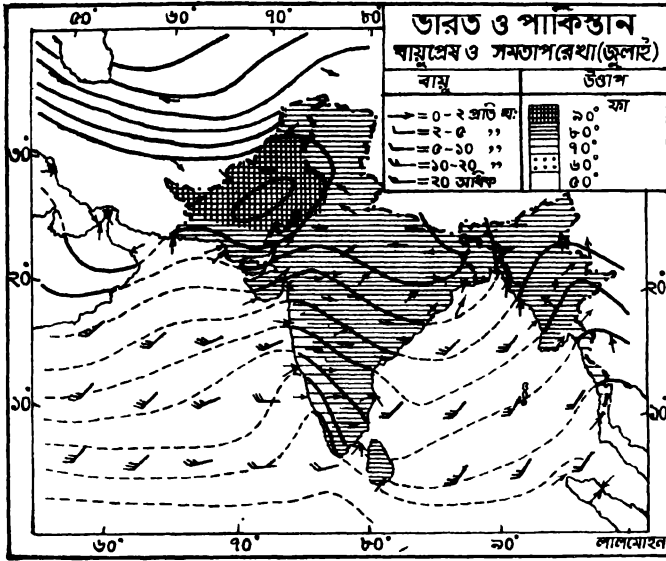
৯নং চিত্র

Courtesy : Indian Meteorological Office, Poona.

ঊর্দ্ধ উত্তাপ ১২০° ফা. ছাড়াইয়া যায়। মে মাসে দেশের প্রায় সমস্ত অংশেই দৈনিক নিম্নতাপ ৭০° ফা., কিন্তু উপদ্বীপ অংশের পূর্ব্ব অর্দ্ধে উত্তাপ ৮০° ফা. অতিক্রম করে।

এপ্রিল-মে মাসে ক্রমশঃ বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হয়, ও উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুর স্থানে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু বহিতে থাকে। এই পরিবর্ত্তনকালে দুই বায়ুর সংঘর্ষে ঝড়-বৃষ্টি হয়। এই সময়েই ভারতে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে।

(৩) মৌসুমকাল বা বর্ষা ও শরৎ কাল (জুন হইতে অক্টোবর)।— এই সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রধানতঃ বর্ষাকাল। মে মাসের শেষের দিকে দেশের মধ্যে উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ও সেজন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সেজন্য আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপরিস্থ উচ্চচাপের স্থান হইতে বায়ু দেশের নিম্নচাপের স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়, এবং ফেরেল-বিধি অনুসারে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু হইয়া যায়। এই সময়ে সূর্য্য তাহার উত্তরায়ণের প্রায় শেষসীমায়

আসিয়া পৌঁছায়, এবং সূর্য্যের গতির সহিত সমস্ত উত্তাপবলয়গুলিও উত্তরে সরিয়া যায়। সেজন্য দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দক্ষিণ-পূর্ব্ব আয়ন বায়ুবলয় উত্তরে সরিয়া বিষুবরেখার উত্তরে আসিয়া পৌঁছে। কিন্তু উত্তর-গোলার্দ্ধে বায়ুর গতির দিক্ দক্ষিণ-গোলার্দ্ধের দিক্ অপেক্ষা বিপরীত। সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব আয়নবায়ু বিষুবরেখার উত্তরে আসিলেই দক্ষিণ--পশ্চিম বায়ু হইয়া যায়, এবং এখানকার পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর সহিত মিলিয়া তাহার বল বৃদ্ধি করে। এই বায়ু প্রকৃতপক্ষে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু-অঞ্চলে প্রবাহিত—ইহা নিত্যবহ,—ইহা গ্রীষ্মের মরসুমে স্থানীয় কারণে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু হইয়াছে—তাই ইহার নাম দক্ষিণ-পশ্চিম মরসুমী বা মৌসুমি বায়ু। ইহা সমুদ্র হইতে স্থলে আসিতেছে। তাই ইহা জলগর্ভ।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর দুইটি প্রধান শাখা—(১) আরব সাগর শাখা, ও (২) বঙ্গোপসাগর শাখা।

(১) জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মালাবার উপকূলে আরব সাগর হইতে মৌসুমি--বায়ু প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং ক্রমশঃ গ্রীষ্মবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিকে ও দেশের ভিতরের দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। **আরব সাগর শাখার**ও আবার দুই অংশ। এক অংশ পশ্চিম-ঘাটের পশ্চিম-পার্শ্ব বাহিয়া উপরে উঠিবার কালে পশ্চিমের উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পরে পশ্চিম-ঘাট অতিক্রম করিয়া যখন নামিতে থাকে, তখন বৃষ্টিপাত কম হয় ও অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত করিতে-করিতে উপদ্বীপ-অংশ উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হয়।

আরব সাগর শাখার অন্য এক অংশ সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও সিন্ধুর উপকূলে কথঞ্চিৎ বৃষ্টিপাত করিয়া রাজস্থানের দিকে অগ্রসর হয়, এবং আরাবলী পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে প্রতিহত হইলে সেখানে কিছু বৃষ্টিপাত করে। ইহা যতই উচ্চ তাপের দেশে অগ্রসর হয়, ততই ইহার জলকণা-ধারণের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, এবং জলকণার ঘনীভবনের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সেজন্য আরব সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহের এই অংশ দ্বারা বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না।

(২) বঙ্গোপসাগরের শাখা দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুরূপে তেনাসেরিম ও আরাকান উপকূলে বৃষ্টিপাত করে। ইহার একশাখা বঙ্গদেশের দক্ষিণ হইতে উত্তরে যায়,—এবং বঙ্গদেশে ও আসামে সেজন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপ প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ও পরে পশ্চিম দিকে যায়। সুতরাং বঙ্গদেশ ও আসামের উপরিস্থ মৌসুমি বায়ু হিমালয়ের পাদদেশ বাহিয়া পশ্চিমে নিম্নচাপ স্থানের দিকে চলিতে থাকে, এবং সেজন্য গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরে উত্তর-ভারতে বৃষ্টিপাত হয়।

এই সময়ে, পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে যে-উপকূল, সেখানে ১০০″ ই. ও তদপেক্ষা বেশী বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু পশ্চিমঘাটের পূর্ব্বে মোটামুটি ২০ হইতে ৩০ ই. বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর আসামেও এই বর্ষাকালে ১০০ ই. ও তদূর্দ্ধ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে,—এবং সেখান
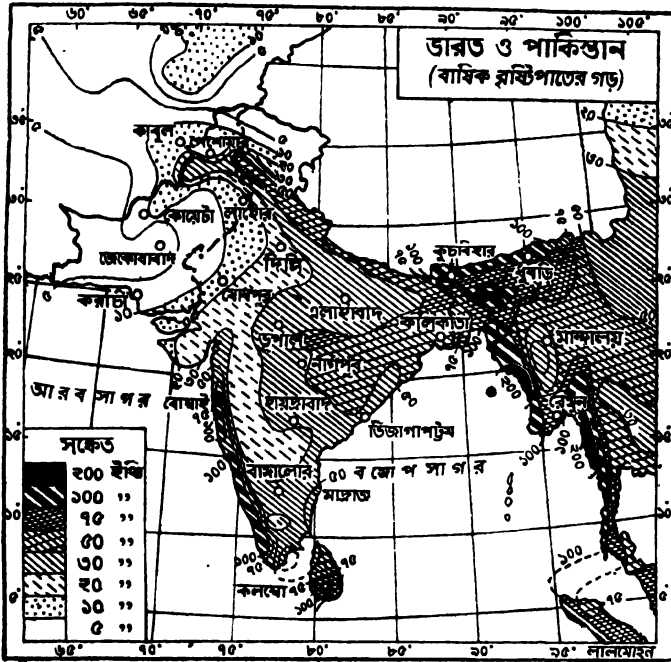
১০নং চিত্র

Courtesy : Indian Meteorological Office, Poona.

হইতে পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশে বৃষ্টিপাত ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সমস্ত ভারতবর্ষেই এই সময়ে উত্তাপ কম হয়।

(৪) মৌসুমী-পরবর্ত্তী সময় (অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর)।—সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পাঞ্জাব ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়, এবং ক্রমশঃ শীতের সূচনা বুঝিতে পারা যায়। যতই দিন যাইতে থাকে, ততই উত্তর-পশ্চিম ভাগের নিম্নচাপ দূরীভূত হয়, এবং বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বঙ্গোপসাগরের উপর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ধীরে-ধীরে অপসরণ করিতে থাকে, এবং উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমি বায়ু, অর্থাৎ স্বাভাবিক উত্তর-পূর্ব্ব আয়ন বায়ু, তাহার স্থান অধিকার করিতে থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া যাইবার

সময়ে জলগর্ভ হয়। অপসারণপর দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু এই সময়ে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুতাড়িত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতের করোমাণ্ডাল উপকূলে পৌছিয়া সেখানে বৃষ্টিপাত করে। এই সময়ে আগচ্ছমান উত্তর-পূর্ব্ব, এবং অপস্রিয়মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সংঘর্ষে ঝড়বৃষ্টি হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও অরণ্য-সম্পদ্

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের পার্থক্যের হেতু, মরুভূমি, তৃণভূমি, বনভূমি, বনগুলির পরিচয়, বনের পরিমাণ, বৃক্ষের শ্রেণীভেদ, বনের শ্রেণীভেদ, বনবিভাগ, বনবিভাগ--পরিচালনা, কাষ্ঠের ব্যবহার (utilisation), বনজ শিল্পদ্রব্য, আমদানি ও রপ্তানি, পাকিস্তানের বন।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ।—পৃথিবীর যে-সকল অংশে আদৌ মনুষ্য-সমাগম হয় নাই, সেই সকল দেশে স্বভাবতঃ যে-উদ্ভিজ্জ জন্মে, তাহাকে বলে **স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ**। মনুষ্য-সমাগম হইলে মানুষ এই সকল উদ্ভিজ্জ নষ্ট করিয়া দেশের জমি নিজ ব্যবহারে লাগায়। লোকবসতি অত্যন্ত ঘন হইলে এই সকল দেশের যে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ কি, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না।

উদ্ভিজ্জের পার্থক্যের হেতু।—সাধারণতঃ (১) **বৃষ্টিপাত**, (২) **উত্তাপ**, ও (৩) **উচ্চাবচতা**,—ইহাদের প্রভাবে উদ্ভিজ্জের পার্থক্য হইয়া থাকে।

(১) বৃষ্টিপাত।—উদ্ভিজ্জের উপর বৃষ্টিপাতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বৃষ্টিপাতের ন্যূনাধিক্যবশতঃ কোন স্থানের বায়ুর আর্দ্রতার ন্যূনাধিক্য হয়, এবং এই আর্দ্রতার উপরেই উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি নির্ভর করে। খুব মোটামুটিভাবে বলা যায়,—কোন স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০ ই. পর্য্যন্ত হইলে সেখানে **মরু-উদ্ভিজ্জ** জন্মে ;—১০ ই. হইতে ২০ ই. পর্য্যন্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের স্থানে কেবল **তৃণ জন্মে,**—বৃক্ষ জন্মে না। তাহার বেশী বৃষ্টি হইলে বৃক্ষ জন্মে। বৃষ্টি যত বেশী হইতে থাকে, বৃক্ষ ততই বেশী হইতে থাকে, এবং ঘাস ততই কমিতে থাকে। বৃষ্টির পরিমাণ কম হইলে ঘাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বাড়ে ও গাছ কম হয়। অত্যন্ত উত্তাপ-প্রধান স্থানে ৬০ ই. বৃষ্টিপাত হইলে সেখানে **স্থায়ী বনভূমি** হয়। এরূপ স্থলে ৬০ ই. অপেক্ষা বৃষ্টিপাত কম হইলে, সেখানে তৃণও জন্মে, বৃক্ষও জন্মে,—অর্থাৎ সে-স্থান **স্যাভানা-ভূমি** (Savannah)।

বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিজ্জের যে-সম্পর্ক প্রদর্শিত হইল, ইহা নিতান্ত মোটামুটি হিসাবে সত্য। কারণ, যে-পরিমাণ বৃষ্টিপাতে উত্তাপ-প্রধান স্থানে যে-উদ্ভিজ্জ জন্মে, শীতপ্রধান স্থানে কিন্তু সেই অবস্থায় অন্য উদ্ভিজ্জ জন্মে। কারণ, উত্তাপ-প্রধান স্থানে যতটা বৃষ্টির জল বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়, শীতপ্রধান দেশে ততটা বৃষ্টির জল বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না এবং ইহার জন্য বায়ুর আর্দ্রতার ইতরবিশেষ হয়। যেমন, হিমশীতোষ্ণ অঞ্চলের কোন মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানে ২০ ই. বৃষ্টিপাত হইলে বৃক্ষ জন্মিতে পারে, কিন্তু উষ্ণশীতোষ্ণ স্থানের এরূপ স্থলে ২০ ই. বৃষ্টিপাত হইলে তৃণমাত্র জন্মে ;—শেষোক্ত স্থানে গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবন বেশী হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের তারতম্য অত্যন্ত বেশী ;—দক্ষিণাপথ উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে ও আসামের পূর্ব্বভাগে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ ই. হইতে ২০০ ই.,—চেরাপুঞ্জীতে প্রায় ৫০০ ই.,—দেশের মধ্যভাগে ৫০ ই. হইতে ৭৫ ই.,—রাজপুতানা অঞ্চলে ১০ ই. হইতে ৩০ ই.। বৃষ্টিপাতের এই পরম পার্থক্যের জন্য স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জেরও চরম পার্থক্য রহিয়াছে।

(২) উত্তাপ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে উত্তাপের পার্থক্য কম নহে; উত্তাপ-প্রধান মরুভূমি হইতে শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত সকল রকমের স্থানই এদেশে রহিয়াছে। ইহার বার্ষিক সর্ব্বোচ্চ তাপ সিমলায় ৭৫'১ ডিগ্রি ফা., ও দার্জ্জিলিং সহরে ৬৪'৯ ডিগ্রি ফা., কানপুরে ১০২'৭° ; এবং সর্ব্বনিম্ন তাপ সিমলায় ৩৫'৪°, দার্জ্জিলিং সহরে ৩৫'৪°, কানপুরে ৮৩'০°। পাকিস্তানের অন্তর্গত জেকোবাবাদে সর্ব্বোচ্চ তাপ—১১৩'৯°, সর্ব্বনিম্ন তাপ—৪৩'৮°., এবং লাহোরে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন বার্ষিক উত্তাপ ১০৫'১° ও ৪০'১° ডি. ফা.। যে-দেশের বিভিন্ন অংশে একই সময়ে, এবং একই অংশে শীত-গ্রীষ্মে উত্তাপের পার্থক্য এত বেশী, সেদেশে বায়ুর আর্দ্রতার পার্থক্য যে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের উপর কত বেশী প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(৩) উচ্চাবচতা।—সমুদ্র-সমতল হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জ জন্মিবার উচ্চতম প্রদেশ অপেক্ষাও উচ্চতর অংশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ এই উচ্চতার পার্থক্যে উদ্ভিজ্জের বিভিন্নতা হইবেই। তদুপরি দেশের অত্যুচ্চ স্থানগুলি বায়ুপ্রবাহে বাধা সৃজন করিয়া কোথাও বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটাইতেছে, কোথাও বা উত্তাপের ইতরবিশেষ সম্পাদন করিতেছে। ইহাতেও পাকিস্তানে ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের প্রকারভেদ ঘটিতেছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিচার করিলে ভারত ও পাকিস্তানকে নিম্নলিখিত স্বাভাবিক

উদ্ভিজ্জ-অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারা যায়,—যথা,—১। **মরুভূমি** ও **গুল্মভূমি**, ২। **তৃণভূমি**, ও ৩। **বনভূমি**।

১। **মরুভূমি ও গুল্মভূমি**।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম ভাগে ও পশ্চিম-পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে থার মরুভূমি অবস্থিত। এই মরু সিন্ধু--উপত্যকায় বহুদূর প্রবেশ করিয়াছে। এই মরু ও ইহার সংলগ্ন মরুপ্রায় ভূমিতে বৃষ্টিপাত ২০" অপেক্ষা কম ;—তাই খর্ব্বাকার ঝোপই এখানকার উদ্ভিজ্জ। প্রকৃতপক্ষে এখানে যে-উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহা মরুভূমির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে ;—এই উদ্ভিজ্জ অন্য দেশে বৃষ্টিবিরল স্থানের শুষ্ক বনে দেখিতে পাওয়া যায়। খয়ের এখানকার একটি বৃক্ষ। এখানকার গাছের শিকড় দীর্ঘ হয়।

২। **তৃণভূমি**।—পার্ব্বত্য বনভূমিতে পর্ব্বতের প্রতিবাত-পার্শ্বে, মধ্যভারতের মালভূমিতে, ও দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলির মধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমিতে বৃষ্টিপাত ১৫ ই. হইতে ৩০ ই.। বৃষ্টির অল্পতার জন্য এখানে তৃণ জন্মে, এবং খর্ব্বকায় বৃক্ষ ও কাঁটাঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসকল বৃক্ষের অধিকাংশ অন্য উপযুক্ত স্থানে জন্মিলে দীর্ঘতর হইতে পারে। কিন্তু এখানে এইসকল বৃক্ষ খর্ব্বাকার,—মরুপ্রদেশের বৃক্ষের ন্যায় তাহাদের শিকড় দীর্ঘ, এবং সেই শিকড় দিয়া ইহার রস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। এইসকল বৃক্ষসংযুক্ত তৃণভূমি স্যাভানারই অনুরূপ। গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিম অংশে পলাশ, শিমূল, বেড়, প্রভৃতি বৃক্ষ সহযোগে স্যাভানা শ্রেণীর তৃণভূমি রহিয়াছে।

৩। **বনভূমি**।—ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বনভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী,—তৃণভূমি নিতান্ত কম, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে মরু-অঞ্চলেও নানা খর্ব্ব বৃক্ষের ঝোপ জন্মে। ১৯৪৬-৪৭ সালের গবর্ণমেণ্ট-প্রদর্শিত হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষে সমগ্র জমির **২৫·২ শতাংশ বনাচ্ছন্ন**।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃষ্টির তারতম্যানুসারে বনভূমি বা তৃণভূমি হয়। আবার, এই বৃষ্টির ন্যূনাধিক্য বশতঃই বৃক্ষের শ্রেণীবিভাগ হয় ;—যেমন,—সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ডাড্‌লে স্ট্যাম্পের মতানুসারে, যেখানে ৮০ ই. ও তদধিক বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে **চিরহরিৎ বৃক্ষ** (Evergreen tree),—যেখানে ৪০ হইতে ৮০ ই. বৃষ্টিপাত হয় সেখানে **পর্ণমোচী বৃক্ষ** (Deciduous tree),—২০ হইতে ৪০ ই. বৃষ্টিপাতের স্থানে **খর্ব্ব বৃক্ষ** ও **তৃণ**,— এবং ২০ ই. অপেক্ষা কম বৃষ্টির স্থানে **মরু-উদ্ভিজ্জ** জন্মে।

বিভিন্ন অঞ্চলের বনগুলির পরিচয়

১। **মরুভূমি**।—মরুভূমির খর্ব্ববৃক্ষের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

২। **পূর্ব্ব-হিমালয়ের বন**।—নেপালের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে আসামের

শেষ পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত অংশকে **পূর্ব্ব-হিমালয়** বলিয়া এস্থলে গ্রহণ করা হইল। হিমালয়ের পাদদেশে যে তরাই ও পাহাড়-অঞ্চল আছে, তাহাও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হইল। পৃথিবীর উষ্ণতম নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে মেরুপ্রদেশ
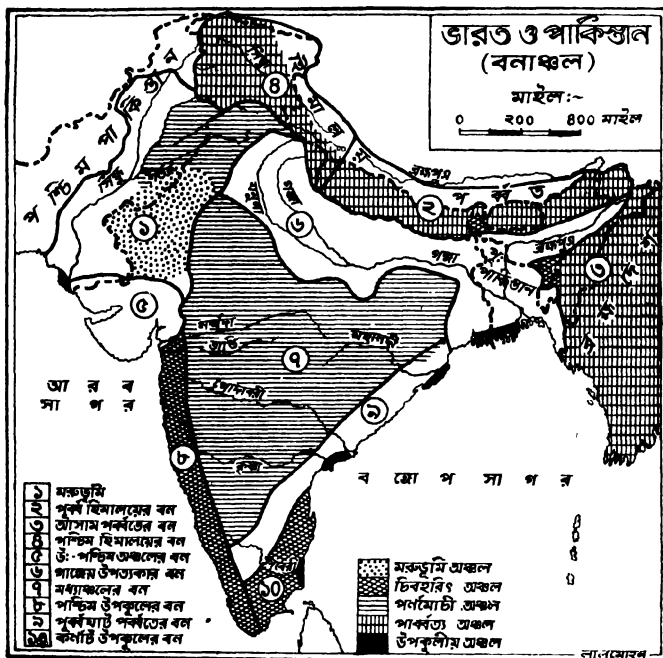
১১নং চিত্র

দ্রষ্টব্য।—ম্যাপের ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি পুস্তকের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ-অঞ্চলের বিভাগের অনুরূপ সংখ্যার উদ্ভিজ্জজ্ঞাপক।

পর্য্যন্ত অংশের যেমন উত্তাপ ক্রমশঃ কমিতে-কমিতে হিমমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে ও সেজন্য সেস্থান চির-বরফাচ্ছন্ন হইয়াছে, হিমালয়াদি উচ্চ পর্ব্বতেরও সেইরূপ পাদদেশ হইতে উপরের দিকে ক্রমশঃ উত্তাপ কমিতে থাকে, এবং তাহার উচ্চতম প্রদেশে চিরতুষার বিরাজ করে। ভারতবর্ষ মোটামুটি নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত,—সেজন্য ইহার বনভূমিকে নিরক্ষীয় বনভূমি বলা হয়। এজন্য হিমালয়ের পাদদেশ হইতে উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত বনগুলিকে উত্তাপভেদে নানাভাগে ভাগ করা হয়; যেমন,—**(ক) নিরক্ষীয়** বা গ্রীষ্মদেশীয় (Tropical) বনভূমি, **(খ) নিরক্ষ-প্রান্তীয়** (Sub-tropical) বনভূমি, **(গ) নাতিশীতোষ্ণ** (Temperate)

বনভূমি, **(ঘ) পর্ব্বতের উচ্চদেশীয়** (Alpine) বনভূমি। ইহার উপরে তুষারভূমি।

(ক) নিরক্ষীয় বনভূমি (৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত)।—ইহার দক্ষিণ ভাগে অস্বাস্থ্যকর তেরাই (Terai) অঞ্চল, এবং উত্তর অংশে হিমালযের সন্নিকটে পাহাড়--বহুল উচ্চভূমি। জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং, কালিম্পং, উত্তর-আসাম এই অংশে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত পূর্ব্বভাগে মোটামুটি ১০০ ই.। এই অঞ্চলে ঘাস আছে বটে, কিন্তু চিরহরিৎ-প্রায় (Semi-evergreen) বনভূমিও আছে। পাহাড়ের গাত্র বনাচ্ছন্ন, এবং শালই সেখানে প্রধান বৃক্ষ।

(খ) নিরক্ষ-প্রান্তীয় (Sub-tropical) **বনভূমি** (৩০০০—৬০০০ ফিট্)।—উষ্ণমণ্ডলের প্রান্তভাগে ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রথমভাগে এই বনভূমি অবস্থিত। এই অংশে চিরহরিৎ ওক ও চেষ্টনাট,—এবং উত্তর ভাগে অল্‌ডার ও বার্চ্চ প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষ জন্মে। এখানে গর্জ্জন গাছও আছে, এবং যেখানে বালুকাময শুষ্কভূমি সেখানেই মাত্র অল্প পাইন-জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পাইন--অঞ্চল আরও উচ্চে। এখানকার বন ঘন ও বৃক্ষগুলিও একশত-দেড়শত ফিট্ উচ্চ।

(গ) নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) **বনভূমি** (৬০০০—৯০০০ ফিট্)।—নেপাল, পূর্ব্ব- ও পশ্চিম-বঙ্গ ও আসামের পর্ব্বতপ্রদেশের উচ্চাংশে চিরহরিৎ ওক ও চেষ্টনাট বৃক্ষের ঘন বন দেখিতে পাওয়া যায। ম্যাপ্‌ল, এল্‌ম্, প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পর্ব্বতের উচ্চদেশীয় (Alpine) **বনভূমি** (৯০০০—১৬০০০ ফিট্)।—এই বিভাগের দক্ষিণ অংশে—মোটামুটি ১২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত অল্প নীল-পাইন (Blue pine), রৌপ্য-পাইন (Silver pine), জুনিপার, প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ (Conifers) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে,—সরলবর্গীয় বৃক্ষের প্রাদুর্ভাব হিমালয়েই বেশী,—এবং এখানে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার। এই মণ্ডল হইতে গাছগুলি খর্ব্ব হইতে-হইতে ১৬০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত গিয়া লোপ পাইয়াছে। খর্ব্ব বার্চ্চ, রোডোডেনড্রন ও সরলবর্গীয় বৃক্ষাদি মিলিয়া এখানে ঘন বনের সৃষ্টি করিয়াছে।

পর্ব্বতের উচ্চদেশে ১২০০০ হাজার ফিটের উপরে তৃণভূমি,—তাহার মধ্যে-মধ্যে খর্ব্ব রোডোডেনড্রেন ও খর্ব্ব জুনিপার প্রভৃতির গাছ। এই ঘাসের মাঠ উৎকৃষ্ট পশু--চারণ-ক্ষেত্র। গ্রীষ্মে এই তৃণাঞ্চল ফুলের শোভায় বিচিত্র হইয়া উঠে।

ষোল হাজার ফিটের উত্তরেই তুষারভূমি।

৩। আসাম পর্ব্বতের বনভূমি।—নাগা, খাসি ও মণিপুর পাহাড়ে

৩০০০ ফিটের ঊর্দ্ধে পশ্চিম-হিমালয়ের চির্-পাইনের (Chir pine) ন্যায় খাসিয়া--পাইনের বন আছে।

৪। **পশ্চিম-হিমালয়ের বনভূমি।**—কাশ্মীরের উত্তর-প্রান্ত হইতে পশ্চিম-ভূটান পর্য্যন্ত হিমালয়ের অংশকে **পশ্চিম-হিমালয়** বলা হয়। পূর্ব্ব--হিমালয় অপেক্ষা এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম,—এবং বৃষ্টিপাত পশ্চিমে ক্রমশঃ কম হইয়াছে। বৃষ্টির তারতম্যানুসারে এই অঞ্চলে প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের
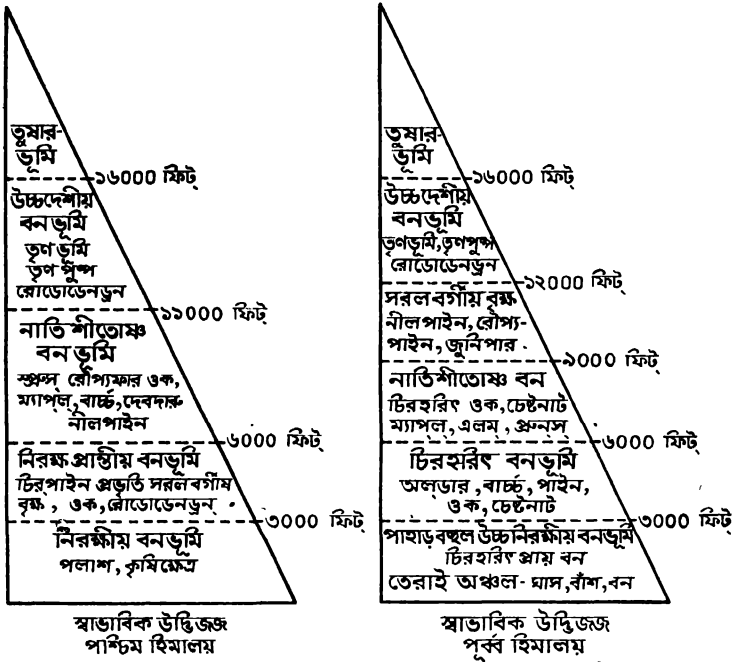
১২নং চিত্র

বন আছে। একে ত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, তদুপরি কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের অঞ্চল অধিকতর উত্তরে অবস্থিত। সেজন্য উচ্চতা-অনুসারে বনভূমির মণ্ডল-বিভাগ সহজ নহে,—এবং পূর্ব্ব-হিমালয়ের মণ্ডলের সহিত এখানকার মণ্ডলের সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যও নাই।

(ক) নিরক্ষীয় বা গ্রীষ্মদেশীয় (Tropical) **বনভূমি** (৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত)। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চি,—সুতরাং পূর্ব্ব-হিমালয়ের অঞ্চলের ন্যায় এখানে ঘন বন নাই। এই অঞ্চলের নিম্নাংশ পূর্ব্ব-হিমালয়ের তেরাই অঞ্চলের মত অস্বাস্থ্যকর নহে। এই নিম্নাংশে পাহাড়শ্রেণী আছে। এই অঞ্চল

কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং এই অঞ্চলের নদীগুলির জল জমিতে সেচনার্থ ব্যবহৃত হয়। এইজন্য পশ্চিম-হিমালয়ের এই অঞ্চলেও কতকগুলি সহরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলে পলাশ প্রধান বৃক্ষ ;—ফুল ফুটিলে ইহার বনক্ষেত্র যেন অগ্নিক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। পলাশ ও এই অঞ্চলের অন্য-অন্য গাছের কাঠ প্রধানতঃ জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

(খ) নিরক্ষ-প্রান্তীয় (Sub-tropical) **বনভূমি** (৩০০০-৬০০০ ফিট্)।—চির্-পাইন-শ্রেণীর সরলবর্গীয় বৃক্ষ এখানকার প্রধান বৃক্ষ। ওক ও রোডোডেনড্রন বৃক্ষও এই বনে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) **বনভূমি** (৬০০০-১১০০০ ফিট্)।—দক্ষিণের পাইন-জাতীয় বন এই বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে, এবং চির্-পাইনের পরিবর্ত্তে দেবদারু ও পরত্তাল (Blue pine) বৃক্ষের ও এই বিভাগেব উত্তর অংশে স্প্রুস্, রৌপ্য-ফার (Silver fir) প্রভৃতির মিশ্রিত বিস্তৃত বন আছে। কোথাও-কোথাও একই বৃক্ষের পৃথক্ বনও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকলই নরম কাঠের গাছ। কিন্তু কোথাও-কোথাও চিরহরিৎ ওক, ম্যাপ্‌ল্, বার্চ্চ ও এল্‌ম্ প্রভৃতি প্রশস্তপত্র ও শক্তকাঠের বৃক্ষও এই বিভাগেব বনে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পর্ব্বতের উচ্চদেশীয় (Alpine) **বনভূমি** (১১০০০-১৬০০০ ফিট্)।—পূর্ব্ব-হিমালযের এই বিভাগের বনভূমির তুল্য।

এই বিভাগের উত্তবেই চিরতুষারভূমি।

৫। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বন।—কচ্ছ, গুজরাট, পশ্চিম--রাজপুতানা, প্রভৃতির স্থান মরুপ্রায় ভূমি,—এখানকার জমিও লবণযুক্ত। শিমূল, পপিতা, খয়ের, বাবলা, শাল, ঝাউ প্রভৃতির অতি-পাতলা বন এই অঞ্চলে আছে। এখানে গাছগুলি খর্ব্ব হইয়া যায়।

৬। গাঙ্গেয় উপত্যকার বন।—গাঙ্গেয় উপত্যকা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কৃষিভূমি, এবং এখানে লোকবসতিও বিশেষ ঘন। সেজন্য এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নাই বলিলেই চলে। এক সময়ে যে ইহা শালবনে আবৃত ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে **সুন্দর-বন** নামক বনে আবৃত ইহার ব-দ্বীপ অংশেই মাত্র গভীর বন আছে।

গাঙ্গেয়-উপত্যকা-উদ্ভিজ্জের বর্ত্তমান প্রকৃতি হিসাবে ইহাকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—(ক) পশ্চিম-গাঙ্গেয় উপত্যকা, (খ) মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা, ও (গ) গাঙ্গেয় উপত্যকার ব-দ্বীপ অংশ।

(ক) পশ্চিম-গাঙ্গেয় উপত্যকা।—মোটামুটি পশ্চিম প্রান্ত হইতে উত্তর প্রদেশের বানারাস সহর পর্য্যন্ত গঙ্গা ও তাহার উপনদীগুলির উপত্যকা এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটিভাবে ইহা গরম অঞ্চল, এবং ইহার উদ্ভিজ্জও তদুপযোগী। এই অঞ্চলের স্যাভানা-ভূমির কথা পূর্ব্বেই (৩৭ পৃ.) বলিয়াছি।

(খ) মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকার উদ্ভিজ্জ বিহার, উড়িষ্যার কিয়দংশ, বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল স্থান এক্ষণে কৃষিক্ষেত্র ও ফলের বাগানে পরিণত হইয়াছে।

(গ) ব-দ্বীপের বন।—গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপে চিরহরিৎ বৃক্ষযুক্ত সুন্দর-বন নামে এক গভীর বন আছে। ইহার সমুদ্রতীরে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতজ (Tidal) বৃক্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে ওড়চাকা, কেওড়া, গরাণ, সুন্দরী, গেঁও, পশুর প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এইসকল বৃক্ষের কতকগুলি চামড়া রং করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রতীরে বিস্তর গোলপাতা হয়। গোলপাতা দরিদ্রের ঘরের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বনে সেগুণ-গাছও বিস্তর পাওয়া যায়। এখানকার বনের তলদেশে সোলার ন্যায় একপ্রকার কোঁড় মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়। গাছের মাটির মধ্যস্থ শিকড় হইতে এগুলি বাহির হয়।

৭। মধ্যাঞ্চলের বন।—উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা, পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট, এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট,—এই সীমার মধ্যবর্ত্তী অংশ প্রধানতঃ পর্ণমোচী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সেগুণ ইহার সর্ব্বত্র জন্মে। গোদাবরী নদী হইতে উত্তরাংশে শাল জন্মে। সাটিন বৃক্ষ, মহীশূর অঞ্চলের চন্দনবৃক্ষ, চিক্রাশি (আসাম প্রদেশে ইহার নাম—বোগাপোমা), পত্রাঙ্গ (Soymida), তুন, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষই এই অঞ্চলে প্রধান। এখানকার গাছ ১০০ হইতে ১৫০ ফিট্ উচ্চ হয়।

৮। পশ্চিম-উপকূলের বন।—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম-উপকূলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী। সেজন্য এখানে যেরূপ চিরহরিৎ বৃহৎ বৃক্ষের বন আছে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্র কোথাও এরূপ বন নাই। ইহার উপকূলে বালুকাময় স্থানে নারিকেল, নদীর পার্শ্বে সুপারী বন, গর্জ্জন, মেসুয়া, চিক্রাশী, শিশু, ছোপিয়া, তুন, পুন, বিশপ, প্রভৃতি প্রধান বৃক্ষ। পর্ব্বতের পূর্ব্ব ভাগে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানতঃ মহীশূরের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ জন্মে। নিকৃষ্ট দারুচিনি ও এলাচির গাছও এই বনে জন্মে।

৯। পূর্ব্বঘাট-পর্ব্বত প্রদেশ।—এখানে গর্জ্জন, পিয়াশাল, বাবলা, পলাশ, জারুল, অর্জ্জুন ও সেগুণ গাছের বন আছে। কিন্তু এই বন পশ্চিমঘাটের বনের মত ঘন নহে। ইহার মধ্যে-মধ্যে তালজাতীয় বৃক্ষ আছে। উত্তর ভাগে কুঁচেলা ও আবলুস্ গাছ জন্মে।

১০। কর্ণাট উপকূল।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব-উপকূলের দক্ষিণ অংশে কর্ণাট উপকূলে উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমি বায়ুপ্রভাবে যে-বৃষ্টিপাত হয়, তাহা পশ্চিম উপকূলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষা কম। সেজন্য এখানে প্রধানতঃ পশ্চিম উপকূলের বৃক্ষাদি জন্মিলেও তাহা আকারে ছোট হয়। তেঁতুল, নিম, আবলুস, প্রভৃতি এই বনের প্রধান বৃক্ষ।

এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের নদীমুখেও বন আছে।

পশ্চিম-পাকিস্তানে,—সিন্ধুনদের অববাহিকা বৃষ্টিবিরল স্থান। সেজন্য ইহা মরুপ্রায় ভূমি, এবং এখানকার উদ্ভিজ্জ—গুল্ম, খর্ব্ববৃক্ষ ও কাঁটাঝোপ আকারে দেখা যায়। বাবলা একটি প্রধান বৃক্ষ। বেলুচিস্তানে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে, পশ্চিম-পাঞ্জাবের লবণ পর্ব্বতে, চিত্রল পাহাড়ে—দেবদারু, পাইন, ফার, এবং ওয়ালনট্, চেষ্টনট, ম্যাপল্, প্রভৃতি চিরহরিৎ বন আছে। কিন্তু পশুচারণ, বৃক্ষচ্ছেদন, প্রভৃতির দ্বারা এখানকার বন নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে—পূর্ব্ববঙ্গ গাঙ্গেয় উপত্যকার ব-দ্বীপ বিভাগের অন্তর্গত। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের বনের পরিমাণ

অবিভক্ত ভারতে, বৃটিশভারতে মোট ১৬০,৩০৬ বর্গমাইল বন ছিল (১৯৪৬-৪৭)। প্রদেশভেদে উহা নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত ছিল।

প্রদেশ	মোট বন (বর্গ মাইল)	মোট জমির যত শতাংশ
আসাম	২১,৬৩৭	৩৯·০
পশ্চিমবঙ্গ	৪,২৩৪	১৫·২
বিহার	৯,৯৪৭	১৪·৩
উত্তর-প্রদেশ	১৭,৩৭২	১৬·৪
পাঞ্জাব	৪,৭৬১	১২·৩
উড়িষ্যা	৪,৪৯২	১৩·৭
মধ্যপ্রদেশ	৪৭,০৫৭	৪৭·৭
আজমীর	৫৯৩	২৫·১
বোম্বাই	১২,৮৭২	১৬·৯
কুর্গ	১,১৭৫	৭৪·৩
মান্দ্রাজ	৩৩,৬৬৬	২৬·৯
আন্দামান নিকোবর	২,৫০০	১০০·০
মোট	১৬০,৩০৬	২৫·২

ঐ বৎসর দেশীয় রাজ্যে ১০,৯৭৮ বর্গমাইল বন ছিল। সুতরাং সমগ্র ভারতে মোট বনের পরিমাণ ১৭১,২৮৪ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র অবিভক্ত ভারতের মোটামুটি ১৩ শতাংশ বন ছিল।

বৃক্ষের শ্রেণীভেদ।—উপরে যে-বনগুলির উল্লেখ করা হইল, তাহার বৃক্ষাদি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) চিরহরিৎ, (২) পর্ণমোচী, (৩) সরলবর্গীয়, ও (৪) স্রোতজ।

(১) চিরহরিৎ বৃক্ষ।—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে, কর্ণাট উপকূলে, আসামের উত্তরাংশে, ও পূর্ব্ব হিমাচল-অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে। গর্জ্জন, হোপিয়া, চিক্রাশী, পুন, তুন, শিশু, বিশপ, লাকুচ, আবলুস প্রভৃতি বৃক্ষ চিরহরিৎ। বাঁশও এই চিরহরিৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত। পর্ব্বতের উচ্চ অংশে বৃষ্টিবহুল স্থানে অনেক পর্ণমোচী বৃক্ষ চিরহরিৎ হইয়া যায়।

(২) পর্ণমোচী বৃক্ষ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মালভূমি অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। শাল, সেগুণ, পিয়াশাল, পাদাউক, চন্দন, অর্জ্জুন, জারুল, পত্রাঙ্গ (Soymida), শিরিশ, বাবলা, নিম, তেঁতুল, আবলুস প্রভৃতিই প্রধান পর্ণমোচী বৃক্ষ।

(৩) সরলবর্গীয় বৃক্ষ।—সরলবর্গীয় বৃক্ষের মধ্যে পাইন জাতীয় বৃক্ষই প্রধান। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরে ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য অংশে ইহা জন্মে।

(৪) স্রোতজ বৃক্ষ।—ইহা সাধারণতঃ নদীর ব-দ্বীপে জন্মে। সুন্দরী, পশুর, ওড়চাকা প্রভৃতি বৃক্ষ ও গোলপাতা প্রভৃতি তাল-জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান স্রোতজ বৃক্ষ। ইহা লবণজলপূর্ণ নদী- ও সমুদ্র-তীরে জন্মে।

এই সকল বৃক্ষে গঠিত বনভূমির ইহাদের নামেই নামকরণ হয়। যেমন,—চিরহরিৎ বৃক্ষের বন, সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন, ইত্যাদি।

বনের শ্রেণীভেদ।—রক্ষণকার্য্যের পার্থক্য হিসাবে বনগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়,—**(১) খাস বন** (Reserve Forest)—এই বনে কেহ বনরক্ষকের অনুমতি ব্যতীত গাছ কাটিতে বা পশুচারণ করাইতে পারে না। বনরক্ষক এই বনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন;—**(২) রক্ষিত বন** (Protected Forest)—এই বনে স্থানীয় লোকের পশুচারণের, জ্বালানি কাষ্ঠ ও পশুখাদ্য সংগ্রহের অধিকার আছে। বনরক্ষক এই সকল কার্য্যের হিসাব রাখিয়া থাকেন;—**(৩) অ-শ্রেণী বন**—(Unclassified Forest)—এই বনে বনজ দ্রব্য ব্যবহার করার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই, এবং ইহার তত্ত্বাবধানেরও বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

আবশ্যকতা-অনুসারে বনের অন্যরূপ শ্রেণীবিভাগও হইয়া থাকে। যেমন,—**(১) কাষ্ঠ-প্রদায়ী বন**—এই বন হইতে গৃহাদি, নৌকা-জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণের কাঠ ও তক্তা রপ্তানির জন্য পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বন হইতে বেশী মূল্য আদায় হয়;—**(২) ক্ষুদ্র প্রয়োজন-নির্ব্বাহের বন,**—জ্বালানি কাঠ, পশুখাদ্য ও স্থানীয় লোকের গৃহাদির জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি এখান হইতে সংগৃহীত হয়;—**(৩) বন্যা-ও-ক্ষয়-নিরোধক বন।**—এই বনের জন্য বন্যা বা বৃষ্টির জলে মাটি ধ্বসিয়া পড়িতে পারেনা; **(৪) অপ্রধান বন**—বনবিভাগেব অধীনস্থ বটে,—কিন্তু প্রকৃত বন নহে,—পশুরক্ষণ-স্থান মাত্র;—ইহা প্রধানতঃ ক্ষুদ্র তৃণভূমি, কিন্তু এখানে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ আছে।

বনবিভাগ-পরিচালনা।—পূর্ব্বে বনবিভাগ কেন্দ্রীয় সবকারের অধীন ছিল। ১৯৩৫ সাল হইতে প্রত্যেক প্রদেশেব বনবিভাগ সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন হয।

এক্ষণে প্রত্যেক প্রদেশে বনাঞ্চলগুলি একজন বনরক্ষকেব (Conservator of forest) অধীনে কযেকটি কার্য্যক্ষেত্রে (circle) বিভক্ত হইয়াছে। যদি কোন প্রদেশে বনভূমি বহুবিস্তৃত হয, এবং তজ্জন্য সার্কেলেব সংখ্যাও বৃদ্ধি পায, তবে বনবক্ষকগুলিব উপবও একজন প্রধান বনবক্ষক নিযুক্ত হন।

প্রত্যেক **কার্য্যক্ষেত্র** যে-বনবক্ষকের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে, তিনি প্রায়ই একজন পুবাতন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী হইয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আবার কযেকটি **উপ বিভাগে** ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি এক-একজন নূতন বনরক্ষকের অধীনে দেওয়া হয়। এই নূতন কর্ম্মচারীর অধীনস্থ বিভাগ আবার কয়েকটি **রেঞ্জারে** (Ranger), এবং প্রত্যেক রেঞ্জার কয়েকটি করিয়া ছোট-ছোট **রোঁদ** ও **বীটে** ভাগ করা হয়। কার্য্যক্ষেত্র বড হইলেই তবেই তাহাকে এইরূপ ভাগ, বিভাগ, ও উপবিভাগে ভাগ করা হয।

বনের উপকারিতা।—পৃথিবী-খণ্ডের ২৫৩ পৃ. দেখ।

কাষ্ঠের ব্যবহার (Utilisation)।—কাষ্ঠ নানা প্রয়োজনীয় অভাব বিদূরিত করে। ইহা দ্বারা এদেশে নানা শিল্পদ্রব্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান শিল্পদ্রব্য ও তাহাতে ব্যবহৃত কাষ্ঠের উল্লেখ করা হইল,—

(১) নৌকা ও জাহাজ।—ইহার জন্য প্রধানতঃ সেগুণ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বাবুল, খয়ের, পুন, গর্জ্জন, বেন্‌টিক, সুঁদুরি কাষ্ঠ **হাল**-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। **মাস্তুল**-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়—বেন্‌টিক, দেবদারু, পুন প্রভৃতি। **দাঁড়**-নির্ম্মাণের জন্য দরকার—দেবদারু, গর্জ্জন, পাইন, লেণ্ডি প্রভৃতি।

(২) **গাড়ীর কাঠাম**-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়—গর্জ্জন, শিশু, জামান, বিলি দেবদারু, বেন্‌টিক, চুগলাম প্রভৃতি। **চক্রনাভি**-নির্ম্মাণে—বাবুল, খয়ের, সন্দন (বিহারে পঞ্জন), শাল, অঞ্জন, সুঁদুরি প্রভৃতি। **চাকার পাখি** (spokes)-নির্ম্মাণে—শিশু, বিজাশাল বা পিয়াশাল প্রভৃতি।

(৩) **বাড়ী** ও **সেতু** প্রভৃতি নির্ম্মাণে ও **জোড়া দিবার কাষ্ঠ** রূপে ব্যবহৃত হয়,—শিরিশ, বাবলা, চাপলাশ, চিক্রাশী, বিশপ, দেবদারু, পুন, তুন, শিশু, সুঁদুরি, জারুল, আম, অঞ্জন, চির্‌পাইন, ব্লু-পাইন, পাদৌক, শাল, সেগুণ প্রভৃতি।

(৪) **আসবাব পত্রের** জন্য—শিরিশ, সাটিন, শিশু, তুন, চিক্রাশী, মেহগনি, সেগুণ, লরেল, ওয়ালনাট প্রভৃতি।

(৫) **কৃষিযন্ত্র**-নির্ম্মাণে—বাবলা, ধামান, কুসুম, শাল, বেড়, পাদৌক, সাটিন, শিশু, জামান প্রভৃতি।

(৬) **খেলার সরঞ্জাম।—হকি, টেনিস,** প্রভৃতি খেলার লাঠি তৈয়ার করিতে এমন কাঠ দরকার হয় যে, তাহা যেন বাঁকানো যায়। এইরূপ কার্য্যের জন্য শিশু, তুঁত, লেণ্ডি, আম, বিজাশাল, শিরিশ, তুন প্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

(৭) **বাজনা।**—সেতার, ভায়োলিন, প্রভৃতির জন্য তুন, সেগুণ, স্প্রুস্, শিশু, তুঁত;—**ব্যাঞ্জোর জন্য** সেগুণ;—**হারমোনিয়াম** ও **অর্গানের** জন্য ওক ও সেগুণ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

(৮) **প্যাকিং বাক্সের** জন্য শিমূল, আম, কদম, তুন চাপলাশ ও পাইন প্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

(৯) **পেনসিলের কাঠের** জন্য একমাত্র ভারতীয় জুনিপার উপযোগী,—ব্লু-পাইন, শিমূল, তুন প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

(১০) **কলমের বাঁট** প্রস্তুত করার জন্য স্প্রুস্, ফার, শিমূল, তুন, হাল্‌দু ও বিশপ প্রভৃতি কাষ্ঠ ও অন্য বহু কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

(১১) **দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স।**—বিলাতী আস্‌পেন (Aspen) কাঠের মত দেশলাইয়ের কাঠির উপযোগী কাষ্ঠ এদেশে নাই। তবে মোটামুটি ব্যবহারোপযোগী কাঠি করিবার জন্য, কদম, পপিতা, ময়না, ধূপ, মালাবার আস্‌পেন, পপ্‌লার, প্রভৃতি গাছের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

(১২) **রেলওয়ে পাড়ন।**—এজন্য এদেশের সেগুণ, শাল, ইরুল, ও দেবদারুর কাষ্ঠ উপযোগী।

(১৩) **রেলগাড়ীর পাড়ন, বেঞ্চের কাঠ, জানালা-দরজা, প্রভৃতি**

বিভিন্ন কার্য্যের জন্য শাল, সেগুণ, জারুল, বিজাশাল, হাল্‌দু, দেবদারু, শিশুম্, বাবলা, পাদৌক, চিরপাইন, ব্লু-পাইন, প্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

(১৪) মাকু।—তাঁতের জন্য বহু মাকু বা মাকুর কাষ্ঠ বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। কিন্তু শিশু, বাবলা, আবলুস্, সন্দন, বেন্‌টিক, ভেন্দা প্রভৃতি কাষ্ঠে ভাল মাকু হইবার সম্ভাবনা আছে।

(১৫) তবক কাঠ (ply wood)।—কাঠ পাতলা করিয়া ফাড়িয়া সেই পাতলা কাঠ দুই বা তিনখানি স্তরে-স্তরে বা তবকে-তবকে আঁটিয়া একখানি কাঠরূপে বিক্রয় করা হয়। তিনখানি পাতলা কাঠ আঁটিয়া যে-কাঠ হয়, তাহাকে তে-পিস্ কাঠ বলা হয়। আম, শিমূল, শিশু, তুন, সেগুণ, হলং প্রভৃতি কাষ্ঠ হইতে এই কাঠ প্রস্তুত করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, এদেশে কাগজের জন্য মণ্ড, সেলুলোজ, তামাকের পাইপ, কাঠের খেলনা, তাঁবুর খুঁটি, ছবির ফ্রেম, ছাপার ছাঁচ, ইলেক্‌ট্রিক তারের খুঁটি, তেলের কূপ, জুতার ফর্ম্মা (last) প্রভৃতি করার জন্যও নানা কাঠ ব্যবহৃত হয়।

বনজ শিল্পদ্রব্য।—বনজ প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য (ক) কাষ্ঠ, ও (খ) জ্বালানি কাষ্ঠ। বৎসরে গড়ে সাড়ে ত্রিশকোটি বর্গফুট কাষ্ঠ, ও জ্বালানি কাষ্ঠ বন হইতে পাওয়া যায়। তথাপি কাষ্ঠ ও কাষ্ঠদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ আমদানি করিতে হয়। এই অধ্যায়ের শেষে কাষ্ঠ আমদানি-রপ্তানির একটি হিসাব দেওয়া হইল। বনজ কাষ্ঠ হইতে যে-শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বন হইতে **বাঁশ, বেত, ফল,** গাছের **আঁশ, মধু, মোম, আঠা, ধুনা, ছাল, লাক্ষা, চন্দনকাষ্ঠ,** প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(১) বাঁশ।—সরু বা মোটা, অতিদীর্ঘ বা অতিক্ষুদ্র, অতিভারী বা অতিহাল্কা এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার বহুপ্রকার বাঁশ আছে। ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র বাঁশ পাওয়া যায়। চিরহরিৎ-প্রায় বনাঞ্চলে, এবং আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনে ইহা প্রধানতঃ জন্মে। ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য। গৃহনির্ম্মাণ, বেড়া বাঁধা প্রভৃতি বহু কার্য্যে সাধারণ গৃহস্থ ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। এক্ষণে ইহা হইতে কাগজের মণ্ডও প্রস্তুত করা হইতেছে।

(২) বেত।—বেত হইতে টেবিল, চেয়ার, ঝোড়া, ঝুড়ি প্রভৃতি বহু আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার বেত ও বেতদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল।

(৩) **আঁশ।**—তালের পাতার আঁশ দিয়া বিলাতী ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। ত্রিনাভেলি ও দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে, এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণা অঞ্চলে এই আঁশ-তোলার কার্য্য বিস্তৃত- -ভাবে হয়। কোকোনদ হইতে ইহা ইংলণ্ডে যায়।

(৪) **মধু** ও **মোম।**—সমুদ্রতীরস্থ বনে, বিশেষতঃ সুন্দরবনে বড়-বড় মৌচাক হইতে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়।

(৫) **আঠা।**—বাবলা গাছ হইতে যে-আঠা পাওয়া যায় ব্যবসাক্ষেত্রে তাহার মূল্য আছে। কিন্তু এই ব্যবসায় এখানে ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই।

(৬) **ধুনা** ও **তার্পিণ।**—চির্‌পাইন গাছ হইতে তার্পিণ ও ধুনা পাওয়া যায়। এজন্য পাঞ্জাবের জাল্লো, উত্তর-প্রদেশের বেরেলি, ও কাশ্মীরের জম্মুতে কারখানা আছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ৯,৪১১ হন্দর রজন রপ্তানি হইয়াছিল। চির্‌পাইন ব্যতীত অন্য পাইন গাছেও ধুনা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭৫ লক্ষ ৯৬ হা. ৭৭৬ টাকার রজন ও ধুনা রপ্তানি হইয়াছিল।

(৭) **ছাল।**—সুন্দরী প্রভৃতি গাছের ছালে চামড়া রং করা হয়। এজন্য হরীতকী, বহেড়া, ও আমলকীও ব্যবহৃত হয়। এইসকল ফল মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে রপ্তানি করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭৩ লক্ষ ৮৭ হা. ১৮৩ টাকার রং করার ছাল রপ্তানি হইয়াছিল।

(৮) **লাক্ষা।**—সংস্কৃত "লক্ষ" শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। কয়েকটি বিশিষ্ট গাছে লক্ষ-লক্ষ লাক্ষার পোকা লাগাইয়া লাক্ষা উৎপন্ন করা হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে **লক্ষা** বা লাক্ষা,—ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ lac। ইহার কথা পরে বলা হইয়াছে।

(৯) **চন্দনকাষ্ঠ** ও **তৈল।**—মহীশূরে, কুর্গ প্রদেশে, কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রে, ও মান্দ্রাজের কোইম্বাটুর ও সালেম জেলায় চন্দনবৃক্ষ আছে। ইহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। ইহার কাষ্ঠ হইতে ছোট-ছোট বাক্স, ছবির ফ্রেম ও নানা সৌখীন দ্রব্য পাওয়া যায়। চন্দনকাষ্ঠ ও তৈল প্রধানতঃ বিদেশেই রপ্তানি হয়, এবং রপ্তানির চাহিদার উপরেই ইহার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। ১৯৩৫-৩৬ সালে শতকরা ৬৬ ভাগ কাষ্ঠ আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে, এবং ১৩½ ভাগ জাপানে রপ্তানি হয়। কিন্তু ঐ বর্ষে মোট তেল উৎপন্ন হয় ১০২ সহস্র পাউণ্ড,—তাহা হইতে ৬০ সহস্র পাউণ্ড যায় ইংলণ্ডে, এবং ৩২ সহস্র পা. যায় জাপানে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ২৯ লক্ষ ২০ হা. ৩৬ টাকার চন্দনকাষ্ঠ রপ্তানি হইয়াছিল।

কাষ্ঠ ও কাষ্ঠদ্রব্যের আমদানি- ও রপ্তানি-মূল্য (টাকা)

(১৯৪৭-৪৮)

দ্রব্য	আমদানি	রপ্তানি
১। পাইন কাষ্ঠ	১৭,৪১,৮০৮	
২। সেগুণ কাষ্ঠ	২,৩৬,১৩,২৯৬	৮,০৪,২১৯
৩। জ্বালানি কাষ্ঠ	৭৪১	
৪। অন্য কাষ্ঠ	৫৫,৯৩,৭৮২	১৯,০৬,৭৬৭
৫। তবক কাষ্ঠ	৭৩,৬৬৯	
৬। চন্দন কাষ্ঠ	৬০০	২৯,২০,০৩৬
৭। কাষ্ঠদ্রব্য (আসবাব-পত্র বাদে)	১৯,৮২,৬৩৭	৪,৮৮,৬৫০
মোট	৩,৩০,০৬,৫৩৩	৬১,১৯,৬৭২

ইহা ব্যতীত ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮ লক্ষ ৭৩ হা. ৮৯৯ টাকার কাগজের জন্য কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত মণ্ড, ও ৯ লক্ষ ৪২ হা. ৭২১ টাকার আসবাবপত্র রপ্তানি হইয়াছিল।

আমাদের দেশে কাষ্ঠ ও কাষ্ঠদ্রব্যাদি আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ও কেনিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আসে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে ১৪ হা. ৫০০ বর্গমাইল (৯২,৮১,২৮০ একর) বনভূমি আছে;—ইহাতে সমগ্র রাষ্ট্রের ৬·২ শতাংশ মাত্র বনাচ্ছন্ন। পূর্ব্ব পাকিস্তানেই বন বেশী—এখানে সমগ্র প্রদেশের ১৪ শতাংশ বনে আবৃত। সিন্ধুনদের অববাহিকা বৃষ্টিবিরল স্থান। সেজন্য ইহা মরুপ্রায় ভূমি। বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশ প্রস্তরময় পার্ব্বত্যভূমি। সিন্ধু অঞ্চলে গুল্ম, খর্ব্ববৃক্ষ ও কাঁটাঝোপ প্রধান উদ্ভিজ্জ। বাবলা এখানে একটি প্রধান বৃক্ষ। বেলুচিস্তানে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পশ্চিম-পাঞ্জাবের লবণ পর্ব্বতে, চিত্রল পাহাড়ে,—দেবদারু, পাইন, ফার এবং ওয়ালনাট, ম্যাপল প্রভৃতি চিরহরিৎ বন আছে। কিন্তু পশুচারণ, বৃক্ষ-ছেদন, প্রভৃতির দ্বারা এখানকার বন নষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উদ্ভিজ্জ, বিশেষতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব-দ্বীপ অংশের উদ্ভিজ্জের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ-রাষ্ট্রে বনের পরিমাণ অত্যন্ত কম;—সেজন্য বনজ দ্রব্যের অভাব অত্যন্ত বেশী। এখানে কয়েকটি দেশলাইয়ের কল আছে। কিন্তু কাঠের অভাবে সেগুলিতে ভাল কাজ চলিতেছে না। জ্বালানি কাষ্ঠেরও এখানে বিশেষ

অভাব। কাষ্ঠের অভাব বিদূরিত করিবার জন্য পাকিস্তান-গবর্ণমেণ্ট সক্কর বাঁধ, ও সিন্ধুনদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের বাঁধের অঞ্চলে নূতন-নূতন স্থানে বনসৃষ্টির, গবর্ণমেণ্টের খাসবন রক্ষার, জমিদারের অধীন বনগুলি গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আনার ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনজ সম্পদ্ বৃদ্ধির আয়োজন করিয়াছেন, এবং এজন্য অনুসন্ধান-প্রতিষ্ঠান (Research Institute) গঠিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জলসেচ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ।—কৃষির জন্য জলের দরকার অত্যন্ত বেশী। জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হইলেও জলের অভাবে কৃষিকার্য্য হইতে পারে না। এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবে খাদ্য-শস্য বিশেষ উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পাঞ্জাবে কেবলমাত্র নদীতীরবর্ত্তী নিম্নভূমিতে কৃষিকার্য্য হইত। সেজন্য কৃষকদিগের দুরবস্থার শেষ ছিল না,—দুর্ভিক্ষ নিত্যবস্তুর মধ্যে গণ্য হইত, এবং পাঞ্জাবের লোকসংখ্যা তখন অত্যন্ত কম ছিল। এক্ষণে পাঞ্জাবের যে খাল-অধ্যুষিত ভূমিতে লক্ষ্মী-শ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে উহা মরুপ্রায় ভূভাগ মাত্র ছিল।

ভারতবর্ষে—জলপূর্ণা নদীও আছে, বৃষ্টিপাতেরও প্রাচুর্য্য আছে, তথাপি ভারতবর্ষে কৃষির জন্য **জলসেচের আবশ্যকতা** আছে। কারণ—

(১) **বৃষ্টিপাত**—এই মহাদেশ-প্রতীম দেশে সর্ব্বত্র সমান নহে। ইহার চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে প্রায় ৪২৫ ই. বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলে ৩-৪ ই. বৃষ্টি পড়ে। এইরূপ অন্যত্রও কোথাও ১০ ই., কোথাও ২০ ই. মাত্র বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য বৃষ্টির জল সর্ব্বত্র কৃষির জন্য সুপ্রতুল নহে।

(২) **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর** প্রভাবে গ্রীষ্মকালেই এখানে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময় সকলই অনিশ্চিত। কোন বৎসর বৃষ্টিপাত দেরীতে আরম্ভ হয়, তাহাতে কৃষিদ্রব্য পাকিবার পূর্ব্বে পরিপুষ্ট হইবার সময় পায় না। কোন বৎসর হয়ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়, এবং ফসল পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়া যায়। কখনও বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়। এরূপ হইলে কৃষির অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এজন্য এই বৃষ্টির জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।

বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষে মোটামুটি গড় বৃষ্টিপাতের বার্ষিক পরিমাণ ৪৫ ই.—গড় বৃষ্টিপাত বৎসরে ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী-কম না হইলেও দেখা যায় যে, স্থানে-স্থানে হয়ত বৃষ্টিপাত বার্ষিক গড় বৃষ্টি--পাতের অর্দ্ধেক, কোথাও বা সিকি, কোথাও বা তদপেক্ষা কম হইয়াছে। ইহাতে কোন-কোন স্থানে ফসলের অবস্থা ভাল হইলেও কোন-কোন স্থানে নিতান্ত খারাপ হইয়া দুর্ভিক্ষ আনিতে পারে।

(৩) বৃষ্টিপাত বৎসরের সকল সময়ে সমান হয় না;—জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রভাবে বৃষ্টিপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—শীতকালে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম;—কেবল দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস অবধি অপস্রিয়মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রভাবে কিছু বৃষ্টিপাত হয়;—মার্চ্চ
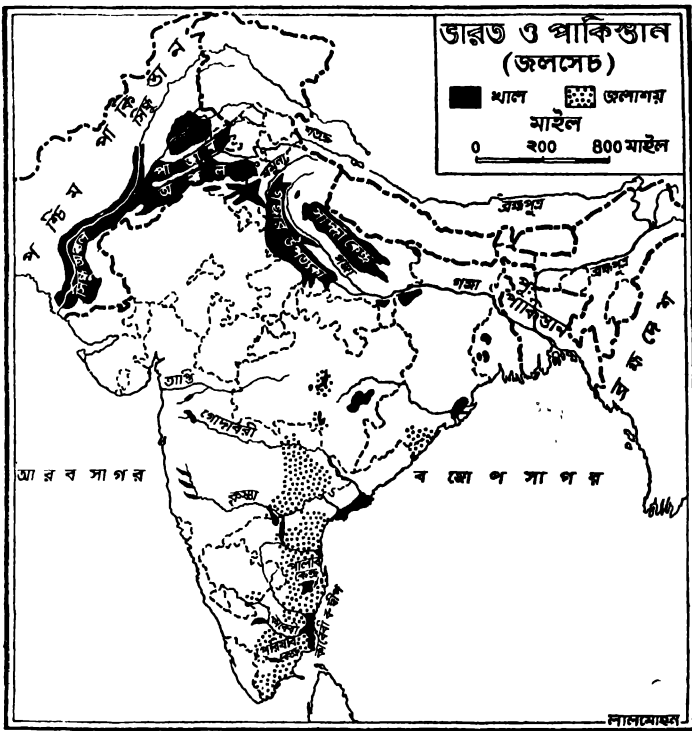
১৩নং চিত্র

হইতে জুন পর্য্যন্ত আদৌ বৃষ্টিপাত হয় না বলা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষে গ্রীষ্মের ফসলই প্রধান ফসল;—জলের অভাবে শীতের ফসল হওয়া সম্ভব নহে।

(৪) ভারতবর্ষের কোন-কোন বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে যে-বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়, তাহা, সেই দেশের ধান্য প্রভৃতি যে-সকল ফসলের জন্য বেশী বৃষ্টিপাত আবশ্যক হয়, তাহার উপযোগী নহে।

এই অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে কূপ হইতে, এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নানাপ্রকার জলাশয়ে বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে, ক্ষেত্রে জলসেচনদ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদন করা হইতেছে। মোগল-যুগে কোন-কোন স্থানে প্লাবন-খাল খনন করা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এদেশে জলসেচের কার্য্য প্রচুর বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বের কূপ ও জলাশয় হইতে জলসেচের সঙ্গে-সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খাল খনন করিয়া বিস্তৃতভাবে জলসেচন হইতেছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারত ইউনিয়নে ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে চাষের জন্য জলসেচ করিবার আবশ্যকতা ছিল। কোন স্থানের বৃষ্টিপাত ও উচ্চাবচতা বিচার করিয়া এক্ষণে প্রধানতঃ তিন উপায়ে জলসেচন হয়। যেমন—**(১) কূপ, (২) জলাশয়, ও (৩) খাল।**

(১) কূপ।—কূপ হইতে (ক) **দণ্ডযন্ত্র,** (খ) **নিম্নগামী গোরু,** বা (গ) **পারসিক চক্র** দ্বারা জল তুলিয়া ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। ক্ষেত্রের ভিতর অগভীর নালী কাটিয়া ঐ জল দূরেও লইয়া যাওয়া যায়।

(ক) দণ্ডযন্ত্র।—একটি খুঁটির উপরে অবস্থিত **একটি দণ্ডের একদিকে** বাল্‌তি ঝুলাইয়া দেওয়া থাকে, অপর দিকে লৌহখণ্ড প্রভৃতি ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া দেওয়া থাকে। বাল্‌তির দড়ি টানিয়া সহজেই বাল্‌তি জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অপর প্রান্তে ভারের প্রাবল্যে জলসহ বাল্‌তি আপনি উঠিয়া আসে। ইহাতে জল সহজে তুলিয়া লওয়া যায়।
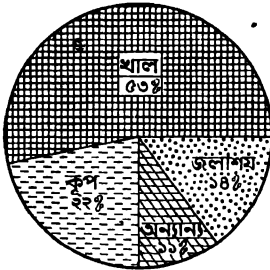
জলসেচের নানা প্রণালী
(শতকরা অংশ)

খাল ৫৩%
জলাশয় ১৪%
কূপ ২২%
অন্যান্য ১১%

১৪নং চিত্র

(খ) নিম্নগামী গোরু।—একগাছি দড়ির একপ্রান্তে বাল্‌তি বা জলধারণের জন্য বড় চামড়ার মশক বাঁধিয়া দিতে হয়, এবং দড়িগাছি একটি কাষ্ঠের উপর আবদ্ধ চাকার উপর দিয়া চালাইয়া একজোড়া গোরুর জোয়ালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হয়। কূপের পার্শ্বে কতকটা জমি নীচু দিকে ঢাল করা থাকে। গোরু সেই ঢাল দিয়া সহজেই নীচের দিকে চলিলে উপরি-উক্ত জলের মশক জলপূর্ণ হইয়া উপরে উঠে এবং ঐ জল মাঠে ঢালিয়া দেওয়া হয়। গোরু দুটি ঢাল বাহিয়া পুনরায় উপরের দিকে উঠিবার কালে মশক কূপের ভিতর নামিয়া যায়।

(গ) পারসিক চক্র।—এই চাকা অনেক প্রকারের হয়। এক প্রকার চাকার

গায়ে নানা আকারের বাল্‌তি বাঁধা থাকে। চক্র ঘুরাইয়া সেই বাল্‌তিতে জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ যে-সকল নিম্ন-সমতল স্থানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী না হইলেও ফসলের পক্ষে হয়ত একেবারে কম নহে —অথচ আরও জল পাইলে ফসলের প্রাচুর্য্য হইতে পারে,—এবং যেখানে অল্পদূর খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়,—সেখানে কূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা হয়। পাঞ্জাবে, উত্তর-প্রদেশে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-অংশ প্রভৃতি স্থানে এই কূপ-সেচনপ্রথা প্রচলিত। দাক্ষিণাত্য মালভূমিতেও কূপদ্বারা জল-সেচন হয়। কয়েক বৎসর হইতে উত্তর-প্রদেশ ও বিহারে নলকূপ হইতে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে সেচন করা হইতেছে।

(২) **জলাশয়।**—পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ও উত্তর-ভারতের অন্য কয়েক স্থানে ছোট বা বড় জলাশয় হইতে ডোঙ্গা প্রভৃতি দ্বারা জল তুলিয়া সেচন করা হইত। এখনও এই প্রথা অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যে জমি অসমান। সেজন্য দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় স্বাভাবিক গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গর্ত্তে, ও নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া, জলসঞ্চয় করিয়া তাহার সাহায্যে জলসেচন হয়। দাক্ষিণাত্যে যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশী সে-সকল অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই জলাশয় দেখা যায়। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় নানাস্থানে বড়-বড় জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে, মহীশূরে ও হায়দ্রাবাদে এইরূপ জলাশয় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষাকালে জল ধরিয়া রাখা হয় ও উপযুক্ত সময়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি বড়-বড় পুষ্করিণী ও হ্রদের মত বড় হয়। কোন-কোনটি পাঁচ-ছয় মাইল লম্বা।

(৩) **খাল।**—খাল দ্বারা জলসেচনই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই খাল দুই প্রকার—(ক) প্লাবন খাল, (খ) নিত্যবহ খাল।

(ক) বর্ষাকালে নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে সেই সময় নদী হইতে কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত খনিত খালে জল প্রবেশ করে, এবং তখনই কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন সম্ভব হয়। এই খালকে **প্লাবন খাল** (Inundation canal) বলে। এই খালের মুখে জল নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন বাঁধ থাকে না।

(খ) আবার কতকগুলি খাল নদী যেখানে পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া সমভূমিতে নামিয়া আসে ঠিক সেখান হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়। পাকা বাঁধ দিয়া এই খালে জল সংগ্রহ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই খালকে বলে **নিত্যবহ খাল** (Perennial canal)। এখানে বারমাসই খালের শাখাপ্রশাখা দ্বারা ক্ষেত্রে ইচ্ছামত জল পরিচালিত করা যায়। এইরূপ খাল উত্তর-ভারতেই বেশী। কারণ

উত্তর-ভারতের নদীগুলিতে বারমাসই জল সংগ্রহ করা যায়। উত্তর-প্রদেশের **সার্দ্দাখাল** পৃথিবীর দীর্ঘতম খাল। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে-পাঁচ হাজার মাইল। খালদ্বারা জলসেচনে পাঞ্জাব প্রদেশের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। উত্তর-প্রদেশ ও বিহার প্রদেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রেও খালের দ্বারা জলসেচন হয়। দক্ষিণ-মান্দ্রাজ প্রদেশে
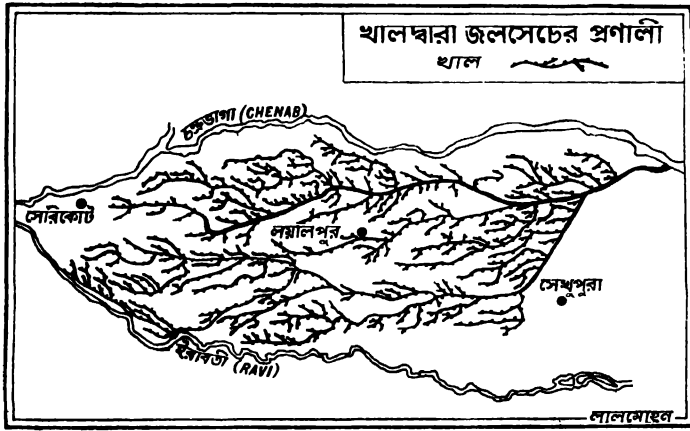
১৫নং চিত্র

জলসেচ-খালের সংখ্যা কম। কারণ দক্ষিণ-ভারতে বৃষ্টি কম। সেজন্য ইহার বৃষ্টিবহুল পশ্চিমভাগে এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে প্রধানতঃ খালদ্বারা জলসেচন হয।

খালের শ্রেণীভেদ।—গবর্ণমেণ্ট যে-সকল খাল কাটাইয়াছেন তাহার কার্য্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) লাভকর, (২) অলাভকর, (৩) মূলধন-রহিত।

(১) যে-সকল খালের পূর্ত্তকার্য্য শেষ হওয়ার পর, দশ বৎসরের মধ্যে, খালের কার্য্য চালাইবার খরচ ও মূলধনের সুদের টাকা, জলেব কর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই **লাভজনক** কার্য্য।

(২) যে-সকল জলসেচ-কার্য্য দ্বারা উপযুক্ত করপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা **অলাভজনক** কার্য্য।—সাধারণতঃ কোন অঞ্চলে নিকৃষ্ট জমির কিছু উন্নতি সাধন করিয়া সেই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বন্ধ করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে, এইরূপ কার্য্য গ্রহণ করা হয়।

(৩) যে-সকল কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন মূলধন ব্যয় করেন না, তাহাই **মূলধন-রহিত** কার্য্য। ইহাতে লাভ বা লোকসানের কোন প্রশ্নই নাই।

ভারত ও পাকিস্তানের জলসেচন

জলসেচ-ব্যবস্থায় ভারত ও পাকিস্তান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ। এখানে মোটামুটি ৫ কোটি একর জমিতে জলসেচদ্বারা কৃষিকার্য্য হয়। কিন্তু জলসেচ-হিসাবে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে কিঞ্চিদধিক ২½ কোটি একর জমিতে মাত্র জলসেচ দ্বারা কৃষিকার্য্য হয়। ভারতবর্ষে জলসেচ-হিসাবে সর্ব্বপ্রথম প্রদেশ—পাঞ্জাব (পূর্ব্ব ও পশ্চিম), তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রদেশ।

পাকিস্তান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জলসেচ।—এখানকার **সোয়াত** নদীর জল,—খাল কাটিয়া ও ঐ খাল মালাকান্দ পাহাড়ের বেষ্টন পর্ব্বত-সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া লইয়া,—তাহাদ্বারা পেশওয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে জলসেচন করা হয়।

পাঞ্জাবের জলসেচ।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৫০ পৃ.) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগেও পাঞ্জাবে কেবল নদীতীরবর্ত্তী নিম্নভূমিতে, বা যেখানে কূপ খনন সম্ভব সেই অঞ্চলে কৃষিকার্য্য হইত এবং দুর্ভিক্ষ সেখানকার নিত্যসহচর ছিল। পরিশেষে বৃটিশরাজের চেষ্টায় এ-অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা হইলে এই প্রদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী স্থানে পরিণত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খাল কাটিবার পূর্ব্বে কৃত্রিম জলসেচের জন্য এদেশে কূপ খনন করা হইত। কিন্তু সর্ব্বত্র কূপ খনন করা সম্ভব ছিল না। কারণ, নদী-বিধৌত যে-সকল অঞ্চলে ভবিষ্যতে খালপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে-সকল অঞ্চলে ৭০-৮০ ফিট না খুঁড়িলে জল পাওয়া যাইত না। সেজন্য ঐ সকল অঞ্চলে কূপ খনন সম্ভব হয় নাই,—সুতরাং ফসল-উৎপাদনেরও বিশেষ সুবিধা ছিল না। এজন্য উহা পশুচারণের তৃণভূমি মাত্র ছিল।

কিন্তু বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বেও মুসলমান রাজত্বে তিনটি প্লাবন-খাল কাটা হইয়াছিল— (১) ফিরোজ শাহ্ তোগলকের রাজত্বকালে দিল্লী ও হিসার প্রদেশে রাজোদ্যানে জল-সেচনের জন্য খনিত **যমুনা খাল**। এই খাল হইতে সম্রাট্ শাজাহান এক শাখা দিল্লীর উদ্যানে জল দিবার জন্য কাটাইয়াছিলেন। (২) লাহোরের সালিমার বাগানে জলসেচনের জন্য আকবর ও শাজাহান বাদশাহের উৎসাহে খনিত **হাসলি খাল**। (৩) কৃষকদিগের উৎসাহে ও যৌথভাবে খনিত কয়েকটি খাল। এই সকল খালদ্বারা চারি লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইত। কিন্তু কালক্রমে এই সকল খাল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

পাঞ্জাব প্রদেশ বৃটিশরাজের অধীন হইলে গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, যে-সকল দেশের জন্য কৃত্রিম জলসেচ দরকার,—কৃত্রিম জলসেচ ব্যতীত যাহাদের উন্নতি সম্ভব নহে, এবং যে-সকল স্থানে কৃত্রিম জলসেচ সম্ভব,—পাঞ্জাব সেই প্রকৃতির দেশ। কারণ,

(১) এখানে বৃষ্টিপাত কোথাও ৫ই., কোথাও ৮ই., কোথাও বা ১০ ই., কোথাও বা ১৫ই. মাত্র হয়।

(২) বৃষ্টির জল তিন-চতুর্থাংশ গ্রীষ্মকালেই পড়ে, সুতরাং শীতের ফসলের জন্য বা গ্রীষ্মের ফসলের শস্যসংগ্রহের কাজে জলের নিতান্ত অভাব হয়।

(৩) অধিকাংশ স্থলে জলতল (Water level) প্রায় ৮০ ফি. নিম্নে অবস্থিত। সুতরাং কূপখনন বহু ব্যয়সাধ্য ও অসুবিধাজনক।

(৪) ব্যয়বহুল কূপ খনন করিলেও জলের সুবিধা হয় না। কারণ কূপের জল প্রধানতঃ লবণাক্ত, এবং একটি কূপ হইতে কষ্ট করিয়াও ২৫ একরের বেশী জলসেচন চলে না।

(৫) পর্ব্বত হইতে আগত ইহার নদীগুলিতে প্রচুর জল আছে, এবং সেই জল অকারণে সমুদ্রে পড়িতেছে, কাহারও ব্যবহারে লাগিতেছে না।

(৬) জল চলিবার পক্ষে খালের ঢাল কৃষিক্ষেত্রের দিকে করার বিশেষ সুবিধা আছে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া ১৮৬৫ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১½ কোটি টাকা লইয়া খাল কাটিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে এই ঋণের পরিমাণ ৩৮ কোটিতে উঠিয়াছিল। তাহা হইলেও অর্থ ও সামর্থ্য,—উভয়ই সার্থক হইযাছে। ১৯৪১ সালে প্রায় দেড় কোটি একর ভূমিতে জলসেচন দ্বারা ফসল হইত, প্রায় ৬ কোটি টাকা এই খাল হইতে রাজস্ব আদায় হইত, ও ৪০ কোটি টাকার ফসল এই অঞ্চলে উৎপন্ন হইত। এই খালের প্রাসাদে দেশবিভাগের পূর্ব্বে পাঞ্জাব হইয়াছিল শস্যবহুল উদ্বৃত্ত অঞ্চল,—পাঞ্জাবের চাষী হইয়াছিল সমৃদ্ধিশালী, সুখী ও নির্ভয়।

পাঞ্জাবের খাল।—পাঞ্জাবে এখনও সিন্ধু উপত্যকায় **প্লাবন খাল** আছে। কিন্তু ইহা ক্রমশঃ **নিত্যবহ খালে** পরিণত হইতেছে। পাঞ্জাবে এখন নিম্নলিখিত খালগুলি পড়িয়াছে। এই খালগুলি হইতে নানা শাখা-প্রশাখা-খাল কাটিয়া তাহাদের দ্বারা নদীগুলির মধ্যবর্ত্তী দূরস্থিত জমিতে জলসেচন হয়। দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী অংশগুলিকে দুই জলস্রোতের "দোয়াব" বলে। নদীগুলির ইংরাজী নামের আদ্য অক্ষর বা কিছু অংশ লইয়া এই দোয়াবগুলির নামকরণ হইয়াছে। যেমন—Jhelum ও Chenab,—এই দুই নদীমধ্যস্থ দোয়াবের নাম Jech (জেচ) দোয়াব। Ravi ও Chenab নদী--মধ্যস্থ দোয়াবের নাম Rechna (রেচনা) দোয়াব। Ravi'-র দক্ষিণে বারি দোয়াব।

(১) উচ্চ-বিপাশা (Bari) দোয়াব খাল।—ইরাবতী (Ravi) নদীর মাধুপুর নামক স্থান হইতে খাল কাটিয়া বিপাশা (Beas) ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থ বারি দোয়াবে গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও লাহোর জেলায় প্রায় ১২½ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হয়। ইহার দৈর্ঘ্য দেড় হাজার মাইল। ইহা ভূতপূর্ব্ব হাসলি খালের পুনঃসংস্কৃত ও বিস্তারীকৃত নবরূপ। প্রথমে ইহার নাম ছিল বারি দোয়াব খাল। কিন্তু অবশেষে নিম্ন-বারি দোয়াব খাল কাটা হইলে ইহার নাম হইল উচ্চ-বারি দোয়াব খাল। ইহা পাকিস্তান ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

১৬নং চিত্র

(২) নিম্ন-চন্দ্রভাগা (Chenab) খাল।—চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ খান্‌কি নামক স্থান হইতে খাল কাটিয়া রেচনা দোয়াবের প্রায় ২৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হইতেছে। এই স্থানে পূর্ব্বে কোন চাষ-আবাদ হইত না,—কোন লোকবসতি ছিল না,—কেবল স্থানে-স্থানে পার্ব্বত্য জাতিরা পশুচারণ করিত। এখানে কোন সহর বা গ্রাম ছিল না। বহুদিন ধরিয়া এই অংশে ভবিষ্যৎ গ্রাম-আদির আকারের,—বন্দোবস্ত করণার্থ নির্দ্দিষ্ট জমিখণ্ডের আকারের ও পরিমাণের,—এবং খালের গতি প্রভৃতির,—সুষ্ঠ পরিকল্পনা করিয়া, তাহার পর খাল-খনন ও জমির উন্নয়ন-ব্যবস্থা আরম্ভ করা হইয়াছিল।

এক্ষণে এই অঞ্চল সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে—এখানে উন্নত গ্রাম ও বড়-বড় সহরের সৃষ্টি হইয়াছে—লোকবসতি অত্যন্ত বেশী হইয়াছে,—এখানে লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৪০০। লায়ালপুর, ঝাং, সরকট প্রভৃতি বড়-বড় ব্যবসার স্থান এক্ষণে এই অঞ্চলে অবস্থিত। শাখা-প্রশাখা লইয়া এই খালের দৈর্ঘ্য দুই হাজার চারিশত মাইল।

(৩) নিম্ন-বিতস্তা (Jhelum) খাল।—বিতস্তা নদীর রশুল নামক স্থান হইতে এই খাল বাহির হইয়াছে। ইহার দ্বারা গুজরাট, সাপুর ও ঝাং জিলার ৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হয়। ইহার দ্বারাও এক জনমানবহীন পতিত জমির অঞ্চল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য এক সহস্র মাইল।

(৪) উচ্চ-বিতস্তা (Jhelum), উচ্চ-চন্দ্রভাগা (Chenab) ও নিম্ন-ইরাবতী (Ravi) দোয়াব খাল বা ত্রিক পরিকল্পনা।—উচ্চ-ইরাবতী খাল কাটিয়া দেখা গেল যে, মূলতান ও মণ্টগোমারি অঞ্চলে জলসেচনের জন্য জলের অভাব হইতেছে। কিন্তু ইরাবতীর উচ্চ অঞ্চল হইতে যে "উচ্চ-ইরাবতী" খাল কাটা হইয়াছে, সেই খালে এত জল চলিয়া যায় যে, সোজাসুজি ইরাবতীর নীচের দিকের কোন স্থান হইতে "নিম্ন-ইরাবতী" খাল কাটিলে সেইখানে বিশেষ জল পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা—এই তিন নদী অবলম্বন করিয়া পূর্ত্ত-কৌশলের এক অপূর্ব্ব পরিকল্পনা করা হইল। বিতস্তা নদীর উচ্চ অংশে অবস্থিত মাংলা নামক স্থান হইতে উচ্চ-বিতস্তা খাল কাটিয়া আনিয়া, খান্‌কি নামক চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থিত যে-স্থান হইতে নিম্ন-চন্দ্রভাগা খাল বাহির হইয়াছে তাহার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বিতস্তা নদীর উচ্চ অংশের জল নিম্ন-চন্দ্রভাগা নদীতে পড়িয়া এত জল বৃদ্ধি করিল যে, চন্দ্রভাগা নদীর উপরের অংশের জল সেই খালে খুব বেশী না আসিলেও কোন ক্ষতির কারণ থাকিল না। তৎপরে চন্দ্রভাগা নদীর উচ্চ অংশে অবস্থিত মেরালা নামক স্থান হইতে উচ্চ-চন্দ্রভাগা খাল কাটিয়া ঐ খাল ইরাবতী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত বাল্লোকি নামক স্থানের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে চন্দ্রভাগার উচ্চ অংশ হইতে প্রচুর জল বাল্লোকিতে আসিতে লাগিল। তখন ইরাবতী নদীর এই স্থানের বামকূল হইতে নিম্ন-ইরাবতী খাল কাটিয়া মণ্টগোমারী ও মূলতানের বৃষ্টিবিরল পতিত জমিতে লইয়া যাওয়া হইল। ইহাতে যে কেবল এই শুষ্ক অঞ্চলে প্রচুর ফসল হইতে লাগিল তাহা নহে, প্রত্যেক খালটি দেশের যে-যে অংশের উপর দিয়া আসিয়াছে তাহারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই তিনটি খালের মোট দৈর্ঘ্য ৩,১৬৭ মা. এবং ইহাদের দ্বারা ১৮ লক্ষ একর স্থানে জলসেচন হয়।

(৫) শতদ্রু (Sutlej) উপত্যকা খাল।—এখানে শতদ্রু নদী হইতে চারিটি খাল আছে,—(১) পূর্ব্বখাল, (২) দিপলপুর খাল, (৩) পাকপত্তন খাল, ও (৪) মৈলসি খাল। এতদ্ব্যতীত ইহার শাখা বিকানীর ও বহবলপুর গিয়াছে। খালগুলির দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইল, এবং ইহাদের দ্বারা ৫০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হয়। এই পর্য্যায়ের (System) কতকাংশ পাকিস্তানে ও কতকাংশ ভারত-ইউনিয়নে পড়িয়াছে।

(৬) হাভেলি খাল—চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মিলন স্থান হইতে কিছু দক্ষিণে বাহির হইয়া ইরাবতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে তিনটি খাল বাহির হইয়া মূলতান জেলার মধ্যে আসিয়াছে।

থল পরিকল্পনা।—এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে, সিন্ধুনদের কালাবাগ হইতে এই খাল বাহির হইবে এবং সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর মধ্যগত ১২ লক্ষ একর পতিত জমিতে ইহা দ্বারা জলসেচন করা হইবে। সিন্ধুদেশের জলসেচ সিন্ধুনদের জলের উপর নির্ভর করে। সেজন্য এই পরিকল্পনা-কালে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, থল খালের জন্য পাঞ্জাব সিন্ধুনদ হইতে ৬০০০ কুশেকের (Cusecs) বেশী জল লইতে পারিবে না।

সিন্ধুর জলসেচন,—সক্কর বা লয়েড বাঁধ।—সিন্ধুদেশে মাত্র ৪-৫ই. বৃষ্টি হয়। সেহেতু কৃষির জন্য সর্ব্বদাই কূপ ও প্লাবন খালের উপর নির্ভর করিতে হইত।

সক্কর বাঁধ
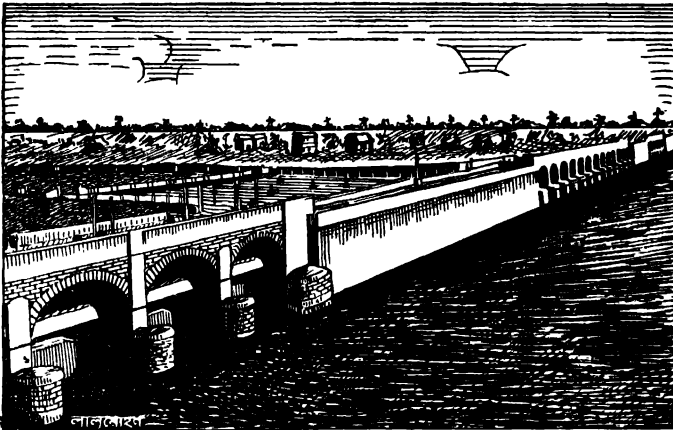
১৭নং চিত্র

সিন্ধুদেশে ১৭১০১ কূপদ্বারা ৫২ হাজার ৯০০ একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট চাষ প্লাবন খালের সাহায্যে জলসেচন দ্বারা করিতে হয়। সিন্ধুনদে যে-মাসে প্লাবন হইত, সেই সময় প্লাবন খাল কার্য্যকরী হইত। কিন্তু যখন সিন্ধুনদে জল কম থাকিত, অথবা যে-বৎসর প্লাবন হইত না, বা কম হইত, সে-বৎসর ফসল হইত না। সেজন্য

১৯৩২ সালে এখানে সিন্ধুনদের উপর অবস্থিত সক্কর নামক স্থানে ঐ নদের উপর ১মা. দীর্ঘ বাঁধ দিয়া, এবং ৭টি খাল কাটিয়া ৫৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হইতেছে। একটি মাত্র বাঁধ অবলম্বনে এত বড় জলসেচন-পদ্ধতি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচের খাল

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে জলসেচন

(১) পশ্চিম যমুনা খাল।—ফিরোজশাহ্ তোগলক ও শাজাহানের যমুনা খাল পুনরুদ্ধার করিয়া ও বিস্তৃততর করিয়া এই খাল কাটা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১,৯০০ মাইল। ইহার দ্বারা কর্ণাট, দিল্লী, রোটক, হিসার, পাতিয়ালা ও ঝিন্দ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৯ লক্ষ একর স্থানে জলসেচন হয়।

(২) সিরহিন্দ খাল।—শতদ্রু নদীতীরস্থ রুপর (Rupar) নামক স্থান হইতে এই খাল কাটা হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১,৬২৪ মাইল। ইহার দ্বারা লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, হিসার, পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, মালের কোট্‌লা, ফরিদকোট ও কালসিয়া অঞ্চলের ১২ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচ হয়।

(৩) ভাখ্‌রা ভেড়ি (Dam) পরিকল্পনা।—এই পরিকল্পনা-অনুসারে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত, শতদ্রু নদীতে ভাখ্‌রা নামক স্থানে ৪৮০ ফিট্ একটি বাঁধ বা ভেড়ি দিয়া একটি জলাধার করিয়া তাহা হইতে হিসার ও রোটক জেলায় জলসেচন হইবে ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইবে। ইহার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

উত্তর-প্রদেশে জলসেচন

উত্তর-প্রদেশে বৃষ্টিপাত কমই হয়। সেজন্য প্রাচীনকাল হইতে এখানে কূপ দিয়া জলসেচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে এখানে ১১,৩৩,৪৪২টি কূপ দ্বারা ৫৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্রমশঃ পশ্চিমভাগে বৃষ্টি কম হইতে-হইতে চলিয়াছে। সেজন্য উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত কম। কূপের জলেও বেশী জমিতে জলসেচন চলিত না। সেজন্য প্রথমে তৈলযোগে ইঞ্জিন চালাইয়া নলকূপ হইতে অধিক জল উত্তোলনের চেষ্টা হইয়াছিল, এবং এক্ষণে বিদ্যুৎ-শক্তি দ্বারা জল উত্তোলন করা হইতেছে এবং ইহাতে বিশেষ ফললাভ করা যাইতেছে। গঙ্গাখালে জলবিদ্যুৎ-গ্রিড্-পদ্ধতি (Hydro-electric-Grid) কার্য্যকরী হইলে এই বিদ্যুৎ-শক্তি দ্বারা নলকূপের জল উত্তোলন করা হইতেছে। এক্ষণে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে ৯৬২টি

এবং পশ্চিমকূলে ৪৫৬টি এরূপ কূপ আছে। একটি সাধারণ কূপে ২৫ **একরের বেশী জমিতে** জলসেচন চলে না। কিন্তু বিদ্যুৎচালিত নলকূপে ২০০ হইতে ৩০০ একর জমিতে জলসেচন করা হয়।

খাল।—কিন্তু খালদ্বারা জলসেচনও উত্তর-প্রদেশে প্রচুরভাবে চলে। এখানে ৬টি খাল আছে। যথা—

(১) পূর্ব্ব-যমুনা খাল—৩,৪৮৩ মাইল
(২) আগ্রা খাল—৮৯৫ মা.
(৩) উর্দ্ধগঙ্গা খাল—৫৩৮ মা.
(৪) নিম্নগঙ্গা খাল—৩,৯৮৬ মা.
(৫) সার্দ্দা খাল—৪,২৬০ মা.
(৬) বুন্দেলখন্দ খাল—

(১) পূর্ব্ব-যমুনা খাল।—এই খাল সর্ব্বপ্রথম মোগলসম্রাট শাজাহানের সময় খনন করা হয়। কিন্তু শেষে ইহা মজিয়া যায়। অবশেষে ইংরাজ-রাজত্বকালে ইহার
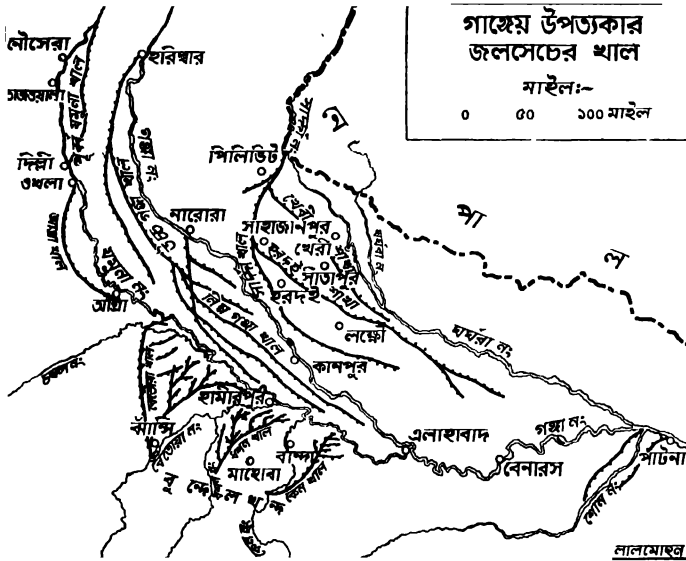
১৮ নং চিত্র

পুনরুদ্ধার হয়। ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসে এই খালের কার্য্য দ্বিতীয়বারে প্রথম আরম্ভ করা হয়। ফয়জাবাদে যমুনা হইতে ইহা বাহির হইয়াছে, এবং দিল্লীতে ইহার শেষ হইয়াছে। শাখা-প্রশাখা সমেত ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৪৮৩ মাইল, এবং

সাহারানপুর, মজঃফরনগর ও মীরাট জেলার প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে ইহার দ্বারা জলসেচন হয়।

(২) আগ্রা খাল।—ইহাও যমুনা খাল,—দিল্লীর ১১মা. নিম্নে যমুনায় অবস্থিত ওখলা হইতে ইহা উঠিয়াছে এবং আগ্রায় ইহা শেষ হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য শাখা-প্রশাখা সমেত ৮৯৫মা. এবং ইহার দ্বারা দিল্লী প্রদেশের কতকাংশ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলা ও উত্তর-প্রদেশের মথুরা ও আগরা জেলায় জলসেচ হয়।

(৩) উচ্চগঙ্গা খাল।—হরিদ্বার সহরের ২২ মাইল উপর হইতে গঙ্গার একটি স্রোত এই সহরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্রোতের উপরিস্থিত মায়াপুর হইতে এই খাল বাহির হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য শাখা-প্রশাখা সমেত ৫৬৮ মাইল, এবং ইহা ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করে। ইহার প্রথম কুড়ি মাইলে স্রোত এত বেশী যে, মধ্যে-মধ্যে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়া স্রোত কমাইতে হইয়াছে। এই সকল প্রপাতের সাহায্যে এক্ষণে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। বৎসরের কোন-কোন সময়ে প্রধানতঃ শীতকালে এই সকল খালে জলের অভাব হয়। এজন্য ৩০টি নলকূপ খুঁড়িয়া তাহারই জল এই খালে সেই সময় প্রবাহিত করা হয়। সাহারান-পুর, মুজঃফরনগর, মীরাট, বুলন্দ সহর, আলিগড়, মথুরা ও এটাওয়া জেলার জমিতে এই খাল হইতে জলসেচন করা হয়।

(৪) নিম্নগঙ্গা খাল।—গঙ্গার নিম্নপ্রদেশে ইহার উপরে অবস্থিত নারোরা হইতে এই খাল কাটিয়া ইহার দ্বারা গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবে জলসেচন হয়। ইহার দৈর্ঘ্য শাখা-প্রশাখা সমেত ৩,৯৮৬ মা. এবং ইহার দ্বারা ১২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হয়। ইহার পাঁচটি শাখা—(১) ফরাক্কাবাদ, (২) বেওয়ার, (৩) কানপুর, (৪) এটাওয়া, ও (৫) ফতেপুর।

(৫) সার্দ্দা খাল।—সার্দ্দা নদীর উচ্চ অংশে বনমধ্যে অবস্থিত বনবাসা হইতে এই খাল বাহির হইয়াছে। প্রধানতঃ নদীর পশ্চিমভাগের দিকেই হরদই অঞ্চলের শুষ্কতা দূর করার জন্যই ইহার পরিকল্পনা হয়। ইহার অল্প অংশ নেপাল রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। ইহার দুইটি শাখা প্রধান—(১) খেরিশাখা ও (২) হরদই শাখা। শাখা-প্রশাখা সমেত মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৬০ মা. এবং দ্রুত জল নিঃসারণের জন্য আরও প্রায় দেড় হাজার মাইল খাল আছে। ইহার দ্বারা পিলিভিত, সাজাহানপুর, খেরি, সীতাপুর, হরদই প্রভৃতি জেলার ৭০ লক্ষ একর স্থান জলসিক্ত হয়।

(৬) বুন্দেলখণ্ড খাল।—এই অঞ্চলে প্রধান তিনটি খাল বাহির হইয়াছে—(ক) **বেতোয়া**—বেতোয়া নদী হইতে এই খাল খনন করা হয়। ঝান্সি ও হামিরপুর জেলার কতকাংশে ইহাদ্বারা জলসেচন চলে। (খ) **কেন খাল**—১৯১৬ সালে কাটা

হয়, এবং ইহার দ্বারা বান্দা জেলায় জলসেচন হয়। (গ) **দশন খাল**—১৯১০ সালে কাটা হয়, এবং ইহার দ্বারা হামিরপুর জেলায় জলসেচন হয়।

এই খালগুলি যমুনার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। সেজন্য এগুলিকে বলা হয় যমুনার অপর পার্শ্ববর্ত্তী খাল। যে সকল নদী হইতে এই খাল কাটা হইয়াছে, সেগুলি শীতকালে শুকাইয়া যায়, তখন এই খালে জলসেচন হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই খালগুলির দ্বারা বেশী খাদ্য উৎপাদন করিয়া দুর্ভিক্ষ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য।

পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের জলসেচ।—ভারতবর্ষে এই দুইটি স্থানে জলসেচ-প্রথা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ও দেশের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। কিন্তু এই দুই স্থানে জলসেচব্যবস্থা-সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য আছে, এবং তাহা বুঝিবার জন্য স্মরণ রাখা দরকার যে, পশ্চিম-পাঞ্জাবের বার্ষিক বৃষ্টিপাত গাড়ে ৩০″ ,—স্থানে-স্থানে ২০″ অপেক্ষা কম,—দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরও কম। উত্তর প্রদেশে ও তৎসন্নিকটে,—দিল্লীর বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৬·২৫ই., দিল্লী হইতে গঙ্গার উপত্যকা দিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত বেশী ; আলিগড়—৩০·৮৫, লক্ষ্ণৌ,—৪০·৩২, এলাহাবাদ—৪১·৮২ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত, অনেক উপনদী ইহাতে জল লইয়া আসে। সেজন্য—

(১) পাঞ্জাবের নদীগুলি যেখানে পর্ব্বত হইতে জল আনিয়া সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে, নদীর সেই উপরের অংশেই খাল কাটিয়া জল আনা হয়। নদীর নীচের দিকে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া ও জলপ্রাপ্তির অন্য উপায় না থাকায়, সেদিকের কোন অংশ হইতে খাল কাটা সম্ভব নহে। কিন্তু উত্তর-প্রদেশের গঙ্গা নদীর উপরের ও নীচের দুই অঞ্চলেই খাল কাটা হইয়াছে।

(২) পাঞ্জাবে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া যেরূপ সারা বৎসরই জলসেচন দরকার, উত্তর-প্রদেশে সেরূপ নহে, সেখানে সাধারণতঃ শীতকালেই জলসেচন দরকার।

(৩) যুক্তপ্রদেশে বৃষ্টিপাত বেশী বলিয়া, যাহাতে খালগুলির ক্ষতি না হয় সেজন্য জল-নির্গমনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পাঞ্জাবে ইহার দরকার হয় না।

(৪) পাঞ্জাবের মরুপ্রায় অঞ্চল জলসেচনের জন্য শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়াছে। কিন্তু উত্তর-প্রদেশে ফসলের সাধারণ অবস্থা খারাপ ছিল না, জলসেচদ্বারা তাহার উন্নতি হইয়াছে মাত্র।

দাক্ষিণাত্যে জলসেচন

দাক্ষিণাতের জলসেচ-ব্যবস্থা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) বৃষ্টি ও (২) মৃত্তিকা। দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল ব্যতীত দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্যত্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর জন্যই বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এই মালভূমির পশ্চিমঘাটের পূর্ব্বে

বৃষ্টিচ্ছায় প্রদেশে বৃষ্টিপাত কম হয়;—অধিকন্তু ইহা অনিশ্চিত, এবং ইহার পরিমাণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ,—বিশেষতঃ ক্রমশঃ পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ মধ্য-মান্দ্রাজে কম। সেজন্য এখানে জলসেচের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী।

দ্বিতীয়তঃ—এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিম ভাগে অল্প স্থানে কৃষ্ণমৃত্তিকা। বৃষ্টিপাত হইলে কৃষ্ণমৃত্তিকার নিম্নস্তরে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেজন্য সেখানে জলসেচের আবশ্যকতা প্রধানতঃ কম বটে, কিন্তু এই মালভূমির অপর অংশে,—লাল দো-আঁশ মাটিতে,—বৃষ্টিপাত হইলেও জল শুষিয়া যায়। সুতরাং সে-সকল অঞ্চলে জলসেচের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। তা'ছাড়া, জলসেচের দ্বারা দো-আঁশ মাটিতে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল হইতেই দাক্ষিণাত্য মালভূমির লোকে কৃষির জন্য জলের অভাব অনুভব করিতেছে। সেজন্য প্রাচীনকাল হইতেই কূপ ও জলাশয়,—এই দুইয়ের সাহায্যেই এদেশে জলসেচন হইয়া আসিতেছে। আবার, গ্রানাইট শিলার মালভূমি বলিয়া এখানকার ভূ-তল অসমান, এবং সর্ব্বত্রই গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য এখানে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে, এবং সেখান হইতে জলসেচন করা হয়।

কূপ।—কূপ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে ও দো-আঁশ মাটির অঞ্চলে,—সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু কূপ এ-দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। কারণ, দো-আঁশ মাটির অঞ্চলে মৃত্তিকার অল্প তলেই পাথর বেশী,—সুতরাং কূপখনন দুঃসাধ্য;—আবার, লাভা সঞ্চয় দ্বারা কৃষ্ণমাটির অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, সেখানে কূপখননের বিশেষ অসুবিধা নাই বটে, কিন্তু অন্য অসুবিধা আছে;—এ-অঞ্চলের উপরিভাগে যে-জল পতিত হয়, তাহাই নিম্নস্তরে সঞ্চিত হইলে, কূপখনন করিয়া সেই জলই তুলিতে হয়, যে--কোন কারণে সেই জল ফুরাইয়া যাইতেও পারে;—যে-জল সাধারণতঃ নিম্নের অপ্রবেশ্য স্তরে জমিয়া-জমিয়া কোন নিম্ন অংশকে পরিপৃক্ত করিয়া সেইস্তরের উপর দিয়া দূর-দূরান্তরে যায় ইহা সেই জল নহে। সুতরাং কূপখনন করিলে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে জল নাও পাওয়া যাইতে পারে। সেজন্য কূপ এ-অঞ্চলেরও উপযোগী নহে। তা'ছাড়া, উত্তর-প্রদেশের পাললিক শিলার অঞ্চলে কূপ খনন করিলে তাহাতে যেরূপ জল পাওয়া যায়, বা সেই জলে যতদূর জলসেচন করা যায়, এখানকার কূপে তাহা সম্ভব নহে।

জলাশয়।—অসমতল দাক্ষিণাত্য মালভূমির স্বাভাবিক খাদগুলিতে জল সঞ্চয় করিয়া, অথবা নদীর একাংশে বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখিয়া যে-জলাশয়ের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইতেই জলসেচন করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলাশয় হইতে জলসেচন-প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ের কতকাংশে প্রচলিত। কিন্তু এই সকল

জলাশয় ছোট ও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় মহীশূরে, মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের পশ্চিম-অংশে বড়-বড় জলাশয় খনন ও তাহা দ্বারা জলসেচন করা হইয়াছে। নদীর উপত্যকায় বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখিয়া তাহা হইতে খাল কাটিয়াও জলসেচন করা হইয়াছে। এই সকল জলাশয় অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল অংশে অবস্থিত, এবং ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা প্রায় সহস্র একর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হয়।

১৯নং চিত্র।
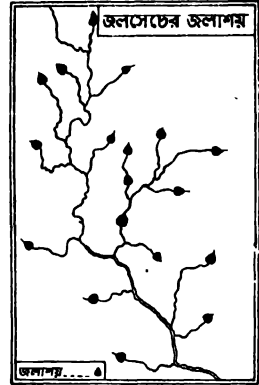
খাল।—এক্ষণে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাষ্ট্রে খালদ্বারাও জলসেচন হইতেছে। বোম্বাই রাষ্ট্রের পশ্চিম-অংশে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেজন্য সেখানকার নদীগুলিতে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া সেখান হইতে খাল কাটিয়া জলসেচন হয়। বোম্বাইয়ের খালগুলি প্রধানতঃ জলাশয়-খাল। **ভাতগড়ের লয়েড বাঁধ, ভান্দার দেবার উইলসন বাঁধ** ও **খাদকের ওয়ালশা বাঁধ** উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে উইলসন বাঁধ ভারতের সর্ব্বোচ্চ বাঁধ। ইহাতে প্রচুর শস্য জন্মিবার সুবিধা হয়। কিন্তু পার্ব্বত্য-অঞ্চলে খাল কাটিবার খরচ এত বেশী যে বিশেষ লাভ হয় না। পশ্চিম-ঘাটের পূর্ব্বভাগে বৃষ্টির অপ্রতুলতাবশতঃ গ্রীষ্মকালে নদীগুলি শুষ্কপ্রায় থাকে। সেজন্য সে-অঞ্চলে এরূপ খাল কাটা সম্ভব নহে।

হায়দ্রাবাদের নিজাম সাগর বাঁধ ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ বাঁধ।

মান্দ্রাজের গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে **পেন্নার নদী হইতে** খালযোগে জলসেচন হয়।

মান্দ্রাজের **পেরিয়ার নদী হইতে** জলসেচনের প্রণালী বিস্ময়কর। পেরিয়ার পশ্চিম-উপকূলের নদী ও আরব সাগরে পড়িতেছে। প্রায় ৩,০০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয় করিয়া সেই জলাশয় হইতে কার্ডামম পর্ব্বতের ভিতর দিয়া **৫,৭০০ ফি.** দীর্ঘ খাল কাটিয়া পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে লইয়া ভৈগৈ নদীর সহিত যুক্ত করিয়া মাদুরার কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হইতেছে।

কাবেরীর উপরে **মিটুর** নামক স্থানে বাঁধ দিয়া উহা হইতে জলসেচন হয়। এই বাঁধে প্রায় ৯৩ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট জল ধরিয়া রাখা যায়। এত বড় একটি জলাশয় পৃথিবীতে আর নাই।

কুর্নুল ও কাড্ডাপা খাল।—তুঙ্গভদ্রা নদীর উপরিস্থিত কুর্নুল ও পেন্নার

নদীর উপরিস্থিত কাড্ডাপা সংযুক্ত করিয়া জলসেচনের খাল করা হইয়াছিল। কিন্তু এই খালে আশানুরূপ ফললাভ হইল না বলিয়া এই খাল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন নদী হইতে বহুপ্রকার উপকার লাভের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বহুমুখী নদীব্যবহার-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই সকল নদীর উন্নয়নদ্বারা প্রধানতঃ তুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—(১) বিদ্যুৎ-শক্তিজনন ও (২) কৃষিভূমিতে জলসেচন। পরবর্ত্তী "শক্তির উৎস" শীর্ষক দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এই নদীগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ সকল নদীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের—**দামোদর** ও **ময়ূরাক্ষী**, বিহারের—**কুশী**, উড়িষ্যার—**মহানদী** (হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা), মান্দ্রাজ ও হায়দরাবাদের—**তুঙ্গভদ্রা**, মধ্যভারত ও রাজস্থানের—**চম্বল** নদী, ও মহীশূরের—**লক্কাবল্লী** পরিকল্পনা প্রধান। ইহাদের মধ্যে ময়ূরাক্ষী ও তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা প্রধানতঃ জলসেচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পশু-পক্ষি-পালন

গোরু ও মহিষ, দুগ্ধ, মেষ ও অন্যান্য প্রাণী

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বহুপ্রকার জন্তু আছে। গৃহপালিত জন্তুদিগের মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগল, শূকর, উষ্ট্র, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি জন্তু, এবং হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষী অর্থনীতি--ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে ১২২ কোটি ১৭ লক্ষ গবাদি জন্তু আছে; তন্মধ্যে গোরু-মহিষ ৬৯ কোটি, এবং ভেড়া-ছাগল ৫৩ কোটি ১৭ লক্ষ; পাকিস্থান সমেত ভারতবর্ষে গোরু-মহিষ—২২ কোটি ৫০ লক্ষ, এবং ভেড়া ও ছাগল—১০ কোটি ৩৮ লক্ষ। সুতরাং পৃথিবীর ৩১ শতাংশ গোরু-মহিষ, ১৯ শতাংশ ভেড়া ও ছাগল, এবং ২৭·৫ শতাংশ অন্যান্য জন্তু ভারতবর্ষে রহিয়াছে। গবাদি জন্তু হইতেই ভারতবর্ষ প্রতি বৎসরে ১,৯০০ কোটি টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গোরু ও মহিষ

গবাদি পশু।—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, এবং এদেশে কৃষিকার্য্যে গো-মহিষের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। লাঙ্গলচাষে গোরুই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তবে মহিষও কোথাও--কোথাও ব্যবহার করা হয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ খাদ্য দুগ্ধ প্রধানতঃ এই দুই জন্তু হইতেই

পাওয়া যায়,—তবে মহিষ বেশী পরিমাণে দুধ দেয়, এবং মহিষের দুধে মাখন বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু গো-দুগ্ধ শিশুর জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং গো-মাংস পৃথিবীর অন্যতম প্রধান খাদ্য। এজন্য এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই মাংসের জন্য ও দুগ্ধের জন্য গোরু পৃথক্‌ভাবে প্রতিপালিত হয়। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান বলিয়া এখানে গো-মাংসের প্রচলন অত্যন্ত কম, এবং এইজন্যই এখানে মাংসের ও দুগ্ধের জন্য গোরু পৃথক্ নাই; যে-গোরু দুধ দেয়,—আবশ্যক হইলে তাহাই কসাইখানায় প্রেরিত হয়।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে গোরুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল,—এবং কৃষিকার্য্যে ও দুগ্ধপ্রয়োজনে ইহার তুলনা ছিল না বলিয়া, ভারতবর্ষে গোজাতি হিন্দুর নিকট পূজনীয় ছিল, —তাহারা গোরুকে প্রধান সম্পদ্ বলিয়া গণ্য করিত,—গোরুকে গোমাতা বলিয়া ভক্তি করিত,—এবং নানা পার্ব্বণে গোরুর পূজা করিত। কিন্তু এক্ষণে গো-সেবায় ভারতীয় হিন্দুর স্থান অতিনিম্নে। অন্যান্য দেশে,—বিশেষতঃ ইউরোপে ও নিউজিল্যাণ্ডে, গোরুর যেরূপ সেবাযত্ন হয়, ভারতে তাহার সামান্য অংশও হয় না। ভারতের গোরু তুলনায় ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল, এবং দুগ্ধদানে নিকৃষ্ট।

গোরুর সংখ্যা *—ভারতবর্ষে (ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে) ১৯৪৫ সালের পশুগণনা-অনুসারে এইরূপ :—

গোরু	৬	কোটি	৫০	লক্ষ
গাভী	৫	"	১৬	"
তিন বৎসর ও তদপেক্ষা ন্যূন বয়স্ক বাছুর	৪	"	৩২	"
মোট	১৫	কোটি	৯৮	লক্ষ

হিসাব করিলে দেখা যায়, ভারতযুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটি ৪ কোটি ও পাকিস্তানে ১ কোটি দুগ্ধবতী গাভী আছে।

* ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পরে ১৯৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পশুপক্ষীর গণনা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫১ সালের গণনার ফল এখনও বাহির হয় নাই। সুতরাং এই অধ্যায়ের অঙ্ক ১৯৪৫ সালের বিবরণ-অনুসারেই প্রদত্ত হইল। এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯৪৫ সালে ভারতবিভাগ হয় নাই। সুতরাং এস্থলে অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাই প্রদত্ত হইল।

নিম্নের হিসাবে গাভীর সংখ্যা দেখিলে প্রতীয়মান হইবে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গাভী ভারতবর্ষেই আছে,—

পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি দেশের গাভীর সংখ্যা

দেশ	সংখ্যা (হাজার)	দেশ	সংখ্যা (হাজার)
১। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র	২,২৭,৪১	৫। নিউজিলণ্ড	১৭,৪৮
২। গ্রেট বৃটেন	৩৬,৮৭	৬। সুইডেন	১৭,১২
৩। ক্যানাডা	৩২,৬০	৭। ডেনমার্ক	১৫,৮৭
৪। অস্ট্রেলিয়া	২৩,৪০	৮। হলণ্ড	১৪,৮৪

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গোরু।—আকৃতি, প্রকৃতি এবং দুগ্ধদানের ক্ষমতায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গোরুগুলির ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গোরু ও মহিষগুলির মধ্যে ৩০টি গোরুর ও ৬টি মহিষের বংশ বিখ্যাত। কিন্তু ঐ সকল গোবংশের মধ্যে অনেক ভাল জাতির গোরুর আবাসস্থল এক্ষণে পাকিস্তানের অন্তর্গত। তবে পাকিস্তানের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গোরু এখন ভারতে উৎপাদন করা হইতেছে।

উচ্চবংশের গোরু

গোরুর জাতি	আদি জন্মস্থান	বিশেষত্ব
১। গীর	কাথিয়াবাড় ও মহীশূর	গোরুগুলি চাষের উপযোগী, গাভী প্রচুর দুধ দেয়, প্রতি দুগ্ধদানের সময়ে মোট ২৫০০ পাউণ্ড হইতে ৬০০০ পা. দুগ্ধ দেয়।
২। সাহিওয়াল	ফিরোজপুর (পূর্ব্ব-পাঞ্জাব)	গাভীর দুগ্ধের প্রাচুর্য্য।
৩। হারিয়ানা	পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ	গাভীর দুগ্ধের প্রাচুর্য্য ও গোরুর চাষের উপযোগিতা।
৪। কঙ্করেজ	কচ্ছ, আমেদাবাদ	দুগ্ধপ্রাচুর্য্য ও চাষে উপযোগিতা।
৫। লাল সিন্ধি	এক্ষণে দক্ষিণ ভারত। আদি—সিন্ধুদেশ	প্রতি দুগ্ধক্ষরণ-কালে মোট ২৫০০ পা. হইতে ৫০০০ পা. দুগ্ধ দেয়।
৬। থার পারকার	কর্ণাল (পূ.-পাঞ্জাব), পাটনা	দুগ্ধের প্রাচুর্য্য।
৭। খিল্লারি	দক্ষিণ-বোম্বাই	চাষের উপযোগিতা।

ইহাদের মধ্যে হারিয়ানা, সাহিওয়াল, সিন্ধি, থারপারকার প্রভৃতি গো-বংশের আদি জন্মস্থান এক্ষণে পাকিস্তানের অন্তর্ভূত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজপুতানার—নাগর ও সাউচর; উত্তরপ্রদেশের—কেনিওয়ারিয়া, খেরিগড়, কোশী; বিহারের—বাচাউর; বোম্বাই-এর কঙ্কণ অঞ্চলের—ডিঙ্গি; মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলের—অমৃতমহল, নেলোর, আলামবাদী, দিওনি, কাঙ্গায়াম; মধ্যভারতের—মালভি প্রভৃতি গো-বংশ উল্লেখযোগ্য। এগুলির অধিকাংশই চাষে বিশেষ উপযোগী। বাঙ্গালায় কোন গো-বংশই উল্লেখযোগ্য নহে। কেবল, দার্জ্জিলিং জেলায় প্রতিপালিত, এবং সিকিম ও ভূটান হইতে আনীত সিরি গোরু বিখ্যাত। এই বংশের গোরুগুলি মালবহনে দক্ষ, এবং গাভীগুলি প্রচুর দুগ্ধদাত্রী।

গো-জাতির জন্মস্থানের ভৌগোলিক প্রকৃতি।—মানচিত্রে উপরি-উক্ত গো-জাতির আবাসস্থলগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বৃষ্টিবহুল আর্দ্রস্থানে ভাল জাতির গোরু জন্মে না। **ভাল জাতির গোরু বৃষ্টিবিরল, শুষ্ক অঞ্চলেই প্রধানতঃ জন্মে।** পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজপুতানা, মহীশূর প্রভৃতি বৃষ্টিবিরল স্থানগুলি কয়েকটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির গোরুর জন্মস্থান। আর্দ্রতা হিসাবে গো--জাতির জন্মস্থানের অঞ্চলগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যেমন—

১। **বৃষ্টিবহুল** মালাবার-অঞ্চলে, ও দক্ষিণ-কানাড়ায়,—বঙ্গদেশে ও আসামে গোরু বিশেষ **দুগ্ধবতী নহে** ও **দুর্ব্বল।** এখানে প্রতি গাভী বৎসরে হিসাবমত ৩৬০ পা. দুধ দেয়। তাই, এ-অঞ্চলে মানুষে প্রতিদিন সর্ব্বাপেক্ষা কম দুধ খায়।

২। **বৃষ্টিমধ্যম**—পূর্ব্ব-বোম্বাই, মধ্য- ও উত্তর-পূর্ব্ব মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে—গাভীগুলি **অপেক্ষাকৃত বেশী দুধ দেয়।** প্রতি গাভীর বার্ষিক দুগ্ধের পরিমাণ ৪৬০ পা.। সুতরাং, এ-অঞ্চলের মানুষ বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের লোক অপেক্ষা প্রতিদিন বেশী দুধ খায়।

৩। পাঞ্জাব (পূর্ব্ব ও পশ্চিম), দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি **বৃষ্টিবিরল** উত্তর-পশ্চিম ভারতের গোরুতে যেমন **বেশী দুধ দেয়,** মানুষেও তেমনি প্রত্যহ বেশী দুধ খায়। এখানে প্রতি গোরু হিসাবমত বৎসরে ৭৭০ পা. দুধ দেয়।

মহিষ।—১৯৪৫ সালের পশুগণনা-অনুসারে ভারতবর্ষে অর্থাৎ বর্ত্তমান ভারত--যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে মহিষের সংখ্যা এইরূপ—

মহিষ	৬৪ লক্ষ
স্ত্রী-মহিষ	২ কোটি ২৮ "
তিন বৎসর ও তন্ন্যূন বয়স্ক মহিষ	১ " ৭০ "
মোট	৪ কোটি ৬২ লক্ষ

মোটামুটি হিসাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ও পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ দুগ্ধবতী মহিষী আছে।

মহিষের সংখ্যা উত্তর প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (৮,৫২৩), তৎপরে ক্রমশঃ সিন্ধু (৬৬২৬), মান্দ্রাজ (৬২৮৯), বিহার (২৮৬২), বোম্বাই (২৩৫০)।

মহিষের উচ্চ জাতি।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কাথিয়াবাড়ের **জাফারদি,**— এবং বোম্বাই রাষ্ট্রের **সূর্ত্তি** ও **পান্ধারপুরী** মহিষই শ্রেষ্ঠ। পাঞ্জাবে **মুরা** মহিষ শ্রেষ্ঠ।

দুগ্ধ।—যদিও গোরু ও মহিষের সংখ্যা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু ভারতের গোরু পৃথিবীর সকল দেশের গোরু অপেক্ষা কম দুধ দেয়। মোটামুটি—

ভারতবর্ষের	গোরু	দৈনিক	দুধ	দেয়	৩½	ছটাক
আ. যুক্তরাষ্ট্রের	"	"	"	"	১৮½	"
সুইজর্লণ্ডের	"	"	"	"	৩৩	"
ডেনমার্কের	"	"	"	"	৭৪	"
নিউজিলণ্ডের	"	"	"	"	১২২	"

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৬৪ কোটি ৪০ লক্ষ মণ দুগ্ধ ও দুগ্ধদ্রব্য প্রতি বৎসর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে প্রকৃত দুগ্ধ ১৭ কোটি ৩৮ লক্ষ মণ। দুগ্ধ ও দুগ্ধদ্রব্যের মোট পরিমাণের ⅓ অংশ পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু পাকিস্তানে দুগ্ধবতী গো ও মহিষের সংখ্যা মোটামুটি ১ কোটি ৩০ লক্ষ, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি। সুতরাং ভারতের গোরু-মহিষের ¼ অংশ গোরু-মহিষ পাকিস্তানে বাস করে। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে পাকিস্তানের গোরু ও মহিষ যুক্তরাষ্ট্রের গোরু ও মহিষ অপেক্ষা বেশী দুধ দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাল বংশের গোরু ও মহিষ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। সেজন্য পাকিস্তানের গরু ও মহিষ প্রতি দুধের অনুপাত বেশী।

গোরু ও মহিষের উন্নতিকল্পে গঠিত পরামর্শ-সভার নির্দ্দেশ।—ভারতবর্ষের গবাদি পশুবংশের উন্নতির ও দুগ্ধপান-প্রচারের জন্য ১৯৪৪ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটির নির্দ্দেশ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। উচ্চ জাতির **গোবংশ** প্রত্যেক **বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী করিয়া বৃদ্ধি করিয়া** তাহার বলদ ও গাভী **গ্রামে-গ্রামে প্রদান** করা উচিত।

২। **বিদেশী গরুর সাহায্য না লইয়া** এদেশী গোরুর সাহায্যেই **প্রজনন** কর্ত্তব্য।

৩। দুগ্ধ ও কৃষি—এই উভয়েরই উপযোগী গোরু পালন করা উচিত।

৪। হিন্দুদিগের যে "ধর্ম্মের ষাঁড়" ছাড়িবার প্রথা আছে, ঐ ষাঁড় **উচ্চ জাতির** হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ঐ ষাঁড় নির্ব্বাচনকালে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের, বা পশুরক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লওয়া বিধেয়।

৫। গবাদির **খাদ্যবস্তুর উপযুক্ত ব্যবস্থা** করা দরকার। কিরূপ খাদ্য খাইলে পশুবংশের উন্নতি হইতে পারে সে-বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণা হওয়া দরকার।

৬। উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ-উৎপাদন সম্ভব হইলে **"আরও-দুধ-খাও"-প্রচারক দ্বারা প্রচার কার্য্য** চালানো দরকার।

৭। **অ-বিশুদ্ধ দুগ্ধবিক্রয় আইন-নিষিদ্ধ** হওয়া উচিত।

৮। **বধগৃহ** একজন পশুচিকিৎসকের অধীনে থাকা উচিত। দুগ্ধবতী গাভী বা কর্ম্মক্ষম গোরু বধ করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

৯। **পিঞ্জরাপোল** বা **গোরক্ষমণ্ডলের** উচ্চ শ্রেণীর **গো-প্রজনন অন্যতম উদ্দেশ্য** হওয়া উচিত।

১০। **গো-চিকিৎসা**র, ও **গো-রোগ-গবেষণা**র উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পশুজাতির উন্নতি-বিধায়ক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান।— পশুজাতির উন্নতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান আছে ;—

(১) দিল্লী কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠান (Agricultural Research Institute at Delhi); (২) বাঙ্গালোর সাম্রাজ্যিক দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান (The Imperial Dairy Institute at Bangalore); (৩) দিল্লী কৃষিগবেষণা সংসদ (The Imperial Council of Agricultural Research at Delhi); (৪) উত্তরপ্রদেশের মুক্তেশ্বর শ্রেষ্ঠ পশুচিকিৎসা গবেষণাগার (The Imperial Veterinary Research Institute at Mukteswar); (৫) বেরিলীর নিকট ইজাতনগরের শ্রেষ্ঠ পশুখাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (The Imperial Animal Nutrition Institute at Izatnagar). মুক্তেশ্বর ও ইজাতনগরের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকার-পরিচালিত। এখানে লসিকা (Serum) ও টীকার গো-বীজ প্রস্তুত করিয়া প্রাদেশিক সহরে বিক্রয় করা হয়। এতদ্ভিন্ন পশুখাদ্য, পশুচিকিৎসা গবেষণার জন্য রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আরও কমিটি আছে।

দুগ্ধের যৌথ কারবার।—যৌথভাবে দুগ্ধের ব্যবসায় পরিচালনার জন্য

কয়েকটি কোম্পানি আছে। তন্মধ্যে নাগপুরের তেলাঙ্খেরি যৌথ দুগ্ধ কোম্পানি, (২) লক্ষ্ণৌ দুগ্ধসরবরাহ কোম্পানি, (২) মান্দ্রাজ যৌথ দুগ্ধসরবরাহ সম্প্রদায়, ও (৪) কলিকাতা দুগ্ধসরবরাহ ইউনিয়ন প্রধান। এক্ষণে কোন-কোন সহরে দুগ্ধরক্ষণের পাস্তুর-আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসৃত হয়, ও সেই দুগ্ধ সাধারণতঃ সহরে বিক্রীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হরিণঘাটায় এইরূপ দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করেন।

কৃষি ও পশু চিকিৎসা-কলেজ।—গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অনেক দেশে কৃষিকলেজ স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে গো-বিদ্যারও অনুশীলন হয়। বাঙ্গালোরের পশু-কৃষি-দুগ্ধ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত,—এখানে উচ্চ অঙ্গের গবেষণা হয়।

পশুচিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, ও পাটনায় পশুচিকিৎসা কলেজ আছে। এই সকল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হয়,—পশুজাতির উন্নতি-সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না।

মেষ ও অন্যান্য প্রাণী

মেষ।—মেষ প্রধানতঃ মাংস ও পশমের জন্য প্রতিপালন করা হয়। ইহার দুগ্ধও নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৫ সালের পশুগণনা-অনুসারে ভারতবর্ষে সে-সময় ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ভেড়া ছিল। ইহা হইতে হিসাব করিয়া বলা যায় যে, যে-অংশ এখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত, তখন সে-অংশে আনুমানিক ৪ কোটি, এবং পাকিস্তানের অংশে ৪০ লক্ষ ভেড়া ছিল।

ভেড়ার শ্রেণীভেদ।—এদেশে যে ভেড়া আছে, তাহা **নিকৃষ্ট শ্রেণীর।** এই জাতির নাম **কারাকুল,**—ইহাদের ওজন কম ও পশম নিকৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মেষবংশের উন্নতির জন্য এখানে বিশেষ কোন চেষ্টাই নাই। মোটামুটি মেষপালকের হাতেই ইহাদের জীবন-মরণ ও উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। মেষপালকগণ ইচ্ছামত ইহাদের একস্থান হইতে স্থানান্তরে চরাইয়া বেড়ায়,—ইচ্ছামত ইহাদের লোম কাটে,—ও মাংস বিক্রয় করে। এজন্য **ভারতের পশম ভাল নহে;**—ইহা লম্বায় ছোট এবং ইহার সঙ্গে চুল ও অন্যান্য ময়লা মিশ্রিত থাকে। ভারতে বৎসরে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ইহার অতি অল্প অংশই রপ্তানি করা হয়। ইহার দ্বারা দেশে অপকৃষ্ট কম্বল প্রভৃতিই প্রস্তুত করা হয়। পশম-শিল্পের জন্য বিদেশ,—বিশেষ অস্ট্রেলিয়া,—হইতে পশম আমদানি করা হয়।

বৎসরে প্রায় ১০ হাজার মেষ রপ্তানি করা হয়।

ভেড়ার উন্নতির চেষ্টা।—বোম্বাই-অঞ্চলে ও মহীশূরে মেষবংশের উন্নতির জন্য কিছু-কিছু চেষ্টা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে মেরুনো ভেড়া আমদানি করা হইয়াছে,

এবং সেখানে দেশী ভেড়ার সহিত ঐ ভেড়ার সংযোগে এক সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করা হইয়াছে। মহীশূরে কৃষিবিভাগের চেষ্টায় যে সঙ্কর মেষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সেখানে পশম-শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সেখানে ছাটাই কার্য্য কলে হয়,—পশম শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিক্রয় করা হয়, এবং পশম-বিক্রয়ের ব্যবস্থাও সেখানে ভাল।

লোম ছাটাই।—ভেড়ার লোম মোটামুটি তুইবার ছাটাই করা হয়। মোটামুটি এই তুই ছাটাইয়ের পশমের ওজন বৎসরে মাথাপিছু দেশী ভেড়ার ১১ পাউণ্ড, মেরুনো ভেড়ার ১০ পা., এবং সঙ্কর ভেড়ার ১৩ পা.। পুণায় পশম বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার গবেষণাগার ও ভেড়ার আড়ত আছে।

পশ্চিমবঙ্গে মেষ।—পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্বে বিশেষভাবে মেষপালন হইত। কিন্তু ম্যালেরিয়ার জন্য এখানে মেষপালনের হানি হইয়াছে। এক্ষণে সমগ্র ভারতের মেষের সংখ্যার শতকরা ১টি মাত্র মেষ পশ্চিমবঙ্গে আছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মেষ বাস করে বীরভূম জেলায়,—তারপরে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধমান, ও বাঁকুড়া প্রভৃতি শুষ্ক জেলায়।

ছাগ।—১৯৪৫ সালের হিসাব-অনুসারে অবিভক্ত ভারতে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ছাগল ছিল। হিসাব করিলে বলা যায় তখন **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে** ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ও **পাকিস্তানে** ৯০ লক্ষ ছাগল ছিল। মোটামুটি সমস্ত পৃথিবীর সিকি ছাগল ভারতে ছিল। সে-সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছাগল ছিল,—বঙ্গদেশে, তারপরে ক্রমান্বয়ে—মান্দ্রাজে, উত্তরপ্রদেশে, পাঞ্জাবে, বিহারে, বোম্বাই প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও সিন্ধুদেশে। মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, বৃষ্টিপ্রধান দেশে ছাগল বেশী থাকে, এবং বৃষ্টিবিরল দেশে কম থাকে। বৎসরে প্রায় ৩০ হাজার ছাগল রপ্তানি করা হয়। প্রধানতঃ মাংসের জন্য ছাগল পোষা হয়; কিন্তু ইহার তুগ্ধও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। একটি ছাগলে বছরে ২ মণ তুধ দেয়।

অন্য জন্তু।—১৯৪৫ সালের গণনার হিসাবে ভারত ও পাকিস্তানে **গাধার** সংখ্যা ছিল—১৯ লক্ষ, **উষ্ট্রের**—১১ লক্ষ, **শূকরের**—৩৮ লক্ষ ও **ঘোড়ার**—১৮ লক্ষ।

হাঁস-মুরগী পালন।—ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে ঘরে-ঘরে হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে ব্যবসায়ের জন্য ইহার প্রতিপালন হয়। ১৯৪৫ সালের গণনা অনুসারে ভারতবর্ষে অর্থাৎ এখনকার ভারত ও পাকিস্তানে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। এই পক্ষীগুলির আনুমানিক মূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকা। ইহারা বৎসরে যে ডিম দেয় তাহার মধ্যে ৬০ শতাংশ মুরগীর এবং ৪০ শতাংশ হাঁসের। ইহাতে বৎসরে প্রায় ৫ কোটি টাকার ডিম বিক্রয় হয়।

হাঁস-মুরগীর ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কৃষিকলেজে হাঁস-মুরগী--পালনক্ষেত্র রহিয়াছে ;—উচ্চ শ্রেণীর মোরগ ও দেশী মুরগীর সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর সঙ্কর মুরগী সৃষ্টির বহুবিধ চেষ্টা এখানে হইয়া থাকে। পুণা সহরে হাঁস-মুরগী-পালনের শিক্ষা দিবার জন্য হাস-মুরগী-পালনক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে খৃস্টান মিশনরীগণও গ্রামবাসীদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিয়া থাকেন। ত্রিবাঙ্কুরের মার্থান্দাম নামক স্থানের হাঁস-মোরগ-পালনক্ষেত্রে,—কি করিয়া এই সকল পক্ষী পালন ও রক্ষা করা যায়,—কি করিয়া ইহাদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, এবং কিরূপে এই ব্যবসাযে গ্রামবাসিগণের আর্থিক উন্নতি করা সম্ভব,—তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণিজ শিল্প

পশমশিল্প, চর্ম্মশিল্প, লাক্ষাশিল্প, রেশম- ও রেয়ন-শিল্প

প্রাণিজাত শিল্প।—মাংস ও **পশম** প্রাণিজাত সর্ব্বপ্রধান পণ্যদ্রব্য। এতদ্ব্যতীত **শিং, হাতীর দাঁত, চামড়া, বসা** ও **রঙ** প্রভৃতিও পণ্যরূপে বাণিজ্যক্ষেত্রে আসে।

শিং হইতে বোতাম, লাঠি, খেলনা, শিরিষ (glue), জিলাটিন (gelatin) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও উত্তর প্রদেশ হইতে শিং-এর রপ্তানি হয়। উড়িষ্যার শিং-এর দ্রব্য বিখ্যাত।

হাতীর দাঁত হইতে নানাপ্রকার খেলনা প্রস্তুত হয়। মুর্শিদাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি স্থান এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আসাম, বোম্বাই, মহীশূর, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি বনময় স্থান হইতে ইহার রপ্তানি হয়।

বসা পাওয়া যায় গোরু, ভেড়া, ছাগল ও শূকরের মাংস হইতে।

পশমশিল্প

বহু প্রাচীনকাল হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ কাশ্মীর, পশমদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। কাশ্মীরের শাল ও গালিচা বহুকাল হইতে দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা ভারতের একটি গৃহশিল্প মাত্র ছিল। অবশেষে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে **সর্ব্বপ্রথম** কানপুর সহরে যন্ত্রচালিত **কানপুর পশমমিল** স্থাপিত হয়। এক্ষণে

ভারতবর্ষে ১৯টি বড় যন্ত্রচালিত পশম মিল আছে। কিন্তু তথাপি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়, যে ইহার কারিগরগণের দক্ষতা এত বেশী যে, যন্ত্রচালিত কারখানার সৃষ্টি হইলেও হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত পশমী দ্রব্যের গৌরব অধিক ভিন্ন অল্প নহে।

শীতের দেশের মেষ ও ছাগলের গায়েই পশম জন্মে। সেজন্য কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান অঞ্চলে প্রধানতঃ পশম উৎপন্ন হয়, এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সকল স্থানে পশমের কুটীর-শিল্প ছিল। দক্ষিণ-মহীশূরে ভাল পশম পাওয়া যায়। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চলের পশমই উৎকৃষ্ট। এইসকল পশমেই শালের উপযুক্ত সূতা প্রস্তুত হয়। কিন্তু অন্য স্থানের পশম ভাল নহে, তাহা মোটা ও অপরিষ্কার। সাধারণতঃ তাহা গালিচা প্রস্তুত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তর-পশ্চিম ভারতই পশমী দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। ঐ অঞ্চলে পশম উৎপন্ন হইত বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী শীতপ্রধান আফগানিস্তান, এশিয়াধীন রুশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতেও পশম এই অঞ্চলেই আসিত, এবং এখনও আসে। এইসকল পশম উৎকৃষ্টতর। এই অঞ্চলের কুটীরশিল্পে এইসকল পশমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধ্য-এশিয়া হইতে প্রাপ্ত আইবেক্স নামক ছাগলের পেটের লোম কাশ্মীরী শালের উপযোগী পশম।

পশমী বস্ত্র তৈয়ার করিতে ভারতে বৎসরে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ পাউণ্ড পশম ব্যবহৃত হয়। তাহার অর্দ্ধেক বস্ত্রাদি বয়নে এবং অপরার্দ্ধ পশমী সূতা প্রস্তুত করিতে দরকার হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার পশমে গালিচা প্রভৃতি মোটা পশমী-দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। পাতলা ও উচ্চ অঙ্গের পশমী বস্ত্রাদির জন্য সূতা আমদানি করিতে হয়। ভারতবর্ষে উত্তরের ও উত্তর-পশ্চিমের সন্নিহিত দেশ, এবং ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া হইতে বৎসরে ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট পশম আমদানি করে।

আমদানি ও রপ্তানি

উৎপাদন।—পশমী দ্রব্য কলের তাঁতে ও তাঁতীর তাঁতে এত বে-হিসাবিভাবে প্রস্তুত হয় যে, বৎসরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ সঠিক বলা দুরূহ। পশমের কারখানায় ৩ কোটি পাউণ্ড পশম-দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, এবং

১৯৪৬ সালে ২ কোটি ৭০ লক্ষ
১৯৪৭ „ ২ „ ৪০ „
১৯৪৮ „ ২ „ ০ „
এবং ১৯৪৯ „ ২ „ ১০ „

পাউণ্ড পশম-দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কুটীরশিল্প-হিসাবে বা ছোট-ছোট

কারখানায় যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ইহার অন্তর্ভূত নহে! গড়হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের উৎপন্ন পশমের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১১ লক্ষ পা., এবং ঐ সময়ে আমদানি ছিল ৭৯ লক্ষ পা.। সুতরাং গড়ে বৎসরে ১ কোটি ৯০ লক্ষ পা. পশম-দ্রব্য এদেশে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এদেশে উচ্চধরণের পশম-দ্রব্য আমদানি হয়, এবং এদেশ হইতে মোটা কম্বল, র‍্যাগ প্রভৃতিও রপ্তানি হয়; **টাকার হিসাবে** কাঁচা পশম ও পশম-দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির হিসাব এইরূপ :—

পশমের হিসাব

সাল	কাঁচা পশম সমুদ্র ও বায়ুপথে		পশম-দ্রব্য ও সূতা সমুদ্র ও বায়ুপথে	
	আমদানি (সহস্র)	রপ্তানি (সহস্র)	আমদানি (সহস্র)	রপ্তানি (সহস্র)
১৯৪৬	২৩,২৬	২৮,৭৩	৫০,৬৮	৩৩,৯০
১৯৪৭	১৮,৩২	৩৯,৫৩	৩৩,৯৮	৪২,৫৬
১৯৪৮	২২,৯২	৯৬,০	৬৩,২৩	২৫,৯১
১৯৪৯	৩১,৬৫	২১,০৮	৬১,৬১	২৮,৪৮
১৯৫০	৩৬,০১	৪২,৯৪	১২,৬৬	৪৩,৪৯

কারখানা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম যান্ত্রিক কারখানা স্থাপিত হয় কানপুরে,—তাহার ছয় বৎসরেও পরে (১৮৮২) ধারিওয়াল ও বাঙ্গালোরে মিল স্থাপিত হয়। তৎপরে দাদার, অমৃতসরে, ও এলাহাবাদে মিল বসে। ১৯৩৯ সালে এইরূপে পাকিস্তান সমেত ভারতবর্ষে ১৫টি মিল ছিল এবং ১৯৪৪ সালে ছিল ২৪।। কিন্তু বে-সরকারী হিসাবে এক্ষণে ভারত ও পাকিস্তানে পশম-মিলের সংখ্যা—৭৩, তন্মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাবে—৩৩, উত্তরপ্রদেশে—১২, বোম্বাই—১১, মাদ্রাজ—৫, মহীশূর—৩, বঙ্গদেশ—১, বিহার—১, আজমীর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর প্রত্যেকে—১।*

কানপুর ও ধারিওয়াল।—উপরি-উক্ত কলগুলির মধ্যে কানপুর পশম মিল সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং সে-হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ধারিওয়াল। আশ্চর্য্যের বিষয় কানপুর পশম-উৎপাদন-স্থানও নহে, স্থানের সন্নিকটে অবস্থিতও নহে। কানপুরের শ্রেষ্ঠত্ব ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতা (Geographical Inertia)-র অন্যতম উদাহরণ। ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলা নাই, কিন্তু কার্পাসশিল্পে ল্যাঙ্কাশায়ার

* *Indian & Pakistan Year Book, 1950.*

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—বহু প্রাচীনকালে অন্য সকলের আগেই এখানে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়া এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, এক্ষণে অন্য অনেক কার্পাসশিল্পের স্থান, বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, ল্যাঙ্কাশায়ারকে তাহার সম্মানজনক প্রথম স্থান হইতে উঠাইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ শেষ হইলে যখন কানপুরে একটি সৈন্যাবাস স্থাপিত হইল, তখন প্রধানতঃ তাহাদের প্রয়োজনেই এখানে পশমের (এবং চামড়ার) কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ভারতে প্রথম পশম-কল। সন্নিকটবর্ত্তী উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চল হইতে পশম আনানো এখানে সুবিধাজনক, এবং ইহা উত্তর-ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত,—এখান হইতে বঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত সকল স্থলের বাজারের সহিত সংযোগ রাখা সহজ। আবার বোম্বাই বন্দরে বিদেশের পশম আমদানি করা ও কলিকাতা বন্দর হইতে পশমদ্রব্য রপ্তানি করাও এখান হইতে সহজ। তাই ক্রমশঃ এই স্থান শ্রেষ্ঠ পশম-শিল্পস্থল হইয়াছে।

ধারিওয়াল পশম-উৎপাদন-অঞ্চলে অবস্থিত, এবং সন্নিহিত দেশ হইতে পশম আমদানি করাও ইহার পক্ষে সুবিধাজনক। সেজন্য ধারিওয়াল শীঘ্রই উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ভারতের পশমশিল্প ও মহাযুদ্ধ।—দুইটি মহাযুদ্ধই ভারতের পশম-শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পশমী দ্রব্যের আমদানি কমিল, অথচ চাহিদা বাড়িল। ইহাতে এদেশে পশমশিল্পের উন্নতি হইল, এবং যুদ্ধের পরেও পশমশিল্পের কারখানা স্থাপিত হইল। কিন্তু যুদ্ধের পর বেশী দিন আর চাহিদার জোর রহিল না, অথচ বিদেশ হইতে, বিশেষ জাপান হইতে, পশম আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল। ইহাতে এদেশী পশমশিল্পের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও পূর্ব্ববৎ চাহিদা ভীষণ বাড়িল, এবং আমদানিও ভীষণ কমিল। এবার জাপান যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িল ;—সেজন্য আমদানির পরিমাণ খুবই কমিয়া গেল,—পশমী দ্রব্য ও পশমসূত্র—দুইয়েরই অভাব হইয়া পড়িল। কিন্তু এত অভাব সত্ত্বেও সূত্রের অভাবে এদেশে পশমী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িল না। শেষে অস্ট্রেলিয়া ও গ্রেটবৃটেন হইতে সূত্র আসিতে লাগিল, এবং তখন হইতে এদেশে পশমের কলগুলি চলিতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ ভারতে পশম-শিল্পের অবস্থা উজ্জ্বল হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার পরেই ভারত-বিভাগবশতঃ এই শিল্পসম্পর্কে একটা ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। ভারত-বিভাগের ফলে—

১। বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম-পাঞ্জাব প্রভৃতি ভাল-ভাল

পশম-উৎপাদন স্থানগুলি পাকিস্তানে রহিল। কিন্তু সমস্ত ভাল-ভাল পশমের মিলগুলি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পড়িল।

২। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন কাঁচা পশমের পরিমাণ মোটামুটি ৯ লক্ষ পা. ছিল। ভারত-বিভাগের পর কিঞ্চিদধিক সিকি ভাগ পাকিস্তানে পড়িল বটে, কিন্তু ভারতের উৎকৃষ্ট পশম পাকিস্তানেই রহিল।

৩। ভারত-বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, (১) উৎপাদন কমিল, ও (২) বেকার-সমস্যা বাড়িল।

৪। পশম মিলের সুদক্ষ কারিগরের অধিকাংশই মুসলমান। তাহারা পাকিস্তানে চলিয়া গেলে ভারতে দক্ষ কারিগরের অভাব হইল।

৫। পশ্চিম-পাকিস্তানে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যাইত। কিন্তু সেখানে কোন কারখানা ছিল না। সেজন্য উহা পশমীদ্রব্য বিক্রয়ের ভাল বাজার ছিল। ভারত--বিভাগের ফলে পাকিস্তানের পক্ষে পশম-বিক্রয়ের এবং ভারতের পক্ষে পশমীদ্রব্য--বিক্রয়ের সহজ বাজার চলিয়া গেল।

কুটীরশিল্প।—পশমের কুটীরশিল্প হিসাবে প্রধান শিল্প—কার্পেট। ইহা প্রধানতঃ রপ্তানি-দ্রব্য। কারণ এদেশে একে ত এই দ্রব্যেরই খরিদ্দার কম, তদুপরি সৌখীন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে,—তা ছাড়া হাতে প্রস্তুত কার্পেট অপেক্ষা কলে প্রস্তুত কার্পেট সস্তা। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারতের পশমী দ্রব্যের যেমন একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন পারস্য ও চীনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। সেজন্য ভারতের কুটীরশিল্প ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইতেছে।

পাকিস্তানে পশমশিল্প।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাকিস্তানে উৎকৃষ্ট পশম জন্মে ও নিকটবর্ত্তী শীতপ্রধান দেশগুলি হইতে উৎকৃষ্ট পশম আমদানি হয়। এইরূপে এখানে প্রায় ৩ কোটি পা. পশম সংগৃহীত হয়। কিন্তু পাকিস্তানে পশমের কল নাই ;—কয়েকটি কুটীর শিল্পের কারখানা আছে মাত্র। সেজন্য পাকিস্তানে এখন পশম--শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে, উৎকৃষ্ট মুসলমান কারিগর পাকিস্তানে গিয়াছে। সুতরাং উৎকৃষ্ট সহজপ্রাপ্য পশম ও উৎকৃষ্ট কারিগর লইয়া মিল স্থাপন করিলে শীঘ্রই পশমশিল্পের উন্নতি হইবে।

চর্ম্মশিল্প

ব্যবসায়ক্ষেত্রে কয়েকটি ইংরাজি শব্দের প্রচলন আছে—Hide, Skin ও Leather. ইহাদের অর্থ-সম্বন্ধে এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ২৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। আবশ্যকবোধে এখানেও উল্লেখ করা যাইতেছে যে,—গোরু ও মহিষ প্রভৃতি বড়-বড় জন্তুর চামড়াকে বলে Hide, এবং ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতি ছোট-ছোট জন্তুর চামড়াকে বলে Skin. আবার ব্যবসায়ক্ষেত্রে গোচর্ম্মের নাম এবং মহিষ চর্ম্মের নাম Buffs. এই সকল চামড়া কতকগুলি বৃক্ষের ও ফলের রস দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইলে তাহার নাম হয় Leather.

পশ্চিম-পৃথিবীতে চামড়া রং ও সংস্কার করা হয় ওক ও হেমলক প্রভৃতি গাছের ছালের রসে। ভারতবর্ষে চর্ম্মশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়—(১) বাবলা, আভারাম, দিবিদিবি ও ওয়াট্‌ল্ (wattle), গরাণ, গর্জ্জন, সোনালি প্রভৃতি গাছের ছাল ও হরীতকী ফলের কষায় রস, অথবা (২) কতকগুলি লবণ-পদার্থ ও বাসায়নিক দ্রব্য। যে ক্রোম চামড়া বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ক্রোমিয়ম সল্ট (chromium salt) নামক লবণ-দ্রব্য-যোগে প্রস্তুত হয়।

উপরি-উক্ত কষায় দ্রব্যগুলির মধ্যে দিবিদিবি ও ওয়াট্‌ল্ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই দুইটিই বিদেশী গাছ। এক্ষণে দক্ষিণ-ভারতে ইহার চাষ হইলেও ইহাদের ছালের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। বাবলা উত্তর-ভারতে জন্মে, আভারাম জন্মে দক্ষিণ-ভারতে প্রধানতঃ মান্দ্রাজ-অঞ্চলে। গরাণ, গর্জ্জন ও সোনালী বঙ্গদেশের গাছ,—ইহাদের মধ্যে সোনালী ভাল,—গরাণের রস অত্যন্ত রক্তবর্ণ, সেজন্য চামড়া ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া দৃষ্টিকটু হয়।

ক্রোমিয়ম লবণ দিয়া চর্ম্মসংস্কার দক্ষতাসাপেক্ষ। সেজন্য অভিজ্ঞ শ্রমিক না হইলে এই প্রথা কার্য্যকরী হয় না। এইজন্য দেশী কষায়বহুল দক্ষিণ-ভারতে ইহার প্রচলন কম। ইহার প্রচলন উত্তর-ভারতে বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে বেশী।

চামড়ার প্রাপ্তিস্থান।—চামড়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় মান্দ্রাজ হইতে। কারণ এখানকার গবাদি পশুর মৃত্যুর হার বেশী। এই কারণে বঙ্গদেশ হইতেও বেশী চামড়া পাওয়া যাইত। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশ পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এখানকার চামড়ার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের পরে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রভৃতির স্থান। পশ্চিম-ভারতে গোরুর মৃত্যুর হার কম। সেইজন্য গোরুর সংখ্যা বেশী হইলেও চামড়া কম পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে

গোবধ নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধপ্রায়। পাঞ্জাব হইতে বেশী চামড়া পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধেক এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা দরকার,—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের চামড়ার শতকরা ৮০ ভাগ মৃত গোরুর চামড়া। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কসাইখানায় নিহত গোরুর চামড়াই উৎকৃষ্ট। ছাগল, ভেড়া প্রত্যহই অধিক পরিমাণে কসাইখানায় বধ করা হয়। সেজন্য ইহাদের নিহত প্রাণীর চামড়ার সংখ্যাই বেশী।

চর্ম্মশিল্পের কেন্দ্রভূমি।—চর্ম্মশিল্পকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) চর্ম্মসংস্কার (tanning), ও (২) চর্ম্মদ্রব্য-নির্ম্মাণ (shoe-making, etc.)।

কতক পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে চর্ম্মসংস্কার ও চর্ম্মদ্রব্য-নির্ম্মাণের জন্য এদেশে প্রায় সাড়ে চারিশত কারখানা আছে বটে, কিন্তু এখনও এই দুইটি শিল্পই দেশের চামার শ্রেণীর হাতে রহিয়াছে। তাহারা প্রাচীন দেশীয় মতেই এখনও চর্ম্মসংস্কার করে এবং কুটীরশিল্প-হিসাবে চামড়া রং করে ও চর্ম্মদ্রব্য প্রস্তুত করে। সেজন্য এই ব্যবসা কেন্দ্রীভূত হয় নাই ;—সর্ব্ব রাস্ট্রের সকল অংশেই ছড়ানো রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে চর্ম্মসংস্কার ও চর্ম্মদ্রব্য প্রস্তুত করার বড় কারখানা সমগ্র ভারত-যুক্তরাস্ট্রে ৬টি মাত্র আছে। এগুলি মান্দ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত।

চর্ম্মসংস্কার-হিসাবে দক্ষিণ-ভারতই শ্রেষ্ঠ। কারণ (ক) দক্ষিণ-ভারতে,—বিশেষতঃ মান্দ্রাজে, চামড়া পাওয়া যায় বেশী,—ছোট জন্তুর চামড়া (skin) এখানে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। (খ) চর্ম্মসংস্কারের উপযোগী কষায়-দ্রব্যের মধ্যে আভারাম এখানে প্রচুর পাওয়া যায় ;—হরীতকীও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং শ্রেষ্ঠ বিদেশী কষায়িন ওয়াট্‌ল্ পূর্ব্ব-ও দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-ভারতের বন্দরে বেশী আসে। সেজন্য দক্ষিণ-ভারতে উহা সহজেই ব্যবহার করিতে পারা যায়। আবার, (গ) মহীশূরে ও হায়দরাবাদে অতি প্রাচীনকাল হইতে এক জাতি বাস করে ;—চামড়া রং করাই তাহাদের পেশা। (ঘ) পণ্ডিচেরীর একজন ফরাসী মরিশস দ্বীপ হইতে উন্নত প্রণালীতে চামড়ার সংস্কার শিখিয়া আসিয়া মান্দ্রাজের নানাস্থানে কারখানা করেন। ইহাতে শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারত চর্ম্মসংস্কারে পটুতা লাভ করে। (ঙ) দক্ষিণ-ভারতে চর্ম্মসংস্কার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বড় জন্তুর পাকা চামড়ার (finished leather) চাহিদা কম। সেজন্য ভারতের অর্দ্ধ-সংস্কৃত (half-tanned) বড় জন্তুর চামড়ার (hides) তিন-চতুর্থাংশ অপেক্ষা বেশী এ-অঞ্চলে তৈয়ারি হয়, ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পূর্ণ-

-সংস্কৃত চামড়া উত্তর-অঞ্চলে বিশেষতঃ কানপুরে বেশী। কিন্তু পূর্ণ-সংস্কৃত ছোটজন্তুর চামড়া মান্দ্রাজেই বেশী জন্মে।

উত্তর-ভারতে চর্ম্মসংস্কার-শিল্পে উত্তর-প্রদেশ ও বঙ্গদেশই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বেই বলিযাছি, সৈন্যাবাসের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কানপুরে পশমী দ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হয়। এই সৈন্যগণের প্রয়োজনেই এখানে গবর্ণমেণ্ট অশ্বসজ্জা-প্রস্তুতের কারখানা করেন, এবং ক্রমশঃ এখানে ইউরোপীয়গণের চেষ্টায় জুতা-প্রস্তুত কারখানাও স্থাপিত হয়। চামড়াশিল্পের পক্ষে এস্থান উপযোগীও ছিল। কারণ (১) চারিদিক্ হইতে এখানে চামড়া সংগ্রহ করার স্থবিধা ছিল, (২) এই অঞ্চলে প্রচুর বাবলার গাছ ছিল। তাহার ছালের কষায় রস চামড়া রং করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (৩) কানপুর উত্তর-ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। স্থতরাং শিল্পদ্রব্য চালান করার বিশেষ স্থবিধা। (৪) সৈন্যাবাস স্থাপিত হওয়ায় এখানে চর্ম্মদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাও বাড়িয়া যায় এবং ইউরোপীয়গণ ও গবর্ণমেণ্ট অগ্রণী হওয়ার জন্য এই শিল্প এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চর্ম্ম-উৎপাদক স্থান ছিল। কষায়িন বাবলা গাছ এবং হরীতকী ঐ অঞ্চলে কিছু-কিছু মিলিলেও ব্যবসায়ের পক্ষে প্রচুর নহে। কিন্তু কলিকাতা একটি বড় বন্দর,—বঙ্গদেশের চামড়া-রপ্তানির শ্রেষ্ঠ স্থান, এবং কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিয়া, এ অঞ্চলে চামড়া, ও চর্ম্মদ্রব্যের চাহিদা বেশী ছিল। এজন্য এ-অঞ্চলে চর্ম্ম-সংস্কারশিল্প বহুদিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। এদেশ হইতে বাবলা ও হরীতকী পাওয়া যায়, এবং বিদেশ হইতে ওয়াট্‌ল্ বা ওয়াট্‌ল্-নির্য্যাস আনাইয়া লইতে হয়। কিন্তু কেমিক্যাল-যোগে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করা তদপেক্ষা স্থবিধাজনক বলিয়া এখানে এইরূপ চর্ম্মসংস্কারের প্রথার প্রচলন বেশী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চর্ম্মসংস্কারের সর্ব্বপ্রধান স্থান বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশ, এবং হায়দরাবাদ ও মহীশূর লইয়া গঠিত অঞ্চল। এই অঞ্চলে সমগ্র ভারতের ৬০ শতাংশ সংস্কৃত চামড়া উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে আবার মহীশূর ও মান্দ্রাজ রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু দক্ষিণ-ভারত চর্ম্মদ্রব্য প্রস্তুত করার শ্রেষ্ঠ স্থল নহে। কারণ, এই অঞ্চলে ইহার চাহিদা কম। পরিধেয় দ্রব্যের অঙ্গস্বরূপ অথবা অশ্বসজ্জার দ্রব্যরূপে কিংবা সৌখীন দ্রব্যের ব্যবহারে ইহার চাহিদা উত্তর-ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতেই বেশী। সেজন্য চর্ম্মদ্রব্য-শিল্প উত্তর-ভারতেই বেশী। কানপুরই এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ স্থান। সকল প্রকার চর্ম্মদ্রব্যের কারখানা এখানেই বেশী,—উচ্চাঙ্গের দ্রব্য ইউরোপীয়গণের প্রচেষ্টায় এখানেই প্রথম প্রস্তুত হয়। তাহারই ফলে এখানে এই শিল্প সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ইহাকে ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতা (geographical inertia) বলা যায়। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বড় রকমের কোন চর্ম্মদ্রব্যের কারখানা হয় নাই বটে,

কিন্তু চর্ম্মদ্রব্য কুটীরশিল্প-হিসাবে প্রস্তুত করার ইহা একটি প্রধান স্থান এবং চীনাগণ অন্যতম প্রধান কারিগর। কিন্তু এক্ষণে বাটা কোম্পানির কারখানা চর্ম্মদ্রব্য-শিল্পে খ্যাতিপ্রাপ্ত বড় কারখানা।

যুদ্ধের জন্যই এদেশে চর্ম্মশিল্পের উন্নতি হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চর্ম্মদ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে কানপুরের কারখানায় পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে ঘোড়ার সাজ ও জীন প্রস্তুত হইত। যুদ্ধের প্রয়োজনে জুতার উপরের ও তলার চামড়া প্রস্তুত হইতে থাকে। সেজন্য চর্ম্মশিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে চাহিদা কমিয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঐ চাহিদা পুনরায় বাড়িয়া যায়। সেজন্য চর্ম্মসংস্কার-শিল্প ও চর্ম্মদ্রব্যের পুনরায় উন্নতি হয়। কেবল ছাগলচর্ম্মের সংস্কারের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সেজন্য ইহার রপ্তানি সর্ব্বদাই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোম চামড়ার উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্লেস্ কিড্ চামড়া এখনও এদেশে বিশেষ প্রস্তুত করা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যেমন যুদ্ধকালীন চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, তেমনি চর্ম্মসংস্কারের ও চর্ম্মদ্রব্য-উৎপাদনের কারখানাও বাড়িয়াছে। সেজন্য এদেশে কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। যেমন

	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬
	লক্ষখানি	লক্ষখানি	লক্ষখানি	লক্ষখানি	লক্ষখানি
বৃহৎ পশু (গরু মহিষাদি)	২১.২	১০.৭	১১.০	৪.১	১.৭
ছাগল	৩৪১.০	২৩৬.০	২৫৩.২	১৬৭.৩	১৪৭.০
ভেড়া	২৮.২	৯.৬	১৬.৯	৩৫.৩	৫৭.০
অন্য চামড়া	৭.৯	৬.৭	১১.৩	২৬.২	৩০.১

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পশুর চামড়া রপ্তানির হিসাব

ভারত বিভাগ হওয়ায় চর্ম্মশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বড় জন্তুর ভাল চামড়া পাওয়া যাইত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে,—এক্ষণে উহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের চামড়ার চাহিদা পৃথিবীর অন্যদেশের ভাল ভাল কারখানায় খুব বেশী। আবার ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে গো-মহিষ--বধ কমিয়া যাইতেছে। ইহাতেও চামড়ার সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৃত জন্তুর চামড়া অপেক্ষা নিহত জন্তুর চামড়া উৎকৃষ্ট। সে-হিসাবে পাকিস্তানে ভাল চামড়ার সংখ্যা বেশী। কিন্তু পাকিস্তানে চর্ম্মশিল্পের অবস্থা আদৌ ভাল নহে। সেজন্য পাকিস্তানকে চামড়া বিদেশে চালান দিতে হয়—হয় ভারতে না হয় অন্য স্থানে।

পৃথিবীর উৎপাদনের ১৫.৫ শতাংশ বৃহৎ জন্তুর চামড়া ও ১৯.১ শতাংশ ক্ষুদ্র জন্তুর চামড়া ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত, ইহার নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে চামড়া আমদানি হয়। পাকিস্তান হইতে ১৯৪৪ সালে ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার, ১৯৪৯ সালে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার এবং ১৯৫০ সালে ১৪ লক্ষ ২ হাজার টাকার চর্ম্ম আমদানি হইয়াছিল। এইসকল চামড়া ও এদেশের চামড়া এখানকার কারখানায় ব্যবহৃত হওয়ার পরেও কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৪৮ সালে যাহা রপ্তানি হয়, তাহার ওজন—১০০০ টন;—১৯৪৯ সালে ২ হাজার টন;—১৯৫০ ১ হাজার টন।

চামড়ার রপ্তানিকার্য্যে বিদেশ হইতে নিম্নলিখিতরূপ মূল্য পাওয়া যায় :—

চামড়ার বিদেশী ব্যবসায়
রপ্তানি

সাল	অ-সংস্কৃত বড় ও ছোট গবাদি পশুর চামড়া (সহস্র মুদ্রা)	সংস্কৃত চামড়া (সহস্র মুদ্রা)
১৯৪৬	৬,৭২০	১,৩১,২৫
১৯৪৭	৭,৫৯২	১,৬৪,০৫
১৯৪৮	৪,৪৮০	৯৮,৫০
১৯৪৯	৫,২২৬	১,২৭,০৯
১৯৫০	৭,২৬৬	১,৯০,৪৯

লাক্ষাশিল্প

লাক্ষা কি ?—পলাশ ও কুসুম ফুল প্রভৃতি কয়েকটি গাছের নরম ডালে এক প্রকার অতিক্ষুদ্র পোকা লাগাইয়া দেওয়া হয়। এইসকল পোকা ক্রমশঃ ঐ ডালের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও ঐসকল গাছের নরম ছাল খাইয়া জীবিত থাকে। ইহার পরে ঐসকল কীটের শরীর হইতে লালাব ন্যায় একপ্রকার আঠাল পদার্থ বাহির হইয়া কীটসমেত ডালটিকে ঢাকিয়া ফেলে। কীটগুলি এত ঘন-ঘন থাকে যে, দেহনিঃসৃত পরস্পরের লালায় ডালটি একেবারে ঢাকিয়া যায়। ডালের এই আবরণই লাক্ষা। ডাল হইতে ছুরি দ্বারা এই লাক্ষা ছাড়াইয়া বিক্রয় করা হয়। কখনও-কখনও ডাল হইতে ছুরি দ্বারা ছাড়ানো অসুবিধাজনক হইলে ডাল হইতে উহা না ছাড়াইয়া লাক্ষাসমেত ডালগুলি ১ ইঞ্চি বা ২ ইঞ্চি করিয়া কাটিয়া উহাই বিক্রয় করা হয়।

লাক্ষা, রঞ্জন জাতীয় দ্রব্য। লাক্ষা ধুইলে গাঢ় লালবর্ণের আলতা পাওয়া যায়। এই আলতা লাক্ষাকীটের দেহজাত রক্তবর্ণ রং এবং পূর্ব্বে এই আলতার জন্য লাক্ষার চাষ করা হইত। এই রঙে ভিজানো তুলা আলতা নামে বিক্রীত হইত এবং হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ঐ তুলা জলে ভিজাইয়া ঐ রঙে পদপ্রান্ত রঞ্জিত করিত। কৃত্রিম লাল রং-এর জন্য এই আলতার ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে গ্রামোফোন রেকর্ড করিতে, কাষ্ঠ দ্রব্য পালিশ করিতে, বিদ্যুৎরোধক পদার্থ-নির্ম্মাণে, মোহরের গালা প্রস্তুত করিতে ও এইরূপ নানা কারণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কুলগাছের শাখায় অপরিপক্ব লাক্ষা

বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে লাক্ষার চাষ হয়। তন্মধ্যে বিহারই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিহারের লাক্ষা-উৎপাদন-স্থানগুলি প্রধানতঃ ছোটনাগপুরেই অবস্থিত। ছোটনাগপুরের রাঁচী, পালামৌ, মানভূম ও সিংহভূম লাক্ষার জন্য বিখ্যাত। সাঁওতাল পরগণা জেলাতেও কিছু লাক্ষা জন্মে। বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলাতেই লাক্ষা জন্মে। ভারতে প্রায় ৩৫০টি লাক্ষার কারখানা আছে,—ইহার অধিকাংশ বিহারে অবস্থিত।

১ মণ লাক্ষা পরিষ্কার করিলে ⅔ মণ হয়। এই পরিষ্কৃত লাক্ষাই ব্যবহারে লাগে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় গড়ে ১০ লক্ষ মণ লাক্ষা জন্মে। লাক্ষা ভারতের প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায়-দ্রব্য। পৃথিবীর ৯০ শতাংশ লাক্ষা ভারতেই উৎপন্ন হয়। ১৯৪৯ সালে আঠা ও ধূনা সমেত ৮ কোটি টাকার এবং ১৯৫০ সালে ১১ কোটি টাকার লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে লাক্ষার উৎপাদন, চাহিদা অপেক্ষা বেশী ছিল। ইহাতে মূল্য কমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধকালে ইহার চাহিদা বাড়িলে মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যুদ্ধান্তে মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন, চাহিদা অপেক্ষা কম। সেজন্য এদেশের অনেক কারখানায় পূর্ণভাবে কাজ চলিতেছে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লাক্ষা ভারতের প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায়। সেজন্য বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম লাক্ষা প্রস্তুত করা হইয়াছে ও হইতেছে। লাক্ষার মূল্য কিছু বাড়িলেও রজন--জাতীয় এই কৃত্রিম লাক্ষার সহিত প্রতিযোগিতায় বহুপূর্ব্বে লাক্ষার যে-মূল্য ছিল, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।

রেশম ও রেয়ন-রেশমশিল্প

এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় কৃত্রিম রেশম (Rayon) সম্বন্ধে এবং ৮০ পৃষ্ঠায় রেশমশিল্প-সম্বন্ধে নানাকথা বলা হইয়াছে। সেজন্য সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল ভারতবর্ষের রেশমশিল্পের পরিচয় এস্থানে প্রদত্ত হইল।

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে কুটীরশিল্প হিসাবে রেশমশিল্পের প্রচলন আছে। বহুদিন ধরিয়া ভারতের রেশম বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এদেশে এই শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এক্ষণে এদেশ হইতে আর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রেশম বিদেশে রপ্তানি হয় না,—বরং বৎসরে প্রায় দেড়কোটি টাকার রেশম এদেশে আমদানি হয়। ১৮৮৬ সালে এদেশ হইতে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার রেশম--দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে হয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার। (১) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পেব্রাইন (Pebrine) নামে একপ্রকার জীবাণু-সম্ভূত ব্যাধির জন্য রেশম-কীটের বিনাশ,—(২) বিদেশে এদেশের রেশম-রপ্তানির বিরুদ্ধে শুল্কস্থাপন—এবং (৩) এদেশে ক্ষতিকর শুল্কস্থাপন,—(৪) বিদেশে কলে সহজে নাটাইয়ে সূতা জড়াইবার ব্যবস্থা,—(৫) পৃথিবীতে রেশমদ্রব্যের চাহিদার অল্পতা,—(৬) বিদেশের—বিশেষ চীন ও জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষমতা ও,—(৭) নকল রেশমের আবির্ভাব,— প্রধানতঃ এদেশে এই শিল্পের অবনতির কারণ।

রেশমের প্রকারভেদ।—প্রাপ্তিস্থান।—ভারতবর্ষে চারি প্রকারের রেশম উৎপন্ন হয় :—**রেশম, তসর, মুগা ও এণ্ডি।** তুঁতগাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশম-কীট প্রতিপালন করিয়া সেই কীট হইতে যে-রেশম উৎপাদন করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ রেশম এবং তাহারই নাম সাধারণতঃ রেশম। তসর-কীট অশ্বথ, শিমুল, শাল, সেগুণ, জাম, মাদার, অর্জ্জুন, সজিনা, কুল প্রভৃতি গাছে উৎপন্ন হয়। মুগা-কীট এরূপ অনেক গাছে জন্মে এবং এণ্ডি বা এড়ি-কীট এরণ্ড, বা ভেরাণ্ডা গাছের পাতা খাইয়া বাঁচে। এই সকল কীটের মধ্যে তুঁতপাতাভোজী রেশম-কীট ও এরণ্ড গাছের এণ্ডি-কীট হইতে যে-গুটি পাওয়া যায়, তাহাকে বলে **পালিত গুটি** এবং মুগা ও তসরের গুটিকে বলে **বন্য গুটি।**

তুঁত-কীটের রেশম উৎপন্ন হয়—**পশ্চিমবঙ্গে**—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা হইতে ;—**আসামের** নানাস্থান হইতে ; **মহাশূর** রাষ্ট্রের বাঙ্গালোর, মহীশূর, তুমকুড় ও কোলার জেলা হইতে ;—**মান্দ্রাজের** কইম্বাটুর জেলা হইতে ও **কাশ্মীর** ও **জম্মু** রাষ্ট্র হইতে। এই রেশম **পাকিস্থানে** পাওয়া যায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজশাহী জেলায় ও পাঞ্জাবের অন্তর্গত কোন-কোন স্থানে।
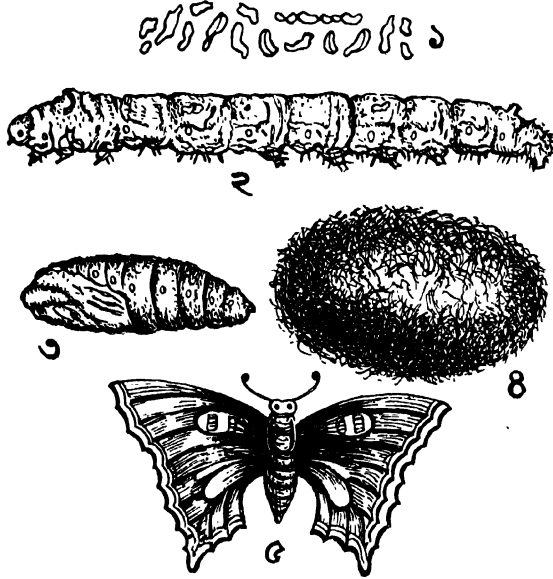
২১নং চিত্র—রেশমকীট

১। রেশমকীটের প্রথমাবস্থা ; ২। পরিণত রেশমকীট—ইহা সূতা বাহির করিয়া নিজের চারিদিকে সূতা দিয়া গুটি বাঁধে ও গুটির ভিতরে থাকে ; ৩। গুটির ভিতর রেশমকীট এই আকারে থাকে ও এই কীট বড় হইতে পারিলে গুটি কাটিয়া বাহির হয় ; ৪। রেশমগুটি ; ৫। গুটির পোকা বাহির হইতে পারিলে এইরূপ প্রজাপতি হয়।

তসরের কীট পাওয়া যায় বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর, পালামৌ ও ছোটনাগপুর হইতে, এবং উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম রাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ হইতে। **মুগার কীট** পাওয়া যায় একমাত্র আসামে ;—এবং **এণ্ডি** জন্মে আসামে এবং আসাম-সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলায়, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ও বোম্বাই-এর বরোদা অঞ্চলে। এণ্ডি-সূতা তূলার ন্যায় পিঁজিয়া চরকায় সূতা তুলিয়া পাকাইয়া লইতে হয়। অন্য রেশমের সূতা গুটি হইতে তুলিয়া লইতে হয়।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই রেশম-কীট

প্রতিপালিত হয় এবং প্রধানতঃ ইহা **ভারতের চারিটি অঞ্চলেই বিশেষভাবে** দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) মহীশূর ও মান্দ্রাজের কইম্বাটুর লইয়া গঠিত দক্ষিণ-ভারত অঞ্চল, (২) মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া ও উত্তরবঙ্গ লইয়া গঠিত পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল, (৩) কাশ্মীর ও জম্মু অঞ্চল ও (৪) আসাম অঞ্চল।

পাকিস্তানে (১) পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া গঠিত পশ্চিম--পাকিস্তান অঞ্চল, ও (২) উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও মালদহ লইয়া গঠিত পূর্ব্ব-পাকিস্তান অঞ্চল রেশম-উৎপাদন-স্থান। কিন্তু সর্ব্বত্র রেশমদ্রব্য প্রস্তুত হয় না। এক্ষণে মহীশূরের বাঙ্গালোর ও মহীশূর,—মান্দ্রাজের কইম্বাটুর জেলা এবং কাশ্মীর শ্রেষ্ঠ রেশম-শিল্পের স্থান। অন্যত্র রেশমশিল্পের অবস্থা ভাল নহে। উদাহরণস্বরূপ—মোটামুটি উৎপাদন—

রাষ্ট্রে	যত লক্ষ টাকার রেশম
মহীশূর	৩৮
কাশ্মীর	১২
মান্দ্রাজ	৫
পাঞ্জাব	½

রেশম-শিল্পের জন্য এক্ষণে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য—পশ্চিমবঙ্গে—মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া (বিষ্ণুপুর), ও বীরভূম ; বিহারে—ভাগলপুর ; উত্তরপ্রদেশে—কাশী ও সাহাজাহানপুর , বোম্বাই-এ—সুরাট, আহম্মদাবাদ, পুণা, ধারওয়ার প্রভৃতি , মান্দ্রাজে—কইম্বাটুর, মাদুরা, হুবলি, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লী ; মহীশূরে মহীশূর ও বাঙ্গালোর ; এবং কাশ্মীরে—শ্রীনগর। ইহাদের মধ্যে কেবল মহীশূরে —একটি, বঙ্গদেশে—একটি ও বোম্বাই স্টেটে—একটি যান্ত্রিক তাঁতের কারখানা আছে। অন্যত্র তাঁত হাতে চলে।

রেশমশিল্পের উন্নতি ও অবনতি।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে কেবল জাপান ও চীন হইতে রেশম আমদানি হইত। কিন্তু যুদ্ধকালে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। সেজন্য সেই সময় এদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতি হয়। সেই সময় প্রায় ২০০ শতাংশ বেশী কাঁচা মাল উৎপন্ন হয়, এবং দ্রব্যমূল্যও ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে মহীশূর ও কাশ্মীর রেশম-শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি করে। ১৯৪৪ সালে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল প্রায় ২৬ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৫ সালে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

পরিকল্পনা।—রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ সালে **ইম্পিরিয়াল সেরিকালচার কমিটি** গঠিত করেন। এই কমিটির নির্দ্দেশে মহীশূর, কাশ্মীর ও আসামে রেশম-শিল্পের উন্নতির জন্য কমিটির সৃষ্টি হয়,— বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়,—এবং বঙ্গদেশে দুইটি রেশমশিল্প-সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরে ভারতের স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৮ সালে **সেণ্ট্রাল সিল্ক বোর্ড আইন** পাশ করেন, ও তাহার বলে ১৯৪৯ সালে বাঙ্গালোরে **সেণ্ট্রাল সিল্ক বোর্ড** স্থাপন করেন। এই বোর্ড রেশম-কীটের চাষ, কীটপালন, কীটের খাদ্যবস্তুর উন্নতিসাধন, রেশম-কীটের চাষের বিস্তৃতি, গুটি হইতে সূতা বাহির করা ও তাহা নাটাইয়ে জড়াইবার উন্নত কৌশলাদি সম্বন্ধে এবং এই শিল্পের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির উপায়-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন। এই বোর্ড, শিল্প-উৎপাদক রাষ্ট্রগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকার,—এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রেশমশিল্পের সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ লোকের সংযোগস্থল। এই বোর্ড বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সমগ্র দেশের রেশমশিল্পের কল্যাণ সাধন করিবেন।

নকল রেশম (Rayon)।—১৮৮৪ সালে সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সে নকল রেশমের কল স্থাপিত হয়, এবং তখন প্রতিদিন ১০০০ পা. নকল রেশম উৎপন্ন হইতে থাকে। শীঘ্রই ইহার চাকচিক্য, অল্পমূল্য, এবং অল্পমূল্যে রেশমদ্রব্য ব্যবহারের গৌরব জগজ্জয় করিয়া ফেলে। এক্ষণে প্রতিদিন নকল রেশমের নানাদ্রব্য পৃথিবীতে দুই সহস্র মিলিয়ন পাউণ্ড উৎপন্ন হইতেছে। ভারত ও পাকিস্তান এবিষয়ে দীনাতিদীন। কারণ পাকিস্তান ও ভারত প্রচুর নকল রেশম ব্যবহার করে, কিন্তু ইহার সূতা প্রস্তুত করিতে পারে না। অবশেষে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে সর্ব্বপ্রথম **ত্রিবাঙ্কুর রেয়ন লিঃ** স্থাপিত হয়, এবং ঐ বৎসরই হায়দরাবাদে **সিরসিল্ক** (Sir Silk Ltd.) ও বোম্বাইতে **ন্যাশন্যাল রেয়ন কর্পোরেশন** স্থাপিত হয়। এই সকল কলে প্রস্তুত দ্রব্য শীঘ্রই বাহির হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাণিজ শিল্প (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৎস্যের চাষ

ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক লোক মৎস্যভোজী—বিশেষতঃ যে-সকল রাষ্ট্র সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, সেখানে মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষে মাছও প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু এতকাল দেশের অভ্যন্তরস্থ খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত মৎস্যই সুপ্রচুর বলিয়া মনে হইত। সেজন্য অন্যান্য অনেক দেশে মৎস্য-সংগ্রহের যে নানারূপ উপায় বাহির হইয়াছে, ভারতবর্ষ সে-বিষয়ে উদাসীন ছিল। এক্ষণে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মৎস্যেরও অপ্রতুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৈনিক অন্ততঃ প্রত্যেকের দুই ছটাক মাছের প্রয়োজন। কিন্তু এখন লোকে দৈনিক এক ছটাক মাছও পায় না—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এক কাঁচ্চাও জুটিতেছে না। এজন্য এক্ষণে আর দেশের কেবল আভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মাছ,—মাছের অভাব দূর করিতে পারিতেছে না। তাই এক্ষণে সমুদ্র-উপকূল ও গভীর সমুদ্র হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এ-বিষয়ে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গই অগ্রণী হইয়াছে।

মৎস্যশিল্পের উন্নতির উপায়।—সামুদ্রিক মৎস্য-চাষের ভবিষ্যৎ। ভারতবর্ষে সামুদ্রিক মৎস্য-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের উপকূল ৩২০০ মাইল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ উপকূলের কোন-কোন স্থানে মাত্র ৫-১০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে মাছ ধরা হয়। ইহার ৬০০ ফিট গভীর অংশ বহুদূরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত অংশে বহু মৎস্যের সম্ভাবনা আছে। যদি **সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য ডেনমার্ক, হলণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত নৌকা, যন্ত্রপাতি, জাল প্রভৃতি** এদেশে **ব্যবহৃত হয়** এবং মৎস্য-শিকারে সেদেশে বর্ত্তমানে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয়, সে-সকল প্রণালী এ-দেশে অনুসরণ করা হয়, তবে মনে হয় এদেশেও মৎস্যের চাষের প্রচুর উন্নতি হইতে পারে।

অন্য হিসাবেও ভারতবর্ষে সমুদ্রীয় মৎস্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। গভীর সমুদ্রে **হাঙ্গর, তিমি প্রভৃতি** মৎস্যের সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সকল বৃহৎ মৎস্য ধরিতে পারিলে ইহাদের তৈল, চামড়া, হাড় প্রভৃতি দ্বারা মৎস্যজাত শিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার ইহার হাড় প্রভৃতি হইতে সারও প্রস্তুত হইতে পারে।

মুক্তা-সঞ্চয়।—সমুদ্রে **মুক্তা-সঞ্চয়** একটি লাভজনক ব্যবসায়। কচ্ছ উপসাগরে, সৌরাষ্ট্র রাষ্ট্রের পার্শ্বে, সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে সর্ব্বজনবিদিত মুক্তাক্ষেত্র আছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে এখানে মুক্তা সংগ্রহ হয়। কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুক্তার চাষ করা ও মুক্তাক্ষেত্রের উন্নতি বিধান করা দরকার। মান্দ্রাজে ইহার জন্য গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে আরও চেষ্টা আবশ্যক।
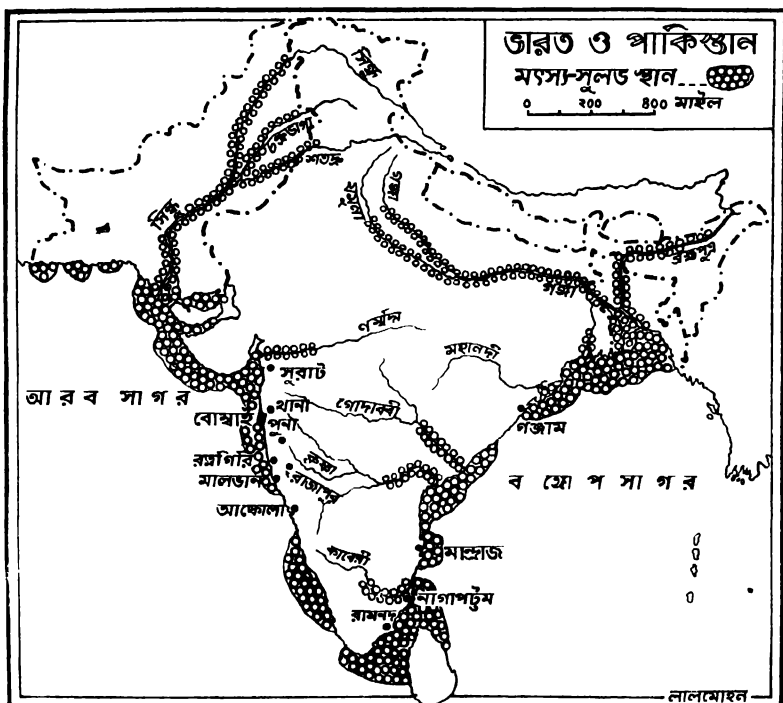
২২নং চিত্র—মৎস্যের চাষ—মৎস্য-সুলভ স্থান।

বিদেশী মাছের চাষ।—স্বদেশী ও বিদেশী—দুইপ্রকার মাছের চাষই যাহাতে এদেশে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি আবশ্যক।

মৎস্য-ব্যবসায়ীকে উৎসাহদান।—মৎস্য-ব্যবসায়িগণ যাহাতে লবণ প্রভৃতি মৎস্যরক্ষণদ্রব্য সহজে পাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এজন্য লবণশুল্ক বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

জনসাধারণকে উৎসাহদান।—জনসাধারণ যাহাতে উৎসাহসহকারে এই ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয় সে-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা আবশ্যক। মৎস্য-সম্বন্ধে ও মৎস্য-

-ব্যবসায়-সম্বন্ধে গবেষণাগার সর্ব্বত্র আবশ্যক। (করাচী*), বোম্বাই, ক্রুশদৈ দ্বীপ, মান্দ্রাজ, ভিজাগাপত্তন, (চট্টগ্রাম*) এই সকল স্থানে গবেষণাগার স্থাপন করিলে সমগ্র উপকূল ও তৎসন্নিহিত সমুদ্র-সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হইতে পারে।

মৎস্যশিল্পে ভারতের বর্ত্তমান স্থান।—মৎস্যশিল্পে জাপানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ :—

জাপান	মাছ ধরে	মাথাপিছু	১১১ পা.
ক্যানাডা	"	"	১০৯ "
ডেনমার্ক	"	"	৬৩ "
যুক্তরাজ্য	"	"	৪৯ "
আ. যুক্তরাষ্ট্র	"	"	৩৮ "
রুশিয়া	"	"	১৮ "
ভারতবর্ষ	"	"	৪ "

মৎস্যের শ্রেণীভেদ।—প্রাপ্তিস্থান হিসাবে ভারতবর্ষে মৎস্যকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—

১। আভ্যন্তরীণ বা **অসামুদ্রিক মৎস্য।**—দেশের অভ্যন্তরে যে-সকল মাছ পাওয়া যায়, তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর মাছ কতক পাওয়া যায়,—খাল, বিল, মিষ্ট জলের নদী ও হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি মিষ্ট জলের জলাশয় হইতে, এবং কতক পাওয়া যায় নদীমুখের ও উপহ্রদের লবণাক্ত জল হইতে। প্রায় সকল স্টেট হইতেই এই শ্রেণীর মাছ পাওয়া যায়।

* পাকিস্তানে

২। সামুদ্রিক মৎস্য।—প্রধানতঃ সমুদ্রতীরস্থ স্টেটগুলিতে সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হয়। ভারতবর্ষের উপকূলের নিকটে বা উপকূল হইতে অল্পদূরে মাছ ধরা হয় বটে, কিন্তু গভীর সমুদ্রে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই স্টেটেই ইউরোপীয় প্রথায় মাছ ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার জন্য ইউরোপ হইতে জাল ও জেলে আনা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে-মাছ ধরা হয়, তাহা সাধারণতঃ এ-দেশের লোকের পক্ষে সুপ্রচুর নহে। সেজন্য কিছু-কিছু লোনা মাছ, শুঁট্‌কি মাছ ও টিনের কৌটার মাছ এদেশে আমদানি করা হয়, কিন্তু টাট্‌কা মাছ আসে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে শুঁট্‌কি মাছ ব্যবহৃত হয়। শুঁট্‌কি মাছের ব্যবসায়ে মান্দ্রাজ শ্রেষ্ঠ—অর্দ্ধেকের বেশী শুঁট্‌কি মাছ এখানেই জন্মে। সেখানে মাছ শুকাইবার অনেক আড়ত আছে। ভারত-বিভাগের পর পাকিস্তানের—বিশেষতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্তানের টাট্‌কা মাছ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা হইত বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই আমদানি অনিশ্চিত,—কখনও আসে, কখনও আসে না। যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটি ৫ লক্ষ টন মাছ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই সমুদ্রীয় মৎস্য।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মৎস্যজাত ব্যবসায়-দ্রব্য বিশেষ উৎপন্ন হয় না। কেবল বোম্বাই ও মান্দ্রাজ স্টেটে হাঙর ধরিয়া তেল উৎপাদন করা হইতেছে। ভবিষ্যতে এদেশে মাছের তেলের ব্যবসায়ে উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে।

কয়েকটি প্রধান মৎস্য-চাষের প্রদেশ।—

(ক) মান্দ্রাজ।—মৎস্যশিল্পে মান্দ্রাজ বহু উন্নত,—এবং বহুদিন হইতে এই স্টেট নানাপ্রকার মৎস্যশিল্পে লিপ্ত আছে। ইহার উপকূল-সন্নিহিত লবণ জলে, নদীতে, জলসেচ-জলাশয়ে, হ্রদে ও অন্যান্য জলাশয়ে প্রচুর মাছ জন্মে। গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিভাগ মৎস্য-চাষের উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহশীল। অধিকাংশ জলাশয়ে গভর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিভাগের দ্বারা, অথবা ইহার তত্ত্বাবধানে অন্য লোক দ্বারা মৎস্য-চাষ করা হয়, এবং মৎস্যের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার গবেষণা করা হয়। এই মৎস্য-বিভাগের তত্ত্বাবধানেই কাবেরী নদীতে রোহিতাদি মৎস্যের এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীতে ইলিশ মাছের "পোনা" উৎপাদন করা হয়। এই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ-বিশেষ আইন আছে।

কেন্দ্রীয় মৎস্য-বিভাগ ব্যতীতও, জেলায়-জেলায় মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য মৎস্য-ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য (মান্দ্রাজ)।—নানাপ্রকার রুই, ইলিশ, বাইন প্রভৃতি এবং মৎস্য-বিভাগের চেষ্টায় প্রতিপালিত যবদ্বীপ হইতে আনীত

গৌরমি (Gaurami), বিলাতী রুই, বিলাতী টেঞ্চ (Tench) ও রঙ্গীন ট্রাউট (Trout) এখানকার আভ্যন্তরীণ মাছ। বিদেশী মাছ এখানে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়, এবং অন্য-অন্য স্টেটে বিক্রীত হয়।

সামুদ্রিক মৎস্য (মান্দ্রাজ)।—মান্দ্রাজের উপকূল ১৭৫০ মা. দীর্ঘ—পূর্ব্বভাগে ইহার মহীসোপান বহুদূর বিস্তৃত,—উপকূলে ৬০০ ফুট গভীর সমুদ্রতল পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ ফল,—৪০,০০০ বর্গ-মাইল। সুতরাং এই অঞ্চলে মাছের প্রাদুর্ভাব হওয়া উচিত। কিন্তু এ-অঞ্চলে এখনও ট্রলার প্রভৃতি জেলে-স্টিমার প্রভৃতি রাখিবার মত পোতাশ্রয়ের অভাব,—এমন কি দেশীয় নৌকা রাখারও অসুবিধা। সেজন্য এ-অঞ্চলে দূরসমুদ্রে মৎস্যশিকারের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। কেবল গাঞ্জাম হইতে নাগাপত্তন পর্য্যন্ত "কাটামারান" নামক স্থানীয় জেলে-নৌকায় উপকূল হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত মৎস্যশিকার হয়।

কিন্তু মান্দ্রাজের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে—কতক পোতাশ্রয়ের জন্য ও কতক মৎস্য-শিকারের সুবিধার জন্য অধিকতর মৎস্যজীবী বাস করে এবং অধিকতর পরিমাণে মাছ ধরে। এই অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ মণ মাছ ধরা পড়ে। ম্যাকারেল, সার্ডিন (Sardine), চিংড়ি মাছ (Prawn), ভাওয়াল (Pomfret), ছোল (Sole), বিড়াল-মৎস্য (Cat-fish) প্রভৃতি এই অঞ্চলের মাছ।

মান্দ্রাজের মৎস্য-বিভাগের কার্য্য।—মান্দ্রাজের মৎস্য-বিভাগের চেষ্টায় এখানে মৎস্যশিল্পের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, সেরূপ আর ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। (১) ইহা মান্দ্রাজের উপকূলে প্রায় একশত "লোনামাছ" প্রস্তুত করার কারখানা করিয়াছে। এই স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে সস্তায় লবণ সরবরাহ করা হয়। ১৯৪৯ সালে এখানে ১৪ লক্ষ মণ মাছ লবণাক্ত করা হয়। লোনামাছ তৈয়ারির এত বিস্তৃত ব্যবস্থা মান্দ্রাজের মত অন্য কোথাও নাই।

(২) ইহা যুদ্ধকালে ১৯৪৪ সালে সৈন্যগণের জন্য ধূমযোগে মাছ শুকাইবার সাতটি কেন্দ্র স্থাপন করে। ইহা হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে সওয়া-লক্ষ পাউণ্ড ধূমশুদ্ধ মৎস্য সৈন্যদিগকে পাঠানো হয়। যুদ্ধান্তে এই ধূমশুষ্ক মৎস্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য এখন কালিকটে এরূপ একটি মাত্র কারখানা আছে।

(৩) ইহা মান্দ্রাজে ধরা-মাছ জীবিত রাখার জন্য একটি সামুদ্রিক জলাশয় (marine aquarium) স্থাপন করে। এরূপ জলাশয় সমগ্র এশিয়ায় অন্য কোথাও ছিল না। যুদ্ধের সময় ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে আবার উহা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

(৪) ইহা **তিরুনেলভেলি ও রামনাদের** নিকট যে-ঝিনুকক্ষেত্র আছে সেখান হইতে মুক্তা-ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছে ও সেই সম্বন্ধে গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে।

(৫) ইহা ১৯৪৪ খৃঃ অব্দ হইতে গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকারের ব্যবস্থা করিয়াছে, স্থানীয় মৎস্যজীবীরা যাহাতে এই গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকারে উৎসাহিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে, এবং হাঙ্গর ধরিয়া তাহার লিভার হইতে ভিটামিন "এ" সম্পদে মূল্যবান্ হাঙ্গর-তৈল প্রস্তুত করিতেছে। এই তৈলে কডলিভার তৈলের অভাব অনেকাংশে পূরণ করিবে।

(৬) এতদ্ব্যতীত এই বিভাগ সামুদ্রিক জন্তু-সম্বন্ধে ও মৎস্যাদি-সম্বন্ধে গবেষণার জন্য নানাস্থানে গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে। সামুদ্রিক জন্তু-সম্বন্ধে ক্রুশদই দ্বীপে যে গবেষণাগার আছে, তাহা অপূর্ব্ব—তাহা দেখিবার জন্য দলে-দলে প্রতি বৎসর শিক্ষার্থী সেখানে আসে।

(খ) কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র।—কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে মৎস্য-শিকারীরা বিশেষ দক্ষ,—তাহাদের নৌকাও সুগঠিত। সমুদ্র বমবিল (bombil) ও পমফ্রেট (pomfret) এখানকার প্রধান মৎস্য। নিকটেই বিখ্যাত কোডিনার মৎস্যক্ষেত্র। এখান হইতে বোম্বাই বাজারে পমফ্রেট মৎস্য বিক্রয়ের জন্য যায়।

(গ) বোম্বাই।—বোম্বাই রাষ্ট্রে মৎস্যের চাষের উপযোগী জলসেচ-খাল, জলাশয় প্রভৃতির অভাব নাই বটে, কিন্তু এ-অঞ্চলে স্বাদু জলের মাছ বিশেষ নাই। কয়েক জাতীয় রোহিত মৎস্য এখানে জন্মানো হয় বটে, কিন্তু পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে উহার পোনা আনিতে হয়। সেজন্য স্বাদু জলের মাছের এখানে বিশেষ অভাব।

সামুদ্রিক মৎস্য—বোম্বাই অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য সুপ্রচুর। ইহার উপকূল সুদীর্ঘ ;—সম্মুখে বিশাল সমুদ্র,—সুতরাং উপকূলে বহুসংখ্যক সাহসী মৎস্যজীবী বাস করে। তা'ছাড়া এই উপকূলে নৌকাদি রাখিবার অনেক পোতাশ্রয় আছে। সেজন্য এই রাষ্ট্রের পশ্চিম-উপকূলে কচ্ছ হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত উপকূলে, এবং বোম্বাই সহরের দক্ষিণে রত্নগিরি ও বাজাপুর অঞ্চলে সমুদ্র-উপকূলে, সেপ্টেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত প্রচুর মৎস্য ধরা পড়ে। বম্বেল (বোম্বাই Duck), পমফ্রেট (Pomfret), জু মাছ (Jew Fishes) এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য।

গভীর সমুদ্রের মৎস্য।—বোম্বাই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ইউরোপ হইতে জেলে-স্টিমার আনাইয়া গভীর সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে এইরূপ একটি মাছ ধরিবার আড্ডা আছে। সেখান হইতে হাঙ্গর ধরিয়া হাঙ্গরের লিভার হইতে তৈল বাহির করিবার কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই সরকারের মৎস্য-শিল্প-উন্নয়ন-কার্য্য।—মৎস্য-শিল্পের উন্নতিকল্পে বোম্বাই সরকার অনেক কার্য্য করিয়াছেন। যেমন—

(১) সামুদ্রিক মৎস্য চালান দিবার জন্য মোটর-নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাণ্ডা

নামক স্থানে প্রথম এইরূপ মোটর-নৌকা চলিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে বোম্বাই হইতে মৎস্য ধরিবার স্থান পর্য্যন্ত ৪০ খানি মোটর-নৌকা চলিতেছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার উপযোগিতা বুঝাইবার জন্য প্রথম হইতে মৎস্যজীবীদিগের সাহায্যে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে ইহাতে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে, এবং এক্ষণে বে-সরকারী যৌথ কোম্পানিও এই কার্য্য চালাইতেছে।

(২) বোম্বাই, পুণা, রত্নগিরি, মালভান, চেণ্ডিয়া আঙ্কোলা প্রভৃতি স্থানে মাছ টাট্‌কা রাখিবার জন্য বরফের কল স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) মাছ লবণাক্ত করার জন্য বোম্বাই সহরে—৪০টি, রত্নগিরি জেলায়—২০টি ও কানারা জেলায়—১৫টি কারখানা আছে। এই সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিনা শুল্কে লবণ দেওয়া হয়।

(৪) গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার কার্য্যে, জেলে-স্টিমার ও মোটর-স্টিমার চালাইতে, মৎস্য চালান দিতে ও যৌথ কারবার চালাইতে, এদেশী মৎস্যজীবীরা যাহাতে পটুত্ব লাভ করে, সেজন্য সুরাট, বোম্বাই, থানা, রত্নগিরি, কানারা প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

যৌথ কারবার।—যৌথ কারবারের উপকারিতা বোধ করিয়া মৎস্যজীবিগণ কর্ত্তৃক সুরাট, থানা, বোম্বাই, রত্নগিরি, কানারা প্রভৃতি জেলায় বহু স্থানে মৎস্যব্যবসায়-সংক্রান্ত যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সকল কোম্পানি জেলে-স্টিমার, মোটর-স্টিমার, লবণ, বরফ প্রভৃতি সম্পর্কে নানা সাহায্য পাইয়া থাকে।

মৎস্যজাত দ্রব্য,—(বোম্বাই)।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে কডলিভার তেলের আমদানি বন্ধ হইলে হাঙ্গরের তেলের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং দেখা যায় যে, ইহাতে ভিটামিন "এ" প্রচুর আছে, ইহা কডলিভার তৈল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেজন্য জেলেদের মধ্যে সহজে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষণে অনেক স্থলে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। সাস্থন ডকে Fisheries Technological Laboratory স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের তৈলও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই স্থানে ৪০০০ গ্যালন তৈল পরীক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত এখানে মাছের ডানা, হাড় ও আঁশ হইতে শিরিষ (gelatine) ও আঠা (glue) ও জমির সার প্রস্তুত হয় ও অন্যত্র চালান যায়।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ।—পশ্চিমবঙ্গের লোক প্রধানতঃ মৎস্যভোজী, এবং বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মৎস্যের প্রাচুর্য্য ছিল। ইহার স্বাদু জলে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং সুন্দরবনের লবণ জলে ভেটকি, তপসে, পারসে, ইলিশ প্রধান মৎস্য। ১৯৫১

সালের লোকগণনা অনুযায়ী মাথা পিছু এক ছটাক হিসাবে ধরিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন ৩৮ হাজার মণ মাছের দরকার। কিন্তু এক্ষণে এখানে প্রত্যহ ন্যূনাধিক দুই হাজার মণ মাছ উৎপন্ন হয়, এবং মোটামুটি ২ হাজার মণ আমদানি হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে মাছের বিশেষ অভাব হইয়াছে। এই **অভাবের কারণ** মোটামুটি এইরূপ—

(১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপানী কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া পাছে তাহারা সহজে নদী খাল পার হইতে পারে সেজন্য তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট জেলেদের নৌকা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) নৌকাশূন্য হইয়া অনেক মৎস্যজীবী অন্য জীবনোপায় অবলম্বন করিয়াছিল। অব্যবহারে জেলেদের জালও নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরে অনেক জেলে মারা যায়।

(৪) যুদ্ধের পরে কাষ্ঠ ও সুতা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়ে এবং মূল্য দিলেও উহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এজন্য জেলেরা আর নৌকা ও জাল প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না।

(৫) বঙ্গবিভাগের পর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট মৎস্যক্ষেত্র পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে ২৫ মাইল মাত্র সমুদ্রোপকূল, গুটিকয়েক নদী, কয়েকটি মাত্র বিল, খাল ও পুষ্করিণী এবং ১২ লক্ষ একর উচ্চভূমির জলাশয়। ইহাদের মধ্যে নদীগুলি প্রায় মজিয়া গিয়াছে, এবং বিল, খাল, পুষ্করিণীগুলি পঙ্কে ও দামে পরিপূর্ণ। উপকূলও অতি অল্প বলিয়া সৈকতীয় মৎস্যশিকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৬) নদী ও নদীশাখা দ্রুত মজিয়া যাইতেছে।

মৎস্যশিল্প উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা।—পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যের অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে—

(১) গ্রামের ভিতরের পঙ্ক ও দামপূর্ণ পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণ দিবেন। অথবা পুষ্করিণী খরিদ করিয়া পঙ্কোদ্ধার করিয়া মৎস্যচাষের জন্য জমা দিবেন।

(২) গবর্ণমেণ্ট পুকুরে রোহিত প্রভৃতি মাছের পোনা ফুটাইয়া সেই পোনা স্থানীয় লোকদের নিকট বিক্রয় করিয়া মৎস্যচাষে উৎসাহ দিবেন।

(৩) সৈকতীয় ও দূর-উপকূলীয় মৎস্যশিকার যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য উপযুক্ত জাল, নৌকা প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া জেলেদিগকে উৎসাহ দিবেন।

(৪) দূর হইতে মৎস্য চালানের সুবিধার জন্য বরফঘরযুক্ত স্টিমারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) ইউরোপ হইতে জেলে-স্টিমার ও জেলে আনিয়া সমুদ্র হইতে মৎস্য-শিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং হাঙ্গরের লিভর হইতে তৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। কণ্টাই মহকুমার উপকূলে এক্ষণে এই তৈল উৎপন্ন হইবে এবং কলিকাতা টেকনোলজিক্যাল ল্যাবোরেটরিতে ইহা শুদ্ধীকৃত হইবে। অন্য-অন্য মৎস্যজাত দ্রব্যও এখানে প্রস্তুত করা হইবে।

(ঙ) উড়িষ্যা।—উড়িষ্যার পূর্ব্বদিকের সমুদ্র এবং আভ্যন্তরীণ বিল, নদী ও পুষ্করিণী, বিশেষতঃ চিল্কাহ্রদ, মৎস্যপূর্ণ। সেজন্য উড়িষ্যার মৎস্য-সম্পদ্ বেশী। কিন্তু উড়িষ্যার মৎস্যশিকার ও মৎস্য-সংক্রান্ত ব্যবসায় সাধারণতঃ জনসাধারণের হস্তে,—গবর্ণমেণ্ট এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন না। উপকূলে পোতাশ্রয়ের অভাব, ব্যবসায়ের মূলধনও কম, মাছ তাজা রাখিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। সেজন্য উপকূলীয় মৎস্যশিকার উন্নত হয় নাই। জেলেরাও গরীব।

আভ্যন্তরীণ নদী, বিল, খাল ও পুষ্করিণীতে রোহিত, মৃগেল, কাতল ও ইলিশ প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। বালেশ্বর, কটক, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে মাছের পোনা সংগৃহীত হয়। বালেশ্বর জেলার লক্ষ্মণনাথে মাছের পোনার ব্যবসা চলে।

চিল্কাহ্রদে প্রচুর মৎস্য আছে, এবং এখানে প্রধানতঃ ভেকৃটি, মুলেট (mullet), ম্যাকারেল, পমফ্রেট, ভারতীয় স্যামন (Indian salmon) প্রভৃতি ধরা হয়। মাছ প্রধানতঃ কলিকাতায় চালান যায়। এখান হইতে অন্ততঃ ৫০ হাজার মণ মাছ রপ্তানি হয়। মহানদী নদীমুখেও ভাল মাছ পাওয়া যায়, এবং সেখানে স্থানে-স্থানে মাছের আড়ত আছে।

উড়িষ্যার সমুদ্রে ম্যাকারেল, পমফ্রেট, ইলিশ, সার্ডিন প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায় এবং পূর্ব্ব-উপকূলে চাঁদবালি, চণ্ডীপুর, তালপাড়া, পুরী, গোপালপুর ও সোনারপুর প্রভৃতি স্থানে সামুদ্রিক মাছের আড়ত আছে। এই সকল মাছ চালান দিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

মৎস্য শুষ্ক করা ও লবণাক্ত করা এখানকার মৎস্য-সংক্রান্ত অন্য শিল্প।

(চ) অন্যস্থান।—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাইয়ের অন্তর্গত বরোদা, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, হায়দারাবাদ প্রভৃতি স্থানেও মৎস্য পাওয়া যায়, এবং ঐ সকল স্থানে মৎস্য-শিল্পের উন্নতি-সম্বন্ধে নানা চেষ্টা হইতেছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক উৎপাদন।—ভারত যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে মোটামুটি ৫ লক্ষ টন মৎস্য ধরা হয়,—কিন্তু ইহার ⅔ অংশ সামুদ্রিক ও নদীমুখের মাছ। এতদ্ব্যতীত, এদেশে শুষ্ক ও লবণাক্ত ও টিনের মাছ আমদানি করা হয়।

মাছের চাষের বর্ত্তমান অবস্থা।—মাছের চাষের দিকে বর্ত্তমান ভারত সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এজন্য তাঁহারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রায় ৫০টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন—

(১) রোহিতাদি প্রধান মৎস্যের পোনা-সংগ্রহ,—উপযুক্ত জলাশয়-রক্ষা,—এবং কোন রাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত পোনা অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ।

(২) মৎস্য-শিকার, -রক্ষণ, -চালান ও -বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(৩) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতি করা, তাহাদের মধ্যে যৌথ কারবার করিবার সুবিধা প্রচার করা ও তাহাদের এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা।

(৪) মৎস্য লবণাক্ত ও শুষ্ক করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া—বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, প্রভৃতি দেশে মৎস্যরক্ষণশিল্প-স্থাপনের যথোচিত উন্নতি করা, ও বিজ্ঞানসম্মত উন্নত মৎস্যরক্ষণ-প্রথার প্রবর্ত্তন করা।

এই সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভারত-সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রকে ৩৪,৫৬,৫৩৬ টাকা সাহায্যদান, ২৩,৬০,০০০ টাকা ঋণ দান করিয়াছেন।

পাকিস্তানে মৎস্যের চাষ

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—এই দুই পাকিস্তানেই প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব--পাকিস্তানই মৎস্যশিল্পে প্রধান।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান।—পূর্ব্ববঙ্গের খালে, বিলে, পুষ্করিণীতে ও নদীতে—এমন কি যে-কোন জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সেজন্য ভাত ও মাছ এখানকার বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিং, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট হইতেও প্রচুর মাছ আসামে চালান যায়। পূর্ব্ব--পাকিস্তানের প্রধান মৎস্য—ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস প্রভৃতি। পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। মধ্যে-মধ্যে নদীতে হাঙ্গর ধরা পড়ে ও তাহার লিভর হইতে তৈল প্রস্তুত করা হয়। মোটের উপর পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রচুর মাছ পাওয়া যায়, এবং নিজেদের অভাব মিটাইয়াও ইহা বিদেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, রপ্তানি করা হয়।

পশ্চিম-পাকিস্তানে **সিন্ধু প্রদেশে** সামুদ্রিক মৎস্যই প্রধান মৎস্য। করাচীই সমুদ্র-মৎস্য ধরিবার প্রধান কেন্দ্র—এবং বেলুচিস্তানের দক্ষিণে গোয়াডার উপসাগর পর্য্যন্ত সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হয়। করাচীতে লোনা মাছ ও শুঁটকি মাছ করিবার কারখানা আছে। কিন্তু সব কারখানাই ব্যবসায়ীর নিজের।—সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি মাছ লবণাক্ত করার ও শুকাইবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

পাকিস্তান সরকার মৎস্যচাষের উন্নতি, সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা, চিংড়ি মাছ শুকাইবার ও তাহা চালান দিবার ব্যবস্থার জন্য নানা গবেষণা করিতেছেন, এবং তজ্জন্য অনুসন্ধান- ও গবেষণা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃত্তিকা

মৃত্তিকার প্রয়োজন।—কৃষিকার্য্যের জন্য মৃত্তিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকা ভূ-ত্বকের বহিরাবরণের সর্ব্বোপরিস্থ স্তর। এই মৃত্তিকার উপরেই কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকা হইতেই কৃষিদ্রব্য তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে। যে-মৃত্তিকা হইতে কৃষিশস্য যত অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে, সে-মৃত্তিকাকে তত উর্ব্বরা বলা হয়। মৃত্তিকাতে একবার ফসল হইলে সেই ফসলে মৃত্তিকার খাদ্যাংশ কমিয়া যায়। ইহাতেই লোকে বলে যে, সেই জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে। তখন সেই জমিতে সার অর্থাৎ নূতন খাদ্য মিশাইয়া দিয়া জমিকে উর্ব্বরা করিতে হয়। এই মৃত্তিকা যে শস্যকে কেবল খাদ্য দেয় তাহা নহে, ইহা তাহাকে আর্দ্রতা ও দাঁড়াইবার ক্ষমতা দেয়;—মৃত্তিকা হইতে শস্য তাহার রস সংগ্রহ করে, এবং ইহার দ্বারা তাহার মূল দৃঢ়বদ্ধ হইলেই সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সুতরাং যে-মাটি অন্তরে জল আবদ্ধ রাখিয়া শস্যের মূলের যত আর্দ্রতা সাধন করিতে পারে, এবং যাহা শস্যমূল আঁটিয়া রাখিয়া তাহাকে যত খাড়া রাখিতে পারে, তাহার উপযোগিতা তত বেশী। অনেক স্থলে বৎসরে অতি অল্পদিন বৃষ্টিপাত হয়। সেখানকার মাটির মধ্যে যদি জল সঞ্চিত থাকে, এবং শস্যের মূল যদি সেই জল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তবেই সেখানে উৎকৃষ্ট ফসল হইতে পারে। নিম্নলিখিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা এইরূপ মাটি। এইরূপ মাটির কণা যত ক্ষুদ্র তাহার জলধারণের ক্ষমতাও তত অধিক।

মৃত্তিকার পক্ষে আরও একটি জিনিষ দরকার,—ইহার **গভীরতা**। সমুদ্র ও নদীর উপকূলে মাটি জমিয়া-জমিয়া গভীর হয়, ও বহুদিন কৃষিকার্য্যের উপযোগী থাকে। কিন্তু চালু জমির মাটি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে যখন ধুইয়া-মুছিয়া চলিয়া যায়,—সে-স্থান আর তখন চাষের উপযুক্ত থাকে না।

উর্ব্বরতা রক্ষার উপায়।—এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি যে, জমি হইতে প্রত্যেক শস্য তাহার নিজের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিলে

যে-খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা হয়ত পুনরায় সেই শস্য-উৎপাদনের পক্ষে প্রচুর নহে : কিন্তু তাহাতে হয়ত অন্য শস্য তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতে পারে। এরূপ স্থলে সেখানে শেষোক্ত শস্যের ফসল করিলে ফসল ভালই হইতে পারে। আবার কোন- -কোন শস্যের পাতা বা ডাঁটা মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে জমির যে ভক্ষ্য উপাদান বাড়িয়া যায়, তাহাতে হয়ত অন্য শস্যের ভাল ফসল হয়। সুতরাং সারের বদলে এইরূপ **শস্যাবর্ত্তন** দ্বারা বহুদিন জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করা যায়।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ।—সাধারণতঃ মৃত্তিকা তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—(১) এঁটেল মাটি, (২) বালি মাটি, ও (৩) দো-আঁশ মাটি। যে-জমি আঠালো—যাহাতে বালির ভাগ অত্যন্ত কম, তাহাই **এঁটেল মাটি**। যাহাতে বালির ভাগ বেশী, তাহাই **বালি মাটি** বা বেলে মাটি। বেলে মাটিতে জল শুষিয়া যায় ও ইহা সহজে গরম হইয়া উঠে। সুতরাং সব ফসল ইহার উপরে হয় না। যাহাতে বেলে ও এঁটেল মাটি প্রায় সমান ভাগে মিশ্রিত থাকে, তাহাকে বলে **দো-আঁশ** মাটি। যে **দো-আঁশ মাটি** বালিপ্রধান, তাহাকে বলে **হাল্কা দো-আঁশ মাটি** ; এবং এঁটেল-মাটি-প্রধান দো-আঁশ মাটিকে বলে **কঠিন দো-আঁশ মাটি**।

মাটির আর একপ্রকারের নাম আছে ;—যেমন,—পলিমাটি, ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা। মৃত্তিকা নদীবাহিত হইয়া আসিয়া নদীর উপত্যকায় সঞ্চিত হইলে, তাহাকে বলা হয় **পলিমাটি**। পলিমাটি অতি সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত উর্ব্বরা। আর আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত লাভা,—রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে চূর্ণীকৃত হইলে মৃত্তিকায পরিণত হয়। এই মাটি মোটামুটি কৃষ্ণবর্ণ। এজন্য ইহার নাম **কৃষ্ণ মৃত্তিকা**। এই মাটিও অতিশয় উর্ব্বরা।

এক্ষণে নানাপ্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে গোবরের সার, এবং লতা-পাতা, পক্ষিপুরীষ ও নানা আবর্জ্জনা পচাইয়া যে- -সার হয়, তাহাই ব্যবহৃত হয়। খইল পচাইয়াও সাররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভারতের মৃত্তিকা-সংস্থান।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যে-মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) **পলিমাটি** (Alluvial soil)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের **উত্তরভাগে** সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের উপনদী বাহিত হইয়া ইহাদেরই উপত্যকায় সঞ্চিত হইয়াছে। (সিন্ধুপ্রদেশের অধিকাংশ, পশ্চিম-পাঞ্জাব*), পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজরাটের অধিকাংশ, উত্তর-রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, (পূর্ব্ববঙ্গ*), আসামের

* পাকিস্তান।

ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকায় এই মাটি প্রচুর পরিমাণে আছে। দক্ষিণ-ভারতেও সমুদ্রোপকূলে এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর উপত্যকায় এই মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মৃত্তিকা হইতে আগত নদীগুলির উপরে কৃষ্ণ মৃত্তিকা জমিয়াছে। ইহা মোটামুটি ৩ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থানে আছে।

কিন্তু এই মৃত্তিকা, উপরি-উক্ত স্থলের সর্ব্বত্রই একই প্রকারের নহে। কোথাও বালুকা-প্রধান, কোথাও এঁটেলমাটি-প্রধান। যেমন, রাজপুতানার জমি বালুকা-প্রধান। যে-সকল স্থানে নানাদ্রব্য পচিয়া ইহার সহিত মিশিয়াছে তাহার রং কাল হয়, এবং তাহা অতিশয় উর্ব্বরা। পার্ব্বত্য-অঞ্চলে পুরাতন পলিমাটি কঙ্করময়।
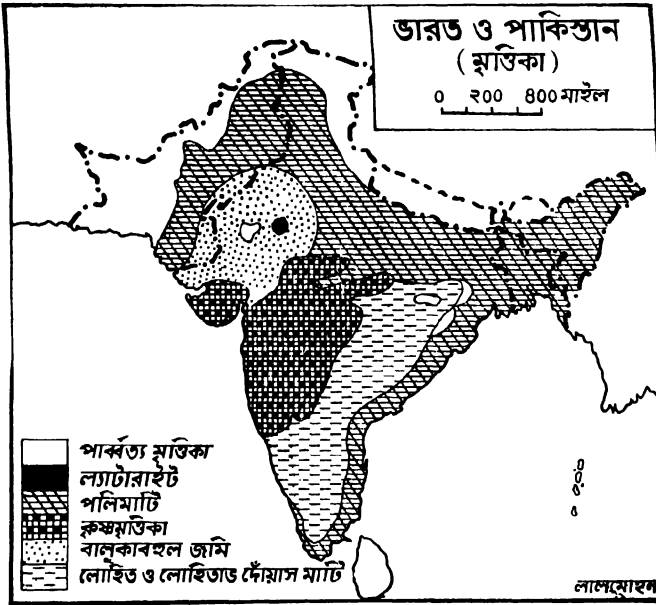
২৩নং চিত্র।

(২) **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** (Black Soil)।—গুজরাট, মালব মালভূমি, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই, হায়দারাবাদ প্রভৃতির উপর ইহা সঞ্চিত। বোম্বাই অঞ্চলে আগ্নেয়গিরিজাত যে-প্রস্তর আছে, তাহারই উপর ইহা প্রধানতঃ অবস্থিত। গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেনগঙ্গা, ভীমা প্রভৃতি যে-সকল নদী এই কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে, তাহারও উপত্যকায় ইহা পলিমাটিরূপে সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের মধ্যে কোন-কোন অংশেও এই মাটি আছে। এই মাটিও সর্ব্বত্র একরূপ নহে, কোথাও গভীর কৃষ্ণ, কোথাও মধ্যম ধরণের কৃষ্ণ, কোথাও অল্প কৃষ্ণ। পটা

সারের (humus) তারতম্যানুসারে ইহা বেশী ও কম কৃষ্ণ হয়, এবং কৃষ্ণবর্ণের গভীরতার তারতম্যানুসারে উর্ব্বরতারও তারতম্য হয়। এই মাটিতে অল্প নিম্নে জল সঞ্চিত থাকে, ইহা অত্যন্ত উর্ব্বরা। কার্পাস এই মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট জন্মে। গম, জোয়ার, তিসি প্রভৃতি ভালভাবে জন্মে। ইহা দুই লক্ষ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত।

(৩) **লোহিত মৃত্তিকা** (Red Soil)।—পরিবর্ত্তিত শিলার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে এই মৃত্তিকার উদ্ভব হয়। ইহা হাল্কা দো-আঁশ মাটি;—লৌহ (Iron peroxide) সংযোগে ইহার বর্ণ লোহিত বা পিঙ্গল হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য-অঞ্চলে কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল,—ও উপকূল-অঞ্চল বাদে,—অবশিষ্ট অংশে ইহা প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় ইহার উর্ব্বরতা বেশী। ওয়েনগঙ্গা উপত্যকায়ও ইহার উর্ব্বরতা বেশী। সেখানে ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহারের সাঁওতাল পরগণা, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি ও মির্জ্জাপুর জেলা, প. বঙ্গের বীরভূম জেলা, রাজপুতানার কিয়দংশ, মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড ও আরাবলী অঞ্চলে এই মৃত্তিকা আছে। বৃষ্টিপাত বা জলসেচ এবং সার ব্যতীত এই মৃত্তিকায় ভাল শস্য হয় না।

(৪) **মাকড়া** (Laterite)।—ইহা গ্রীষ্মমণ্ডলের শিলা। দক্ষিণ-ভারতের ল্যাটারাইট প্রস্তরের (মাকড়া পাথরের) উপর এই মৃত্তিকা প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণও অম্লজান-জারিত লৌহের (Iron peroxide) মিশ্রণে লোহিত বর্ণ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা হইতে ইহা বিভিন্ন। এই মাটি সূক্ষ্মছিদ্রবহুল,—সুতরাং ইহার উপর বৃষ্টি পড়িলে মাটি শুকাইয়া যায়। ইহা উর্ব্বরাও নহে। এজন্য সার দিয়া ও জলসেচদ্বারা ইহার উপরে চাষ করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যে ১৮° উ. অক্ষরেখার দক্ষিণেই এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে কয়েকটি উচ্চস্থানে ইহা আবরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। দাক্ষিণাত্যে পশ্চিমঘাটের ২,০০০ হইতে ৫,০০০ ফিট উচ্চে এই মৃত্তিকা রহিয়াছে। ইহার নিম্ন অঞ্চলেও এই ল্যাটারাইট কোন-কোন অংশে আছে। কিন্তু মহীশূরে পশ্চিমঘাটের ঢালুস্থানে, নীলগিরি পর্ব্বতের গাত্রে ৬,০০০ ফিট উচ্চস্থানে একপ্রকার লোহিত বা লোহিতাভ মৃত্তিকা আছে, ইহাকে কেহ-কেহ ল্যাটারাইট শ্রেণীভুক্ত করেন বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ল্যাটারাইট নহে। এখানেই মহীশূরের কফিক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যে চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা অনেক পর্ব্বতের মস্তক এই মৃত্তিকায় আবৃত।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উত্তরভারতে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রধানতঃ পলিমাটি। পাঞ্জাবে কিছু বায়ুতাড়িত লোয়েস মৃত্তিকা ও মরুভূমি-অঞ্চলে বালুকাই প্রধান। দক্ষিণভারতে (১) পলিমাটি, (২) কৃষ্ণমৃত্তিকা,

(৩) লোহিত মৃত্তিকা, ও (৪) ল্যাটারাইট মৃত্তিকাই প্রধান। পার্ব্বত্য-অঞ্চলে কঙ্করময় পলিমাটি আছে।

মৃত্তিকার ক্ষয় ও তাহার প্রতিকার

পৃথিবী প্রস্তরাদি শিলাদ্বারা গঠিত,—তাহার উপরে একটি পাতলা মৃত্তিকার আবরণ আছে। কৃষিকার্য্যে সেই মৃত্তিকার আবশ্যকতা অসামান্য,—মৃত্তিকা না থাকিলে কৃষিকার্য্যই হয় না। কিন্তু এই মৃত্তিকা অনবরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, জলের স্রোতেই হউক, বায়ুপ্রবাহেই হউক, অথবা মানুষের দ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারেই হউক, একস্থানের মৃত্তিকা অপসারিত হইলে সেইস্থানে জমি অনুর্ব্বরা হইয়া কৃষিকার্য্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক কারণে এবং মনুষ্য ও পশুদিগের দ্বারাও এই ক্ষয় নিয়ত সাধিত হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি একর জমি মৃত্তিকার ক্ষয়হেতু কৃষিকার্য্যের অযোগ্য হইয়াছে, এবং ১০ কোটি একর জমি কৃষির জন্য পুনঃসংস্কার করিতে হইয়াছে। মৃত্তিকাক্ষয়ের কয়েকটি কারণ- ও প্রতিকার-সম্বন্ধে নিম্নে স্থূলভাবে আলোচনা করা যাইতেছে :—

(১) **পশুচারণ।**—মাটিতে ঘাস জন্মিলে সেই ঘাসে মাটি এমন ভাবে আবদ্ধ থাকে যে, তাহা বাতাসে উড়িয়া যাইতে বা জলের স্রোতে একেবারে ভাসিয়া যাইতে পারে না। মানুষেরা পশুখাদ্যের জন্য এই ঘাস ছিঁড়িয়া লইলে, অথবা ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি তাহাদের ছোট মুখ ও ধারালো দাঁতে ঘাস ছিঁড়িয়া মাটিকে এই তৃণমূল- -বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে, মাটির ক্ষয়-সাধন হয়।

অনেকস্থলে, বিশেষতঃ পশ্চিম-হিমাচল-অঞ্চলে ও হিমালয়ের পাদদেশে, অনেক বনে পশুচারণের অবাধ অধিকার আছে। তাহার ফলে এই সকল বনের গাছ এরূপভাবে বিনষ্ট হয় যে, প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে মাটি ধুইয়া বাহির হইয়া যায়, ও নীচের শিলা বাহির হইয়া পড়ে।

গ্রামের শস্যক্ষেত্রের শস্য কাটা হইলে, তাহা পশুচারণ-ভূমিতে পরিণত হয়। যতদিন আবার শস্য না হয় ততদিন ইহা গ্রাম্য পশুগণের বিচরণক্ষেত্র হইয়াই থাকে। ইহাতে শস্যের যে মূল ইত্যাদি থাকে, পশুসকল তাহা তুলিয়া ফেলে, ও অত্যন্ত বিচরণের ফলে জমি কোন-কোন দিকে ঢালু হইয়া পড়ে,—পরে যখন বৃষ্টি হয়, তখন সেই পথে মৃত্তিকা ধুইয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে পশুচারণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা সর্ব্বথা বিধেয়।

পশুচারণক্ষেত্রে পশুগণ যে-মল পরিত্যাগ করে, তাহা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। এই সকল সার যেন সাধারণ লোকে জ্বালানির জন্য কুড়াইয়া লইয়া না যায়,—সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(২) বন-উৎসাদন।—(ক) মৃত্তিকা গাছের শিকড় দ্বারা যথাস্থানে আবদ্ধ থাকে। বৃষ্টির সময় যে-জোরে বৃষ্টিপাত হয়, গাছের ডালে ও পাতায় বাধিয়া বৃষ্টির ফোটার সে-জোর কমিয়া যায়। ইহাতে জলের তোড় মাটি কাটিয়া বাহিরে লইতে পারে না। গাছের তলায় যে-সকল আগাছা থাকে তাহারাও বৃষ্টির জলের গতিতে বাধা উৎপাদন করিয়া মাটি সংরক্ষণ করে। আবার, বনের মধ্যে, বন্যা আসিলে বা জলের স্রোত প্রবল হইলেও মৃত্তিকা গাছের শিকড়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। নদীর উপকূলে এইরূপ বন থাকিলে মাটির ক্ষয় রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বন যদি না থাকে, তবে দুই পাশের মাটি ধুইয়া আসিয়া নদীগর্ভে পড়ে। এইজন্য বন যথেচ্ছভাবে কাটিতে দেওয়া উচিত নহে। সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই এজন্য আইনবলে বন রক্ষা করেন এবং যে-সকল বনের গাছ কাটিলে বা যেখানে পশুচারণ করিলে জমির ক্ষতি হইবে না, সেইস্থানে মাত্র গাছ কাটিতে ও পশু চরাইতে দেন। এজন্য ভারতবর্ষেও গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৫ সালে বনরক্ষার নিয়মাদি করেন, এবং ১৮৭৮ সালে বনবিধি (Forest Act) আইনবদ্ধ করেন। কোন দেশের মোট জমির সিকি-অংশে বন থাকা দরকার। অন্ততঃ স্থানীয় লোকের জ্বালানি কাষ্ঠ ও গৃহাদি নির্ম্মাণের কাষ্ঠের জন্য ছোট-ছোট বন থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে নানাভাবে উপকার হয়।

আসাম, বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রদেশে জুম-চাষ হয়। জুমিয়ারা বনের মধ্যে-মধ্যে কতকাংশ পরিষ্কার করিয়া, তাহা প্রথমে অগ্নিদগ্ধ করে, পরে সেখানে চাষ করে। নূতন জমিতে প্রথমে দুই-এক বৎসর চাষ ভাল হয় বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে উপরের মাটি ধুইয়া গেলে সেখানে আর ফসল হয় না। তাই জুমিয়ারা দুই-এক বৎসর পরে সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া বনের অন্য অংশে চলিয়া যায় ও সেখানে এইরূপ চাষ করে। ইহাতে জমির অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

(৩) অব্যবস্থিত চাষ।—চাষের অপব্যবহারের জন্যও জমির ক্ষতি হয়।

(ক) জমি চাষ করিয়া কোন-কোন **শস্যের ক্ষেত্রে নালা** কাটিয়া দেওয়া হয়। এই নালা দিয়া যদি জমির ঢালু অংশের দিকে জল প্রবাহিত হয়, তবে জমির ক্ষতি হয়। স্থানে-স্থানে এইরূপ নালা বাড়িয়া-বাড়িয়া খালে পরিণত হয় ও নানাপ্রকারে মৃত্তিকা ক্ষয়িত হয়। এরূপ নালা কাটা উচিত নহে। (খ) জমি **চাষ করিয়া ফেলিয়া রাখিলে** তাহার উপরের মাটি সহজেই জলে ধুইয়া যাইতে পারে। ইহাতে মৃত্তিকা ও শস্যের খাদ্য এক সঙ্গে চলিয়া যায়। (গ) পাহাড়ের গাত্রে বা অন্য ঢালু জমিতে চাষ করিলে, পাহাড়ের গা বহিয়া বা খুব **ঢালু জমি বহিয়া মৃত্তিকা ধুইয়া বাহির হয়।** এইরূপ ঢালু জমির গায়ে যদি ঢাল অনুসরণ করিয়া নালা কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে সর্ব্বনাশ আরও শীঘ্র-শীঘ্র সংসাধিত হয়। গাছপালা উপড়াইয়া যায়।

কখনও-কখনও সেখানে নালার সৃষ্টি হয়। এরূপস্থলে ঢালু জমির গায়ে আড়াআড়ি থাক কাটিয়া চাষের জমি করা উচিত। তাহাতেও উপকার না হইলে ঐরূপ থাক-কাটা জমির ধারে আইল দেওয়া উচিত। (ঘ) পর্ব্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় জমির বাহিরে যথাক্রমে আইল দিলে বা গাছ লাগাইলে জমির ক্ষতি হইতে পারে না।

(৪) বাঁধ দিয়া বান নিবারণ করিয়া, শস্যানুবর্ত্তনদ্বারা, জমি উদ্ভিজ্জে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াও, জমির ক্ষতি নিবারণ করা যাইতে পারে।

(৫) **বাতাস।**—বাতাসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে-দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসে, সে-দিকে বনের সৃষ্টি করা উচিত। তাহা হইলে সেই বনে বাতাস বাধিয়া যায়, ও জোরে মাটি উড়াইতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃষিকার্য্য

ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। ইহার ন্যূনাধিক ২০ শতাংশ লোক বাস করে সহরে এবং অবশিষ্ট অংশ বাস করে গ্রামে। গ্রামের লোকে কোন-না-কোন প্রকারে কৃষিকার্য্যের সহিত লিপ্ত।

কিন্তু ভারতের কৃষি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় যে নিতান্ত পশ্চাৎপদ, এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় গমের ও ১৪৩ পৃষ্ঠায় ধানের একর প্রতি ফলন দেখিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। কৃষিনির্ভর দেশের কৃষির এই **দুরবস্থার কয়েকটি বিশেষ কারণ** আছে।

(১) কৃষির জন্য মৌসুমি বায়ু-আনীত বৃষ্টির জলের উপরেই এদেশের লোকে নির্ভর করে। যে-বৎসর ভাল বৃষ্টি হয়, সে-বৎসর ভাল ফসল হয়। বৃষ্টির অভাব ঘটিলে অজন্মা হয়,—আবার বৃষ্টির অত্যন্ত প্রাচুর্য্য ঘটিলে বন্যার জলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, ধান নষ্ট হইয়া যায়। বৃষ্টি হইলেও প্রতি বৎসরে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না, এবং বিভিন্ন বৎসরেও একই কালে সমান বৃষ্টি হয় না। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের এক বৎসরের পরিমাণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের পার্থক্য ধারণা করা যাইবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রভাবে বৃষ্টিপাত
১৯৪৯ সাল

ভারতে বিভিন্ন বৃষ্টিপাতের বিভাগ	বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	এখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (Normal)
আসাম	৬৬·৯	৬১·৭
প. বঙ্গ	৫২·৪	৫৩·৯
পশ্চিম বঙ্গের হিমালয়-অঞ্চল	৭৮·৪	৮১·৪
প. বঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা	৪৩·১	৪৪·২
উড়িষ্যা	৩৩·০	৪৩·০
ছোটনাগপুর	৪৩·০	৪৩·১
বিহার	৪৭·৩	৪১·৮
উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব্ব)	৪১·০	৩৭·২
উত্তরপ্রদেশ (পশ্চিম)	৪০·২	৩৫·৫
পাঞ্জাব	২১·৯	২০·৫
রাজস্থান (পশ্চিম)	১১·০	৯·৫
রাজস্থান (পূর্ব্ব)	২২·৩	২৪·৬
সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ	২১·৯	১৭·৪
গুজরাট	২৭·২	২৯·৮

ভারতে বিভিন্ন বৃষ্টিপাতের বিভাগ	বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	এখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (Normal)
মধ্যভারত ও ভূপাল	২৮·৪	৩৮·১
বিন্ধ্য প্রদেশ	৩৯·৫	৩১·৭
বেরার	৪০·৫	২৮·০
মধ্যপ্রদেশ (প.)	৪৬·০	৪৩·০
মধ্যপ্রদেশ (পূ.)	৪৩·৪	৪৭·৫
বোম্বাই (দাক্ষিণাত্য)	২৩·৬	২৫·৬
হায়দারাবাদ (উ.)	৪০·২	২৮·১
হায়দারাবাদ (দ.)	২৯·২	২৩·১
মহীশূর	২৭·১	২৯·১
মালাবার	৮৭·০	৭৬·০
কঙ্কণ	১০৫·৮	৯৩·৭
মান্দ্রাজ (দ.-পূ.)	১৫·১	১১·২
„ (দাক্ষিণাত্য)	২০·৬	১৫·৫
„ (উ.-উপকূল)	২৮·০	২০·৪

প্রকৃতির এই খামখেয়ালির প্রতিবিধানকল্পে এদেশে যেরূপ জলসেচ বা বাঁধবন্দির ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অপ্রতুল। জমির উন্নতিকল্পে কোন বৈজ্ঞানিক সার দিবার ব্যবস্থা, এবং অন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রথাও, এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আদিমকালের প্রথামত গোবরের সারই একমাত্র উৎকৃষ্ট সার বলিয়া এদেশে আজও প্রচলিত। আবার সার দিবার প্রয়োজনীয়তা-বোধও এদেশে বিশেষ জাগিয়া উঠে নাই।

(২) এদেশে চাষের প্রণালীও অতি প্রাচীন। মনুষ্য ও পশু—এই দুই প্রাণীর সীমাবদ্ধ শক্তির উপরেই এদেশের কৃষি নির্ভর করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্রিক উপায়ে চাষের প্রণালীও এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যান্ত্রিক চাষের জন্য যে বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রয়োজন, সেরূপভাবে জমি একীকরণের কোন চেষ্টাও এখানে হয় নাই।

মধ্যযুগের ভূমিব্যবস্থা, অত্যধিক লোকসংখ্যা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য এখানকার কৃষিভূমির মোটামুটি আয়তন অত্যন্ত ছোট।

(৩) গোরু ও মহিষ এদেশে চাষকার্য্যে ব্যবহৃত পশু। কিন্তু পশুদিগের খাদ্যের এবং ইহাদের উন্নতির কোন সার্থক প্রচেষ্টা হয় নাই। এদেশে পশু মানুষের খাদ্য--শস্যের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র পায়; পশুখাদ্যের জন্য কোন চাষ এখানে হয় না। তাই এখানকার পশু ক্ষীণদেহ ও দুর্ব্বল।

(৪) এদেশের শতকরা ৯০ জন লোক নিরক্ষর ও অতি দরিদ্র। সেজন্য তাহারা জমির উন্নতির বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কোন সংবাদই রাখে না, বা উন্নতির চেষ্টাও করিতে পারে না। তাছাড়া এদেশের লোক অত্যন্ত রক্ষণশীল, পুরাতনে প্রীতি অত্যন্ত বেশী।

(৫) জমি-উপযোগী বীজনির্ব্বাচন- ও বীজসংরক্ষণ-সম্বন্ধে এদেশের চাষীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

(৬) ভারতের কৃষির বিদেশের কৃষির সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতা নাই বলিলেই হয়। দেশের খাদ্যশস্য-প্রয়োজনেই ভারতের কৃষিকার্য্য; বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহার বিশেষ স্থান নাই। সেজন্য বিদেশের কৃষির সংবাদও কেহ রাখে না, কৃষির উন্নতির কোন প্রয়োজন-বোধও জাগিয়া উঠে না।

উপরে প্রদত্ত বিভিন্ন অংশের বৃষ্টির পরিমাণের হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৃষ্টি কোথাও কম, এবং কোথাও বেশী। বৃষ্টির এই তারতম্য-অনুসারে কৃষি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যেমন ঃ—

আর্দ্র কৃষি। যেখানে ৮০″ বৃষ্টিপাত হয়, অথবা নদীর চরের জমি জলে ডুবিয়া যায়, সেখানকার চাষকে আর্দ্র কৃষি বলে। মালাবারে, পূর্ব্ব-হিমালয়ের পাদদেশে, নিম্ন--বঙ্গে সুন্দরবনের জমিতে এইরূপ চাষ হয়। ধান-পাট- ও চা-চাষে বেশী জলের দরকার বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের চাষ এইরূপ কোন স্থানে হয়।

স্বল্পার্দ্র কৃষি (Humid Cultivation or Farming)। যেখানে বৃষ্টিপাত ৪০″ হইতে ৮০″ পর্য্যন্ত সেখানকার চাষকেই স্বল্পার্দ্র চাষ বলে। মধ্য-গাঙ্গেয়-উপত্যকা, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে এইরূপ চাষ হয়। এরূপ স্থলে জমিতে বৎসরে দুইটি চাষ হয়। তুলা, গম, তৈলবীজ প্রভৃতি এইরূপ স্থানে উৎপন্ন হয়।

সেচন কৃষি (Irrigation Farming)।—৪০″ অপেক্ষা কম বৃষ্টির যে-সকল স্থানে জলসেচদ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সেই সকল স্থানের কৃষিকে বলা হয় সেচন কৃষি। পশ্চিম-গাঙ্গেয়-উপত্যকা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মান্দ্রাজের কিয়দংশে চাষ

এইরূপ। তুলা, ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি এই অঞ্চলের উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য। এরূপস্থলে খারিফ ও রবি—দুই প্রকার শস্যই হইতে পারে। ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাব মত ভারতে ৩৯০ লক্ষ একর ও পাকিস্তানে ১৯৫ লক্ষ একর জমিতে জল সেচন করা হয়।

শুষ্ক কৃষি (Dry Farming)।—যেখানে বৃষ্টিপাত ২৫" অপেক্ষা কম, সেইখানেই এইরূপ চাষ হয়। বৃষ্টির অভাবে এখানে জমি নীরস ও শক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতি জন্মে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে যে-জমি আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাব হইতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের প্রদেশগুলির হিসাব করিয়া নিম্নে যে-তালিকা প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার কতকাংশ কর্ষিত, কতক বনে আবৃত, কতক বা পতিত জমি।

ভারত ও পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে জমির ব্যবহার
১৯৪৫-৪৬ সাল

(লক্ষ অঙ্কে একর)

দেশ	মোট-বর্ষিত ভূমি	মোট আয়তনের যত শতাংশ	বন		অকর্ষিত ভূমি		পতিত জমি
			মোট আয়তন	মোট আয়তনের শতাংশ	আয়তন	মোট আয়তনের যত শতাংশ	
বৃটিশ ভারত	১৭২৪	৪২	৬২৫	১৫	১৩০১	৩২	৩৬২
পাকিস্তান	৪৪৬	৩০	৫২	৩	৪৯৭	৩৩	১০৫

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় বৃটিশ ভারতে মাথা পিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ—৭ একর, পাকিস্তান—৬ একর ছিল।

এখানে প্রধানতঃ বৎসরে এক চাষ হয়,—ডাঙ্গা জমিতে দুই চাষ, খারিফ ও রবি শস্যের জমির কোন-কোন স্থানে তিন চাষ, এবং উত্তরপ্রদেশে জল-সেচনের স্থানে তিন চাষ হয়।

কৃষিদ্রব্য ও তাহাদের চাষের সময়।—ভারত ও পাকিস্তানের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যকে উপযোগিতা-অনুসারে নানাভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন :—

১। খাদ্যশস্য—(ক) ধান্য, গম, বাজরা, রাগী, যব, জোয়ার।
(খ) ডাল।
(গ) মশলা।

২। বাণিজ্য-শস্য বা অর্থপ্রসূ শস্য—(১) তন্তু—কার্পাস, শণ, পাট।
(২) তৈলবীজ—তিল, তিসি, সরিষা, রেড়ি, বাদাম, নারিকেল।
(৩) পানীয় দ্রব্য—চা, কফি।
(৪) মাদক দ্রব্য—তামাক।
(৫) ঔষধ—সিনকোনা।

এই সকল দ্রব্যের যে-গুলি প্রতি বৎসর চাষ করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির গ্রীষ্মকালে ও কতকগুলির শীতকালে চাষ করিতে হয়। ধান্য, ভুট্টা, রাগী, জোয়ার, বাজরা, পাট, কার্পাস গ্রীষ্মকালের ফসল। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই সকল ফসল শেষ হইয়া যায়। ইহাদিগকে বলা হয় **খারিফ**। শীতকালের ফসল আরম্ভ হয়—অক্টোবর-নভেম্বরে, শেষ হয় মার্চ্চ-এপ্রিলে। ইহাদিগকে বলে **রবিশস্য**। এই শস্যের জন্য জলসেচ বিশেষ দরকার। গম, যব, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়। সুতরাং এইগুলি প্রধানতঃ গ্রীষ্মের ফসল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৫-৪৬ সালে খাদ্যশস্যের জন্য ১,৭৭৩ লক্ষ একর, ইক্ষুর জন্য ৩২ লক্ষ একর, খাদ্য তৈলবীজের জন্য ১৮৩ লক্ষ একর, অন্য তৈলবীজের (Linseed and Castor) জন্য ৪৭ লক্ষ একর, তন্তুদ্রব্যের জন্য ১১৯ লক্ষ একর, পানীয় দ্রব্যের জন্য ২০১৭ লক্ষ, এবং মাদক দ্রব্যের জন্য ১০ লক্ষ একর জমি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৯৪৫-৪৬ সালের প্রদত্ত হিসাব-অনুসারে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ

	ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজমির শতকরা ভূমি	পাকিস্তানের কৃষিজমির শতকরা ভূমি
খাদ্যশস্যের	৪২·৫	৮৪·৪
তন্তুদ্রব্যের	২·৮	১০·৬
তৈলবীজের	৫·৫	৩·২
ইক্ষুর	·৮	১·২
পানীয় দ্রব্যের	৪৮·২	·২
মাদক „	·২	·৪

দশম পরিচ্ছেদ

কৃষিজ পণ্যদ্রব্য—১। খাদ্যশস্য (Cereals)

১। ধান্য

খাদ্যশস্যে ধান্যের স্থান।—১৯৫০-৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১,৯৩০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্য জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৫৪ লক্ষ একর জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩৯ ভাগ জমিতে ধান জন্মে। এত অধিক জমিতে এখানে আর কোন খাদ্যশস্যই জন্মে না। আবার ঐ বৎসর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৪১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ২০৩ টন ;—সুতরাং ভারতের মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের শতকরা ৪৮ অংশই চাউল। আবার ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কোন-কোন প্রদেশে চাউলই একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান খাদ্যশস্য হইলেও, সকল রাষ্ট্রেই চাউল খাদ্যশস্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রায় ৫২ শতাংশ লোকে চাউল খায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যশস্য ধান্য।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান-প্রধান খাদ্যশস্য

১৯৫০-৫১ সাল

শস্য	যত লক্ষ একর জমিতে জন্মে	যত লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে	শস্য	যত লক্ষ একর জমিতে জন্মে	যত লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে
ধান	৭৫৪	২০৩	গম	২৩৯	৬৫
জোয়ার	৩৮২	৫২	বাজরা	২২৪	২৩

আবার উৎপাদন-হিসাবে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধান্য-উৎপাদন-স্থান—চীন, তাহার পরেই ভারতবর্ষ। ১৯৪৬ সালে চীন উৎপাদন করিয়াছিল পৃথিবীর ৪৯ শতাংশ, ভারতবর্ষ ৪২·৫ শতাংশ।

পৃথিবী-খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, ধান্য-উৎপাদনের জন্য আবশ্যক (১) পাললিক মাটি, (২) বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা,—অন্ততঃ ৪০ ই. বৃষ্টিপাত, এবং (৩) উত্তাপ ;—৪৫° ফা. অপেক্ষা কম উত্তাপে ধানের চাষ হয় না,—৬৮° ফা. অপেক্ষা কম উত্তাপে অনেক ধানের কলা বাহির হয় না, এবং ধানবৃদ্ধির সময় ৭০°-৮০° ফা. উত্তাপ না পাইলে ধান ভাল হয় না। এই হিসাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ধান্য-উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। কোন স্থানে বৃষ্টির অল্পতা হইলে জলসেচনদ্বারা জলের অভাব পূরণ করা যায়।

উত্তর-প্রদেশের পূর্ব্বভাগে বৃষ্টি বেশী, পশ্চিমে কম। সেজন্য পশ্চিমভাগে জলসেচের আবশ্যক হয়। তাহার পশ্চিমে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে বৃষ্টি কম। সেজন্য সেখানেও জলসেচ করা হয়। মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও কোথাও-কোথাও জলসেচের দরকার হয়। নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই ধান্য উৎপাদন করা হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রধান ধান্য-উৎপাদন রাষ্ট্র

১৯৫০-৫১ সাল

রাষ্ট্রের নাম	ব্যবহৃত জমির আয়তন (লক্ষ একর)	উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ (লক্ষ টন)
বিহার	১৪৫	২৫
মান্দ্রাজ	১০১	৪০
প. বঙ্গ	৯৮	৩৯
উড়িষ্যা	৯৪	২১
উত্তরপ্রদেশ	৯৩	২০
মধ্যপ্রদেশ	৮৯	১৫
আসাম	৩৭	১৩
বোম্বাই	৩০	১০
মধ্যপ্রদেশ	১২	১
হায়দারাবাদ	১১	৩
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	১০	৩
অবশিষ্ট	৩৪	১৩
মোট	৭৫৪	২০৩

পাকিস্তানের ধান্য-উৎপাদন

১৯৫০-৫১ সাল

	ব্যবহৃত জমির আয়তন (সহস্র একর)			উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ (সহস্র টন)		
	শরৎ কালের	শীত কালের	গ্রীষ্ম কালের	শরৎকালের	শীতকালের	গ্রীষ্মকালের
বেলুচিস্তান	×	৬৫	×	×	২০	×
পূ. বঙ্গ	৫২৫৯	১৩৯৪৭	৮০১	১৭৯০	৫২৭৩	২৮০
উ. প. সীমান্ত	×	৩৭	×	×	১৩	×
পাঞ্জাব	×	৮৩৭	×	×	২৮০	×
সিন্ধু	×	১৩৭৬	×	×	৫১৪	×
বহ্বলপুর	×	৬১	×	×	১৮	×
খয়েরপুর	×	১৮	×	×	৭	×
মোট		২২,৪০১			৮১৯৫	

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জমিতে চাষ হয় ক্রমান্বয়ে—১। বিহার, ২। মান্দ্রাজ, ৩। প. বঙ্গ, ৪। উড়িষ্যা, ৫। উত্তরপ্রদেশ, ৬। মধ্যপ্রদেশ, ৭। আসাম, ও ৮। বোম্বাই স্টেটে। আবার, একর প্রতি ফলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মান্দ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে ; তৎপরে ক্রমান্বয়ে আসাম, বোম্বাই, ও

১-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ২-কুর্গ, ৩-মহীশূর. ৪-মান্দ্রাজ, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই, ৭-সৌরাষ্ট্র, ৮-কচ্ছ, ৯-আজমীর, ১০-রাজস্থান, ১১-পেপসু, ১২-পাঞ্জাব, ১৩-হিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাশ্মীর-ও জম্মু, ১৫-দিল্লী, ১৬-উত্তর প্রদেশ, ১৭-বিন্ধ্য প্রদেশ, ১৮-মধ্য ভারত, ১৯-ভূপাল, ২০-মধ্যপ্রদেশ, ২১-উড়িষ্যা, ২২-বিহার, ২৩-পশ্চিম বঙ্গ, ২৪-আসাম. ২৫-ত্রিপুরা, ২৬-মণিপুর, ২৭-সিকিম, ২৮-ভূটান, ২৯-পূর্ববঙ্গ, ৩০-পশ্চিম পাঞ্জাব, ৩১-উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ. ৩২-বেলুচিস্তান, ৩৩-সিন্ধু প্রদেশ।
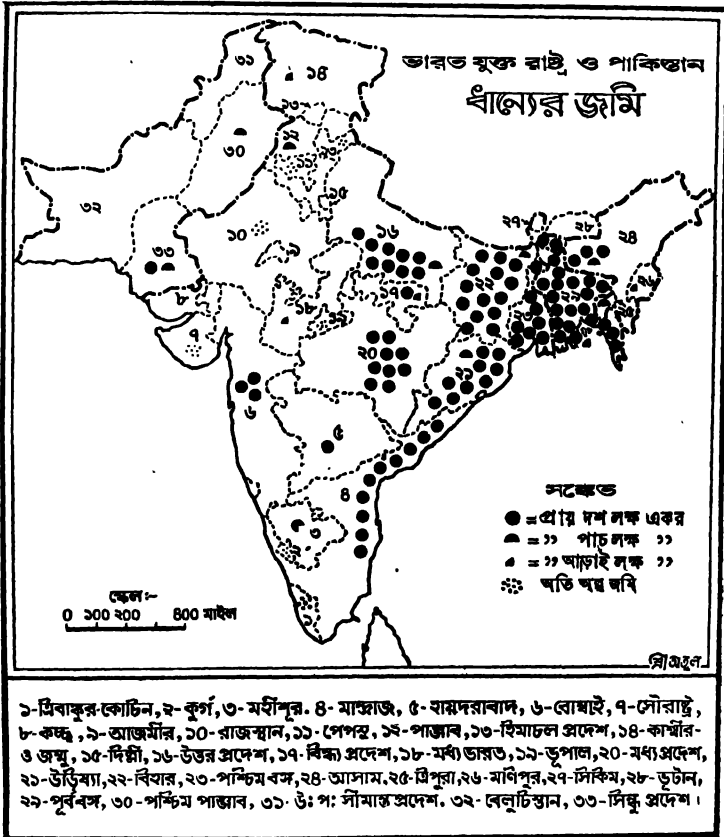
২৪নং চিত্র।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন স্টেটে। উৎপাদন ও ফসলের হিসাবে প্রদেশগুলির ক্রম কিন্তু সকল বৎসরে একরূপ নহে। লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, বৃষ্টি ও উত্তাপ-বহুল পলিমাটি-প্রধান স্থানেই বিঘা প্রতি ফসল বেশী। সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একর প্রতি ফসল (১৯৫০-৫১ সালে) ৬০৩ পাউণ্ড। অবিভক্ত ভারতে ছিল ৮৮১ পা. (১৯৩৬-৩৭)। পৃথিবী-খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে, একর প্রতি ফলন

হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান সর্ব্বনিম্নে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টির পর ইহার ফলনের গড়-পরিমাণ আরও নীচু হইয়াছে।

পাকিস্তানের উৎপন্ন ধানের শতকরা ৮৯'৫ অংশ পাওয়া যায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে। অন্যত্র যে অল্প ধান হয় তাহা কেবল শীতকালেই জন্মে।

ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতে ৮০৭ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হইত। তাহার মধ্যে ৫৮০ লক্ষ একর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ও ২২৭ লক্ষ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে ২৮৩ লক্ষ একর জমিতে ধান হইত। তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে এবং ২১৩ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধান্য--উৎপাদক স্থানগুলি পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। এক্ষণে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, ও ২৪-পরগণাই পশ্চিমবঙ্গে শ্রেষ্ঠ ধান্য-উৎপাদক স্থান। আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি স্থানে কিছু ধান্য উদ্বৃত্ত হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০০০ রকমের ধান আছে। কিন্তু সকল ধানের চাষ এখন আর প্রচলিত নাই; উৎপাদন-প্রণালী ও চাষের সময় অনুসারে ভারতের ধান্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় (পৃ.—১৪৪ পৃ.),— ১। আশু, ২। বোরো, ও ৩। হৈমন্তিক, বা আমন, বা শালিধান্য। হৈমন্তিক ধান্যের চাষের জন্য একস্থানে চারা উৎপন্ন করিয়া সেই চারা তুলিয়া কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে লাগাইতে হয়। অন্য দুই প্রকার ধান্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়।

ধান্যের জন্য এদেশে সাধারণতঃ গোবরের সার ও খৈল দেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে-সকল জমি নদীর জলে প্লাবিত হয়, সে-সকল জমিতে সার দিবার দরকারই হয় না। এজন্য ২৪-পরগণায় সাধারণতঃ সার দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান জেলায় খৈলের সার দেওয়া হয়। রাসায়নিক সারের এখনও বিশেষ প্রচলন হয় নাই। ধানের চাষের পূর্ব্বে ও পরে জমিতে যদি মটর ও কলাই প্রভৃতি দ্বিদল শস্যের চাষ করিয়া লওয়া যায়, তবে জমির উর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভারতে চাষের জন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করা হয়। ইহাতে জলের অভাবে কোন-কোন বৎসর ভাল ফসল হয় না। ফলে দুর্ভিক্ষ হয়। জলসেচের দ্বারা যেখানে চাষ হয়, সেখানে এই অসুবিধা ঘটিতে পারে না।

এক্ষণে অনেকে ট্রাক্টর অর্থাৎ কলের লাঙ্গল দিয়া গভীর চাষের প্রথা প্রচলন করার পক্ষপাতী। কিন্তু বহুবিস্তৃত জমিখণ্ড ব্যতীত কলের লাঙ্গলে চাষ চলে না। ভারতবর্ষে জমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ও ভিন্ন-ভিন্ন লোকের অধিকারভুক্ত। এরূপস্থলে যতদিন জমিখণ্ডগুলি একই অধিকারভুক্ত করিয়া চাষের ব্যবস্থা না করা যায়, ততদিন ট্রাক্টর-চাষ সম্ভব নহে। এজন্য কোথাও-কোথাও সমবায়-প্রথার প্রচলন

হইতেছে। কিন্তু ইহার উপকারিতা এখনও নিরক্ষর চাষিগণের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করে নাই।

ভারতবর্ষ ধান্য-উৎপাদনে স্ব-নির্ভর নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্ব-নির্ভর থাকিলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে চাউল আমদানি করিয়া দেশের অভাব মিটাইতে হইতেছে। যুদ্ধের পরে এই আমদানির পরিমাণ বাড়িয়াছে। তখন প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসিত। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে যে-চাউল ভারতে আসিত, তাহা গবর্ণমেণ্ট-প্রকাশিত রিপোর্টে আমদানি বলিয়া ধরা হইত না। সুতরাং সাধারণে চাউলের অভাবের বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিত না। ১৯৩৫-৩৬ সালে এদেশে ৬৭ লক্ষ টাকার চাউল আমদানি হয়। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানি-হিসাবে দেখাইতে হয়; তাহাতে মোট আমদানি করা চাউলের মূল্য হয় ১১ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার;—কেবল ব্রহ্মদেশ হইতেই ১১ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার চাউল আমদানি করা হয়।

এতৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসরই কিছু চাউল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নিম্নে একটি হিসাব প্রদর্শিত হইল :—

ধান্য ও চাউলের আমদানি ও রপ্তানি

	ধান্য (হাজার টন)		চাউল (হাজার টন)	
	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৩৮-৩৯-এর গড়	১১৮	২	১৩৯২	২৩০
১৯৩৯-৪০	৩৫০	৪	১৭৭২	২৩৩
১৯৪০-৪১	৫৯	২	১১৮৮	২০৬
১৯৪১-৪২	১২	২৮	৮৮১	২৫৬
১৯৪২-৪৩	১১	১১	৫৭	১৮৫
১৯৪৩-৪৪	৪	×	১৪	২৬

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রধান আমদানি-স্থল ব্রহ্মদেশ, অন্য আমদানি-স্থল শ্যাম ও স্ট্রেট্স্ সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি। প্রধান রপ্তানি-স্থল সিংহল।

ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব দূর করার জন্য নানা বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে ধান্যের চাষ বৃদ্ধি পাইবে এবং ধান্যের ফসল ও উৎপাদন বাড়িবে। ধান্য-সম্বন্ধে উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকার উন্নত চাষের প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন ও এ-সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলিতেছে।

২। গম (Wheat)

১৯৫০-৫১ সালের হিসাব মতে,—খাদ্যশস্যের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ধান্যচাষের জমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—৭৫৪ লক্ষ একর, তাহার পরেই জোয়ারের জমি—৩৮২ লক্ষ একর এবং গমের জমির পরিমাণ তাহার পরেই—২৩৯ লক্ষ একর,—ধান্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। উৎপাদন হিসাবে ঐ বৎসরে ধান্যের পরিমাণ—২০৩ লক্ষ টন। তাহার পরেই গমের দ্বিতীয় স্থান, ৬৫ লক্ষ টন। ব্যবহার হিসাবেও গমের স্থান দ্বিতীয় বলিয়াই গণ্য।

১-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ২-কুর্গ, ৩-মহীশূর. ৪-মান্দ্রাজ, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই, ৭-সৌরাষ্ট্র, ৮-কচ্ছ, ৯-আজমীর, ১0-রাজস্থান, ১১-পেপসু, ১২-পাঞ্জাব, ১৩-হিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাশ্মীর-ও জম্মু, ১৫-দিল্লী, ১৬-উত্তর প্রদেশ, ১৭-বিন্ধ্য প্রদেশ, ১৮-মধ্য ভারত, ১৯-ভূপাল, ২0-মধ্যপ্রদেশ, ২১-উড়িষ্যা, ২২-বিহার, ২৩-পশ্চিম বঙ্গ, ২৪-আসাম, ২৫-ত্রিপুরা, ২৬-মণিপুর, ২৭-সিকিম, ২৮-ভূটান, ২৯-পূর্ববঙ্গ, ৩0-পশ্চিম পাঞ্জাব. ৩১-উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ. ৩২-বেলুচিস্তান, ৩৩-সিন্ধু প্রদেশ।
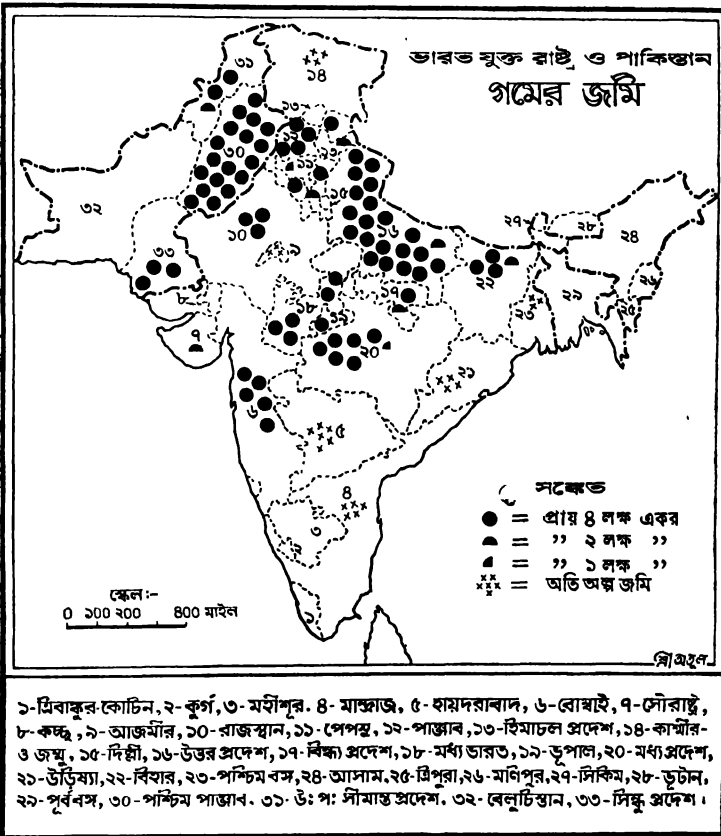
২৫নং চিত্র

ধান্য—প্রধানতঃ খারিফ শস্য, কিন্তু গম রবিশস্য। ধান্যের জন্য জল ও উত্তাপ লাগে প্রচুর। কিন্তু গমের চাষের প্রথমে কিছু বৃষ্টিপাত আবশ্যক হইলেও, বৃদ্ধির সময়

আবশ্যক হয় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া মাত্র, এবং পাকিবার সময় দরকার হয়, সূর্য্যোত্তাপ। ধান কাটিবার সময়,—ডিসেম্বর, জানুয়ারি; কিন্তু গম কাটিবার সময় মার্চ্চ হইতে মে। সুতরাং ধান্য ও গমের জন্য আবশ্যকীয় প্রাকৃতিক অবস্থা পরস্পর-বিরোধী এবং উৎপাদন-ঋতুও বিভিন্ন। সেইজন্য যেখানে-যেখানে ভাল ধান হয় না, সেখানেই ভাল গম হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত স্টেটেই গম জন্মে ;—

গমের উৎপাদন-স্থান, জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৫০-৫১ সাল

স্থান	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন-পরিমাণ (লক্ষ টন)	একর প্রতি ফলন (পাউণ্ড)
উত্তরপ্রদেশ	৮২	২৯	৭৯২
পাঞ্জাব	৩০	১০	৭২০
মধ্যপ্রদেশ	২৫	৬	৫৩৭
বোম্বাই	২০	৩	৩৩৬
ভূপাল	৫	১	৪৪৮
হায়দারাবাদ	৪	০·৪	২২৪
হিমাচল প্রদেশ	২	০·৪	৪৪৮
সৌরাষ্ট্র	২	০·৬	৬৭২
মধ্যভারত	১৯	৩	৩৫৪
বিহার	১৪	২	৩৮০
রাজস্থান	১২	২	৩৭৩
পে-প-সু	৯	২	৪৯৮
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৬	১	৩৭৩
জম্মু ও কাশ্মীর	১·৫	·৬	৮৯৬
পশ্চিমবঙ্গ	১·২	·৪	৭৪৭
অবশিষ্ট	৬০·৩	৩·৬	
	২৯৩	৬৫	৬১৬

পাকিস্তানে গমের উৎপাদন
১৯৫০-৫১ সাল

স্টেট	ব্যবহৃত জমির আয়তন (সহস্র একর)	উৎপন্ন গমের পরিমাণ (সহস্র টন)
বেলুচিস্তান	২৬৪	৫২
পূর্ব্ববঙ্গ	৯৪	২০
উ. প. সীমান্ত	১১০১	২৬৫
পাঞ্জাব	৭২৮৩	৩০০৭
সিন্ধু	১২০২	২৮৯
বহব্বলপুর	৭৯৮	২৮৩
খয়েরপুর	৯০	২৭
	১০৮৩২	৩৯৫৩

উপরি প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১। যেখানে ধান বেশী হয়, সেখানে গম বেশী হয় না ; ২। গম প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে জন্মে, ৩। জলসেচ যেখানে ভাল হয়, গম সেখানে ভাল হয়,—এজন্য গম-উৎপাদনের প্রথম স্থান—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ও দ্বিতীয় স্থান—পূর্ব্ব-পাঞ্জাব। **পাকিস্তানে**—প্রথম স্থান—পাঞ্জাব, দ্বিতীয় স্থান—সিন্ধু।

পৃথিবী-খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একর প্রতি ফলনের অবস্থা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিতান্ত কম। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফলন হয় জার্ম্মানিতে একরে প্রায় ২০০০ পা.—এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম ফলন হয় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, একরে ৬১৬ পা.।

অ-বিভক্ত ভারতে গমের চাষের জমি ছিল ৪১৫ লক্ষ একর, তন্মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে ২৪৪ লক্ষ একর, এবং পাকিস্তানে পড়িয়াছে ১৭১ লক্ষ একর। কিন্তু পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে জলসেচের ব্যবস্থা অতি উত্তম বলিয়া, শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদন-স্থান ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ। সেজন্য অ-বিভক্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদন-স্থানগুলি পাকিস্তানে পড়িয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গম প্রধান খাদ্য। সেজন্য বেশী রপ্তানি হয় সেই রাষ্ট্র হইতে যেখানে প্রধান খাদ্য চাউল। বঙ্গদেশে ইহা অল্প পরিমাণে জন্মে। কিন্তু তথাপি এখান হইতে ইহা রপ্তানি হয়। ১৯৪৮ সালে ১,৪৬৭ হাজার টন গম আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, ইরান, আবিসিনিয়া ও রুশিয়া হইতে আমদানি করা হয়, উহার মূল্য ৫৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

৩। জোয়ার ৪। বাজরা (Millet)

জোয়ার ও বাজরা এই দুই খাদ্যশস্যই বাঙ্গালাদেশে অপরিচিত। যে-অঞ্চলে ধান হয় না বা ধান কম হয় সে-স্থলে এই দুই শস্যের ব্যবহার বেশী। ইহা পশ্চিম- ও বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতে দরিদ্রের খাদ্য। কেহ-কেহ বলেন খাদ্য হিসাবে ধান্যের পরেই ইহার স্থান। গমের উৎপাদন-পরিমাণ জোয়ার অপেক্ষা বেশী বটে, কিন্তু গমের রপ্তানি-পরিমাণও বেশী। ইহার ঘাস গবাদি জাতীয় পশুর খাদ্য।

১-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ২-কুর্গ, ৩-মহীশূর. ৪- মান্দ্রাজ, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই, ৭-সৌরাষ্ট্র, ৮-কচ্ছ, ৯-আজমীর, ১0-রাজস্থান, ১১-পেপসু, ১২-পাঞ্জাব, ১৩-হিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাশ্মীর-ও জম্মু, ১৫-দিল্লী, ১৬-উত্তর প্রদেশ, ১৭-বিন্ধ্য প্রদেশ, ১৮-মধ্য ভারত, ১৯-ভূপাল, ২0-মধ্যপ্রদেশ, ২১-উড়িষ্যা, ২২-বিহার, ২৩-পশ্চিম বঙ্গ, ২৪-আসাম. ২৫-ত্রিপুরা, ২৬-মণিপুর, ২৭-সিকিম, ২৮-ভূটান, ২৯-পূর্ববঙ্গ, ৩0-পশ্চিম পাঞ্জাব. ৩১-উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ. ৩২-বেলুচিস্তান, ৩৩-সিন্ধু প্রদেশ।
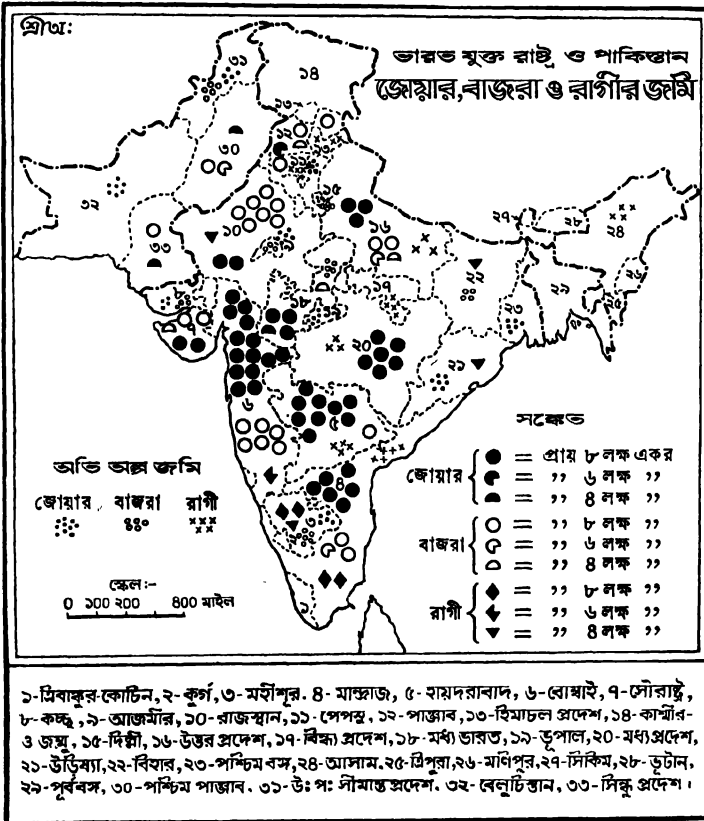
২৬নং চিত্র

বাজরাও পশ্চিম- ও দক্ষিণ-ভারতের দরিদ্রের খাদ্য ;—বাজরাও বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রেশন আফিসে বাজরা-মিশ্রিত গম দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই বোধহয় বাজরার সহিত বাঙ্গালীর প্রথম পরিচয়। বাজরাও গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পাখীর দানা হিসাবে ইহার খুবই বিক্রয় হয়।

জোয়ার প্রধানতঃ খারিফ শস্য ;—কিন্তু একজাতীয় জোয়ার মান্দ্রাজে রবিশস্যরূপে উৎপন্ন হয়।

বাজরাও খারিফ শস্য ;—বর্ষায় ইহার চাষ হয়।

জোয়ার ও বাজরা এই শস্যের জন্য নিকৃষ্ট জমি হইলেই চলে,—বৃষ্টিও খুব বেশী লাগে না ; বালুকা-প্রধান দো-আঁশ মাটি ও ২০″ হইতে ৪০″ বৃষ্টিপাত ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, এই দুইটি শস্য যেমন দরিদ্রের খাদ্য, তাহাদের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্রের মত। জমি যদি ভাল হয়, ও বৃষ্টিপাত ৪০″ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সেই জমি গমের জন্য রাখা হয় ;—জমি যদি খারাপ হয়, অন্য কোন ফসলের পক্ষে অনুপযোগী মনে হয়, এবং বৃষ্টিপাত যদি কম হয়, তবে সে-জমি জোয়ার ও বাজরার ভাগ্যে পড়ে।

যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মহীশূর, হায়দারাবাদ ও মান্দ্রাজ প্রদেশে এই দুই শস্যের বহুল চাষ হয়। (পাকিস্তানে—পাঞ্জাব ও সিন্ধু)। ১৯৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিতরূপ ইহাদের উৎপাদন হইয়াছিল :—

	শস্য	চাষের জমি লক্ষ একর	উৎপাদন লক্ষ টন
১।	জোয়ার	৩৮২	৫২
২।	বাজরা	২২৪	২৩
৩।	রাগী[১]	৫২	১৩

পাকিস্তানে বাজরা ও জোয়ার
১৯৫০-৫১ সাল

স্টেট	বাজরা		জোয়ার	
	জমির পরিমাণ (সহস্র একর)	উৎপাদন (সহস্র টন)	জমির পরিমাণ (সহস্র একর)	উৎপাদন (সহস্র টন)
বেলুচিস্তান	৭	১	৯২	১৩
পূর্ব্ববঙ্গ	১	*	১	*
উ. প. সীমান্ত	১১১	১১	৬৮	১০
পাঞ্জাব	১২৪২	২২৩	৫২১	৯১
সিন্ধু	৭৯৬	৮৩	৩৮৩	৮২
বহব্বলপুর	১৬৫	৩৬	১৩৬	৩০
খয়েরপুর	৫	১	৬৪	১২
	২৩২৭	৩৫৫	১২৬৬	২৩৮

রাগী[১]—জোয়ার ও বাজরার আর একটি রকম। এই গোষ্ঠির শস্য আরও আছে ;—যেমন,—গুণ্ডি মড়ুয়া।

* ৫০০ টন অপেক্ষা কম।

যব (Barley)

রোগীর পথ্যরূপে বার্লি নামটি বাঙ্গালীর পরিচিত। কিন্তু বার্লি যে যবেরই ইংরাজি প্রতিশব্দ ইহা অনেক বাঙ্গালী জানেন না। গমের ন্যায় যবও রবিশস্য; —অক্টোবরে উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় প্রাকৃতিক অবস্থাও গমেরই মত। ইহার অঙ্কুর-উৎপত্তিকালে দরকার—গমের মত ঠাণ্ডা আবহাওয়া;—তাহার পরে দরকার, কিছু উত্তাপ; পাকিবার পূর্ব্বে দরকার—অল্প আর্দ্রতা; পাকিবার সময় লাগে—শুষ্ক আবহাওয়া। তবে গমের মত যবের সব দরকার কাঁটায় কাঁটায় না মিটিলেও চলে,—মাটি যদি কিছু নিকৃষ্ট হয়, উত্তাপ বা আর্দ্রতার যদি একটু ইতরবিশেষ ঘটে, জমিতে যদি সার দেওয়া না হয়, তবে ভাল যব-উৎপাদনের বাধা হয় না।

লোকে ছাতু করিয়া যব খাইয়া থাকে। রুটি খাইতে হইলে ইহাকে গমের আটা বা ময়দার সহিত মিশাইয়া লইতে হয়। উত্তরপ্রদেশে, (পাকিস্তানে,—পাঞ্জাবে, উ. প. সীমান্ত প্রদেশে) ইহা বহুল ব্যবহৃত খাদ্য।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে যব উৎপন্ন হয়। **উত্তরপ্রদেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান।** আবার ইহার গোরক্ষপুর জেলায় এই প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যব জন্মে। এই প্রদেশে যে-সকল জমিতে জলসেচ হয়, ঐ সকল জমি গমের জন্য রাখিয়া অন্য জমিতে যবের চাষ হয়। বিহার ও উড়িষ্যায় অঙ্কুর বাহির হইবার কালে প্রয়োজনমত আর্দ্রতা পাওয়া যায় না বলিয়া এখানে যব ভাল হয় না। বিহারে মজঃফরপুর জেলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যব-উৎপাদন-স্থান। ১৯৫০-৫১ সালে সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৭৬ লক্ষ একর জমিতে যব চাষ হয় এবং ২৩ লক্ষ টন যব উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টন যব হয়।

ভুট্টা (Maize)

ভুট্টার জন্য দরকার, ১৪০টি কুয়াসামুক্ত ও তুষারমুক্ত দিন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে ভুট্টার চাষ সম্পূর্ণ হয়। ভুট্টা উত্তাপপ্রিয় শস্য, তবে অত্যধিক উত্তাপ বা উত্তাপের অত্যধিক হ্রাসবৃদ্ধি ক্ষতিজনক। ইহার জন্য বৃষ্টিপাতও দরকার;—তবে বৃষ্টির জল গাছের গোড়া হইতে সরিয়া যাওয়া দরকার। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে ইহা খারিফ শস্য।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুট্টা জন্মে—উত্তর-প্রদেশে; তারপরে বিহারে, তাহার পরে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে। পাকিস্তানে জন্মে—পাঞ্জাবে। ভারতের মধ্যভাগের সমতলভূমি ও হিমালয়ের সানুদেশে প্রচুর ভুট্টা জন্মিয়া থাকে।

ভুট্টা-উৎপাদনে পৃথিবীতে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভারত ও পাকিস্তানের স্থান দশম (পৃ. ১৫৪ পৃ.)। আ. যুক্তরাষ্ট্রে ইহা পশুর খাদ্য ;—ভারতের ৭৫ শতাংশ মানুষে খায়। উৎপাদনের হারও ভারতে খুব কম। ভারতবর্ষে ১৯৫০-৫১

১-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ২-কুর্গ, ৩-মহীশূর. ৪-মান্দ্রাজ, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই, ৭-সৌরাষ্ট্র, ৮-কচ্ছ, ৯-আজমীর, ১০-রাজস্থান, ১১-পেপসু, ১২-পাঞ্জাব, ১৩-হিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাশ্মীর-ও জম্মু, ১৫-দিল্লী, ১৬-উত্তর প্রদেশ, ১৭-বিন্ধ্য প্রদেশ, ১৮-মধ্য ভারত, ১৯-ভূপাল, ২০-মধ্যপ্রদেশ, ২১-উড়িষ্যা, ২২-বিহার, ২৩-পশ্চিম বঙ্গ, ২৪-আসাম. ২৫-ত্রিপুরা, ২৬-মণিপুর, ২৭-সিকিম, ২৮-ভূটান, ২৯-পূর্ববঙ্গ, ৩০-পশ্চিম পাঞ্জাব. ৩১-উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ. ৩২-বেলুচিস্তান, ৩৩-সিন্ধু প্রদেশ।
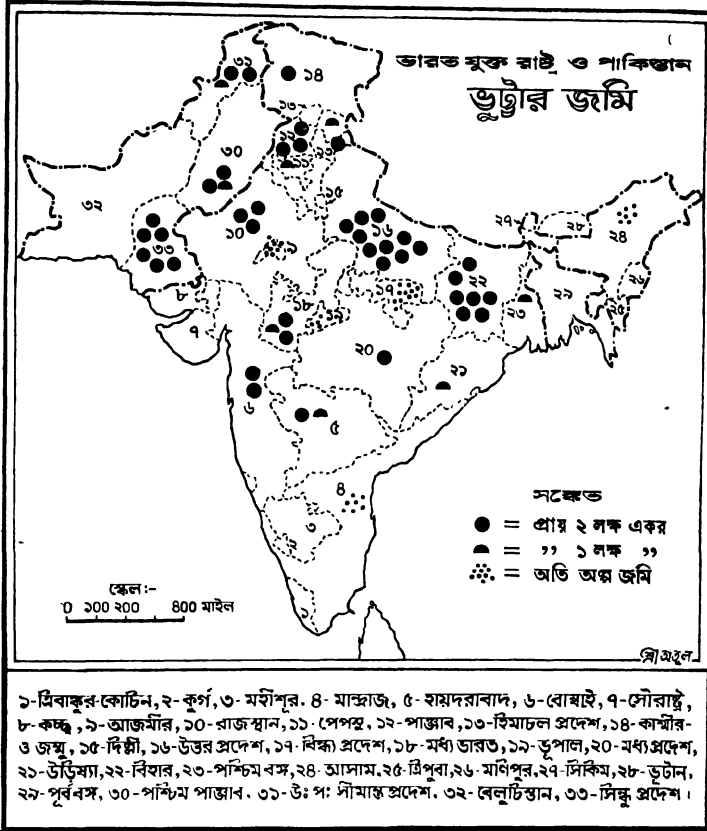
২৭নং চিত্র

সালে ৭৫ লক্ষ একর জমিতে ভুট্টা উৎপাদন করা হইয়াছিল, এবং ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছিল ১৬ লক্ষ টন। পাকিস্তানে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমিতে ১৯৫০-৫১ সালে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টন ভুট্টা জন্মিয়াছিল।

ডাল কলাই (Pulses)

ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য ; ইহাতে খাদ্যের প্রোটিন (Protein) অংশ অধিক পাওয়া যায়। শস্যাবর্ত্তনের জন্য ইহার চাষ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি তিন-চার

বৎসর অন্তর কোন জমিতে ইহার চাষ করা যায়, তবে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মসুর, মুগ, মটর, কলাই, অড়হর, খেসারি, কুলথ প্রভৃতি ডাল আছে। এই সকল ডালের চাষের জমির ও উৎপাদনের পরিমাণ আলাদা-আলাদা ভাবে রাখা হয় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ইহাদের চাষের জমির মোট পরিমাণ ১৯৪৯-৫০ সালে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ একর, এবং উৎপন্ন ডালের মোট পরিমাণ ৪০ লক্ষ টন।

এই সকল ডালের **প্রধান উৎপত্তি-স্থান উত্তরপ্রদেশ** ;—সমগ্র ডালের জমির প্রায় ১/৫ অংশ জমি এখানে রহিয়াছে, এবং সমগ্র উৎপন্ন ডালের ১/৪ অংশ এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। অন্য ডাল-উৎপাদক প্রদেশ—বিহার (১/৫), মধ্যপ্রদেশ (১/৯), হায়দারাবাদ (১/৯), বোম্বাই (১/১০), পশ্চিমবঙ্গ (১/১৬), মান্দ্রাজ (১/২০)। অন্য সকল প্রদেশেই কিছু-না-কিছু ডাল জন্মে।

ডাল প্রধানতঃ খারিফ-শস্য। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইহার চাষ তুলিয়া ফেলা হয়। ছোলা রবিশস্য।

ছোলা (Gram)।—ছোলা অতি পুষ্টিকর ডাল এবং সুস্বাদু। ইহাতে আমিষাংশ বেশী আছে। কিন্তু কিছু দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বাঙ্গালাদেশে ইহার ব্যবহার কম। ছোলার ছাতু করিয়াও অনেকে খায়। ভিজানো ছোলা আদা দিয়া বা গুড় দিয়া অনেকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য সকালে খাইয়া থাকেন। ইহা মানুষ ও পশু—দুই জীবেরই খাদ্য। ছাগল-ঘোড়ার ইহা একটি প্রধান খাদ্য।

ছোলার জমিতে জল দাঁড়ানো ভাল নহে, তবে ইহার চাষের জন্য কিছু ঠাণ্ডা ভাব দরকার। প্রায়ই গমের সহিত ছোলার চাষ হয়। ভারতের সকল দেশেই ইহা উৎপন্ন হয়। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবমতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩ লক্ষ একর জমিতে ছোলার চাষ হইয়াছিল, এবং মোট ৩৭ লক্ষ টন ছোলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ হিসাবমতে, **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছোলা-উৎপাদন-স্থান,—উত্তরপ্রদেশ**। ঐ বৎসরে এখানে ভারতের ৫/১৩ অংশ ছোলা জন্মিয়াছিল। তাহার পরে উৎপাদনের ক্রম-অনুসারে, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব (১/৫), মধ্যপ্রদেশ (১/১৪), পে.প.সু. (১/১৪), রাজস্থান (১/১৯), বিহার (১/২৪) ও বোম্বাই (১/৩৫)। ঐ বৎসর **পাকিস্তানে** ২৮ লক্ষ ১৩ হাজার জমিতে ৭ লক্ষ ৪৩ হা. টন ছোলা উৎপন্ন হইয়াছিল। পাকিস্তানে ছোলা-উৎপাদনে শ্রেষ্ঠস্থান পাঞ্জাব,—২/৩ অংশ ছোলা এখানে জন্মে।

১৯৫০-৫১ সালে ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকার ছোলা, ডাইল, ময়দা রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ৮০ কোটি টাকার ছোলা আমদানি করা হয়।

ইক্ষু (Sugarcane)

ভারতবর্ষই যে ইক্ষুর আদি-জন্মস্থান—ইহা এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত। এই ভারতবর্ষ হইতেই ইহার চাষ নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। এই ইক্ষু-চিনির শিল্প ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় অর্থপ্রসূ শিল্প। এইজন্য ইক্ষুর চাষ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, ও তাহাতে চাষীর দ্রুত উন্নতি হইতেছে।

ইক্ষুর চাষের জন্য বিশেষভাবে দরকার,—(১) উর্ব্বরা জমি, (২) আর্দ্র নিম্নভূমি, (৩) প্রচুর উত্তাপ (৭০°-৭৫°), এবং (৪) প্রচুর জল (৬০")। জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গেলে সার দিয়া উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে হয়; বৃষ্টির জল প্রচুর না পাওয়া গেলে জলসেচদ্বারা জলের অভাব পূরণ করিতে হয়। ধান্যের জন্যও প্রচুর জল দরকার। ধানের ক্ষেতে জল ধানের গোড়ায় জমিয়া থাকা দরকার। কিন্তু আকের ক্ষেতে জল সরিয়া যাওয়া উচিত। আবার অত্যধিক জল পাইলে গাছ ভাল হয় বটে, কিন্তু আকের রস পাতলা হয়, উহাতে চিনির অংশ কম থাকে। নদী বা জলাভূমির সন্নিকটস্থ জমি ও সমুদ্রবায়ু আকের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, **উষ্ণমণ্ডলই ইক্ষুচাষের প্রধান স্থান। তবে উষ্ণমণ্ডলের সন্নিহিত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অংশেও ইক্ষুর চাষ হয়।** যবদ্বীপ, কিউবা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইক্ষু-উৎপাদন-স্থান উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলে ভারতের যে-অংশ অবস্থিত, তদপেক্ষা উষ্ণমণ্ডল-সন্নিহিত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত উত্তর-ভারতবর্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইক্ষুচাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ, প্রচুর জল ও উর্ব্বরা মাটি দরকার। উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটি ও মৌসুমি-বায়ুবাহিত জলের জন্য এই অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়। আবার বৃষ্টিপাত গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ কম;—সেজন্য পূর্ব্বদিকের জমি ইক্ষুচাষের বিশেষ উপযোগী। এই সকল বিষয় পৃথিবী-খণ্ডের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আকের গীরা বা গাঁইট কাটিয়া ভিজাস্থানে পুতিয়া আক জন্মাইতে হয়। প্রচলিত কথায় এই গাঁইটকে বলে "পাব"। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আকের চাষ করা চলে। কিন্তু কার্ত্তিক মাসেই আকের চাষের প্রশস্ত সময়।

বীজের আক অর্থাৎ যে-আকের পাব কাটা হইবে, তাহা ভাল হওয়া দরকার। পূর্ব্বে যবদ্বীপের আকই বীজের জন্য ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কইম্বাটুর ইক্ষু-উৎপাদন

ক্ষেত্রে (Coimbatore Sugarcane Breeding Station) গবেষণার ফলে যে-যে-আক উৎপন্ন হইতেছে তাহার বীজ বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং নানা প্রদেশে গৃহীত হইতেছে। ভারতের ইক্ষুক্ষেত্রের প্রায় ৯০ শতাংশ বীজ

১-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ২-কুর্গ, ৩-মহীশূর. ৪-মান্দ্রাজ, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই, ৭-সৌরাষ্ট্র, ৮-কচ্ছ, ৯-আজমীর, ১০-রাজস্থান, ১১-পেপসু, ১২-পাঞ্জাব, ১৩-হিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাশ্মীর-ও জম্মু, ১৫-দিল্লী, ১৬-উত্তর প্রদেশ, ১৭-বিন্ধ্য প্রদেশ, ১৮-মধ্য ভারত, ১৯-ভূপাল, ২০-মধ্যপ্রদেশ, ২১-উড়িষ্যা, ২২-বিহার, ২৩-পশ্চিম বঙ্গ, ২৪-আসাম, ২৫-ত্রিপুরা, ২৬-মণিপুর, ২৭-সিকিম, ২৮-ভূটান, ২৯-পূর্ববঙ্গ, ৩০-পশ্চিম পাঞ্জাব, ৩১-উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, ৩২-বেলুচিস্তান, ৩৩-সিন্ধু প্রদেশ।
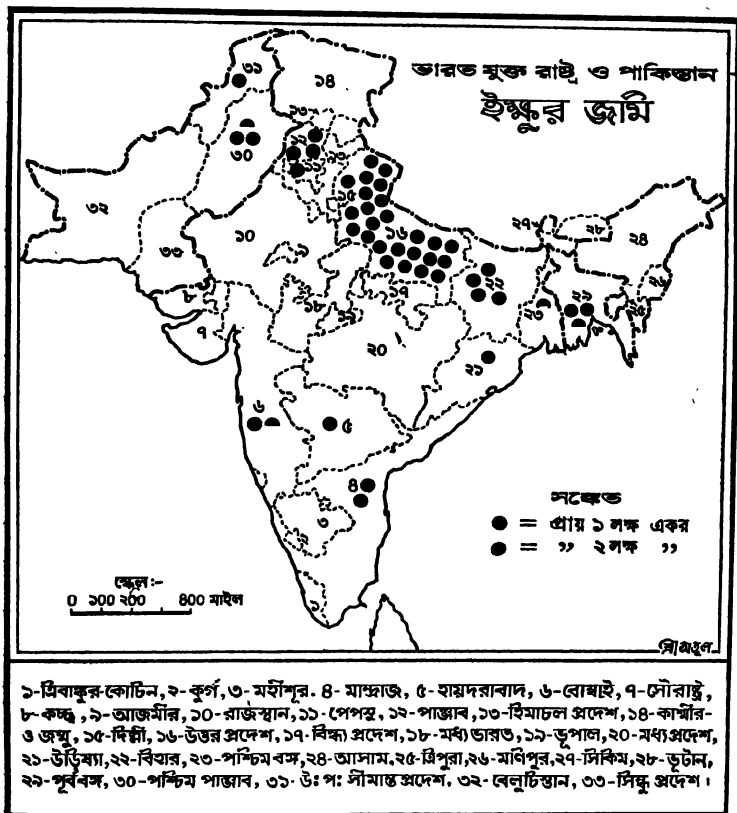
২৮নং চিত্র

এখান হইতেই প্রেরিত হয়। কুইম্বাটুরের ২২১ ও ২১৩ নং বীজের ইক্ষুতে চিনির পরিমাণ বেশী, ও কম জলসেচ দরকার হয়।

১৯৫০-৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৪১ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল ও ৫৪ লক্ষ ৬২ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০-৫১ সালে নিম্নলিখিত প্রদেশে ইক্ষু উৎপন্ন হয় :—

প্রদেশ	চাষের জমি লক্ষ একর	উৎপন্ন আক লক্ষ টন
উত্তরপ্রদেশ	২৪.৯	২৮.৯
মাদ্রাজ	২.১	৬.০
বোম্বাই	১.৮	৫.৪
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	৩.০	৩.৬
বিহার	৪.১	৩.০
হায়দারাবাদ	.৭	১.৪
উড়িষ্যা	.৭	১.১
পশ্চিমবঙ্গ	.৫	.৮
মহীশূর	.৩	.৫
পে.প.সু	.৬	.৭
মধ্যপ্রদেশ	.৪	.৫
অন্যপ্রদেশ	২.২	২.৭
মোট	৪১.৩	৫৪.৬

পাকিস্তানে—১৯৫০-৫১ সালে ৭ লক্ষ একর জমিতে ৮ লক্ষ ৭৪ হা. টন ইক্ষু ৎপন্ন হইয়াছিল। পাকিস্তানে ইক্ষুচাষের জমি ও ইক্ষুর উৎপাদন-পরিমাণ এইরূপ,—

পাকিস্তানে ইক্ষুর জমি ও উৎপাদন
১৯৫০-৫১ সাল

স্টেট	ইক্ষুর জমি (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)
বেলুচিস্তান	×	×
পূর্ব্ববঙ্গ	২২৬	৩৩৩
উ. প. সীমান্ত	৮২	৯১
পাঞ্জাব	৩৩৪	৩৭৯
সিন্ধু	১৭	২৭
বহব্বলপুর	৩৮	৪২
খয়েরপুর	২	২
	৭০০	৮২৪

উপরি-উক্ত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে, (১) গম, যব, ভুট্টা, ডাল ভৃতি খাদ্যশস্য-উৎপাদনে **উত্তরপ্রদেশ যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইক্ষু-উৎপাদনেও**

তেমনি ইহা সর্ব্বপ্রধান। তাহার পরে বিহার, তাহার পরে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব।

উত্তরপ্রদেশে পূর্ব্বভাগে বৃষ্টিপাত বেশী, পশ্চিমে কম। সেজন্য পূর্ব্বভাগে বিনা সেচে ইক্ষু চাষ হয়। মধ্যভাগে ও পশ্চিমভাগে সেচের জলই বৃষ্টির জলের অভাব পূরণ করে। এখানে গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটিও উর্ব্বরা। সেজন্য উত্তরপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এখানে ইক্ষুর চাষ বেশী হইবার আর এক কারণ এই যে, এখানে ইক্ষুই একমাত্র অর্থপ্রসূ শস্য। সেজন্য চাষীরা ইহা চাষ করিতে আগ্রহশীল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের বেশী ইক্ষু এখানেই জন্মে। ইহার গোরক্ষপুর, মীরাট, মজঃফরনগর, বেরিলি, খেরি, মোরাদাবাদ, সাহারানপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতেই ইক্ষুর চাষ বেশী পরিমাণেই হয়।

ইক্ষু-উৎপাদনে **দ্বিতীয় স্থান** অধিকার করে সাধারণতঃ **বিহার**। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের শস্যহানির জন্য এখানে বেশী ইক্ষু জন্মে নাই। উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা এখানে বৃষ্টি বেশী,—জমিও পলিমাটি-গঠিত। তাই এখানে ইক্ষুর চাষ ভালই হয়। প্রধানতঃ গঙ্গার উত্তরে অবস্থিত অংশেই ভাল চাষ হয়।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে জমি উর্ব্বরা, কিন্তু উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, বৃষ্টিপাত কম, এবং শীতে বরফ পড়ে। সে-হিসাবে ইক্ষুর চাষ ভাল হওয়া উচিত নহে। কিন্তু জলসেচনদ্বারা জলের অভাব বিদূরিত হয় এবং ভাল চাষ হয়।

অন্যতঃ **বঙ্গদেশে** বৃষ্টিপাত বেশী, জমি উর্ব্বরা। আবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদ্রবায়ু-প্রবাহিত জমিতে ইক্ষুচাষ ভাল হয়। সে-হিসাবেও বঙ্গদেশ ইক্ষুচাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু বঙ্গদেশে বৃষ্টিপাত সকল স্থানে সমান নয়,—কোথাও বেশী, কোথাও কম। কোথাও চাষের প্রাক্কালে জল পাওয়া যায়, কোথাও যায় না। এজন্য এখানে ইক্ষুর চাষ ভাল চলে না। তাছাড়া পাটের চাষে খুব পয়সা পাওয়া যায়। সেজন্য পাট ছাড়িয়া কেহ ইক্ষুর চাষ করিতে চাহে না।

(২) চাষের জমির পরিমাণ হিসাবেও উত্তর-ভারতের প্রদেশগুলিই প্রধান কেন্দ্র—যথা, (১) উত্তরপ্রদেশ, (২) বিহার, (৩) পূর্ব্ব-পাঞ্জাব। ভারত-বিভাগের ফলে প্রায় ৭ লক্ষ একর ইক্ষুচাষের জমি পাকিস্তানে পড়িয়াছে,—তন্মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ একর পশ্চিম-পাঞ্জাবে, এবং ২½ লক্ষ একর পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে। এজন্য ইক্ষুর জমি হিসাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের স্থান নামিয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক জমি জলে ডুবিয়া যায়। সেজন্য উত্তাপ ও উর্ব্বরতা হিসাবে উপযোগী জমিতেও ইক্ষুর চাষ হইতে পারে না। বিহারে ইক্ষুচাষে চম্পারণ জেলাই প্রধান। দারভাঙ্গা, ছাপরা, গয়া, মজঃফরপুর জেলাতেও ভাল ইক্ষুর

চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণায় ইক্ষু জন্মে।

(৩) ইক্ষুচাষের **দ্বিতীয় কেন্দ্র দক্ষিণ-ভারতে** অবস্থিত। সেখানে **মাদ্রাজ প্রথম, বোম্বাই দ্বিতীয়**। জলবায়ুর জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় কেন্দ্রের মধ্যস্থানে ইক্ষু-উৎপাদন ভাল হয় না।

দক্ষিণ-ভারতে ইক্ষুচাষের এক বিশেষ সুবিধা এই যে, শীতকালে এখানকার উত্তাপ উত্তর-ভারতের মত বিশেষ কম হয় না। সেজন্য এখানে শীতকালেও ইক্ষুর চাষ সম্ভব।

ইক্ষুচাষে পৃথিবী ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—চিনির চাহিদার উপরই ইক্ষুর চাষ নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে ইক্ষু হইতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিনি-উৎপাদন আরম্ভ হয়। তখন হইতেই ইক্ষুর চাষ ভারতবর্ষে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। **অ-বিভক্ত ভারতে** ১৯২৮-২৯ সালে ২৭ লক্ষ একর, ১৯২৯-৩০ সালে কমিয়া হয় ২৬ লক্ষ, ১৯৩০-৩১ সালে বাড়িয়া হয় ২৯ লক্ষ, ও ১৯৩১-৩২ সালে হয় ৩০ লক্ষ একর। ইহার পরে ১৯৩৯-৪০ সালে ইক্ষু চাষের জমি ছিল ৩৬ লক্ষ ৪০ হাজার একর, ১৯৪৫-৪৬ সালে ছিল ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার একর। **বিভক্ত ভারতে** ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল ৩৮ লক্ষ ৫২ হাজার একর, এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৪১ লক্ষ ৩৮ হাজার একর। সুতরাং গত **১০ বৎসরে ১১ লক্ষ একর ইক্ষুর জমি বাড়িয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে** ইক্ষুচাষের জমিতে ভারতবর্ষ প্রথম ছিল, এখনও **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রই** প্রথম আছে। কিন্তু ইক্ষুগুড়ের ফলন এদেশে এত কম যে, পৃথিবীর ২৮ শতাংশ ইক্ষু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে জন্মিলেও, পৃথিবীর ৫ শতাংশ গুড়ও এদেশে জন্মে না।

আকের ফলন।—ভারতের আকের ফলনের হিসাব কিছু অন্য রকমের। শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ তাঁহার "ভারতের পণ্য" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যে সরকারী হিসাব রাখা হয়, তাহাতে দেশে উৎপন্ন সমস্ত গুড়ের পরিমাণ দিয়া আকের ফলনের হিসাব করা হয়। সাধারণের পক্ষে ইহা অতি অসুবিধার কথা। মোটের উপর প্রতি একরে সাড়ে চার হইতে পাঁচশত মণ আক জন্মে বলিয়া আন্দাজ করা যাইতে পারে। কখনও-কখনও ইহা অপেক্ষা বেশী ফলিতে দেখা যায়। তাহার শতকরা ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ বা ততোধিক রস পাওয়া যায়, এবং একর প্রতি ৩৫ হইতে ৪০ মণ গুড় পাওয়া যায় বলিয়া হিসাব ধরা হয়। ভারতের গুড়ের শতকরা ৬০ ভাগ চিনি পাওয়া যায় মনে করিয়া জগতের বাজারে সমস্ত গুড়কে চিনিতে পরিণত করিয়া হিসাব রাখা হয়।

এক একরে ৪৫০-৫০০ মণ আক হইলে, তাহা হইতে ৪০-৫০ মণ গুড়, ২৭-২৮ মণ বিশুদ্ধীকৃত (refined) চিনি, এবং ১৮-১৯ মণ দানা চিনি (Crystallized) পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ১১·২% পর্য্যন্ত চিনি উদ্ধার করা হইয়াছে।"

লেদার সাহেবের মতে, যে-আকের ৭০ শতাংশ রস হয়, ১৫ শতাংশ চিনি হয়, এবং ১৭ শতাংশের বেশী গ্লুকোজ হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট আক।*

একর প্রতি ফলনে ভারতীয় শর্করা-সমিতির মতে, পৃথিবীতে হাওয়াই দ্বীপে প্রতি একরে ৪·৬১ টন, যবদ্বীপে ৪·১২ টন, কিউবায় ১·৯৬ টন ও ভারতবর্ষে ১·০৭ টন চিনি ধরা হয়। সুতরাং ইক্ষুচাষে ও চিনি-উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম বটে, কিন্তু জমির অনুপাতে অন্যান্য অনেক দেশে বেশী চিনি জন্মে।

চিনি।—চিনির জন্যই ইক্ষুর এত উন্নতি। চিনিশিল্পসম্বন্ধে আলোচনাকালে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইবে। তবে এই স্থানে এইটুকুমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট চিনিশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩২ সালে আমদানি চিনির উপর রক্ষণশুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। তাহাতে এদেশের চিনি-শিল্পের এবং তজ্জন্য ইক্ষুচাষের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। চিনির আমদানি কমিয়া ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে প্রায় রহিত হইয়া যায়। এদেশে চিনির কলের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ৩২ হইতে ১৬৪ হইয়া উঠে।

পরে ১৯৪৪ সালে চিনিশিল্পের ও তৎসম্পর্কিত ইক্ষুচাষের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি (Indian Central Sugarcane Committee) স্থাপন করেন। এই কমিটি ইক্ষুচাষের ও চিনিশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই কমিটি কেন্দ্রীয় ও প্রদেশীয় ইক্ষুগবেষণা পরিকল্পনার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, এবং ইক্ষুশিল্পের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ৩ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ইক্ষুর চাষও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়, এবং ১ কোটি ৩৯ হাজার টন ইক্ষু পিষিয়া ৪৯ লক্ষ টন গুড় উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতে খণ্ডেশ্বরী† চিনি ১ লক্ষ টন, কলের চিনি ১০ লক্ষ ১ হা. টন, এবং গুড় হইতে ৩,০০০ টন সুপরিষ্কৃত চিনি—মোট ১১ লক্ষ ৪ হা. টন চিনি পাওয়া

* Mr. Leather says, "A good cane is one which yields 70 p. c. of juice in the mill, affords 15 p. c. or more of canesugar and possesses not more than 17 p. c. of glucose."—Taken from ভারতীয় পণ্য।

† যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলে অনাবৃত পাত্রে জ্বাল দিয়া যে হরিদ্রা রঙের চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার নাম খন্দসরী, খণ্ডেশ্বরী বা খণ্ডে চিনি।

যায়। কিন্তু ১৯৩৮–৩৯ সালে ৭০ লক্ষ ৫ হাজার টন আক পিষিয়া ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত টন চিনি,—গুড় হইতে ১৫ হাজার ৬ শত টন,—এবং খণ্ডেশ্বরী ১ লক্ষ টন,—মোট ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪ শত টন চিনি হইয়াছিল।

আলু (Potato)

আলু-সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ১৯২ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে।
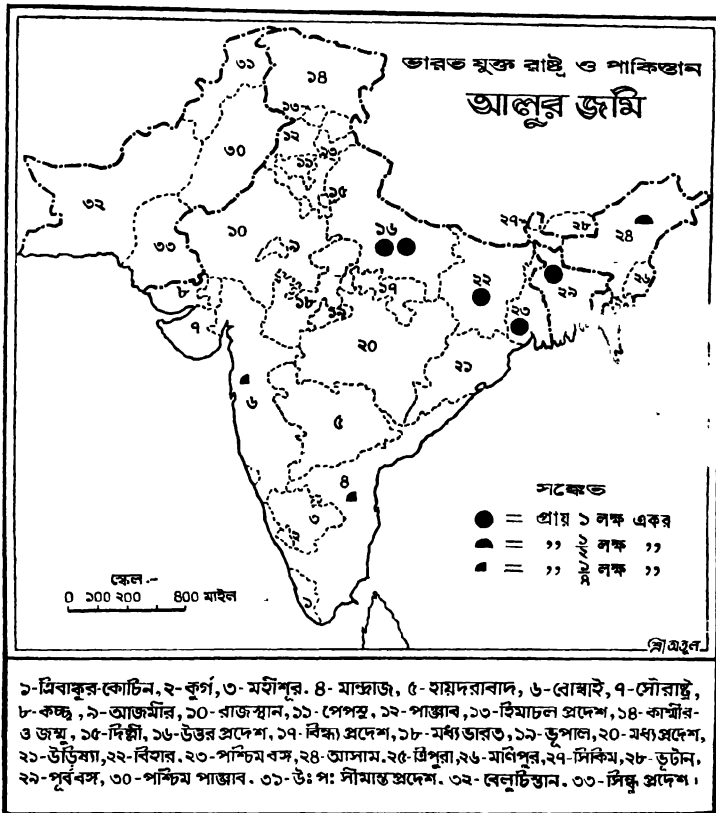
২৯নং চিত্র

আলু শ্বেতসারপ্রধান নিত্য-প্রয়োজনীয় তরকারী। খাদ্যবস্তুর মধ্যে গোলআলু এখন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা সকল প্রকার জলবায়ুতেই জন্মিতে পারে,

কেবল খুব বেশী উত্তাপে ইহা জন্মে না। শীতোষ্ণ আবহাওয়া, এবং বালিপ্রধান, উর্ব্বরা ও আর্দ্র দো-আঁশ মাটি আলুচাষের বিশেষ উপযোগী। সেইজন্য পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান আলু-রপ্তানিকারক দেশ ক্ষুদ্র হলণ্ড। আলুর ক্ষেত্রে বিস্তর সার দিতে হয়, এবং আলুর ক্ষেত গভীরভাবে চষিতে হয়।

পার্ব্বত্য-অঞ্চলের অম্লপ্রধান জমি আলুর উপযোগী। তাই হিমালয়- ও নীলগিরি- -অঞ্চলে আলুর ভাল চাষ হয়। এই অঞ্চল হইতে বীজ আনিয়া সমতল প্রদেশে আলুর চাষ করা হয়। আলুর গায়ে "চোখ" থাকে। আলু জমিতে বসাইলে এই চোখ হইতে গাছ বাহির হয়। তাই এই আলুকে "বীজ আলু" বলে। সমতল দেশের আলু—পাহাড়ে, এবং পাহাড়ের আলু—সমতল প্রদেশে অদল-বদল করিয়া চাষ করিলে আলুর ফসল ভাল হয়, নতুবা আলু খারাপ হইয়া পড়ে।

১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবমত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত স্থানে আলুর চাষ হয়।

প্রদেশ	চাষের জমি (সহস্র একর)	উৎপন্ন আলু (সহস্র টন)	একর প্রতি ফলন (টন)
উত্তরপ্রদেশ	১৯২	৫৫৮	২·৯
বিহার	১০২	২০২	১·৯
পশ্চিমবঙ্গ	৯৫	৩২২	৩·৪
আসাম	৬১	১৪৩	২·৩
বোম্বাই	২১	৬৫	৩
মান্দ্রাজ	১৯	৫৩	৩
হিমাচল প্রদেশ	১৬	২৬	১·৬
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	১৩	৪৩	৩·৩
অন্য প্রদেশ	৩৪	৬২	১·৯
	৫৫৩	১৪৭৪	

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের ন্যায়, প্রধান তরকারীর উৎপাদনের জমি হিসাবে **উত্তরপ্রদেশ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে,** দ্বিতীয় বিহার,—তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরপ্রদেশের প্রধান উৎপাদন- -স্থান নাইনিতাল; বিহারের মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া ও মুঙ্গের; প. বঙ্গদেশের দার্জ্জিলিং, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ও হুগলী; আসামের চেরাপুঞ্জি পাহাড় ও শিলং। আলু এখন ভারতের সকল প্রদেশেই জন্মিতেছে। হিমালয় (৫,০০০ ফি. উচ্চ পর্য্যন্ত), বিন্ধ্য, নীলগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতে এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশের সমতল ক্ষেত্রে আলু জন্মিতেছে।

আমাদের দেশে নাইনিতাল, পাটনাই, দেশী, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েক রকম আলুর চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নাইনিতাল শ্রেষ্ঠ। নাইনিতাল একর প্রতি ২২৫ মণ, ও মান্দ্রাজি আলু ২০০ মণ ফলে। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালের হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গেই ফলন বেশী হইয়াছে,—একর প্রতি মোটামুটি ৯৫ মণ।

আলুর চাষে বিস্তর লাভ হইতে পারে। কিন্তু আলুর চাষে খরচও বিস্তর। ইহার জমিতে দরকার—গভীর চাষ,—প্রচুর সার, ও প্রচুর জলসেচ;—এবং ইহার ভাল বীজ পাওয়া কষ্টকর। তাছাড়া ইহাতে পোকা লাগিবার ভয়ও আছে, এবং কোন-কোন বৎসর আলু সংরক্ষণকালে পচিবারও ভয় বিস্তর। তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, আলু যত্ন করিয়া চাষ করিলে, এবং যত্ন করিয়া বীজ সংগ্রহ করিলে ইহাতে লাভ বিস্তর।

১৯৪৬ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ একর জমিতে ২১ কোটি ৬২ লক্ষ টন আলু উৎপন্ন হয়। ঐ বৎসরে বৃটিশ ভারতে ৪ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে ১৬ লক্ষ ৭ হাজার টন আলু উৎপন্ন হয়। আলু-উৎপাদনে ঐ বৎসরে প্রথম ছিল রুশিয়া। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে পোলণ্ড, জার্ম্মানি, চীন, ফ্রান্স, আ. যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভোকিযা, স্পেন, ইতালী, হাঙ্গারী, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লোভিয়া, মাঞ্চুরিয়া, অষ্ট্রিয়া, ক্যানাডা, তৎপরে ষোড়শস্থানে বৃটিশ ভারত।

একর প্রতি আলু-উৎপাদনে ক্রমান্বয়ে হলণ্ড (৮.৪ টন), আয়ার (৭.৭), বেলজিয়ম (৭.৪), যুক্তরাষ্ট্র (৭.১), চেকোশ্লোভোকিয়া (৫.৬), জার্ম্মানি (৫.৫), সুইডেন (৫.৪), আ. যুক্তরাষ্ট্র (৪.৯), ক্যানাডা (৪.৭), চীন ও ফ্রান্স (৪.৫) এবং ভারতবর্ষ (৪)।

মাথাপিছু উৎপাদন-পরিমাণ ভারতবর্ষে পড়ে মাত্র ১২ পা.;—কিন্তু আয়ারে ২,২৪০ পা., চেকোশ্লোভোকিয়ায় ১৫০২ পা., পোলণ্ডে ১৩৭৭ পা., হলণ্ডে ১০১১ পা.।

তামাক (Tobacco)

তামাকের চাষ ভারতবর্ষের পক্ষে অল্পদিনেই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, একে ত ইহার ব্যবহার নিত্য বাড়িয়াই চলিয়াছে, অন্যতঃ ইহার রপ্তানির অঙ্কও ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

পর্ত্তুগীজেরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে তামাক আনে, ও দাক্ষিণাত্যে চাষ আরম্ভ করে। সেখান হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে তামাকের চাষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পৃথিবী-খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় তামাক-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। তামাকের জন্য যে পচাসারযুক্ত হাল্কা মাটি ও উত্তাপ দরকার,—ইহা যে তুষারপাত সহ্য করিতে

পারে না,—ইহার চাষ করিবার জন্য যে প্রথমে আমন ধানের মত বীজতলা করিতে হয়, এবং সেখানে চারা বড় হইলে তামাকের ক্ষেতে আইল কাটিয়া, সেই আইলের উপর তামাকের চারা ২-৩ হাত অন্তর অন্তর বসাইতে হয় ;—এ-সকল কথা ঐ স্থানে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।
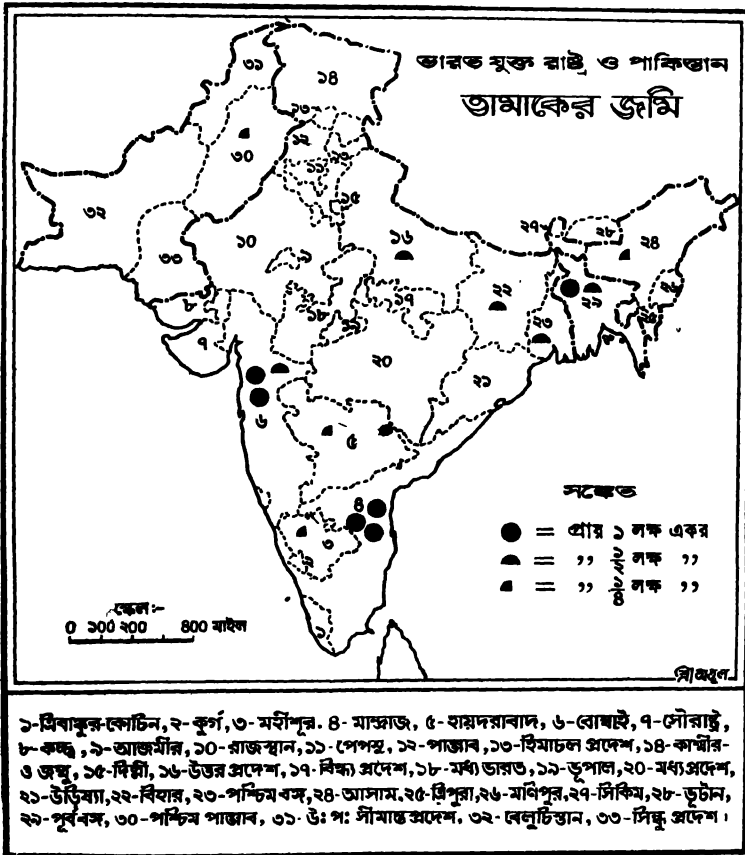
৩০নং চিত্র

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তামাকের বীজতলা করিয়া প্রায় একমাস পরে গাছগুলিকে তুলিয়া পুতিতে হয়। পাতাগুলি যখন অল্প হরিদ্রাবর্ণ ও আঠালো ভাবের হয়, তখন গাছ কাটিয়া লইতে হয়, এবং ঘরের ভিতর পাতাগুলি শুকাইয়া লইতে হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র তামাক-উৎপাদনে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত স্থানে ১৯৫০-৫১ সালে নিম্নলিখিত রূপ তামাকের চাষ হইয়াছিল ঃ—

প্রদেশ	চাষের জমি (হাজার একর)	উৎপন্ন তামাক (হাজার টন)
মান্দ্রাজ	৩১৯	১১১
বোম্বাই	২৪৬	৬৮
পশ্চিমবঙ্গ	৪৪	১১
বিহার	৪৪	১০
উত্তরপ্রদেশ	৪৩	১৪
হায়দারাবাদ	২৭	৬
মহীশূর	২৩	৩
আসাম	২২	৯
অন্য প্রদেশ	৭১	১৯
		২৫১

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এক্ষণে মান্দ্রাজে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জমিতে তামাক চাষ হয়, এবং দক্ষিণ-ভারতে উত্তর-ভারত অপেক্ষা বেশী চাষ হয়। উৎপাদন-হিসাবে ভারতে অর্দ্ধেক তামাক জন্মে মান্দ্রাজে, বোম্বাই প্রদেশে সিকি অপেক্ষা কিছু কম, এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ব্যতীত অন্য প্রদেশগুলির মিলিত উৎপাদন সিকি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

কিন্তু ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে (১৯৪৫-৪৬) সনে সমগ্র ভারতবর্ষে **তামাক-উৎপাদন-**-স্থান ছিল ১,০২১ সহস্র একর, তামাক উৎপাদন হইত ৪২৪ হাজার টন। ভারত--বিভাগের পর এক-ষষ্ঠাংশ (১৯৯ হাজার এ.) তামাকের জমি পাকিস্তানে পড়িয়াছে। তখন যুক্তবঙ্গে ছিল ১৭৭ হা. একর জমি ;—বঙ্গভঙ্গের পরে পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে ১৫২ হাজার একর, এবং পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২৫ হাজার একর—সমগ্র বঙ্গের এক-ষষ্ঠাংশ। পাকিস্তানের ১৯৯ হাজার একর মোট তামাকের জমির মধ্যে ১৫২ হাজার একরই পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছে।

তামাকের ব্যবহার নানা প্রকার। ইহাতে চুরুট, সিগারেট, ও বিড়ি তৈয়ারি হয়, ইহা চিবাইয়া খায়, নস্যরূপে নাকে টানে ও হুঁকায় টানে। এই বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য তামাকেরও বিভিন্নতা আছে, এবং উৎপন্ন হয়ও বিভিন্ন প্রদেশে। সিগারেটের উপযোগী golden leaf নামে ভার্জিনিয়া শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয়,—মান্দ্রাজ স্টেটের গণ্টুর, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায়। মান্দ্রাজের গণ্টুর, গোদাবরী ও বিশাখাপত্তন জেলায়, বিহারের মজঃফরপুর, পূর্ণিয়া ও দ্বারভাঙ্গা জেলায়, গুজরাটের চারতোয়ার

অঞ্চলের আনন্দ, নাদলাদ, বরসাদ, এবং বরোদা অঞ্চলের পেটলাদ ও ভাদরান তালুকে একপ্রকার তামাক হয়, তাহাতে খারাপ সিগারেট হয় এবং খৈনি তামাক ও পাইপের তামাক হয়। ভার্জ্জিনিয়া শ্রেণীর তামাকও এখানে অল্প জন্মিতেছে। বোম্বাইয়ের নিপানি অঞ্চলের বেলগাঁও, সাচারা, কোলাপুর ও সাংলি প্রভৃতি স্থানে, ও মহীশূরে—বিড়ির ও খৈনির তামাক জন্মে। হুঁকার তামাক, ও চিবাইবার তামাক প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পাওয়া যায়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যে-তামাক জন্মে তাহার অধিকাংশই এইস্থানে ব্যবহৃত হয়,—অল্পমাত্র রপ্তানি করা হয়। প্রায় ১০০ বৎসর এদেশ হইতে তামাক রপ্তানি করা হইতেছে,—রপ্তানিমূল্য কখনও বাড়িতেছে, কখনও কমিতেছে। কিন্তু প্রতিযোগিতাও এখন বাড়িতেছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৮-৪৯ সালে ছয় লক্ষ টন তামাক রপ্তানি হইয়াছিল; ১৯০১-২ সালে রপ্তানিমূল্য ৩৫ লক্ষ টাকায় উঠে। ১৯৩০-৩১ সালে ইহা এক কোটি টাকায় উঠিয়া পড়িতে থাকে। ইক্ষুচাষের বৃদ্ধিই ইহার পতনের অন্যতম কারণ। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা আবার উঠে। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেজন্য ব্রহ্মদেশ ঐ বৎসর হইতে যে-তামাক লইতেছে তাহা ভারতের রপ্তানি-অঙ্কে যুক্ত হইতেছে,—ইহাতে রপ্তানি-অঙ্ক বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ, ব্রহ্মদেশ ভারতের তামাকের প্রধান খরিদ্দার। এই সময়ে ইংলণ্ড অধিক পরিমাণে কাঁচা তামাক লইতে আরম্ভ করে, সেজন্যও রপ্তানি-অঙ্ক বাড়িয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে তামাক রপ্তানি হইয়াছে ১৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার।

কিন্তু সিগার ও সিগারেটের কল্যাণে আমদানি-অঙ্ক রপ্তানি-অঙ্ককে ছাড়াইয়া যায়। ইহা

১৯১৬-১৭ সালে—	১ কো. ২৫ ল. ১৩ স.	১৯৩৩-৩৪ „	৭২ লক্ষ ১৫ স.
১৯২০-২১ „	২ „ ৯৫ „ ৯১ „	১৯৩৬-৩৭ „	৮০ „ ৮৩ „
১৯৩০-৩১ সালে	১ „ ৫১ ল. ১৬ স.	১৯৩৭-৩৮ „	৮৫ „ ৪৮ „

১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৭-৩৮ পর্য্যন্ত যে আমদানি-মূল্য কম হইয়াছিল তাহার কারণ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন। **১৯৫০-৫১ সালে আমদানি-অঙ্ক ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৪ হাজার।** সিগারেট ও সিগারের ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের পর হইতেই বিদেশীরা এদেশী হইয়া সিগারেট ও সিগারাদি প্রস্তুত করিতেছে।

ভারতবর্ষের **তামাকের ক্রেতা,**—বৃটেন, ব্রহ্মদেশ, এসেনসান, জাপান প্রভৃতি।

ভারতে তামাকের চাষ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অনুযায়ী চাষ-প্রণালীর কোন উন্নতি হয় নাই। মৃত্তিকা, সার, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বীজ-সম্বন্ধে

চাষীর বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক,—কোন্ প্রকার তামাকের জন্য কি প্রকার চাষ আবশ্যক তাহাও জানা দরকার,—তামাকের পাতার গুণানুসারে ও চাহিদা-অনুসারে শ্রেণীভেদ দরকার,—রপ্তানিক্ষেত্রে কোন্ তামাকের কিরূপ চাহিদা তাহাও শিক্ষা করা আবশ্যক। ইহা শিক্ষা না করিলে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না।

তৈলবীজ (Oil-seeds)

ভারতবর্ষে তৈল একটি অর্থপ্রসূ উৎপন্ন শস্য। ১৯৫১-৫২ সালে ১৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকার তৈলবীজ রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসর প্রায় ২৮ কোটি একর জমিতে নানা দ্রব্যের চাষ হইয়াছিল। সুতরাং মোটামুটিভাবে কৃষিজমির ১/১১ অংশ জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়। তৈলবীজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য। ভক্ষ্যবীজের তৈল রন্ধনাদিতে ব্যবহৃত হয়, এবং অভক্ষ্য বীজের তৈল রং ও পালিশের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

(ক) ভক্ষ্য তৈলবীজ (Edible Oil-seeds)

(দ্রষ্টব্য।—পৃথিবী-খণ্ডে ২৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।)

১। **তিল** (Sesamum—পৃ. ২৪৫ পৃ.)।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সব প্রদেশেই অল্পবিস্তর তিল জন্মে; তবে তিলের জমি **বেশী উত্তরপ্রদেশে** (১১ লক্ষ ৮২ হাজার একর), তৎপরে ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবক্রমে তিল-উৎপাদক স্থান,—মান্দ্রাজ (৭৩৩ হাজার এ.), রাজস্থান (৬৪২ হাজার), হায়দারাবাদ (৬৩১ হাজার) মধ্যপ্রদেশ (৩৮৪ হাজার), সৌরাষ্ট্র (৩১৫ হাজার), মধ্যভারত (৩১৪ হাজার), বোম্বাই (২৭৪ হাজার), উড়িষ্যা (২৫২ হাজার), বিন্ধ্যপ্রদেশ (২৪২ হাজার) প্রভৃতি। ঐ বৎসর মোট ৫২২ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হয়, এবং তাহার এক-পঞ্চমাংশ হয় উত্তরপ্রদেশে। বঙ্গদেশে তিলের চাষ খুবই কম হয়; ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ১৭ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সালে ৪ লক্ষ ২১ হাজার টন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল।

তিলের চাষ জোয়ার, বাজরা, তুলা প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া করা যায়। তিলের চাষের জমি উত্তরপ্রদেশে বেশী বটে, কিন্তু ফলন মান্দ্রাজে বেশী। ১৯৫০-৫১ সালে উত্তরপ্রদেশে ১১,৮২ হাজার একর জমিতে ৮১ হাজার টন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু ঐ বৎসর মান্দ্রাজে মাত্র ৭৩৩ একর জমিতে চাষ দিয়া ৮২ হাজার টন তৈল পাওয়া যায়।

তিল হইতে তৈল, খইল ও বীজ পাওয়া যায়। তৈল সাধারণতঃ প্রদীপে জ্বালাইতে, স্নানার্থে, এবং মার্গারিন ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কোন-কোন স্থানে রন্ধনকার্য্যে লাগে। খইল পশুখাদ্যরূপে ও সাররূপে ব্যবহৃত হয়। তৈল, খইল ও বীজ—এই তিনটিই রপ্তানি-দ্রব্য। বীজের প্রধান খরিদ্দার—ব্রহ্মদেশ, তৎপরে সিংহল ও আরব। তৈলের খরিদ্দার—এডেন ও আরব। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রপ্তানি-বন্দর।

২। চীনা বাদাম (Ground Nut—পৃ. ২৪৬ পৃ.)।—চীনা-বাদাম-উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বপ্রথম। পাকিস্তানে চীনা বাদাম নাই বলিলেই হয়। পথিবীর চীনা বাদামের ৬০ শতাংশ ভারতেই রহিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১০৪ লক্ষ জমিতে ইহার চাষ হয় ও ৩৩ লক্ষ টন বাদাম উৎপন্ন হয়। চাষের জমির পরিমাণক্রমে প্রধান স্থান—মান্দ্রাজ (৩৯ লক্ষ একর—সমগ্র জমির ⅓ অংশ অপেক্ষাও বেশী), বোম্বাই (২০ লক্ষ একর), হায়দারাবাদ (১৬ লক্ষ একর), সৌরাষ্ট্র (১২ লক্ষ), মধ্যপ্রদেশ (৫ লক্ষ), মধ্যভারত (৩ লক্ষ), মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশ (২ লক্ষ)। তৈল-উৎপাদনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্টেট—মান্দ্রাজ (১৬ লক্ষ ২০ হাজার টন), তৎপরে ক্রমান্বয়ে বোম্বাই (৬ লক্ষ ৮৭ হাজার), হায়দারাবাদ (৪ লক্ষ ২ হাজার), সৌরাষ্ট্র (২ লক্ষ ২৬ হাজার), মধ্য প্রদেশ (১ লক্ষ ১৪ হাজার) ইত্যাদি। সুতরাং দাক্ষিণাত্যই চীনা বাদামের প্রিয়স্থান। চাষের জমির শতকরা ৭৫ অংশ, ও উৎপন্ন বাদামের শতকরা ৮৩ অংশ দক্ষিণ-ভারত হইতেই পাওয়া যায়।

কৃষি-গবেষণা-সমিতি চীনা বাদামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যের ফলে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-অঞ্চলে উন্নত ধরণের চীনা বাদামের চাষ হইতেছে। কিন্তু চাষের জমির নিম্নের তালিকা দেখিলে এখনও এই চাষের কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না।

	চাষের জমি সহস্র একর	উৎপন্ন বাদাম সহস্র টন
১৯৩৯-৪০	৮,৪১০	৩,১৬৫
১৯৪৩-৪৪	৯,৮০৮	৩,৮২৩
১৯৪৫-৪৬	১০,২৭৩	৩,৪৬৬
১৯৪৮-৪৯	৯,৮৩২	৩,৩৭৯
১৯৫০-৫১	১০,৪৭২	৩,৩৩১

৩। **সর্ষপ** (Mustard and Rape)।—সর্ষপ উত্তর-ভারতের শস্য। ইহার তৈল রন্ধনার্থে, গাত্রে মাখিবার জন্য, জ্বালাইবার জন্য, ধাতব যন্ত্রকে পরস্পরের ঘর্ষণ-জনিত ক্ষয় হইতে রক্ষার্থ ও অন্য নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা **অধিক শস্যের জমি আছে উত্তরপ্রদেশে**—১৯৫০-৫১ সালে ৩৫ লক্ষ ৩ হাজার একর—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সরিষার জমির $\frac{৭}{১১}$ অংশ। কিন্তু সরিষা অন্য শস্যের সহিত একত্র চাষ করা হয়; উত্তরপ্রদেশে জমির যে-হিসাব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সেই জমি ধরা হয় নাই। ১৯৫০-৫১ সালে সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫ লক্ষ ৫ একর জমিতে চাষ হইয়া ৮ লক্ষ ২৬ হাজার টন সর্ষপ উৎপন্ন হইয়াছিল।

চাষের জমি হিসাবে নিম্নলিখিত রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে প্রধান—১। উত্তরপ্রদেশ, ২। পাঞ্জাব (৩৪৫ হা.), ৩। বিহার (৩১৯ হা.), ৪। আসাম (৩১৫ হা.), ৫। রাজস্থান (২৭০ হা.), ৬। পশ্চিমবঙ্গ (২২১ হা.)।

সর্ষপ উৎপন্ন হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তরপ্রদেশে (৫০৪ হা. ২ টন)। তৎপরে ক্রমান্বয়ে ২। বিহার (৫৮ হা. টন), ৩। পাঞ্জাব (৫৭ হা.), ৪। আসাম (৫৫ হা.), ৫। পশ্চিমবঙ্গ (৪১ হা.), ৬। রাজস্থান (৩৬ হা.)। ইহার বীজ, তৈল, ও খৈল—সবই রপ্তানি-দ্রব্য। বীজের প্রধান খরিদ্দার—ইংলণ্ড; অন্য খরিদ্দার—ইতালী, ফ্রান্স, হলণ্ড, আ. যুক্তরাষ্ট্র। তৈলের প্রধান খরিদ্দার—ব্রহ্মদেশ। খইলের প্রধান খরিদ্দার—সিংহল।

অ-বিভক্ত ভারতে মোট সর্ষপের জমি ছিল ১৯৪৫-৪৬ সালে ৫,৫৩৫ হাজার একর। ইহার মধ্যে ১২ লক্ষ একর জমি পাকিস্তানে পড়িয়াছে। এই বিভাগের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হইয়াছে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের। পাঞ্জাবে সরিষার মোট জমি ছিল ৮০৫ সহস্র একর, এবং বঙ্গদেশে ছিল ৫৫৯ সহস্র একর। তন্মধ্যে ৩৮৮ একর পশ্চিম-পাঞ্জাবে, এবং ৪২৮ একর পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে।

(খ) অভক্ষ্য তৈলবীজ (Non-Edible Oil-seeds)

১। **তিসি** (Linseed).—প্রধানতঃ রং ও বার্ণিসের জন্য তিসির ব্যবহার। ইহা আপনা হইতে শুকাইয়া উঠে, সেইজন্য বার্ণিসের কাজে ইহা বিশেষ উপযোগী। তা'ছাড়া, অয়েল ক্লথ, ছাপার কালি, সাবান-প্রস্তুত করা ও অন্যান্য অনেক কাজে তিসির তৈলের প্রয়োজন হয়। সমস্ত পৃথিবীতে যত জমিতে তিসি জন্মে তাহার সিকি-অংশ ভারত-পাকিস্তানে অবস্থিত। ভারত-বিভাগহেতু তিসির জমির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্তানে পড়ে নাই। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৫-৪৬ সালে তিসির জমি ছিল ৩২ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমি, এবং পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৭৯ হাজার একর জমি।

১৯৫০-৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে তিসির জমি ছিল ৩৫ লক্ষ ৩২ হাজার একর এবং তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিসি-উৎপাদন-স্থান —মধ্যপ্রদেশ (৯৬৩ হা. একর); তৎপরে ক্রমান্বয়ে—উত্তরপ্রদেশ (৮৯১), হায়দারাবাদ (৫৪২), মধ্যভারত (৩২৩), বিহার (৩১৩), বিন্ধ্যপ্রদেশ (১৪৯), রাজস্থান (১৩১)। ঐ বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল উত্তরপ্রদেশে (১ লক্ষ ৪১ হা. টন), তারপরে মধ্যপ্রদেশে (৭৫ হা. টন)। ঐ বৎসরে **পাকিস্তানে** ৬৬ হা. একর ভূমিতে ২০ হা. টন তিসি জন্মিয়াছিল।

তিসির বীজ বিক্রয় হয় গ্রেট বৃটেন, আ. যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হলণ্ড প্রভৃতি দেশে;—খইল বিক্রয় হয়—হলণ্ড, মিশর, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে;—তৈল বিক্রয় হয়—সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে।

২। **এরণ্ড** বা **রেড়ি** (Castor Seed).—পৃথিবীতে মাত্র তুইটি স্থানে —ব্রাজিল ও ভারতবর্ষ—এই তুই দেশে,—রেড়ি উৎপন্ন হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অর্দ্ধেক হয় ব্রাজিলে ও অর্দ্ধেক ভারতে;—অন্য তুই-একস্থানে হইলেও তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে দাক্ষিণাত্য মালভূমিই রেড়ির প্রধান উৎপাদন-স্থান; সমগ্র ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান (১৯৫০-৫১) হায়দারাবাদে—৭ লক্ষ একর,—অর্দ্ধেকেরও বেশী। ইহার পরে চাষের জমির ক্রমানুসারে মান্দ্রাজ (২ লক্ষ ১৭ হা.), বোম্বাই (১ লক্ষ ১৯ হা.) মহীশূর (·৮০ হা.), সৌরাষ্ট্র (৩১ হা.), মধ্যভারত (২৫ হা.) ইত্যাদি। ঐ বৎসরে একলক্ষ টন রেড়ি উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে, বলা বাহুল্য, হায়দারাবাদেই বেশী (৫১ হা. টন);—তৎপরে মান্দ্রাজে (২০ হা.), বোম্বাই-এ (১৪ হা.) ইত্যাদি।

এই রেড়ি হইতে উৎপন্ন তৈল বিশেষ প্রয়োজনীয়; ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা শীতে সহসা জমে না বলিয়া প্রদীপে জ্বালানিরূপে, যন্ত্রাদি পিচ্ছিল রাখিতে ব্যবহৃত হয়, এবং অতিস্নিগ্ধকর বলিয়া স্নানকালেও ব্যবহৃত হয়।

পাকিস্তানে রেড়ির চাষ নাই। সামান্য কিছু সিন্ধুপ্রদেশে হয়—কিন্তু তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

তুলা (Cotton)

পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে তুলার স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত, এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান তুলা-সংক্রান্ত ব্যবসায় করিয়া জগতে অতুল সম্পদ্ ও প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও তুলাশিল্প, এবং তুলার চাষ-সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ ছিল। অথচ অতি প্রাচীনকাল হইতে তুলাশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত ;—বেদেও তুলার উল্লেখ আছে,—মহেঞ্জোদারো খনন করিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পাঞ্জাব-অঞ্চলে তুলাশিল্পের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তুলাশিল্প-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ নগণ্য। এক্ষণে তুলা-শিল্প—যান্ত্রিক শিল্প, যন্ত্রে তুলার আঁশ ছাড়ানো হয়, যন্ত্রে সূতা প্রস্তুত করা হয়, এবং যন্ত্রেই বয়নকার্য্য চলে। কিন্তু নব-নব উদ্ভাবনার ফলে নব-নব উন্নত হইতে উন্নততর যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে যেরূপ সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করা যাইতেছে, ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করা যাইতেছে, সামান্য বাঁশের কাঠি ও লাঠিদ্বারা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর সূত্র ভারতে প্রস্তুত হইত, এবং তাহাতে উৎকৃষ্টতর বস্ত্র প্রস্তুত করা যাইত। ঢাকাই মস্‌লিন তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ইংরাজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ভারতের এই শিল্প নষ্ট করিয়া দেয়। এই শিল্প নষ্ট করিতে বৃটিশ সরকার যে-অত্যাচারে তাঁতীকুলকে নিপীড়িত করিয়াছিল, এবং যে-প্রকার বে-আইনী আইনের সাহায্য লইয়াছিল, তাহার ইতিহাস ইংরাজ-শাসনের এক প্রগাঢ় কলঙ্কের ইতিহাস। ভারতে ক্রমশঃ বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইয়া গেল, ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্র-শিল্পে জগতে প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের কলে তুলা যোগাইতে লাগিল প্রধানতঃ আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের তুলা ছিল গুণে হীন ও দামে সস্তা। কিন্তু ১৮৬২ সালে যখন আমেরিকায় গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল, তখন তুলার জন্য ইংলণ্ডের ভারতের উপরই নির্ভর করিতে হইল। তাহার পর তুলার বাজার চড়িল, আবার পড়িল। —এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। শেষে ইংরাজ ব্যতীত অনেক বিদেশী বণিক্ ভারতীয় তুলার খরিদ্দার হইল। বিশেষতঃ জাপান খরিদ্দার হইলে এদেশে তুলার রপ্তানি বিশেষ বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলেও বটে, এবং যুদ্ধের পরে কতক ভারত-বিভাগের জন্য, কতক বা খাদ্যশস্যের অভাবে ফসল-বাড়াও নীতির প্রচলনের জন্যও বটে,—দেশে তুলা-উৎপাদন কমিয়া গেল ; তুলার রপ্তানিও কমিয়া গেল, বয়নশিল্পেও বিশেষ আঘাত লাগিল।

পৃথিবী-খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি,—তুলার চাষের জন্য দরকার—(১) জলনিকাশী অথচ আর্দ্র, উর্ব্বরা মাটি ; এজন্য বালিমাটি তুলার পক্ষে ভাল নহে, কারণ উহার জল শুকাইয়া যায়। মাটির অল্প নীচে যদি অপ্রবেশ্য স্তর থাকে ও সেই স্তরে জল দাঁড়াইয়া

থাকে, তবে সেই মাটিই ভাল। সেইজন্য **ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল** কার্পাসচাষের বিশেষ উপযোগী।

(২) চাষের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় অল্প-অল্প বৃষ্টিপাত। একেবারে বেশী বৃষ্টি ভাল নহে, এবং দুইবারের বৃষ্টিপাতের মধ্যবর্ত্তী সময়ে উজ্জ্বল রৌদ্র হইলে ভাল হয়। জলসেচদ্বারা বৃষ্টির অভাব পূরণ করা যায়, এবং জলসেচদ্বারা ইচ্ছামত সময়ে ক্ষেতে জল দেওয়া যায় বলিয়া সেচের জমিতে ফসল ভাল হয়।

(৩) গাছের বৃদ্ধিকালে উত্তাপ চাই মধ্যম ধরণের, কম হইলে গাছ ভাল হয় না, বেশী হইলেও ফল ভাল হয় না। উত্তাপ হওয়া চাই পরিমিত, দিনেরাতে সমভাবাপন্ন। আর দরকার,—

(৪) সাতমাস তুষারপাতহীন দিন।

শীতের অবসানে তুলাচাষের প্রথম অবস্থা;—গ্রীষ্মকাল—জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর —মধ্য অবস্থা—ইহা বৃদ্ধির সময়;—শীতের প্রারম্ভে শেষ অবস্থা,—প্রথম তুষারপাতের পূর্ব্বেই তুলার চাষ শেষ হওয়া দরকার। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুলার চাষে ২০০ দিন লাগে। সুতরাং এমন সময়ে চাষ করা দরকার যে, এই ২০০ দিনের মধ্যে তুষারপাত না হয়, এবং এমন বীজ দরকার যে, এই ২০০ দিনে গাছের বীজবপন হইতে তুলা ভাঙ্গা পর্য্যন্ত সব কাজ শেষ হয়। তবে ভারতে তুষারপাতের হাঙ্গামা কম।

তুলার আঁশ।—পৃথিবী-খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় কোন্ দেশের তুলার আঁশ কত বড়, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের তুলার আঁশ নিকৃষ্ট—ইহার আঁশ ছোট। ভারতের দীর্ঘতন্তু তুলার ১ ই. লম্বা আঁশ আমেরিকা হইতে আনীত বীজ হইতে উৎপন্ন। পাঞ্জাবের ও সিন্ধুর তুলা এই শ্রেণীভুক্ত। পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ জমিতে আমেরিকীয় তুলা জন্মানো হয়। ইহার আঁশ ভাল, ও দামও ভাল, এবং চাহিদাও বেশী। সুরাট, কাম্বোডিয়া, ধারোয়ার প্রভৃতি স্থানের তুলার আঁশ $\frac{7}{8}$ই. হইতে ১ই. দীর্ঘ। ব্রোচ, বেরার, খান্দেশ, মধ্যভারত-অঞ্চলের, পাঞ্জাবের ও সিন্ধুর কতক অংশের, এবং যুক্তপ্রদেশ, সালেম প্রভৃতি স্থানের দৈর্ঘ্য $\frac{7}{8}$ই. হইতে অনূর্দ্ধ। কিন্তু এক্ষণে এই সকল স্থানের তুলার দৈর্ঘ্য উন্নত চাষের জন্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে ১৯৪৫-৪৬ সালে অবিভক্ত ভারতে মোট তুলার জমি ছিল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৮ হাজার একর। তন্মধ্যে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার একর ছিল ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, এবং ৩৩ লক্ষ ৮ হাজার একর ছিল পাকিস্তানের অন্তর্গত। সুতরাং সমগ্র তুলার জমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। তা'ছাড়া আমেরিকার বড় আঁশের তুলার জমি অধিকাংশ পাকিস্তানেই পড়িয়াছে।

অথচ অবিভক্ত ভারতের তুলার কলের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ পাকিস্তানে আছে।

সুতরাং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে তুলার অভাব হইতে থাকে। ১৯৩৭ সালে সমগ্র ভারতে তুলার কল ছিল ৪১৯।

ভারত-বিভাগের সময় ১৪টি তুলার কল পড়ে পাকিস্তানে। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে পড়ে ৯টি—পাঞ্জাবে ৪টি ও সিন্ধুতে ১টি। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে তুলা-ছাড়ানো কল ছিল ৩২২, তন্মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাবে ছিল—২৪৪টি।

এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিতরূপ তুলার চাষ ও তুলা উৎপাদন হইয়া থাকে। নিম্নের তিন বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, তুলার চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে :—

তুলার চাষ

	মোট জমি (সহস্র একর)	মোট উৎপাদন (সহস্র বেল, ১ বেল=৩৯২ পা.)
১৯৪৮—৪৯	১১,২৯৩	১,৭৬৭
১৯৪৯—৫০	১২,১৭৩	২,৬২৮
১৯৫০—৫১	১৩,৮৫৯	২,৯৩৬

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তুলার চাষ, ১৯৫০-৫১

রাষ্ট্র	চাষের জমি (সহস্র একর)	উৎপন্ন তুলা (সহস্র বেল, ১ বেল=৩৯২ পা.)
বোম্বাই	৩,০৭৮	৬৭৪
মধ্যপ্রদেশ	২,৭৭৬	৫১০
হায়দারাবাদ	২,৩৭৪	৩৩৮
মান্দ্রাজ	১,৬১৬	৩৩০
মধ্যভারত	১,৫৩১	২১১
সৌরাষ্ট্র	১,০৭৫	২১৬
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	৪৪১	১৯১
রাজস্থান	৩০২	১৫০
পে.প.সু	২৬৫	১৭৫
মহীশূর	১০৮	৩৩
উত্তর প্রদেশ	১০৫	৪৫
অন্যান্য	১৮৮	৫৩
	১৩,৮৫৯	২,৯২৬

উপরি-উক্ত 'অন্যান্য' প্রদেশের মধ্যে আছে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, আজমীর,

ভূপাল, দিল্লী, কচ্ছ, ত্রিপুরা ও বিন্ধ্যপ্রদেশ। কিন্তু ইহার ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের নাম নাই। অবিভক্ত বঙ্গে অতি-সামান্য তুলার চাষ হইত—পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও মৈমনসিংহ জেলায়। উহা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত।

পাকিস্তানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলার চাষ, ১৯৫০-৫১

রাষ্ট্র	তুলার জমি (সহস্র একর)	উৎপাদন (সহস্র বেল, ১ বেল=৪০০ পা.)
পশ্চিম-পাঞ্জাব	১,৬৫২	৫৫২
সিন্ধু	৮০৮	৩৩৫
বহব্বলপুর	৩৮৩	১৭৭
পূর্ব্ববঙ্গ	৫১	১৮
খয়েরপুর	৩৯	১৫
উঃ-পঃ সীঃ প্রঃ	৭	২
	২৯,৪০	১০,৯৯

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়—(১) মধ্যপশ্চিম দক্ষিণ-ভারতের **কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলই শ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন-স্থান,**—সমস্ত শ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন--স্থানগুলি এই স্থানে অবস্থিত। (২) ইহার পরে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, পে.প.স্থ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ লইয়া সিন্ধু-গাঙ্গেয় বালুকাপ্রধান পলিমাটির অঞ্চল ;—এখানে জমি উর্ব্বরা, কিন্তু জল শুষিয়া যায়। তাই জলসেচদ্বারা এ-অঞ্চলে তুলা উৎপাদন করা হয়। (৩) আর একটি অঞ্চল আছে দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণমৃত্তিকা-বহির্ভূত দক্ষিণ-মান্দ্রাজের **লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চলে** কইম্বাটুর, মাদুরা, তিনেভেলি, সালেম প্রভৃতি জেলায়।

ভারত-বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুলা-উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান ছিল দ্বিতীয় ; এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়ার পরে তৃতীয়, পাকিস্তানের স্থান ষষ্ঠ। নিম্নে ১৯৪৯-৫০ সালের পৃথিবীর উৎপাদন-তালিকা দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

পৃথিবীর তুলা-উৎপাদন, ১৯৩৯-৫০

(সহস্র বেল ; ১ বেল=৪৭৮ পা. হিসাবে)

দেশ	উৎপন্ন তুলা	দেশ	উৎপন্ন তুলা
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	১৫,৯৭০	৪। মিশর	১,৮০৫
২। রুশিয়া	২,৭০০	৫। ব্রাজিল	১,৩৮০
৩। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	২,৩০০	৬। পাকিস্তান	১,০২০
		৭। চীন	১,০০০

১৯৪৯-৫০ সালে সমগ্র পৃথিবীর ১/১৩ অংশ তুলা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, ১/৩০ অংশ তুলা পাকিস্তানে উৎপন্ন হইয়াছিল।
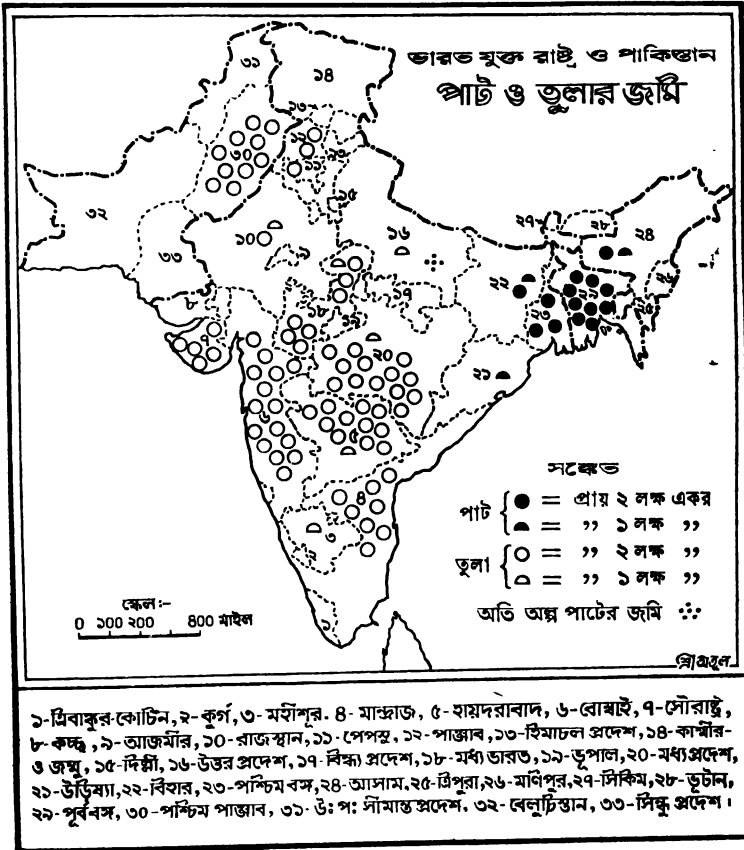
৩১নং চিত্র

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত-বিভাগের ফলে, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে তুলার কলের আধিক্যবশতঃ, ভারতে তুলার ও বিশেষভাবে লম্বা-আঁশের তুলার অভাব হইয়াছে, এবং পাকিস্তানে তাহার আধিক্য ঘটিয়াছে। ভারতের প্রায় ২০ লক্ষ মণ লম্বা আঁশ তুলার দরকার, কিন্তু তাহার ১২।১৩ লক্ষের বেশী এই তুলা নাই। সেজন্য ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে এখানকার লম্বা-আঁশ তুলার রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরে ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ব্যতীত অন্যত্র রপ্তানি বন্ধ হইয়া গেল ;—সেজন্য রপ্তানিক্ষেত্রেও সে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং আমদানির জন্য তাহাকে পরমুখাপেক্ষী, বিশেষতঃ পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী, হইতে হইয়াছে। ইহা

মনে রাখা দরকার, পূর্ব্বে পাকিস্তানের রপ্তানি-তুলার অঙ্ক ভারতের রপ্তানি-অঙ্কের বৃদ্ধি করিত ; এক্ষণে পাকিস্তান হইতে ভারতে রপ্তানি-অঙ্ক ভারতের আমদানি-অঙ্কের বৃদ্ধি করিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের তুলার, বিশেষতঃ ছোট-আঁশ তুলার, খুব বড় খরিদ্দার ছিল জাপান। সেজন্য তুলা-রপ্তানির বাজারে ভারতবর্ষের উচ্চ স্থান ছিল, এবং ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক তুলা রপ্তানি করা হইত। জাপান ছাড়া অন্য খরিদ্দারও ছিল। অন্য খরিদ্দার ক্রমান্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, ইতালী, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি। বোম্বাই, করাচী ও মান্দ্রাজ বন্দর দিয়া এই তুলা বিদেশে যাইত। কতক জাপানের সহিত চীনের তুলাঘটিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ বৃদ্ধির জন্য, কতক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য, ভারতের তুলা-রপ্তানি কমিয়া যায়, এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে স্বাভাবিক রপ্তানি কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায়। কিন্তু ইহার পরে রপ্তানি বাড়িয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে রপ্তানি-অঙ্ক স্বাভাবিক রপ্তানির দ্বিগুণ হয়।

১৯৪৯-৫০ সালের হিসাব অনুসারে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ লক্ষ বেল তুলা দরকার ছিল। কিন্তু গত বৎসরের অতিরিক্ত তুলা ও ঐ বৎসরের উৎপন্ন তুলা লইয়া মোট ৩৮ লক্ষ বেল তুলা মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং ৯ লক্ষ বেল তুলার আমদানি দরকার হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন নির্দ্দেশ অনুসারে ৮ লক্ষ বেলের বেশী তুলা আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তুলার দারুণ অভাব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট অবশেষে ১৪ লক্ষ বেল পর্য্যন্ত তুলা আমদানি করিতে সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪৯ সালের আগস্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে পাকিস্তান হইতে ৩ লক্ষ ২২ হাজার বেল তুলা ভারতে আসিয়াছিল।

১৯৪৯-৫০ সালে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ১৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার তুলা বিক্রয় করিয়াছে, ও ৬৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার তুলা কিনিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত রপ্তানি-তুলার দাম পাইয়াছে—১৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার এবং আমদানি-তুলার মূল্য দিয়াছে—১০০ কোটি টাকা। যে-ভারতবর্ষ তুলা-সম্বন্ধে উদ্বৃত্ত দেশ ছিল, তাহা এখন ঘাটতি দেশে পরিণত হইয়াছে।

১৯২১ সালে তুলার চাষের উন্নতিকল্পে ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি (Indian Central Cotton Committee) স্থাপিত হয়। এই কমিটি ও ইহার অঙ্গীভূত ল্যাবরেটরী, ভারতের তুলাচাষের উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য করিয়াছে। ভারত-বিভাগের পরে এখানে ভারতের তুলার নানা বিষয়ে অবনতি হইয়াছে, এজন্য এই কমিটি তুলার চাষের উন্নতিবিধানের জন্য নূতন উৎসাহে কাজ করিতেছে।

পাট (Jute)

পাট ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, একটি গৌরবের বস্তু। বিদেশ হইতে বিনা দ্বন্দ্বে, বিনা প্রতিযোগিতায়, অর্থ দেশে লইয়া আসিতে পাটের আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। গৃহবিচ্ছেদ ঘটিলে লক্ষ্মীর সংসারও নষ্ট হয়; বঙ্গচ্ছেদ ঘটাইয়া ঘরে-ঘরে যে-বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে পাটের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা বলা কঠিন। পাটের অধিক জমি এখন পূর্ব্ববঙ্গে, পাটের উৎকৃষ্ট জাতিও জন্মে পাকিস্তানি বঙ্গে, কিন্তু পাটের কল সমস্তই পশ্চিমবঙ্গে। ইহাতে পরস্পর-বিরোধী এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। আবার সমগ্র জগতে পাটের বাজারে পাট-বিক্রয়ের অধিকার ভারতের অনন্যসাধারণ বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট পাটের রপ্তানি-শুল্ক এরূপ বৃদ্ধি করিয়াছে যে, পাটের স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি পাটের প্রতীক সৃষ্টি করিয়া পাটকে বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা হয়, তাহা হইলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

পৃথিবী-খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় পাট-সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অন্তর্গত বঙ্গদেশ—পূর্ব্ব- ও পশ্চিম-বঙ্গ—একমাত্র পাট-উৎপাদক-স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সেখানে পাট-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের পাট-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তথাপি এই স্থানে কয়েকটি কথার পুনরুল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে :—

১। পাটের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা—উর্ব্বরা পলিমাটির জমি, চাষের সময়ে ৮০ ডি. ফা. উত্তাপ, প্রচুর বৃষ্টিপাত, এবং ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিবার জন্য সস্তা শ্রমিক। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাই শ্রেষ্ঠ পাট-উৎপাদন-স্থান।

২। প্রধান পাট-উৎপাদক স্টেট ;—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ।

৩। ভারত-বিভাগের ফলে সমগ্র ভারতের পাটের শতকরা ৭৫ ভাগ জন্মে পাকিস্তানে,—পূর্ব্ববঙ্গে, এবং ২৫ ভাগ জন্মে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে।

৪। গম, যব, চিনি প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য চালান দিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে যে-বস্তার দরকার তাহা পাটে নির্ম্মিত হয়। সেইজন্য পাটের এত চাহিদা, এত দেমাক। কিন্তু কতক ভারতবর্ষের প্রতি হিংসাবশে, ও কতক পাটের মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধিবশতঃ পাটের বদলে অন্য জিনিষ ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি কাগজের বস্তায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে সিমেণ্টের আমদানি হইতেছে।

ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পাটের চাষ।—১৯৪৫-৪৬ সালে

ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে ২৪ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইত। তন্মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার একর, পাকিস্তানে ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমি পড়িয়াছে; অর্থাৎ পাকিস্তানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৩ গুণ পাটের জমি পড়িয়াছে; ১৯৫০-৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পাটের জমি ১৪ লক্ষের বেশী হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি স্টেটে পাট হইতেছে—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও ত্রিপুরা। গত ছয় বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিতরূপ পাটের চাষ হইয়াছিল :—

পাটের চাষ

প্রদেশ	পাটের জমি সহস্র একর			উৎপন্ন পাট সহস্র বেল (১ বেল=৪০০ পাউণ্ড)		
	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
পশ্চিমবঙ্গ	৩৫০	৪৯৮	৬৫১	৯০৭	১,৪৫২	১,৪৯৬
বিহার	২১৮	৩৩১	৩৫৮	৪৫৭	৭২৩	৬৫৮
আসাম	২১৮	২৫৯	২৯২	৫৯৯	৭১৭	৪০৯
উড়িষ্যা	৩৬	৫১	১১০	৬৫	১৪৭	২৪২
ত্রিপুরা	১২	১৩	১৪	২৭	২৬	৩৮
উত্তরপ্রদেশ	×	১১	২৪	×	২৪	৪৯
মোট	৮৩৪	১,১৬৩	১,৪৪৯	২,০৫৫	৩,০৪৯	৩,২৯২

বর্ত্তমান বৎসরে পাটচাষের জমি বাড়িয়া ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর হইয়াছে ও সেই জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে। উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৪৬ লক্ষ ৭৮ হা. বেল হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ইহাতে পাটের জমি বাড়িয়াছে ১৯৫০-৫১ সালের জমির উপরে শতকরা ৩৩·৭ ভাগ, এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ৪১·৫ ভাগ। ভারতের পাটের প্রধান খরিদ্দার আমেরিকা। বাণিজ্যক্ষেত্রে আমেরিকা হইতে অধিক ডলার উপার্জ্জনের আশায় খাদ্যশস্যের জমিতে পাট চাষ করাইয়া উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাটের চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গে। কখনও-কখনও কিছু ব্যতিক্রম হইলেও পাটের একর প্রতি ফলনও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় পশ্চিমবঙ্গে। যেমন—

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পাটের ফলন

(একর প্রতি ফলন, পাউণ্ডে)

বৎসর	পঃ বঙ্গ	আসাম	ত্রিপুরা	উড়িষ্যা	বিহার	ভারত
১৯৪৬-৪৭	১,২৪৫	১,০১৯	১,০০০	৯৬৭	৬৯২	৯৮৩
১৯৪৮-৪৯	৯৬১	১,০২৬	৯৪৫	৪০০	১,১১৯	১০১৪
১৯৫০-৫১	১,০৯১	১,০৯৯	৯০০	৭৪৭	৯৮৮	১,০৩৫

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার বিবরণ হইতে দেখা যায় :—

(১) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধেক পাটের জমিতে অর্দ্ধেক পাট জন্মে পশ্চিমবঙ্গে।

(২) পাটের জমি ও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাকিস্তানে পাটের কল নাই, আর ভারতে কলের উপযুক্ত প্রচুর পাট নাই। সেজন্য ভারতে পাটের চাষ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে, এবং পাকিস্তানে কল বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

পাকিস্তানে পাট জন্মে একটি মাত্র স্থানে—পূর্ব্ববঙ্গে। এখানে ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে ৬৩ লক্ষ ৩২ হাজার বেল পাট জন্মিয়াছিল। তাহা হইলে পাকিস্তানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা জমি যেমন ৩ গুণ বেশী, পাট জন্মেও ৪½ গুণ বেশী।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১১২টি পাটের নানারকমের কল (রেজেষ্ট্রিকৃত কল ৫৪টি) আছে। চটকলে সপ্তাহে ৪২½ ঘণ্টা কাজ হইলে সর্ব্বসমেত ৫০ লক্ষ বেল, এবং ৪৮ ঘণ্টা কাজ হইলে সর্ব্বসমেত ৬২ লক্ষ বেল পাট দরকার হয় ;* অর্থাৎ ইহাদের জন্য প্রতি মাসে গড়ে ৫ লক্ষ বেল পাটের দরকার। কিন্তু এত পাট এখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে হয় না। ১৯৪৯-৫০ সালে হইয়াছিল ৩০ লক্ষ বেল, ১৯৫০-৫১ সালে ৩৩ লক্ষ বেল এবং ১৯৫১-৫২ সালের হিসাবে ৪৬ লক্ষ বেল। সুতরাং ভারত-বিভাগের ফলে ছয় মাসের কল চালাইবার তুলার অভাব ছিল, এখনও ৩ মাসের তুলার অভাব আছে। তাছাড়া জনসাধারণেরও প্রায় ৬০০ বেল পাটের দরকার। এই সমস্ত পাটের জন্যই ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী।

১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্তানের পাট-উৎপাদন এইরূপ,—**একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে ১২৫০ সহস্র একর জমিতে ৪৪৫২ বেল (প্রতি বেল=৪০০ পাউণ্ড) পাট জন্মিয়াছে।**

* যুগবাণী—৩১.৫.৫২

পাটের ব্যবসায়।—কাঁচা-পাট ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের বস্তু। ইহার রপ্তানি আছে, আমদানি নাই,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে অর্থ বিদেশে যায় না, কিন্তু বিদেশ হইতে অর্থ আসে। সুতরাং ভারত-বিভাগের পরে যখন পাকিস্তানে ভূতপূর্ব্ব অবিভক্ত ভারতের ৭৫ শতাংশ পাট উৎপন্ন হইতে লাগিল, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কলগুলিকে পাকিস্তানের পাটের উপর নির্ভর করিতে হইল, তখন ভারত-বিভাগের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসেই পাকিস্তান—৪০০ পাউণ্ডের প্রত্যেক কাঁচা বেলের উপরে ১৫৲ টাকা কর ধার্য্য করিল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রও ভারত হইতে পাকিস্তানে প্রেরিত কাঁচা-পাট ও পাটবস্তুর উপর রপ্তানি-শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। এইরূপ পরস্পরের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য পাটের বাজারে একটা বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিল। ইহার পরে ১৯৪৮ সালে ৩১শে মার্চ্চ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রচলিত মুদ্রামান হ্রাস করে, কিন্তু পাকিস্তান করিল না। ইহাতে পাকিস্তানের ১০০৲ টাকা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৪৲ টাকার সমান হইল। এরূপ মূল্যে পাট কিনিলে পাটের কল চলে না বলিয়া অবশেষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পাটের কলে পাকিস্তানের পাট খরিদ বন্ধ হইয়া গেল। পাকিস্তানের বিদেশে পাট-রপ্তানির সুবিধা ছিল না। সেজন্য সেখানে পাটের বাজার পড়িয়া গেল। ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সহিত চুক্তি হইলে এদেশে পাকিস্তান হইতে পাট-আমদানি বাড়িতে থাকে এবং এদেশ হইতে পাটদ্রব্য রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়।

এই পাট-যুদ্ধ হইতে ইহা সুনিশ্চিত হইল যে, পাট-সম্বন্ধে স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে পাটের কল চলিবে না। পাটের দামও যুদ্ধপূর্ব্ব মূল্য অপেক্ষা পাঁচ গুণ বাড়িল। সেজন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পাটের চাষ ও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। (পাটের চাষ শীর্ষক তালিকা দেখ)। কিন্তু পাটের ও ধানের জমি একই প্রকার বলিয়া পাটের চাষ কমিলে ধানের চাষ বাড়ে। ১৯৪৩ সালে বাঙ্গালাদেশে "পঞ্চাশের মন্বন্তর" হইলে বাঙ্গালা সরকারের আদেশে পাটের চাষ কমিয়া ধানের চাষ বাড়িল। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ হইতে বঙ্গদেশে পাটের মূল্যবৃদ্ধির জন্য আবার পাটের চাষ বাড়িতে লাগিল। এজন্য ১৯৪৯ সালে ধানের ও পাটের চাষের পরিমাণ সরকার কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইল।

রপ্তানি।—১৯৪৭-৪৮ সালে ২৬৫ হাজার টন পাট রপ্তানি করা হইয়াছিল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পাটের খরিদ্দার যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টাইনা, চিলি ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। পাটের চাষের উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় পাট কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও সেই কমিটি পাট-চাষের ও পাটের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে।

পাকিস্তানে পাটের ব্যবসায়।—পাট-বিদ্রোহের ফলে ১৯৪৯-৫০ সালে পাটের উৎপাদন কমিয়া ১,৫৫৯ হাজার একর জমিতে, এবং ৪০০ পা. ওজনের ৩৩·৩২ হাজার বেল পরিমাণে, নামে। পাকিস্তানের পাটের রপ্তানিও ভাল হয় নাই। কারণ একে ত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাটের বিবাদ চলিতেছেই, তাছাড়া অন্য-অন্য যে-সকল দেশে মুদ্রামান হ্রাস পাইয়াছে, তাহারাও সহজে যাহারা মুদ্রামান হ্রাস করে নাই সেই সকল দেশ হইতে পণ্য লইতে চাহে না।

পাটের অনুকল্প।—পাট ভারতের একচেটিয়া ব্যবসায়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে পাটের বস্তার আবশ্যকতা এত বেশী যে, পাট না কিনিলেও চলে না। আবার, ভারত-পাকিস্তানের বিবাদের ও মুদ্রামান-হ্রাসের ফলে পাটের মূল্য এমন বৃদ্ধি হইয়াছে যে, অন্য-অন্য দেশে পাটের স্থলে অন্য জিনিস ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। এক্ষণে অস্ট্রেলিয়া হইতে কার্পাস কাপড়ের থলিতে ময়দা আসে, এবং ইংলণ্ড ও হলণ্ড হইতে কাগজের বস্তায় সিমেণ্ট আসে। ভারতের বড় খরিদ্দার ডাণ্ডির কলে পাটের সঙ্গে অন্য আঁশ মিশাইবার চেষ্টা হইতেছে। জার্ম্মানিতে গাছের ছালের আঁশ দিয়া থলি তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে।

পাট-সমস্যা।—পাট-সমস্যা দূরীকরণের জন্য কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত :—

(১) পাটের ও খাদ্যশস্যের জমি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

(২) পাটের জন্য নূতন জমি বাহির করিয়া এমন পাটের চাষ বাড়াইতে হইবে, যাহাতে পাকিস্তানের উপর নির্ভর না করিতে হয়।

(৩) পাটের মূল্য, ও পাটশুল্ক কমাইয়া দিতে হইবে। নতুবা পাটের অনুকল্প বাহির হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে পাটের ব্যবসায় নষ্ট হইতে পারে।

শণ (Hemp)।—ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দুই রকমের শণ পাওয়া যায়—(১) ভাঙ্গশণ, ও (২) ফুলশণ। ভাঙ্গ শণের পাতা ও মুকুল শুকাইয়া ভাঙ্গ,—ডালে ও জটায় যে-আঠালো পদার্থ থাকে তাহা হইতে চরস,—এবং ফুলের জটা শুষ্ক করিয়া গাঁজা প্রস্তুত হয়। ভাঙ্গ ও ফুলশণের গাছ, পাটের মত জলে ভিজাইয়া উহার ছাল হইতে আঁশ বাহির করিতে হয়। মোটা দড়ি-দড়া ও সুতালী প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। পাটের দড়ির চেয়ে এই দড়ি শক্ত।

মান্দ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ফুলশণের চাষ হয়। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এই গাছ

জন্মে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে **বিমলি পাট** নামে এক প্রকার শণজাতীয় গাছ হইতে তন্তু পাওয়া যায়। ইহার তন্তু শক্ত ও উজ্জ্বল। এই সকল তন্তু হইতে ক্যাম্বিসও হয়।

চা (Tea)

পৃথিবী-খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় চা-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর যে-সব দেশে চা জন্মে, তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান সকলের উপরে; চা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রপ্তানি-পণ্য। ভারতের রপ্তানি-শুল্কের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পাটশুল্ক (১৯৫১-৫২ সালে মোটামুটি ৬৫·৫%), তাহার পরেই চা মোটামুটি ১১%, তাহার পরেই তুলা ও কার্পাসদ্রব্য—মোটামুটি ১০·৭%। আবার চা-রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম। সেজন্য পৃথিবী-খণ্ডের বিবরণের মধ্যে (১৬০ পৃষ্ঠা) ভারতের চা-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে।

চা-চাষের জন্য দরকার—প্রচুর বৃষ্টিপাত, বৃদ্ধিকালে প্রচুর উত্তাপ, ও উর্ব্বরা জলনিকাশী জমি। সাধারণতঃ ইহা মনে করা হয় যে, ভাল জমি না হইলে চা-এর চাষ
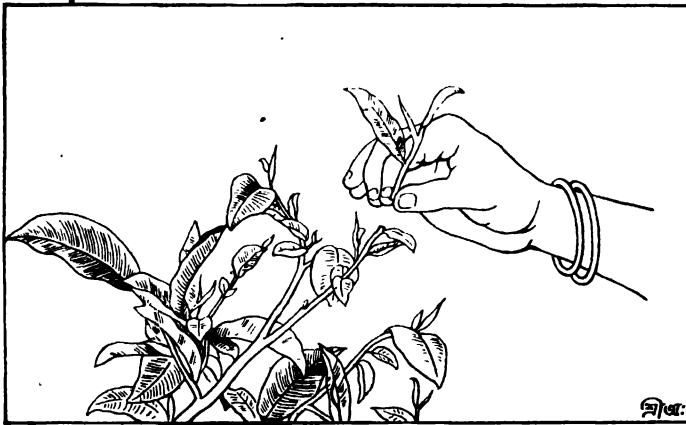
৩২নং চিত্র

চা-গাছ হইতে একটি কুঁড়ি ও দুইটি পাতা কাটিয়া লওয়া হইতেছে।

হয় না, তাই পর্ব্বতগাত্রই চা-চাষের উপযুক্ত স্থান। কিন্তু ১৮৫৬ সালে কাছাড়ে আপনা-আপনি সমতল ক্ষেত্রে চা জন্মে। তাহার পর হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। চা-গাছ হইতে তাহার একটি কুঁড়ি ও দুইটি কচি পাতা মাত্র কাটিয়া লওয়া হয়। আমরা যে চা ব্যবহার করি তাহা চা-এর গাছের ঐটুকু মাত্র অংশ।

চা-শিল্পের ক্রমিক ইতিহাস। চা ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কৃত হয় আসামে। তখন ইহা ছিল স্বচ্ছন্দবনজাত। তাহার পরে ১৮৩৩ সালে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক একটি সমিতি স্থাপিত করেন। এই সমিতির চেষ্টায় লখিমপুরে প্রথম চা-এর বাগান আরম্ভ হয়, এবং ১৮৩৮ সালে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে ৩৫০ পাউণ্ড চা প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পরে ভারতে উত্তর-পূর্ব্ব, উত্তর- ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে নানাস্থানে চা-এর চাষ হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে চা-এর চাষের যে কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তাহা নিম্নের হিসাব দেখিলে বুঝা যাইবে :—

পঞ্চবার্ষিক	চাষের জমি (সহস্র একর)	উৎপন্ন চা (লক্ষ পাউণ্ড)
১৯০০-১৯০৪	৫২৩	২০১
১৯০৫-১৯০৯	৫০৯	২৪২
১৯১০-১৯১৪	৫৯১	২৯০
১৯১৫-১৯১৯	৬৬২	৩৭৪
১৯২০-১৯২৪	৭০৯	৩৩৬
১৯২৫-১৯২৯	৭৫৭	৩৯৭
১৯৩০-১৯৩৪	৮২৬	৪০০
১৯৩৫-১৯৩৯	৮৪১	৪২৪
১৯৪০-১৯৪৫	৮৪১	৫২০
ইহার পরে—		
১৯৪৬	৮৪১	৫৯০
১৯৪৭	৮৪২	৬০০

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমিতে চা-এর বাগান ছিল। ইহার মধ্যে ভারত-বিভাগের ফলে ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার একর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও অবশিষ্টাংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে।

বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় চায়ের চাহিদার ক্রমশঃ বৃদ্ধির জন্যই ভারতীয় চায়ের এত উন্নতি।

ভারত-বিভাগ।—ভারত-বিভাগের পরে এক্ষণে নিম্নলিখিত স্থানে ভারতের ৬,০৪২টি চা-এর বাগান রহিয়াছে।

আসামে—ব্রহ্মপুত্রের দুইপার্শ্বে ও কাছাড় জেলায়। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা-এর জমি আসামেই আছে। ভারতের মোট চা-এর অর্দ্ধেক এখানে জন্মে।

প. বঙ্গদেশে—দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। দার্জ্জিলিং জেলায় পর্ব্বত-গাত্রে ১,০০০ হইতে ৬,০০০ ফিটের মধ্যে চা-এর চাষ হয়। ভারতের উৎপন্ন চায়ের কিঞ্চিদধিক ২৫ শতাংশ এখানে জন্মে।

উত্তর-ভারতে—রাঁচিতে, ডেরাডুনে, ও কাংরা উপত্যকায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে—ত্রিবাঙ্কুর স্টেটে, নীলগিরি পর্ব্বতে এবং দক্ষিণ-ভারতের অন্য স্থলে।

পাকিস্তানে—কেবল **শ্রীহট্ট** ও **চট্টগ্রাম** জেলায় ৭৬,৭০০ একর জমিতে ১৩০টি চা-এর বাগান আছে।

পাকিস্তানে ১৯৫০-৫১ সালে চা-এর উৎপাদন এইরূপ,—

পাকিস্তানে চা (১৯৫০-৫১)

স্টেট	জমি (সহস্র একর)		উৎপাদন (সহস্র টন)	
	রবি চা	খারিফ চা	রবি চা	খারিফ চা
পূর্ব্ববঙ্গ	৩৮০৩৮	৩৭০৩৭	২১,১১২	১৬৭৪৪

চা-এর ব্যবহার। ১৯০৩ সালে চায়ের প্রচলন বাড়াইবার জন্যই 'ভারতীয় চা-কর সমিতি' (Indian Tea Cess Committee) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ১৯৩৭ সাল হইতে বর্ত্তমান 'চা-এর বাজার প্রবর্দ্ধন বোর্ড' (Tea Market Expansion Board) নামে পরিচিত হয়। পরে ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় চা-বোর্ড গঠিত হইলে (Central Tea Board) উপরি-উক্ত চা-এর বাজার প্রবর্দ্ধন বোর্ড তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। এখন ইহারাই চা-এর প্রচলন বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছে। এই প্রবর্দ্ধন বোর্ডের মতে ভারতবর্ষে চা-এর ব্যবহার নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছিল—

১৯৩০-৩১ সালে	৩৮০	লক্ষ পাউণ্ড
১৯৩৫-৩৬ "	৭০০	" "
১৯৪০-৪১ "	১,১৫৫	" "

এই দশ বছরের গড় হিসাব করিলে প্রতি বৎসরে ৭৯৭ লক্ষ পাউণ্ড চা ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ১,৪০০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ মোট উৎপাদনের সিকি অংশ ভারতে ব্যবহৃত হয়, ও অবশিষ্ট রপ্তানি করা হয়। ভারতীয় চায়ের ৭০ হইতে ৮০ শতাংশ রপ্তানি হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র আরও রপ্তানি করিতে পারে।

পৃথিবী-খণ্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে মাথা পিছু চায়ের ব্যবহার বেশী। সর্ব্বাপেক্ষা মাথা পিছু বেশী চা ব্যবহৃত হয়

অস্ট্রেলিয়ায় ১১ পাঃ—তাহার পরে গ্রেটবৃটেনে, ৮ পাঃ। ভারতবর্ষে মাথা পিছু ½ পাউণ্ডেরও কম।

চা-এর ব্যবসায় ও বাজার।—চায়ের বাগান হইতে চা কলিকাতায় আসিলে চা পরীক্ষা করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হয়, এবং সেই চা নিলামের দ্বারা ব্যবসায়িগণকে বিক্রয় করা হয়। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের চা পৃথিবীর নানা জায়গায় বিক্রয় করেন।

১৯৩৩ সালে চা-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯৩২-৩৩ সালে চায়ের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা নামিয়া যায়। ঐ বৎসর কলিকাতায় নিলামের বাজারে চায়ের দাম নামিয়া ৫·৮১ পেন্স হয়। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে ছিল ১ শি. ০·৭৫ পে.। ইহাতে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল, এবং ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল ভারতবর্ষ, জাভা ও সিংহলের মধ্যে একটি চা-সম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি (International Tea Agreement) হইল। এই চুক্তিবশে চা-এর রপ্তানি-পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থির হয়, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে প্রত্যেক দেশের ১৯২৯, ১৯৩০, ও ১৯৩১—এই তিন বৎসরের মধ্যে যে-বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চা রপ্তানি হইয়াছে, সেই বৎসরকে মূল অর্থাৎ প্রমাণ রপ্তানি (standard export) বৎসর ধরিয়া তাহার রপ্তানির উপরে বৎসরে-বৎসরে রপ্তানি পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। ভারতবর্ষ ১৯২৯ সালকেই প্রমাণ বৎসর (standard year) ধরিল। চুক্তির পর বৎসরে ভারতবর্ষ প্রমাণ রপ্তানির ৮৫ শতাংশ রপ্তানির অধিকার পাইল। ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষ ৩৮২,৫৯৪,৭৭৯ পা. চা রপ্তানি করিয়াছিল। সুতরাং ১৯৩৪ সালে তাহার চা-রপ্তানির পরিমাণ হইল ৩২৫,২০৫,৫৬২ পা.। ইহাও স্থির হইল, প্রত্যেক দেশের রপ্তানির জন্য যে আনুপাতিক অংশ নির্দ্ধারিত হইবে, ঐ দেশ উহার অধিক চা রপ্তানি করিতে পারিবে না, কিংবা কোন নূতন বাগান করিতে বা পুরাতন বাগানের বিস্তার করিতে পারিবে না। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য 'ভারতীয় চা-রপ্তানি অনুমোদন কমিটি' (Indian Tea Licensing Committee) গঠিত হয়। প্রথমে ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের জন্য এই নিয়ম হইয়াছিল। পরে ইহার মেয়াদ পুনরায় ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত, এবং পরে ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার পরে আবার নূতন চুক্তি হইয়াছে।

ভারতীয় চায়ের বাণিজ্যের কেন্দ্র—লণ্ডন শহর। লণ্ডনে ভারতবর্ষ হইতে চা-এর চালান পৌঁছিলে, তাহার কিছু অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর ও বাহিরে নানা স্থানে রপ্তানি করা হয়।

কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সোজাসুজি চা রপ্তানি করা হয়—অস্ট্রেলিয়া,

নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, দ. আমেরিকা, সুদূরপ্রাচ্য, স্ট্রেট্স্ সেটেলমেন্ট, বাটুম, পারস্য উপসাগর, লেভাণ্ট, মিশর, দ. আফ্রিকা, ইউরোপের অনেক স্থান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই সকল ব্যবস্থার কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। যদিও ভারতের ব্যবহারের চা-এর নিলাম কলিকাতাতেই হইত, কিন্তু যুক্তরাজ্যে চায়ের ব্যবসায় সেখানকার গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন হয়, এবং সেখান হইতে অন্যস্থানে পুনরায়
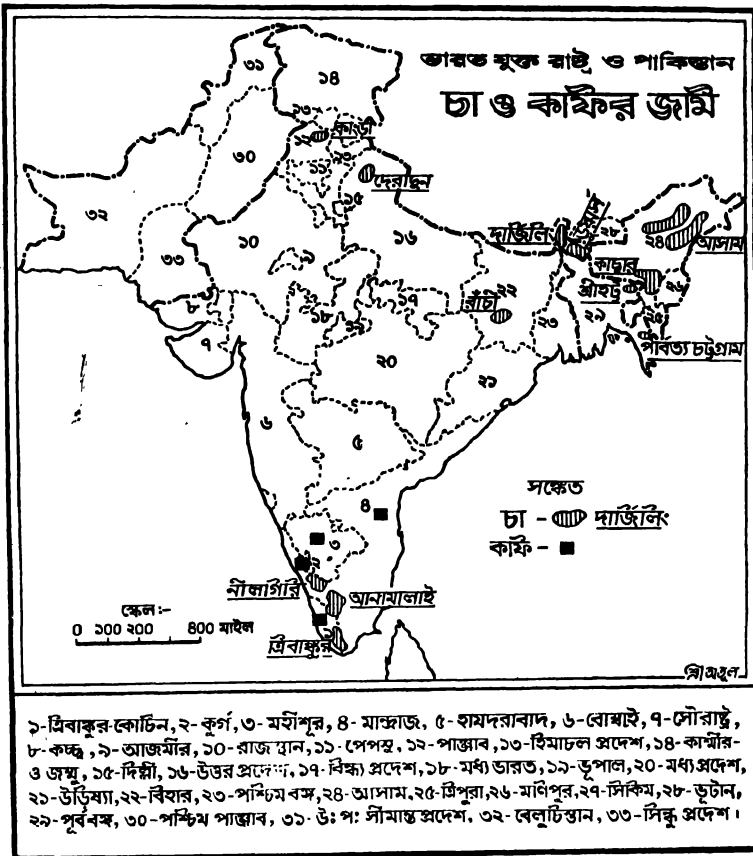
৩৩নং চিত্র

রপ্তানি করা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে চা পাঠানোর ভার ভারতের উপরই পরে। এজন্য ভারতের রপ্তানি-হার স্বাভাবিক হারের অপেক্ষা বেশী হইতে থাকে, এবং আবশ্যকমত কম-বেশীও হইতে থাকে। ১৯৩৫-৩৬ সালে রপ্তানির পরিমাণ স্থির হয়,—নির্দ্দিষ্ট রপ্তানির মান (Standard Export)এর ৮২½ শতাংশ, ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯২½ শতাংশ, ১৯৩৯-৪০ সালে ৯০ শতাংশ ;—

১৯৪০ অক্টোবরে ৯২·৫ শতাংশ,—১৯৪১-৪২ সালে ১১০ শতাংশ,—১৯৪৯ সালে ১১৭·৩ শতাংশ; ইহার পরে, ১৯৪৯-৫০ সালে ১২৫ শতাংশ পর্য্যন্ত উঠে। ইহার জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯-৫০ সালে ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ পা. চা রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৪৭ সাল হইতে উত্তর-ভারতের চা-এর পুনরায় কলিকাতায় নিলাম আরম্ভ হয়; এবং ভারতের জন্য কোচিনে নিলাম হয়।

কোন-এক বৎসরের পৃথিবীর চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি প্রভৃতি আলোচনা করিলেই ভারতের চায়ের ব্যবসায়ের গুরুত্ব অনুভব করা যাইবে। ১৯৪৮ সালে পৃথিবীতে চা উৎপন্ন হয় ৯৭ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড :—তন্মধ্যে ভারতে উৎপন্ন হয় ৫৬ কোটি ৯২ লক্ষ পা, এবং ইহার মধ্যে ভারত রপ্তানি করে ৩৭ কোটি ৬৪ লক্ষ পাউণ্ড; ইহার ২৯ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি করা হয় গ্রেট বৃটেনে।

১৯৪৯-৫০ সালে ৭২ কোটি৪ ৩ লক্ষ, এবং ১৯৫০-৫১ সালে ৭৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকার চা রপ্তানি করা হইয়াছিল। চা-এর ব্যবসায় যে ভারতের পক্ষে কতদূর অর্থপ্রসূ তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

আমদানি।—পাট যেমন এদেশ হইতে রপ্তানি করাই হয়, তাহার আমদানি নাই, চা কিন্তু সেরূপ নহে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চা-উৎপাদক স্থান হইলেও বিদেশ হইতে ভারতে চা আমদানি হয়। এই সকল চা বিশেষ গুণের জন্য আদৃত—ইহার বিশিষ্ট স্বাদের জন্য বিশেষ-বিশেষ দেশের লোকে উহা পছন্দ করে, এবং উহার কতক অংশ সীমার অপর পার্শ্বস্থ দেশে রপ্তানি করা হয়। এই সকল চায়ের মধ্যে হরিৎ চা-ই প্রধান। অন্য চা—কৃষ্ণ চা (Black tea) ও ইস্টক চা (Brick tea). ১৯৪৯-৫০ সালে এক লক্ষ ১২ হাজার ও ১৯৫০-৫১ সালে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার চা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হইয়াছিল।

কফি (Coffee)

১৮৩০ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কফির আবাদ হয় নাই।—ঐ বৎসরে মহীশূরের অন্তর্গত কাডুর জেলার মধ্যবর্ত্তী চিকমগালুরে প্রথম কফির আবাদ আরম্ভ হয়। ১৮৫৬ সালে নীলগিরিতে কফির অনেক আবাদ হয়। ১৮৬২ সালে কফির আবাদ বিশেষ প্রসারতা লাভ করে। কিন্তু ১৮৬৫ সাল হইতে দশ-বার বৎসর পোকায় কফির পাতা নষ্ট করিয়া কফি-চাষের বিস্তর ক্ষতি করে। কিন্তু সিংহলে যেমন পোকার অত্যাচারে কফির চাষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল ভারতে তাহা হয় নাই।

ভারতবর্ষে কফি দক্ষিণ-ভারতের চাষ—দক্ষিণ-ভারতের **পার্ব্বত্য-অঞ্চলের এক হাজার হইতে ছয় হাজার ফিট পর্য্যন্ত** কফির চাষ হয়। জলনিকাশী উর্ব্বর লৌহ-মিশ্রিত জমি, আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু, গরম বাতাস হইতে চারাগুলিকে রক্ষার জন্য ছায়াময় পরিবেশ প্রভৃতি কফিগাছের জন্য দরকার। পৃথিবী-খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় কফি-চাষের উপযোগী অবস্থা-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর, মান্দ্রাজ, কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন কফিচাষের কেন্দ্রভূমি। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত ঢালু অংশ কফিচাষের প্রধান স্থান। মহীশূরে—কাডুর, হাসান ও মহীশূর জেলা এবং মান্দ্রাজে—সালেম, মাদুরা, মালাবার, কইম্বাটুর, তিনেভেলি জেলাই প্রধান কফি-উৎপাদন স্থান।

নানা জাতির কফিগাছ আছে। কিন্তু ভারতে দুই জাতির কফি গাছই প্রধান,—আরবীয় ও রোবাস্তীয়। আরবীয় কফি অল্প জলেও জন্মে। সেজন্য পর্ব্বতের বৃষ্টিবিরল উচ্চ অংশে ইহা জন্মে;—আর পর্ব্বতের বৃষ্টিবহুল নিম্নভাগে জন্মে নিকৃষ্ট রোবস্তা কফি। আরবীয় কফিই উৎকৃষ্ট ও অধিক জন্মে। নিম্নের পাঁচ বৎসরের হিসাব হইতে কোন্ কফি-চাষের জমি কত, এবং উৎপাদন-পরিমাণই বা কত তাহা জানা যাইবে :—

সাল	আরবীয়		রোবাস্তীয়		মোট	
	চাষের জমি সহস্র একর	উৎপাদন সহস্র টন	চাষের জমি সহস্র একর	উৎপাদন সহস্র টন	চাষের জমি সহস্র একর	উৎপাদন সহস্র টন
১৯৪৪-৪৫	১৬০	১৩	৪০	৩	২০০	১৬
১৯৪৫-৪৬	১৬৪	১৯	৪৬	৬	২১০	২৫
১৯৪৬-৪৭	১৬৭	১২	৪৯	৩	২১৬	১৫
১৯৪৭-৪৮	১৬৬	৬	৫২	৮	২১৮	১৪
১৯৪৮-৪৯	১৬৬	১৮	৫৪	৩	২২০	২১

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ২৭,৩৫২ কফিক্ষেত্র আছে। এই সকল কফিক্ষেত্রের আয়তন ৫ হইতে ২৫ একর। ৫ একর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আয়তনের কফিক্ষেত্র ত্রিবাঙ্কুরে আছে। এই সকল ছোট-ছোট কফিক্ষেত্রের চাষের উন্নতি, ফসলের শ্রেণীবিভাগ ও বাজারে দরনির্ণয় প্রভৃতির জন্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বর্ষাকালেই কফির চারা রোপণ করিতে হয়। বর্ষার বর্ষণোম্মুখ দিনে চারা তুলিয়া পোতাই ভাল—কারণ চারাগাছ রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। জমিতে

লম্বা-লম্বা আইল বাঁধিয়া তাহার উপর চারা পুঁতিতে হয়, ও দুই আইলের মধ্যস্থ নালীতে সেচের জল দিতে হয়। ফল অক্টোবর মাসেই পাকে। অক্টোবর হইতে জানুয়ারির মধ্যে ফল তুলিয়া তাহা হইতে কফি প্রস্তুত করা হয়।

ফলন।—মোটামুটি একর প্রতি ৩½ হন্দর কফি হইয়া থাকে। কিন্তু জমি ও জলবায়ু প্রভৃতির অবস্থা ভাল হইলে একর প্রতি ১২ হন্দর কফিও পাওয়া যায়।

পৃথিবী ও ভারতবর্ষ।—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কফি-রপ্তানিকারক দেশ—ব্রাজিল, তারপরে (১৯৪৫-৪৬) গোয়াতেমালা, সালভেডর, মেক্সিকো প্রভৃতি। ভারতবর্ষ হইতে ঐ সালে যত কফি রপ্তানি হইয়াছিল তাহা ব্রাজিলের ১/১৮ ভাগ মাত্র। কিন্তু মহীশূরের কোন-কোন আবাদের কফি পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কথিত আছে আরবের অন্তর্গত ইয়েমেন প্রদেশের মোকা বন্দর হইতে প্রেরিত মোকা কফির সুনাম অত্যন্ত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার অধিকাংশ মাঙ্গালোর তেলিচেরি বন্দর হইতে লোহিত সমুদ্রের বন্দরসমূহে প্রেরিত কফি-ফল হইতে প্রাপ্ত কফি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কফির রপ্তানি।—কফির কতকাংশ খোসাশুদ্ধ ইউরোপে প্রেরিত হয়। আবার মহীশূর, কুর্গ, নীলগিরি, সেভারয় পাহাড় প্রভৃতি হইতে কফির ফল মাঙ্গালোর, তেলিচেরি, কালিকট্ট, কইম্বাটুর প্রভৃতির কফির কারখানায় প্রেরিত হয়, এবং সেখান হইতে কফিরূপে পরিণত হইলে বিদেশে প্রেরিত হয়। রপ্তানির কফি দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) চেরিকফি—ইহা এদেশীয় লোকের বাগান হইতে সংগৃহীত কফি; (২) আবাদী কফি—ইহা বিদেশী লোকের বাগানের কফি। কোচিন, মাঙ্গালোর ও কালিকট্ট ইহার রপ্তানি বন্দর। ইংরাজ ভারতীয় কফির সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার; অন্য খরিদ্দার—নরওয়ে, বেলজিয়াম, ইরাক, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

কফি সেস্ এ্যাক্ট—১৯৩৫।—এই আইনবলে জলে ও স্থলে ভারতবর্ষের বাহিরে যে-কফি প্রেরিত হইতেছে তাহার প্রতি হন্দরে অনধিক ১৲ এক টাকা কর আদায় হইতেছে ও ভারতীয় সেস্ কমিটি নামে গঠিত একটি কমিটির হস্তে উহা প্রদত্ত হইতেছে। ভারতীয় কফির স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবহার বাড়াইবার জন্য,—কফির চাষের ও ফলনের উন্নতি, কফির উন্নতি বিষয়ে গবেষণা, এবং কফি-শিল্পের নানাবিষয়িণী উন্নতির জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হয়। **কফি-প্রচার সমিতি** (Coffee-Expansion Board) এই পরিকল্পনারই অন্তর্গত।

মশলা (Spices)

ভারতবর্ষ হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে ১৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার, এবং ১৯৫০-৫১ সালের ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার মশলা রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে বিদেশ হইতে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকার, এবং ১৯৫০-৫১ সালে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার মশলা এদেশে আসিয়াছিল। ভারতের প্রধান-প্রধান মশলার বিষয় কথঞ্চিৎ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

১। **লবঙ্গ** (Cloves).—পৃথিবীর ৮০ শতাংশ লবঙ্গ জাঞ্জিবর ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহার উৎপাদন নিতান্ত কম। ত্রিবাঙ্কুর ও নীলগিরি অঞ্চলে অল্প লবঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং সামান্য অংশ ব্রহ্মদেশে রপ্তানি করা হয়।

২। **এলাচি** (Cardamom).—দক্ষিণ-ভারতের মান্দ্রাজ, মহীশূর, কুর্গ ও ত্রিবাঙ্কুরে জন্মে।

৩। **গোলমরিচ** (Black pepper).—পশ্চিমঘাটের সানুদেশে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজে অল্প গোলমরিচ উৎপন্ন হয়, এবং সামান্য মাত্র রপ্তানি করা হয়। প্রায় ২২ হাজার টন প্রতি বৎসর জন্মে।

৪। **দারুচিনি** (Cinnamon).—ইহাও দক্ষিণ-ভারতে জন্মে এবং সেখানকার ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও দক্ষিণ-মান্দ্রাজ প্রধান উৎপাদন-স্থল।

৫। **জিরা** (Cummin).—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ব্যতীত সর্ব্বত্র ইহা অল্পাধিক জন্মে। যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। জব্বলপুর ও গুজরাটে ইহার কেনাবেচা হয়।

৬। **লঙ্কা** (Chillies).—লঙ্কা-উৎপাদন স্থান পশ্চিম-বঙ্গদেশ, বিহার, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই। এক্ষণে অল্প অংশ মাত্র রপ্তানি করা হয়।

৭। **ধনিয়া** (Coriander).—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্ব্বত্র বিভিন্ন সময়ে অন্য শস্যের সহিত মিশাইয়া ধনের চাষ করা হয়। ইহারও কিছু অংশ রপ্তানি করা হয়।

৮। **আদা** (Ginger).—পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ইহার প্রধান উৎপাদন-স্থান। ইহারও কিছু অংশ বিদেশে যায়।

৯। **যোয়ান** (Ajawan).—বাঙ্গালাদেশে ইহা বেশী জন্মিলেও ভারতের সর্ব্বত্র ইহা উৎপন্ন হয়।

১০। **মৌরি** (Fennel).—উৎপন্নস্থান—উত্তরভারত ;—বিক্রয়স্থান—বঙ্গদেশ ও বোম্বাই ; এবং ক্রেতা—সিংহল।

রবার (Rubber) ও রবারশিল্প

পৃথিবী-খণ্ডের ২৩৭-৪৪ পৃষ্ঠায় রবার-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে কেবল ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য-সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃ. ২৪২ পৃ.) নিরক্ষীয় অঞ্চলই রবার-বৃক্ষের বাসস্থান,—এবং ইহার উৎপাদনের জন্য দরকার প্রচুর উত্তাপ (৮০° ফা.) ও বৃষ্টিপাত (৮০ ই.)। এই জন্য দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিবহুল স্থানে রবারের আবাদ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি (পৃ. ২৩৯ পৃ.), ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের কিউ বাগানে রবারের চারা করিয়া উহা এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত সিংহল দ্বীপে পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয় ; এবং পরীক্ষার ফল আশাতিরিক্ত শুভ হয়। এক্ষণে এই সিংহল-মালয়-ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাদী রবার-অঞ্চল (পৃথিবীখণ্ডের ৮৬নং চিত্র দেখ)।

দক্ষিণ-ভারতের সহিত সিংহলের জলবায়ুর ও জমির কিছু সাদৃশ্য আছে। সেজন্য সিংহল হইতে ভারতবর্ষে রবারের চাষ ছড়াইয়া পড়ে। এক্ষণে দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাষ্ট্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান রবার-উৎপাদন-স্থান (পৃথিবী খণ্ড—৮৬নং চিত্র)। অন্য বড় উৎপাদন-স্থান মান্দ্রাজের সালেম জেলায় সেভারয় পর্ব্বতমালার সানুদেশ। অন্যস্থান—মহীশূর, কুর্গ, ও আসাম। কেবল তাহাই নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে রবারের চাষ আরম্ভ হয় এবং ১৯০৩-৪ সালে প্রথম রপ্তানি আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু ১৯৩৯ সালে ভারত সাম্রাজ্যে ১৬,৫০০ টন উৎপন্ন রবারের এক-তৃতীয়াংশও ভারতে রবার দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য দরকার হইত না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষ হইতে রবার দ্রব্যের রপ্তানি-মূল্য ১৯০৪ সালে ছিল ২৭ হাজার টাকা। যুদ্ধের চাহিদা ও রবারশিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য চাষের জমির পরিমাণও বাড়িয়া যায়। তাহার পর

১৯৪৫ সালে,	৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।	১৯৪৮ সালে,	১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা
১৯৪৬ „	১৭ লক্ষ ৬৫ „ „	১৯৪৯ „	৭ „ ১৯ „ „
১৯৪৭ „	১৮ „ ৬৮ „ „	১৯৫০ „	১২ „ ৯৩ „ „

১৯৩৮ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫শত একর জমিতে রবারের চাষ হইত। কিন্তু ইহার পরে যুদ্ধকালে রবারের আমদানি কমিয়া গেলে রবার-চাষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ হা. ৮ শত আবাদে ১ লক্ষ

৬৭ হাজার ৮ শত একর জমিতে রবারের চাষ হইতেছে। ইহার মধ্যে

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে	শতকরা	৮১'২৪ অংশ	আন্দামানে	শতকরা	'৩৪ অংশ
মান্দ্রাজে	„	১৬'৫৫ „	মহীশূরে	„	'৩৩ „
কুর্গে	„	১'৫১ „	আসামে	„	'০৩ „

এই সকল আবাদের কোন-কোনটি এক একর অপেক্ষাও কম। এক হইতে ১০ একর আবাদই বেশী। আবার ১০০ একর অপেক্ষাও বিস্তৃত আবাদ আছে। পূর্ব্বে অধিকাংশ আবাদই ইউরোপীয়দিগের সম্পত্তি ছিল। এক্ষণে সমস্ত রবার-চাষই এদেশীয়দিগের সম্পত্তি হইয়াছে।

উৎপাদন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একর-প্রতি রবারের উৎপাদন **সন্তোষজনক নহে**। সিংহলে একর-প্রতি উৎপাদন ৩৫০ পা.। কিন্তু ভারতে কচিৎ ৩০০ পাউণ্ড হইয়া থাকে। সেই জন্য উৎপাদন-হিসাবে ইহার স্থান বহু নিম্নে; ১৯৪৮ সালে ইহার **স্থান** ছিল;—১। মালয়, ২। ইন্দোনেশিয়া, ৩। থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), ৪। সিংহল, ৫। ইন্দোচীন, ৬। সারাওয়াফ, ৭। লাইবেরিয়া, ৮। উত্তর বোর্ণিও, ৯। ব্রাজিলের পরে **দশম**,—১৯৪৯ সালে ১। মালয়, ২। ইন্দোনেশিয়া, ৩। সিংহল, ও ৪। ইন্দোচীনের পরে ইহার স্থান ছিল **পঞ্চম**।

চাষীরা বলে—শ্রেষ্ঠ রবার-উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে এদেশের জমি রবার-উৎপাদনের পক্ষে নিকৃষ্ট, এবং জলবায়ু কম উপযোগী। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের মতে নিকৃষ্ট জলবায়ু এদেশে রবার উৎপাদনের হীনতার কিছু কারণ হইলেও রবারের প্রাচীন চাষপ্রথা অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকাই হীনতার প্রধান কারণ।

মোটামুটি হিসাব ধরিলে ভারতে ১,৬০০ টন (বড় টন) রবার উৎপন্ন হয়। ১৯৪৮ সালে ভারতের রবার-উৎপাদন ছিল ১৫,৫৮৭ বড় টন। ১৯৫০-৫১ সালে যে-রবার আমদানি করা হয়, তাহার মূল্য ছিল ৩ কোটি টাকা, এবং যে-রবার রপ্তানি করা হয় তাহার মূল্য মাত্র ১৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে যে-পরিমাণে রবারশিল্পের ক্রমোন্নতি হইতেছে, তাহাতে এখনও ভারতে উৎপন্ন রবারে দেশের শিল্পের অভাব পূর্ণ হয় না। তজ্জন্য দেশের উৎপাদন-পরিমাণ শীঘ্রই বাড়াইতে হইবে। নতুবা আমদানি-করা রবারে অভাব মিটাইতে হইবে। ভারতে এখন ডানলপ কোং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রবারদ্রব্য-প্রস্তুতকারী। মোটর গাড়ীর চাকা, নল, সাইকেলের টিউব প্রভৃতি এখানেই প্রস্তুত হইতেছে।

রপ্তানি-স্থান। ভারতের রবারের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা—ইংলণ্ড, তাহার পরে আমেরিকা, জার্ম্মান, ইতালী প্রভৃতি।

রবার-চাষের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা।—রবারশিল্পের উন্নতির ফলে, যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট রবার-চাষের উন্নতিকল্পে এক কমিটি গঠিত করেন। তাঁহারা নানা বিষয়ে উপদেশ দান করেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালে রবারশিল্পের উন্নতি, রবার-আমদানি-ও-রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ, রবারের মূল্য-নির্দ্ধারণ, রবার--চাষের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এক ইণ্ডিয়া-রবার-বোর্ড স্থাপিত হয়। ইহার পরে ১৯৪৯ সালে রবার-বোর্ডের মধ্যে শ্রমিকদিগের প্রতিনিধি-গ্রহণের জন্য এক রবার-বোর্ড-সংশোধন আইন হয়।

ভারতে রবার-আবাদের ভবিষ্যৎ।—ভারতে যেরূপভাবে রবারশিল্প বৃদ্ধি পাইতেছে, তদনুযায়ী রবার উৎপন্ন হইতেছে না। সুতরাং তজ্জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইতেছে। যদি পরের উপব রবারের জন্য নির্ভর নাও করিতে হয়, এবং রবারশিল্পের জন্য রবাব আমদানি নাও করিতে হয, তথাপি দ্বিতীয় প্রশ্ন দাঁড়াইবে—অন্য দেশের সহিত গুণে ও মূল্যে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব কিনা। তাছাড়া কৃত্রিম রবারের যেরূপ বিস্তৃতি হইতেছে, তাহাতেও ববার-চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে হয় না। উৎপাদন-মূল্য যদি না কমানো যায়, তবে মূল্য-প্রতিযোগিতা সম্ভব নহে। তখন গবর্ণমেণ্টকে কৃত্রিম উপায়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা চিরদিন সম্ভব নহে, এবং তাহাতে শিল্পের উন্নতি প্রতিহত হইবার সম্ভাবনাও কম নহে।

সিন্‌কোনা (Cinchona)

পৃথিবী-খণ্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় সিন্‌কোনা-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। রবারের ন্যায় সিন্‌কোনা নিরক্ষীয় অঞ্চলের আদিবাসী। তাই রবারের ন্যায় দক্ষিণ--এশিয়ায় ইহার প্রকৃত আবাদ হইতেছে। যবদ্বীপই শ্রেষ্ঠ সিন্‌কোনা-উৎপাদন-স্থান। ভারতবর্ষেও সিন্‌কোনার চাষ হইতেছে। অন্যান্য স্থানে কিছু-কিছু সিন্‌কোনা উৎপন্ন হইলেও দার্জ্জিলিং অঞ্চলের মন্‌সং ও মংপু, ও নীলগিরির নাডুবাতাম ও দোদাবেতার গবর্ণমেণ্ট-আবাদই প্রধান। অন্য স্থান—মান্দ্রাজের আনামলাই ও ত্রিবাঙ্কুরের পার্ব্বত্য--অঞ্চল। সকল স্থানের সিন্‌কোনা গবর্ণমেণ্ট ভাণ্ডারে জমা হয়।

ভারতবর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ পা. কুইনিন দরকার। কিন্তু এখানে একলক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা হইতেও কিছু জার্ম্মানিতে, ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হয়। অবশিষ্ট আমদানি করিতে হয়।

আফিম (Opium)

আফিম উগ্র মাদকদ্রব্য। পোস্ত গাছের ফলের রস হইতে আফিম হয়। মাদক--দ্রব্য বলিয়া গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ইহার চাষ হয়, এবং আফিম প্রস্তুত ও বিক্রয় করা হয়। আবার মাদক দ্রব্য বলিয়া আন্তর্জ্জাতিক আফিম-নিয়ন্ত্রণ ও -উপদেষ্টা বোর্ড ইহারও আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ প্রধান উৎপাদন- ও রপ্তানি-কারক দেশ প্রধান উৎপাদন-স্থান—উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ। গাজিপুর ও নিমচ—এই দুই স্থানে আফিম প্রস্তুত করার কারখানা আছে। ভারত সরকার সস্তা আফিম কিনিয়া লইয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—১। রপ্তানি আফিম, ২। আবগারী আফিম—ইহা প্রত্যেক স্টেট ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ৩। ঔষধার্থ আফিম,—ইহা ঔষধ-বিভাগ হইতে বিক্রয় করা হয় ও কিছু অংশ লণ্ডনে ঔষধার্থ পাঠানো হয়।

১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৬ হাজার ৪ শত একর জমিতে ৩৪২ টন আফিম হইয়াছিল। আফিমের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন হইতেছে। সেজন্য আফিমের ব্যবহার কিছু কমিয়াছিল। আবার চীন প্রভৃতি দেশে আমদানির পরিমাণ কমিয়াছিল। সেইজন্যও ১৯৩২ সাল হইতে আফিমের রপ্তানি কমিয়াছিল। এই সময়ে প্রতি স্টেটে আবগারি বিভাগে আফিম-বিক্রয়ের পরিমাণও কমিয়াছিল। ১৯৩৫ সালে রপ্তানি হইয়াছিল—১,১৬২ বাক্স (Chest ; ১ বাক্স = ১৪০ পা.), ১৯৩৫-৩৬ সালে ৬৬৪ বাক্স, ১৯৩৬-৩৭ সালে ২৫৭ বাক্স। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পর আফিমের রপ্তানি আবার বাড়িয়াছে—১৯৪৬-৪৭ সালে ২২০ হন্দর, ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৩৮২, এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ৪০০ হন্দর।

ফল (Fruits)

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানে নানা প্রকার ফল জন্মে। **আম** জন্মে প. বঙ্গ, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ স্টেটে। **কমলালেবু**—প. বঙ্গ, আসাম, ও মধ্যপ্রদেশে। **কলা, আনারস**—আসাম, বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজে। **আপেল** জন্মে কাশ্মীরে। ভারতে কৃষিজমির ১'৩ ভাগ জমিতে প্রায় ৭০ লক্ষ টন ফল জন্মে। বিদেশ হইতে শুষ্ক ও কাঁচা ফল আমদানি করা হয়।

ফলের চাষের উন্নতির জন্য, সমতল প্রদেশের ফলের উন্নতির জন্য—মান্দ্রাজ ও বিহারে, লেবুজাতীয় ফলের জন্য—নাগপুরে, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের ফলের জন্য—উত্তর প্রদেশের কুমায়ুনে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

পাকিস্তানে পাঞ্জাব প্রদেশেও ফল সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খনিজ সম্পদ্

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, বক্সাইট, সীসক, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, লবণ, সোরা, জিপ্‌সাম, ব্যারাইট্‌স, ইলমেনাইট, মনাজাইট, ক্রোমাইট, গন্ধক, অন্য খনিজ পদার্থ (এস্‌বেস্‌টস্‌, কর্দ্দম, কাইনাইট, গ্রাফাইট, চূণাপাথর, টাংষ্টেন, নিকেল)।

পূর্ব্বকথা।—এই পুস্তকেব পৃথিবী-খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় খনিজ পদার্থ কাহাকে বলে, এবং শিলার সংজ্ঞা কি ও উহা কয় প্রকারের হয় সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা জানি, খনিজ সম্পদ্ অনেকটা শিলার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সেজন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের অবস্থান-সম্বন্ধে জানিতে হইলে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের গঠন- ও প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা দরকার।

ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ তিনটি স্বাভাবিক বিভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—(১) **হিমালয় প্রদেশ,** (২) **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বাহিত প্রদেশ,** ও (৩) **দাক্ষিণাত্য।** ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য প্রাচীনতম। বহু প্রাচীনকালে বর্ত্তমান যুগের আফ্রিকা, আরব সাগর, দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া লইয়া **গণ্ডোয়ানা দেশ** (Gondwana land) নামে একটি মহাদেশ ছিল। কালক্রমে ইহার বিভিন্ন অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায়, অথবা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, বিভিন্ন নামে এখনকার বিভিন্ন অংশের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত সেই গণ্ডোয়ানা দেশের এক অংশ। ইহা এখন দেখিতে ত্রিকোণাকার—ইহার উত্তরে বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালা ও তাহার শাখাপ্রশাখা। বর্ত্তমান যুগে উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণভাগে, বিহারের দক্ষিণভাগে ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমভাগে যে পার্ব্বত্য-প্রদেশ আছে, তাহা এই দক্ষিণ-ভারতেরই অন্তর্গত। সুতরাং অতি প্রাচীন যুগে এমন এক সময় ছিল, যখন দাক্ষিণাত্য ছিল, কিন্তু উত্তর-ভারত ছিল না, বা হিমালয় পর্ব্বতমালাও ছিল না। তখন দক্ষিণাত্যের উত্তরে এখনকার তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও চীনদেশের স্থানে টেথিস্ (Tethys) নামে এক বিশাল সমুদ্র ছিল। এই সমুদ্র পশ্চিমে ইউরোপের দিকেও বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এই টেথিসের উত্তরে ছিল সাইবেরিয়া অঞ্চল।

কালক্রমে টেথিসের গর্ভ হইতে হিমালয়ের উত্থান হয় এবং এই হিমালয় হইতে জলধারাবাহিত পলিমাটি দ্বারা হিমালয় ও বিন্ধ্যশ্রেণীর পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশ পূর্ণ হইয়া সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা গঠিত হয়।

সুতরাং, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অংশ দক্ষিণ-ভারত,—ইহার উপরিস্থিত পর্ব্বতগুলি প্রাচীনতম,—কালধর্ম্মে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই অঞ্চলের শিলা অধিকাংশ স্থলে আগ্নেয়। এই দক্ষিণ-ভারতের উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল স্থান অতি প্রাচীনকালের আগ্নেয় পর্ব্বত-নিঃসৃত গলিত লাভায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহার নাম ব্যাসাল্ট (basalt বা trap); ইহা এখানে প্রায় দুই-তিন হাজার ফিট্ গভীর; ইহার মাটি অত্যন্ত উর্ব্বরা, এবং ইহা কার্পাস-চাষের শ্রেষ্ঠ স্থান।

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম অংশই খনিজ পদার্থের আকর-স্থান—এখানেই ভারতের অধিকাংশ খনিজ সম্পদ লুক্কায়িত আছে। ইহার উত্তর-পূর্ব্বে বিহার প্রদেশের দক্ষিণ অংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খনিজ দ্রব্য উৎপাদন-স্থান,—ভারতের ⅔ অংশ খনিজ দ্রব্য এই প্রদেশ হইতেই পাওয়া যায়;—ইহারই পূর্ব্বভাগ ও তৎ-সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়লা-উৎপাদন-স্থান। এই অঞ্চলেই—বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনস্থলেই—লোহা-পাথরের বিপুল ভাণ্ডার। তাছাড়া, বিহারের এই অঞ্চল অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তামা, কেওলিন, এসবেস্টস্ প্রভৃতি বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্যের আকর-স্থান। মোটামুটিভাবে, পেট্রোলিয়ম ও গন্ধক ব্যতীত ভারতের সকল খনিজ দ্রব্যই এই দক্ষিণ-ভারতে বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মহীশূর ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে প্রদেশভেদে খনিজ দ্রব্যের উৎপত্তি-স্থানের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের উত্তরে অবস্থিত সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা পলিমাটি গঠিত এবং ইহার বয়সও অল্প। সেজন্য এ-অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য বিশেষ পাওয়া যায় না।

হিমালয়-অঞ্চল বয়সে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা অপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু দক্ষিণ-ভারত অপেক্ষা নবীন। সুতরাং ইহার পার্ব্বত্য-অঞ্চলে—আসাম, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান প্রভৃতি স্থানে—কিছু-কিছু খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষে বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, এবং **অভ্র, ইলমেনাইট, মনাজাইট** উৎপাদনে ইহা পৃথিবীর **সর্ব্বপ্রধান** স্থান;—**ম্যাঙ্গানিজ**-উৎপাদনে রুশিয়া ও স্বর্ণ-উপকূলের পরেই ইহার তৃতীয় স্থান। কিন্তু তথাপি ভারতকে খনিজ সম্পদে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। ইহা অপেক্ষা ইউরোপের ও আমেরিকার খনিজ সম্পদ্ অতি প্রচুর। বর্ত্তমান যুগের শিল্পার্থে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় লৌহভাণ্ডার এখানে বিপুল বটে, কিন্তু **লৌহ-উৎখাতে** ভারতের স্থান **বহু নিম্নে**; **কয়লা-উৎপাদনে**ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান **নবম** বা **দশম**; **পেট্রোলিয়াম** এখানে **অতি অল্প**; রৌপ্য,

তাম্র, সীসক ও দস্তা প্রভৃতির পরিমাণ নিতান্ত কম; এবং নিকেল, পারদ, রাং, টাংস্টিন, গন্ধক, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একেবারে নাই বলা যাইতে পারে।

১৯৪৮ সালে—উৎখাদিত হইয়াছিল—

লৌহ	পৃথিবীর	১·০৭	শতাংশ	পৃথিবীতে	স্থান	৮ম
অভ্র	,,	৬৯·০১	,,	,,	,,	১ম
ম্যাঙ্গানিজ	,,	৮·১৬	,,	,,	,,	৩য়
কয়লা	,,	১·৮২	,,	,,	,,	৯ম

১৯৪৯ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৭৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯ হা. ৭০৬ টাকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান-প্রধান কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভারতের উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য ১৯৪৯*

খনিজ দ্রব্য	উৎপাদন (টন)	মূল্য (টাকা)
কয়লা	৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৯৫ হা. ৩৭৫	৪৭,৫৬,৩৬,৯২১
পেট্রোলিয়ম	৬ ,, ৬৭ ,, ১১ ,, ৪১ গ্যালন	১,৮১,২১,৪৫০
লৌহপ্রস্তর	২৮ ,, ৮ ,, ৫২২ টন	১,২৬,৬৫,৬৬১
লবণ	১৯ ,, ৯০ ,, ১১৯ টন	৪,১৩,৩৫,৯৫১
ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর†	৬ ,, ৪৫ ,, ৮২৫ টন	৩,৯৪,৮৯,১৩০
অভ্র†	২ ,, ৭০ ,, ৫১৮ হন্দর	৫,৭০,৬১,৪৬৮
তাম্র প্রস্তর	৩ ,, ২৯ ,, ৩০৪ টন	১,১০,৫৩,২৬৬
ইলমেনাইট	৩ ,, ৮ ,, ১৮০ টন	৪৭,৯৪,৬২২
স্বর্ণ	১ ,, ৬৪ ,, ২০৩ আউন্স	৪,৯৯,০০,২৬৪
ম্যাগ্‌নেসাইট	৯০ ,, ৫৬৪ টন	১৫,৫৩,৪৫৬
ক্রোমাইট	১৯ ,, ৪১৬ টন	৬,২৫,৩০৬
রৌপ্য	১১ ,, ২৭৫ আ.	৫২,৭১৮
সোরা (salt petre)	৬ ,, ৫৫৪ টন	৩৪,৬৬,৬৫২
হীরক	১ ,, ৬৩২ ক্যারাট	২,৭৪,৯৯৫
গ্রাফাইট	১,০৯৫ টন	১,২৪,৫১৯

* Indian Minerals

† রপ্তানি-অঙ্ক

খনিজ পদার্থ—মুল্যবান্ ধাতুদ্রব্য

১। **স্বর্ণ (Gold)**।—স্বর্ণের ব্যবহার ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। সাত-আট হাজার বৎসর পূর্ব্বের যে-সকল প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতেও স্বর্ণের অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে।
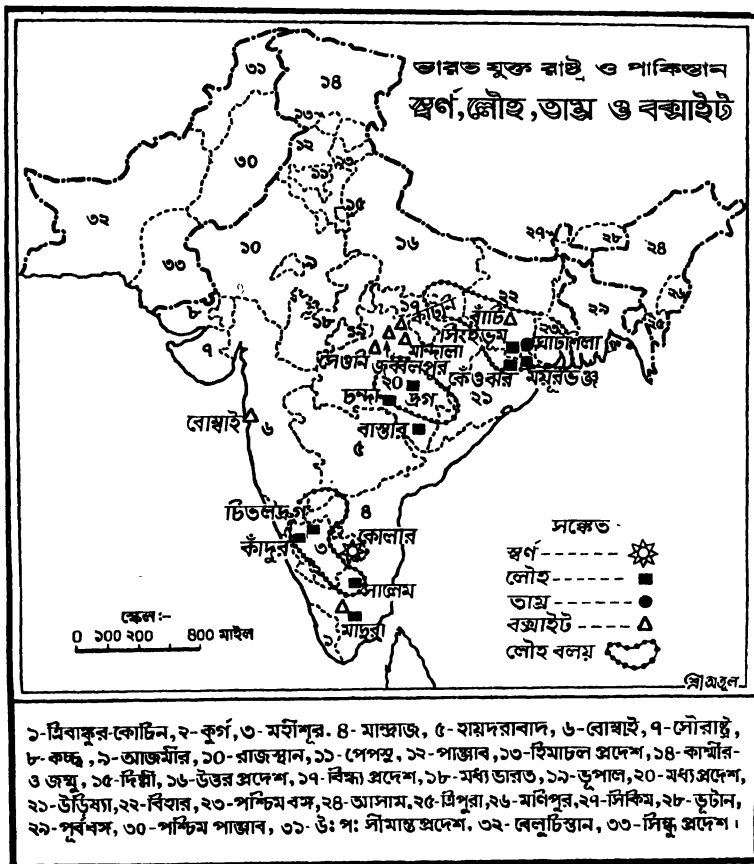
৩৪ নং ছবি—স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, বক্সাইট

সমস্ত শিলারই উপাদানের ৭০.ভাগ সিলিকা (silica) এবং কেলাসিত (cry--stallised) বা স্ফাটিক সিলিকা কোয়ার্টজ (quartz)-এর উপাদান। স্বর্ণ, শিলাস্তরে এই কোয়ার্টজের সঙ্গে গ্রথিত থাকে। শিলাস্তর হইতে আমরা দুই উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্ত হই :

(১) স্বর্ণধর কোয়ার্টজ যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণিত হইলে স্বর্ণকণা বালি প্রভৃতির সহিত জলস্রোতে বাহিত হইয়া নদী প্রভৃতিতে আসিয়া পড়ে, তখন বালুকা ধুইয়া-ধুইয়া তাহা হইতে স্বর্ণরেণু বা সোনার অতি ক্ষুদ্র দলা বাহির করা হয়। এই উপায়ে যে-স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ইহা সাধারণতঃ গ্রাম্য লোকেই সংগ্রহ করে এবং বার্ষিক সংগ্রহের হিসাবে ইহা ধরা যায় না। যে-সকল স্থানে এইরূপ ভাবে সোনা সংগৃহীত হয় সে-সকল স্থানের সোনা ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যায়। ভারতবর্ষে মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানের কোন-কোন নদীর বালুকণা হইতে এইরূপ স্বর্ণকণা বাহির করা হইত। অনেক স্থানে এখন আর এরকম সোনা পাওয়া যায় না। বিহারের সুবর্ণরেখা নদীতে এখনও স্বর্ণ পাওয়া যায়।

(২) কিন্তু স্বর্ণ-সংগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিমতে ভূ-গর্ভ হইতে স্বর্ণধর কোয়ার্টজ তুলিয়া আনিয়া তাহার চূর্ণ জলের সহিত মিশাইয়া তাহা হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়। ভারতে,—**বিহারের** মানভূম ও সিংভূম জেলা, **মাদ্রাজের** চিত্তুর, **মহীশূরের** কোলার ও অনন্তপুর, **হায়দারাবাদের** হট্টি অঞ্চলের খনি হইতে এই দ্বিতীয় উপায়ে স্বর্ণ সংগৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে মহীশূরের কোলার-অঞ্চল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (১৯৪৮ সালে ১৮০,৪২৯ এবং ১৯৪৯ সালে ১৬৪,২০৩ আউন্স)। প্রাচীনকালেই এখানকার খনি হইতে স্বর্ণ উদ্ধৃত হইত। মহীশূর রাষ্ট্রের পূর্ব্বভাগে ২,৮০০ ফু. উচ্চ মালভূমিতে ইহা অবস্থিত এবং স্থানে-স্থানে ৯ হাজার ফিট গভীর। এই স্থানে ৪টি বিলাতী কোম্পানি ভূ-গর্ভ হইতে স্বর্ণধর কোয়ার্টজ তুলিয়া উহা হইতে সোনা বাহির করিতেছে। মনে রাখা দরকার যে, স্বর্ণ ধাতুরূপেই পাওয়া যায়,—লৌহাদির মত ধাতুপ্রস্তর হইতে রাসায়নিক উপায়ে সংগ্রহ করিতে হয় না। অন্য স্বর্ণখনির মধ্যে চিত্তুর (১৯৪৮ সালে ৩৮৪, এবং ১৯৪৯ সালে ৩,১৮০ আ.) ব্যতীত অন্য খনিগুলির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে ১৯৪৮ সালে ৫·৪, এবং ১৯৪৯ সালে ৩·৭ আউন্স, ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৪৮ সালে ·৪, ও ১৯৪৯ সালে ১·৬ আ. স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। বার্ষিক উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

উৎপন্ন স্বর্ণ

	(ওজন—আউন্স)	মূল্য—টাকা
১৯৪৭ সালে	১৭১,৭০৪	৪,৮৯,৫৪,৬৩৯
১৯৪৮ „	১৮০,৪৩০	৫,৪৩,০০,৫৭৫
১৯৪৯ „	১৬৪,২০৪	৪,৯৯,০০,২৬৪
১৯৫০ „	১৯৫,০০০	

২। রৌপ্য (Silver)।—রৌপ্য খনি হইতে ধাতুরূপেই পাওয়া যায়। আবার কয়েক প্রকার খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিতও দেখা যায়। গ্যালেনা ও স্বর্ণের সহিত রৌপ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রৌপ্যখনি এদেশে নাই। কিন্তু প্রাচীন-কালে যে রৌপ্যের ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। বিহারে, উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে, রাজপুতানায়, মান্দ্রাজে, হায়দারাবাদে, মহীশূরে গ্যালেনা নামে এক প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উহা হইতে কিছু রৌপ্য বাহির করা হইত—এখন হয় না। এখন কেবল কোলার স্বর্ণখনির সোনা শোধন করার সময় কিছু রৌপ্য বাহির হইয়া আসে।

কোলার ক্ষেত্র হইতে ১৯৪৮ সালে ১২ হা. ৭৯৭ আ. রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল—তাহার মূল্য ৬০,২০০৲। ১৯৪৯ সালে পাওয়া গিয়াছিল ১১,২৭৫ আ.—ইহার মূল্য ৫২,৭১৮৲।

খনিজ দ্রব্য—হীনমূল্য ধাতু

৩। লৌহ (Iron) প্রস্তর।—এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ২৯৩ পৃষ্ঠায় লৌহ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, লৌহকে আমরা যে-আকারে দেখি সে-আকারে প্রকৃতির রাজ্যে ইহা পাওয়া যায় না—কেবল উল্কাদিতে মাত্র বিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়; পৃথিবীতে এমন কোন শিলা নাই যাহাতে লৌহ নাই,—ভূ-ত্বকের প্রায় একশত ভাগ মাটিতে ৫ ভাগের অল্পকিছু বেশী লৌহ মিশ্রিত আছে। কিন্তু যে-সকল শিলাদিতে লোহার পরিমাণ অতি অল্প, তাহা হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিলে লাভ হয় না। ভারতবর্ষেও সর্ব্বত্রই লৌহপ্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বস্থানের প্রস্তর এখনকার লৌহ-কারখানায় ব্যবহার করা চলে না। তথাপি, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লৌহসম্পদ্ যথেষ্ট, এবং এখানকার বহু স্থানের লৌহপ্রস্তর (iron ore) গুণেও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের 'প্রস্তর' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান হিসাব অনুসারে, সমগ্র পৃথিবীতে লৌহের যে সঞ্চিত ভাণ্ডার (reserve) আছে, তাহার পরিমাণ,—২৯,৩২৯ কোটি ১০ লক্ষ মে. টন। তদ্ব্যতীত আরও ৫ হা. ৩ শত ৯১ কোটি ৮০ ল. মে. টনের সম্ভাবনা আছে। দেশ হিসাবে সকল দেশ অপেক্ষা লৌহপ্রস্তর-ভাণ্ডার দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তৎপরে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে,—জ্ঞাত ও সম্ভাব্য সম্পদ্ মিলিয়া ৭,৪৬০ কোটি মে. টন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান—৩য়, এবং সঞ্চিত লৌহ-সম্পদ্—২,০৩২ কোটি ও সম্ভাব্য ৯৩৪। সুতরাং সমগ্র বৃটিশ কমনওয়েলথে ইহার স্থান দ্বিতীয়—লৌহাংশ ধারণেও ইহার স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু

লৌহপ্রস্তর উংখাতের পরিমাণ হিসাবে ভারতের স্থান আ. যুক্তরাষ্ট্র, রুশ গণতন্ত্র, ফ্রান্স, সুইডেন, ইংলণ্ড ও জার্মানির পরেই সপ্তম।

লৌহের কারখানা।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি লৌহ-শিল্পকেন্দ্র আছে—(১) টাটানগরে টাটা আয়রন ও স্টীল কোং, (২) হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোং, ও (৩) মহীশূরের ভদ্রাবতী নামক স্থানে মহীশূর আয়রন ওয়ার্কস।
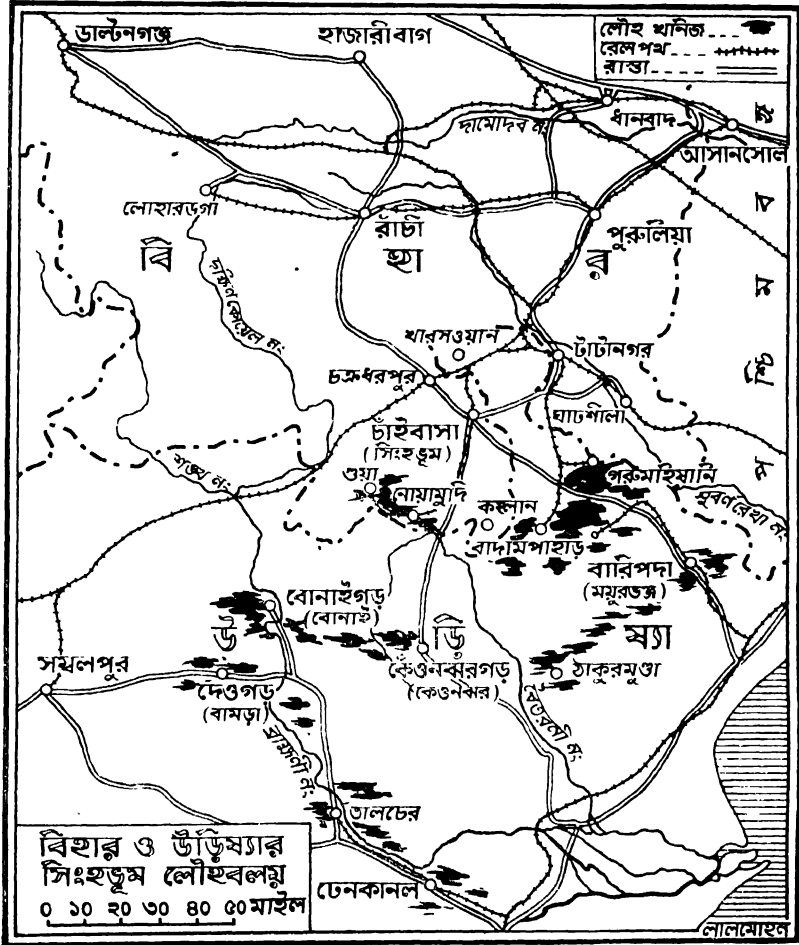
৩৫নং চিত্র

লৌহপ্রস্তর।—ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই অল্প-বিস্তর লৌহপ্রস্তর আছে। কিন্তু ভারতের কোক কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া যে-সব প্রস্তরে ৬০% বা

ততোধিক লৌহ নাই সে-সকল প্রস্তর উত্তোলন করা হয় না। লৌহশিল্পে নিম্নলিখিত স্থানের **হিমাটাইট** লৌহপ্রস্তরই ব্যবহৃত হয়—

(১) সিংহভূম লৌহবলয়।

(ক) বিহারের অন্তর্গত—সিংহভূম জেলায়—কহ্লান নামক সরকারী জমিদারীতে—

১। নোয়ামুন্দি

২। পানসিরা বুরু

৩। বুদা বুরু

৪। গুয়া

(খ) উড়িষ্যার অন্তর্গত—

১। কেঁওঞ্চরের বাগিস্ বুরু খনি

২। ময়ূরভঞ্জের—(ক) বামনঘাট মহকুমায়—(১) গরুমইশানি পর্ব্বত, (২) সুলাইপেত (ওকামপদ)-বাদাম পাহাড় পর্ব্বতমালা।

(খ) পাঁচপীর মহকুমায়—কামদাবেদী ও কান্তিকুয়া হইতে ঠাকুরমুণ্ডা পর্য্যন্ত ২৫ মাইল স্থান।

(গ) সদর মহকুমায়—সিমলি পাহাড়শ্রেণী।

৩। বোনাই পাহাড়।

দ্রষ্টব্য—এই বলয় ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গা নিবাসী স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু কর্ত্তৃক ১৯০৪ সালে আবিষ্কৃত হয়, এবং তাহার ফলেই সিংহভূম জেলায় টাটা কোম্পানীর লৌহ কারখানা স্থাপিত হয়। **এই অঞ্চল ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তর প্রদান করিয়া থাকে। এজন্য সিংহভূম জেলাকে Ontario of India বলে। এখানে নোয়ামুন্দি, গরুমইশানি, বাদামপাহাড়, কেঁওঞ্চর ও বোনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখানকার প্রস্তরে লৌহ-পরিমাণ ৬০—৬৮%।** অন্য কোন দেশে এত অধিক অংশে লৌহ মিশ্রিত "প্রস্তর" এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না।

(২) মধ্যপ্রদেশের লৌহখনির অঞ্চল—(ক) চন্দা জেলাই এখানকার শ্রেষ্ঠখনি। খণ্ডেশ্বর নামে পাহাড়টি প্রায় লৌহে গঠিত। লোহারা, ওগুলপেট প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে উল্লেখযোগ্য প্রস্তর উদ্ধৃত হয়।

(খ) দ্রুগ জেলার দল্লি-লোহারা নামক সাত মাইলব্যাপী পর্ব্বত। ইহাও উপরি-উক্ত প্রমথনাথ বসু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

(গ) বাস্তার—এখানে সিংহভূমের প্রস্তরের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর লৌহপ্রস্তর বহু পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য।—এখানে চন্দা জেলায় প্রায় ৩ কোটি ও দ্রুগ জেলায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন সঞ্চিত লৌহভাণ্ডার আছে, এবং এখানকার প্রস্তরের লৌহ-অংশ প্রায় ৬০—৬৮%। বাস্তারে ৬১ কোটি টন সঞ্চিত লৌহভাণ্ডার আছে বলিয়া অনুমিত হয়। এখানকার প্রস্তরের লৌহ-অংশ ৬০%।

(৩) মহীশূরের লৌহখনি-অঞ্চল।—কাডুর জেলার বাবা বুদ্দান পাহাড়ে প্রচুর হিমাটাইট লৌহ আছে। এই লৌহ ভদ্রাবতীর কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ইহার উচ্চতম অংশে কিছু ম্যাগনেটাইট লৌহও আছে—কিন্তু তাহা বিশেষ ভাল নহে। মহীশূরের তিপ্টুরের নিকট শ্রাবণ পাহাড়ে, শিমোগা জেলার কোদাইছাদ্রি নামক স্থানে এবং চিতলদ্রুগ জেলার পাহাড়েও লৌহ আছে।

দ্রষ্টব্য।—মহীশূরের অনুমিত সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ ১৫ কোটি টন এবং এখানকার প্রস্তরের লৌহাংশ ৬০%।

(৪) মান্দ্রাজ।—লৌহপ্রস্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হিসাবে সিংহভূম বলয়ের পরেই মান্দ্রাজের স্থান। সালেম জেলাই লৌহসম্পদে সর্ব্বপ্রধান। মাদুরা জেলার প্রায় সর্ব্বত্র এবং উত্তর- ও দক্ষিণ-আর্কট জেলায় প্রচুর লৌহপ্রস্তর রহিয়াছে। এখানে প্রচুর ম্যাগনেটাইট লৌহও আছে।

দ্রষ্টব্য।—এখানে কোন-কোন স্থানের লৌহপ্রস্তরের লৌহাংশ অত্যন্ত কম। সর্ব্বসমেত এখানকার সঞ্চিত ভাণ্ডার ৯২৭ কোটি টন। কিন্তু সালেম ও আর্কট জেলায় ভাল লৌহ প্রস্তরের পরিমাণ যথাক্রমে ২০ ও ১৫ কোটি টন।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে—দার্জ্জিলিং, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়; বিহারে—পালামৌ, হাজারিবাগ, ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলায়; বোম্বাই প্রদেশে—রত্নগিরি, সাতারা, পাঁচমহল ও কোলাপুর জেলায়, মধ্যভারতে—ইন্দোর, গোয়ালিয়র, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে; রাজপুতানার—জয়পুর, আজমীড়, উদয়পুর, কোটা প্রভৃতি স্থানে ও আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীতেও লৌহখনি আছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমগ্র প্রদেশেই কিছু-না-কিছু লৌহের সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার টেক্‌নিকাল মিশন অনুমান করেন—ভারতের লৌহভাণ্ডার পৃথিবীর যে-কোন দেশের লৌহভাণ্ডার অপেক্ষা বেশী।

লৌহ-উৎখাদন।—১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে ২৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৭৫ টন লৌহপ্রস্তর উৎখাত করা হইয়াছিল। ইহার ৫১·৫ শতাংশ

বিহার হইতে এবং ৪৫ শতাংশ কেঁওঞ্ঝর প্রভৃতি উড়িষ্যার অংশ হইতে, শতকরা '০৪ অংশ মহীশূর হইতে এবং শতকরা '০০২ ভাগ মধ্যপ্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৯৩৯ সালে	৩১,৬৬,৬৭৪ টন
১৯৪০ "	৩১,০২,৩৫৬ টন
১৯৪১ "	৩১,৯৫,০০০ "
১৯৪২ "	৩২,১৭,০০০ "
১৯৪৩ "	২৬,৫৫,০০০ "
১৯৪৪ "	২৩,৬৪,০০০ "
১৯৪৫ "	২২,৬৪,০০০ "
১৯৪৬ "	২৪,০৮,০০০ "
১৯৪৭ "	২৪,৯৮,০০০ "
১৯৪৮ "	২২,৮৫,০০০ "
১৯৪৯ "	২৮,০৯,০০৯ "

টাটাকোম্পানি।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের লৌহখনিগুলির মধ্যে সিংহভূম--বলয়ের লৌহখনি শ্রেষ্ঠ। এখান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লৌহপ্রস্তর উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলেই এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহকারখানা **টাটানগরে** অবস্থিত। কারণ, ইহার উত্তরেই কয়লাখনি, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমেই লৌহখনি, এবং অদূরেই সিংহভূম-বলয়ের মধ্যেই লৌহশিল্পের আবশ্যকীয় ম্যাঙ্গানিজ ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। এই লৌহ--অঞ্চল রেলপথে একদিকে বিশাখাপত্তন ও অন্যদিকে কলিকাতার সহিত যুক্ত বলিয়া পণ্যদ্রব্য রপ্তানির সুবিধা।

ভারতের লৌহ।—ভারতের লৌহ গুণে কোন দেশের লৌহ অপেক্ষা হীন নহে। ইহার লৌহপ্রস্তরে—লৌহাংশ মোটামুটি ৬৮%। তাছাড়া ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ-অঞ্চল সিংহভূম লৌহবলয়ে পাহাড়ের উপরের স্তরেই লৌহ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশের মত লৌহের সন্ধানে গভীর খাদ কাটিতে হয় না।

৪। তাম্র (Copper) তাম্র-উৎপাদক হিসাবে বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের বিশেষ খ্যাতি নাই। এখন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেপাল, সিকিম, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলে, রাজপুতানায় এবং বিহারের সিংহভূম, হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণায় তাম্রমিশ্রিত খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র **সিংহভূম জেলার মোসাবনি** হইতে উল্লেখযোগ্য তামা পাওয়া যায়। অন্যত্র প্রায় সবগুলির নাম উৎপাদন-স্থানের মধ্যে

উল্লিখিতই থাকে না। এই সিংহভূমের উৎখাত খনিজ হইতে তামা প্রস্তুত হয়। এই খনি প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ, এবং মোসাবনি, ঘাটশিলা ও ধোবানি ইহার উৎপাদন-কেন্দ্র। এদেশে যে বহুদিন হইতে দেশীয় প্রথায় তামা বাহির করা হইত তাহার চিহ্ন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

তামা একেবারে ধাতুরূপেই পাওয়া যায়। আবার কোথাও-কোথাও রাং-এর সহিত মিশ্রিত রূপে পাওয়া যায়। এদেশে মাত্র **কাশ্মীর** ও **মান্দ্রাজ** হইতে ধাতুরূপে তামার গুঁটি পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যত্র,—উপরি-উক্ত সিংহভূম অঞ্চলে,—যে-খনিজ পাওয়া যায়, তাহা লৌহ, তাম্র ও গন্ধকমিশ্রিত (Chalopyrite) ;—ইহা হইতে তামা বাহির করিয়া লইতে হয়। এখানকার খনিজে তাম্রের পরিমাণ শতকরা ২ হইতে ৪ ভাগ। এ-অঞ্চলে তাম্র-নিষ্কাশন বহুদিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু ১৯১৪ সাল হইতে Indian Copper Corporation, Ltd. তাম্র-উৎপাদনের কাজ করিতেছে। কিন্তু এখানকার তাম্র বিশুদ্ধ নহে—নিকেল-মিশ্রিত। তাই এখানকার তাম্রে বিদ্যুৎবাহী তার প্রস্তুত করা যায় না। তাছাড়া এখানকার তাম্র-নিষ্কাশনের খরচও বেশী। তাই আ. যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার উত্তর-রোডেশিয়া হইতে আনীত বিশুদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত সুলভ তাম্রের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা করা সহজ হয় না। বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় তার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই আমদানি-করা তারেই প্রস্তুত করা হয়। তবে, তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইয়া এখানে পিতল প্রস্তুত করা হয়। ঘাটশীলার নিকটবর্ত্তী মৌভাণ্ডারে এই কোম্পানির কারখানা স্থাপিত আছে। নেলোরেও আধুনিক উপায়ে তামা বাহির করা হইতেছে। সিকিম ও জয়পুরে তামা পাইবার সম্ভাবনা আছে। বোম্বাই-এর **ছোট উদেপুর** হইতে ১৯৪৮ সালে ৬ টন তাম্রপ্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন তাম্রের খনিজের পরিমাণ—

১৯৪০ সালে	—৪,০১,২৯৩ টন	১৯৪৫ সালে	—৩,২৯,৩২৫ টন
১৯৪১ „	—৩,৮১,৪৪৯ „	১৯৪৬ „	—৩,৫২,৭১৮. „
১৯৪২ „	—৩,৬৩,১৬৬ „	১৯৪৭ „	—৩,২৩,০৩৫ „
১৯৪৩ „	—৩,৫৯,৭৮৯ „	১৯৪৮ „	—৩,২২,২৮২ „
১৯৪৪ „	—৩,২৬,০১৭ „	১৯৪৯ „	—৩,২৯,৩০৪ „

ইহা হইতে নিষ্কাশিত তাম্র ভারতেরই অভাব মিটাইতে পারে না। ভারতে

বিশুদ্ধ তামা পাওয়া গিয়াছে—

১৯৪৬ সালে	—৬,৩১১ টন	১৯৪৮ সালে	—৫,৮৬৩ টন
১৯৪৭ „	—৫,৯৩১ „	১৯৪৯ „	—৬,৩৯০ „

১৯৫০ সালে—৬,৩৮৫ টন

পাকিস্তানে—পশ্চিম-বেলুচিস্তানে **রাস কো** পর্ব্বতে, উত্তর-ওয়াজিরিস্তানে চিত্রলে—**লোরাল গিরিপথে,** এবং **মোহ্‌মাণ্ড** নামক উপজাতি-অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়।

৫। বক্সাইট (Bauxite) পৃথিবী-খণ্ডের ৩০৪ পৃষ্ঠায় এ্যালুমিনিয়ম-শীর্ষক প্যারায় বক্সাইট-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের সকল মাটি ও পাথরেই এ্যালুমিনিয়ম ধাতু আছে বটে, কিন্তু একমাত্র বক্সাইট হইতে ইহা নিষ্কাশন করিলে খরচ পোষায়। এই এ্যালুমিনিয়মধাতু শক্ত ও হাল্কা এবং দামে সুলভ। সেজন্য গৃহস্থালীর দ্রব্য নির্ম্মাণে, ঘরের চাল প্রস্তুত করিতে এবং আকাশযান, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার প্রচলন খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার আবার বিদ্যুৎ-পরিচালন-শক্তিও বেশী। সেজন্য ইলেকট্রিক সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে। বক্সাইট হইতে ফট্‌কিরিও প্রস্তুত হয়।

ভারতে বক্সাইটের প্রচলন বেশী দিনের নহে। বক্সাইটে লৌহ, এ্যালুমিনিয়ম এবং অন্য খনিজ পদার্থ থাকে। এ্যালুমিনিয়ম যে-বক্সাইটে যত বেশী থাকে, তাহা তত ভাল। যে-বক্সাইট-প্রস্তরে এলুমিনিয়মের অংশ শতকরা ৫২ অপেক্ষা কম নহে এবং সিলেকার অংশ শতকরা ৫ অপেক্ষা বেশী নহে,—তাহাই ব্যবসায়ক্ষেত্রে এলুমিনিয়ম-নিষ্কাশনের উপযোগী। ভারতে এইরূপ বা এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বক্সাইট প্রচুর পাওয়া যায়। ভারতে বক্সাইট-প্রস্তরে শতকরা ৬২ অংশ এলুমিনিয়মও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে-সকল প্রদেশে উৎকৃষ্ট বক্সাইটের সঞ্চয় প্রচুর পরিমাণে আছেতন্মধ্যে **মধ্যপ্রদেশই প্রধান**। এক্ষণে ভারতের নিম্নলিখিত স্থানে বক্সাইট দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) মধ্যপ্রদেশ—জব্বলপুর—ইহার নিকটে কাট্‌নি, মান্দলা, সেওনি, বালাঘাট ও নন্দগাঁ জেলা, সুরগোজা ও যশপুর (রায়পুর জেলা)।

কাটনির নিকটে সর্ব্ববৃহৎ খনি আছে। এই খনি হইতে ১৯৪৮ সালে ১৩,৩৩৭ ও ১৯৪৯ সালে ১৫,৫২১ টন বক্সাইট অর্থাৎ মোটামুটি সমগ্র উৎপাদনের যথাক্রমে $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ পাওয়া গিয়াছিল।

(২) বিহারে—পালামৌ ও **রাঁচি** (লোহারদগা)। বিহারের মুরী ও পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের নিকটস্থ **অনুপনগরে এ্যালুমিনিয়মের কারখানায়** রাঁচি-অঞ্চলের লোহারদগা হইতে বক্সাইট আসে। ১৯৪৯ সালে রাঁচি হইতে **সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সমগ্র উৎপাদনের অর্দ্ধেকেরও বেশী** বক্সাইট পাওয়া যায়। ইহার **পরিমাণ ছিল রাঁচি হইতে** ২৩,৯৯২ ও **পালামৌ হইতে** ১,০৫৭ টন।

(৩) **বোম্বাই প্রদেশে**—বোম্বাই সহর হইতে ৩০ মাইল দূরস্থ তুঙ্গার পর্ব্বতে প্রচুর বক্সাইট আছে; এ-প্রদেশে **বেলগাঁও** একটি প্রধান বক্সাইট-উৎপাদন-স্থান। ১৯৪৯ সালে বেলগাঁও হইতে ৫০০ টন বক্সাইট পাওয়া গিয়াছিল।

(৪) **মান্দ্রাজে**—পাওয়া যায় **সালেমে** ও মাদুরায় ও নীলগিরি পর্ব্বতে। ১৯৪৮ সালে সালেমে ১,৪৯৩ টন, এবং ১৯৪৯ সালে ১,৪৭১ টন বক্সাইট পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত **কাশ্মীর** ও **মহীশূর** রাষ্ট্রে বক্সাইট পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সালে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩১৬ ও ১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৫১ টাকা মূল্যের ২২,১৫৬ টন, এবং ১৯৪৯ সালে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৭৫ টাকা মূল্যের ৪২,৫৪১ টন বক্সাইট পাওয়া যায়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে **অন্ততঃ** ২৫ কোটি টন বক্সাইট সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

৬। **সীসক (Lead)** রৌপ্য-সম্পর্কে গ্যালেনা নামক যে-খনিজের কথা বলা হইয়াছে, সীসা- ও গন্ধক-সংযুক্ত সেই গ্যালেনা নামক খনিজ হইতে সীসা পাওয়া যায়। সীসা এদেশে এক কালে পাওয়া যাইত, এবং রাজপুতানা-অঞ্চলে তাহার চিহ্নও আছে। কিন্তু বর্ম্মা ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার সময় উত্তর-ব্রহ্মের অন্তর্গত **বদুইন** (Bawdwin) খনি হইতে সস্তায় সীসা পাওয়া যাইত। সেজন্য এদেশে কোথাও সীসা বাহির করা হইত না। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত হইলে এদেশে সীসা বাহির করার চেষ্টা হয় এবং রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরে এবং উদয়পুরের জওযার-অঞ্চলে কয়েকটি খনি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সে-খনিতে বিশেষ কাজ হয় নাই। মান্দ্রাজে, মহীশূরে, মধ্যপ্রদেশে, রাজপুতানায়, বিহারের খনিপ্রধান সিংহভূম, মানভূম ও হাজারিবাগে গ্যালেনা আছে। কিন্তু সীসার কার্য্য এদেশে আদৌ ভাল হয় না। ১৯৪৭ সালে ৪ লক্ষ ২৩ হা. ৭২০ টাকার, এবং ১৯৪৮ সালে মাত্র ৪১ হা. ৮০০ টাকার সীসা পাওয়া গিয়াছিল।

পাকিস্তানে—বেলুচিস্তানে গ্যালেনা নামক খনিজ হইতে সীসা পাওয়া যায়।

৭। **দস্তা (Zinc)** দস্তা পাওয়া যায় সীসা ও গন্ধকযুক্ত জিঙ্ক ব্লেণ্ড (Zinc-blende) নামক খনিজ হইতে। ভারতে দস্তা পাওয়া যায় না।—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, কাশ্মীর, মান্দ্রাজ ও রাজপুতানায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

৮। **ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)** লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ভারতবর্ষের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান অর্থপ্রসূ খনিজ দ্রব্য। ইহার উৎপাদনের পরিমাণে এবং খনিজের উৎকৃষ্টতায় ভারতের স্থান অতি উচ্চে।

কযেক প্রকারের ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন (১) **পাইরোলু-সাইট** (pyrolusite বা black oxide) বিশুদ্ধ অবস্থায়, ইহাতে শতকরা ৬৩ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ বর্ত্তমান থাকে ; (২) **সিলোমিলেন** (psilomilane)—বিশুদ্ধ অবস্থায়, ইহাতে শতকরা ৪৫ হইতে ৬০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় ; (৩) **ব্রাউনাইট** (braunite)—ইহার বিশুদ্ধ প্রস্তরে শতকরা ৬২ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ বর্ত্তমান থাকে ; (৪) **ম্যাঙ্গানাইট** (manganite or grey oxide) প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তরই এদেশে বেশী। যে-সকল প্রস্তরে ৪০ হইতে ৬০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ থাকে তাহাই ব্যবহার করা চলে, এবং ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ হিসাবেই প্রস্তরের দাম হয়।

ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান রুশিয়া ও স্বর্ণ উপকূলের পরেই তৃতীয়। কিন্তু ক্রমশঃ ইহার উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, (১) ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ হইতে প্রস্তুত **ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ** লোহার সহিত মিশাইয়া ইস্পাত করিতে সুবিধা। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র টাটা কোম্পানির লৌহকারখানায় ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ হয় ও কিছু রপ্তানি হয়। অন্যত্র অল্প তৈয়ারি হইলেও তাহা তাহাদের নিজের ব্যবহারে লাগে। ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর অপেক্ষা ফেরো-ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বেশী। (২) যুদ্ধকালে রপ্তানি কমিয়া গিয়াছিল। এখন কিছু-কিছু বাড়িতেছে বলিয়া ১৯৪৭ সাল হইতে উৎপাদনও বাড়িতেছে। (৩) রুশিয়ার উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সেজন্য ভারতের উৎপাদন কমিতেছে।*

* **Wadia and Merchant, *Our Economic Problem*, p. 22.**

ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন

১৯৩৭ সালে	১০,৫১,৫৯৪ টন	১৯৪৪ সালে	৩,৭১,০০০ টন
১৯৩৮ "	৯,৯২,৭৯৫ "	১৯৪৫ "	২,১১,০০০ "
১৯৩৯ "	৮,৪৪,৬৬৩ "	১৯৪৬ "	২,৫৩,০০০ "
১৯৪০ "	৮,৬৮,৯১৮ "	১৯৪৭ "	৪,৫১,০০০ "
১৯৪১ "	৭,৮৫,০০০ "	১৯৪৮ "	৫,২৬,০০০ "
১৯৪২ "	৭,৪৭,০০০ "	১৯৪৯ "	৬,৪৬,০০০ "
১৯৪৩ "	৫,৯৫,০০০ "		

ভারতবর্ষে অনেক স্থলে—প্রায় সকল প্রদেশে,—ম্যাঙ্গানিজ-ভাণ্ডার আছে, কিন্তু সকল স্থানে পরিমাণও প্রচুর নহে, খনিজও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন নহে, এবং খনির কাজও সর্ব্বত্র হয় না। ম্যাঙ্গানিজের মূল্য হিসাবে ১৯৪৮ সালে পাওয়া গিয়াছিল—১ কোটি ৭৮ ল. ৪৯ হা. ২৫৬ এবং ১৯৪৯ সালে ৩ কোটি ৯৪ ল. ৮৯ হা. ১৩০ টাকা। প্রধান প্রধান উৎপাদন-স্থানগুলির নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

(১) **মধ্যপ্রদেশে**—বালাঘাট, নাগপুর, ভাণ্ডারা, হিন্দবারা, জব্বলপুর। ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনে **মধ্যপ্রদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ**—ভারতের প্রায় শতকরা ৬৭ অংশ ম্যাঙ্গানিজ এখানেই উৎখাত হয়;—বালাঘাটে হয় সমগ্র মধ্যপ্রদেশের ৩৭%। ১৯৪৯ সালের উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজের মধ্যে ২,৩১,৭৪৩ টন বালাঘাট হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

(২) **মান্দ্রাজ**—বেলারি, কর্ণূল, **সন্দুর**, ভিজগাপট্টম (বিশাখাপত্তন)। প্রায় শতকরা ১৬ অংশ এখানে উৎখাত হয়। ১৮৯১ সালে ভিজগাপট্টমে ভারতে প্রথম ম্যাঙ্গানিজের খনিতে কাজ আরম্ভ হয়। ইহার আট বৎসর পরে নাগপুরে আরম্ভ হয়। এক্ষণে সন্দুর হইতে সমগ্র মান্দ্রাজের ৭৭% শতাংশ উদ্ধৃত হয়।

(৩) **উড়িষ্যা**—কোরাপুট, **কেঁওঞ্ঝর,** বোনাই (সুন্দর গড়)। শতকরা ৮ অংশ ম্যাঙ্গানিজ এখানে উৎপন্ন হয়। কেঁওঞ্ঝর হইতে পাওয়া যায় উড়িষ্যার ৮০%।

(৪) **বোম্বাই**—উত্তর-কানাড়া, **পাঁচমহল।** এখানে মোটামুটি শতকরা ২ অংশ উৎখাত হয়। কিন্তু পাঁচমহল হইতে পাওয়া যায় বোম্বাইয়ের ৮৩%।

(৫) **বিহার**—সিংভূম। এখানে শতকরা ৫ অংশ উৎখাত হয়।

(৬) **মহীশূর**—চিতলদ্রুগ, সিমোগা, **তুমকুর।** এখানে শতকরা ·২ অংশ। তুমকুর মহীশূরের ৭২%।

রপ্তানি।—এদেশে লৌহশিল্পের জন্য যেটুকু ম্যাঙ্গানিজ দরকার তাহা বাদে

সমস্তই রপ্তানি করা হয়। প্রধানতঃ প্রস্তররূপেই ইহার রপ্তানি। সেজন্য মূল্যও কম।

প্রধান খরিদ্দার—আ. যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জাপান।

৯। অভ্র (Mica)

পৃথিবীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভ্র-উৎপাদক দেশ ; এখানকার অভ্র গুণেও শ্রেষ্ঠ এবং উৎপাদনও এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। মোটামুটি বলা যায় পৃথিবীর তিন-পঞ্চমাংশ অভ্র ভারতে পাওয়া যায় ; ১৯৪৭ সালে পৃথিবীর উৎপন্ন অভ্রের শতকরা ৬৯ অংশ ভারতবর্ষ হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যে-অভ্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়, তাহার নাম **মাস্কোভাইট** (muscovite)—ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সাধারণতঃ ব্যবহারে প্রয়োজনীয়। অন্য অভ্র **ফ্লোগোপাইট** (phlogopite)—ইহাও এদেশে পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিমাণ অতি অল্প।

মাস্কোভাইট অভ্রের প্রধান উৎপাদন-স্থান—**(১) বিহার**—বিহার অভ্রবলয় বা অভ্র-অঞ্চল হাজারিবাগ, মুঙ্গের ও গয়া জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত, এবং ৬০।৭০ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ১২ মা. বিস্তৃত। এখানকার অভ্র শ্রেষ্ঠ,—ঈষৎ রঙ্গীণ, ব্যবসার নাম "রুবি (ruby) অভ্র"। মানভূমেও অল্প অভ্র পাওয়া যায়।

(২) নেলোর—মান্দ্রাজ পূর্ব্ব-উপকূলের অর্দ্ধাংশের সমতল প্রদেশে এই অভ্র-অঞ্চল অবস্থিত। ইহা ৬০ মা. দীর্ঘ ও ৮ হইতে ১০ মাইল প্রশস্ত। এখানকার অভ্রও উৎকৃষ্ট—বিহারের অভ্রেরই মত,—তবে সামান্য তফাৎ আছে।

ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূরের হাসান জেলা ও রাজপুতানার আজমীর-মারবার, জয়পুর ও সাপুর হইতেও অল্প অভ্র পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের অভ্রের পরিমাণও অল্প, এবং ইহা উৎকর্ষেও হীন।

ফ্লোগোপাইট অভ্র অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়—কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রে।

অভ্রশিল্প।—এখানে অভ্রের খনির কাজ প্রভৃতি খুব সুশৃঙ্খলায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় না। বিহারের খনি-অঞ্চল আন্দোলিত ;—সেজন্য ইহার অভ্র-শিরা আন্দোলিত, ও বিচ্ছিন্ন—খাড়া ও ঈষৎ-হেলানো,—এখানে সুড়ঙ্গ কাটিয়া খনিতে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু নেলোরের খনি সমতল,—এখানে সুড়ঙ্গের দরকার হয় না,—পুকুরের মত উপর হইতে স্তরে-স্তরে অভ্র কাটিয়া যাইতে হয়।

খনি হইতে অভ্র তুলিয়া তাহা হইতে পাত খুলিয়া লইতে হয়। এদেশের প্রাচীন

অধিবাসীরা,—এমন কি তাহাদের ছোট-ছোট বালকেরাও,—এই পাত খোলার কাজে এরূপ দক্ষ যে, বিদেশ হইতে পাত খোলাইবার জন্য এদেশে অভ্র প্রেরিত হয়। পাত খুলিবার পরে ইহা বর্গ-ইঞ্চি হিসাবে কাটিয়া বিদেশে চালানের উপযোগী করিতে হয়। ১ বর্গ-ইঞ্চি অভ্রের পাত সর্ব্বাপেক্ষা ছোট আকারের অভ্র;—ইহার উপরে ক্রমশঃ দুই বা তিন বর্গ ই. ইত্যাদি আট আকারের অভ্রের পাত আছে। ৪৮ বর্গ-ইঞ্চি পাতকে
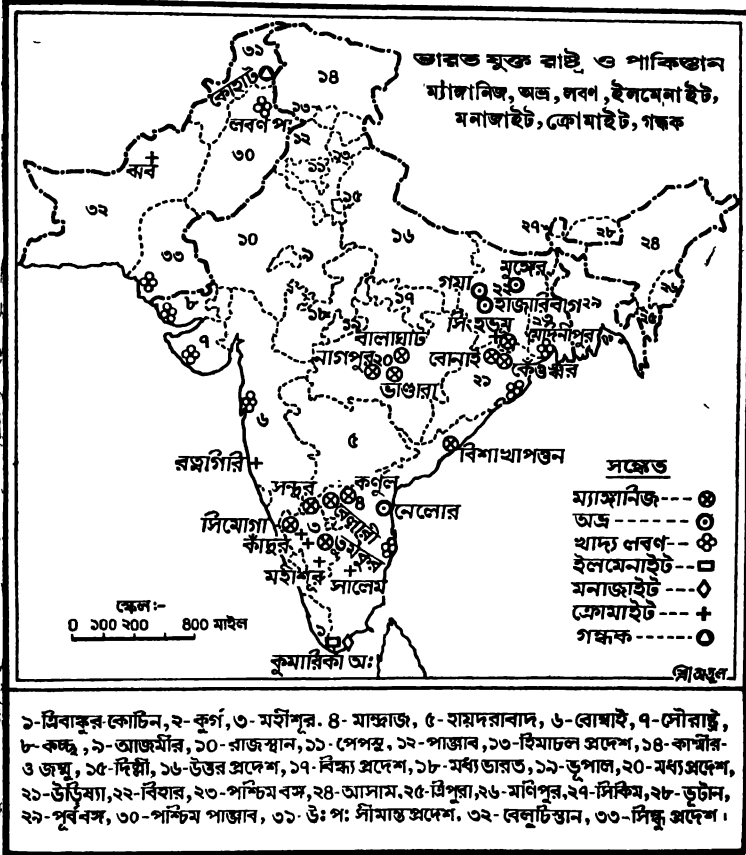
৩৫নং চিত্র

বিশেষ আকারের (special) এবং তদূর্দ্ধ আকারের পাতকে অতি-বিশেষ (extra special) আকারের পাত বলা হয়। এই সকল পাত গুণানুসারে সজ্জিত করিয়া বিক্রীত হয়।

অভ্রের ছাট।—এক-ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট-ছোট অভ্রের ছাটের ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন বিশেষ চাহিদা নাই। এগুলি খনির একধারে গাদা করিয়া রাখা হয়। কিন্তু

এগুলিও কাজে লাগানো যায়। অভ্রের গুঁড়া ম্যাগনেশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া বয়লারের গায়ে লাগাইলে তাহার তাপ রক্ষিত হয়। এজন্য আমেরিকায় অভ্রের খনিতেই গুঁড়া করার কল বসানো আছে। কিন্তু এদেশে এইরূপ গুঁড়ার ব্যবহার কম এবং ইহার চাহিদাও কম। সেজন্য এই টুক্‌রা-অভ্র নষ্ট হইয়া যায়।

রপ্তানি।—ভারতবর্ষে অভ্র প্রধানতঃ রপ্তানির জন্যই ব্যবহৃত হয়। অভ্রের পাত, ছাট ও গুঁড়া প্রভৃতি একত্রে হিসাব করিলে ইহার প্রধান খরিদ্দার—আ. যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় অর্দ্ধেক অভ্র সেখানেই যায়। কিন্তু অভ্রের আসল পাত হিসাবে যুক্তরাজ্যই প্রধান খরিদ্দার। অন্য খরিদ্দার—জার্ম্মানি, জাপান, ইতালী, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। রপ্তানির প্রধান বন্দর—কলিকাতা ; শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ অভ্র কলিকাতা বন্দর দিয়া রপ্তানি করা হয়। অন্য বন্দর—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, তুতিকোরিন, কালিকট্ প্রভৃতি। ১৯৪৮ সালে মোট ৩,৬১,৮৭৫ হন্দর অভ্র রপ্তানি হইয়াছিল ;—মূল্য—৬,১৪,৪০,১০০ টাকা ; ১৯৪৯ সালে ২,৭০,৫১৮ হন্দর ;—মূল্য—৫,৭০,৬১,৪৬৮ টাকা।

ব্যবহার।—অভ্রের একটি বিশেষ গুণ এই যে,—ইহা তাপ-অপবিবাহী—ইহা তাপ-পরিবহন রোধ করিতে পারে। তাই ডাইনামো প্রভৃতি যন্ত্রে বিদ্যুৎ-পরিবহন--রোধের জন্য অভ্র বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কেরোসিন স্টোভ, ও অন্য-অন্য চুল্লীর গায়ে অভ্রের জানালা থাকে। ছোট-ছোট অভ্রের টুকরা গালা দিয়া উপরি-উপরি জুড়িয়া এবং কখনও-কখনও উহা কাগজ বা কাপড়ের উপর রাখিয়া, চাপ দিয়া, মাইকানাইট (micanite) নামক বস্তু প্রস্তুত করা হয়। ইহাদিগকে মাইকানাইট বোর্ড, কাপড় মাইকানাইট বা কাগজ মাইকানাইট বলে। ইহা পাতলা বা মোটা নানা আকারের চাদর বা নল বা ব্লক আকারে পাওয়া যায় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাভজনক নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, অভ্রের প্রধান ব্যবহার—বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্ম্মাণে। কিন্তু এই সকল যন্ত্র প্রায়ই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। আমাদের দেশে বহুদিন হইতে ইহা প্রতিমার সাজ করিতে এবং শোভাযাত্রাকালে যে-সকল ঝাড়-লণ্ঠন ব্যবহার করা হয় তাহার গেলাস তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১০। লবণ (Salt)

খাদ্য-লবণ।—খাদ্য-লবণের রাসায়নিক নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড (Sodium Chloride). ইহা নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু—স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে ও খাদ্য সুস্বাদু করিতে ইহার তুলনা নাই। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য-লবণের উৎপত্তি হিসাবে ইহাকে

তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়—(১) **সমুদ্রজ** ও (২) **আন্তর্দেশিক জলজ** (৩) **খনিজ**।

(১) সমুদ্রজ লবণ।—সমুদ্রের জলে প্রায় শতকরা ২·৭২ ভাগ খাদ্য-লবণ আছে। সমুদ্রের জল চৌবাচ্চা করিয়া ধরিয়া রাখিলে যখন সূর্য্যোত্তাপে জল শুকাইয়া যায়, তখন লবণাংশ দানা বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে।

কচ্ছ রাষ্ট্রে, **সৌরাষ্ট্র** প্রদেশে, **বোম্বাই** প্রদেশে, **ত্রিবাঙ্কুরে, মান্দ্রাজ** প্রদেশে ও **উড়িষ্যার** উপকূলে—যেখানে বৃষ্টি কম ও সূর্য্যোত্তাপ বেশী—সেই সকল স্থানে—এইরূপভাবে লবণ উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে সমুদ্রের এই লবণকে 'করকচ' লবণ বলে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন লবণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ এই করকচ লবণ। সম্প্রতি মেদিনীপুরে সমুদ্রজল হইতে লবণ তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ইহা বৃষ্টিবহুল স্থান। সেজন্য এখানে লবণজল জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিয়া লবণ উৎপন্ন করিতে হয়।

(২) আন্তর্দেশিক জলজ লবণ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজপুতানার সম্বর হ্রদের জল হইতে এই লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহে কচ্ছ উপসাগর-অঞ্চলের সামুদ্রিক লবণাক্ত জলকণা রাজপুতানার বিকানীর ও যশল্মীর অঞ্চলে আসিয়া ভূমির উপর পড়ে, পরে বৃষ্টির জলে ধুইয়া সম্বর হ্রদের জলে পড়ে। সূর্য্যের উত্তাপে ইহার জল শুষ্ক হইলে লবণের দানা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজপুতানায় গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত লবণের কারখানা আছে।

(৩) খনিজ লবণ।—এই লবণ পার্ব্বত্য-প্রদেশের লবণের খনি হইতে পাওয়া যায়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ খনি কেবল পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে **মণ্ডি** অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহা পাথরের মত, প্রায় বিশুদ্ধ ও ঈষৎ লাল। ইহা আমাদের দেশে সৈন্ধব লবণ নামে পরিচিত।

পাকিস্তানে—(১) করকচ লবণ পাওয়া যায়—সিন্ধুদেশের থারপার্কার জেলায় সঞ্চিত লবণস্তূপ হইতে ও করাচীর নিকটস্থ **মৌরিপুর** নামক স্থান হইতে। থারপার্কারের লবণ,—বায়ুবাহিত হইয়া আসিয়া যুগে-যুগে এখানে সঞ্চিত হইয়া আছে ;—স্থানে-স্থানে এই লবণস্তূপের গভীরতা ৬ ফুট ;—ইহাতে সমস্ত পাকিস্তানের ২ হাজার বৎসর চলিতে পারে। মৌরিপুরে সূর্য্যতাপে সমুদ্রজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। এখানে বৎসরে প্রায় ৫ কোটি মণ লবণ প্রস্তুত হয়।

(২) পাকিস্তানের লবণের খনি বিখ্যাত। পশ্চিম-পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে **লবণ-পর্ব্বত** (Salt-Range) নামে এক পর্ব্বত আছে। ইহা লবণময় স্তরে গঠিত। ইহার ঝেলাম জেলার **খেউরা** খনি হইতে ও কোহাট জেলার **বাহাদুরখেল** খনি হইতে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টন বিশুদ্ধ সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়।

ভারতে মাথা-পিছু লবণ খরচ ধরা হয় ১৩ পা.। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে লবণ উৎপন্ন করা হইয়াছিল—

সালে	পরিমাণ	মূল্য
১৯৪৭	১৫,৪০,৩৫৩ টন	২,৪৬,৮৯,৭৯৪
১৯৪৮	২২,৬৪,৫৩৬ „	৪,৩৩,৮৮,৬৬৭
১৯৪৯	১৯,৯০,১১৯ „	৪,১৩,৩৫,৯৫১

ইহা ছাড়াও—ভারতের ৩,৫০০ মাইল সমুদ্রোপকূল থাকা সত্ত্বেও—প্রায় ১ কোটি মণ আমদানি করিতে হয়।

লবণ মানুষমাত্রেরই অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য। তথাপি কি মোগল যুগে, কি বৃটিশ যুগে ইহার উপর ট্যাক্স আদায় করা হইত। ১৯৪৭ সালে বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট নুনের ট্যাক্স তুলিয়া দেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই ; ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ৯½ লক্ষ টাকার আয় কমিয়া যায়, অথচ লবণের মূল্য বাড়িয়া যায়,—কোন-কোন স্থানে দুষ্প্রাপ্য হয় ;—কেবল ব্যবসায়িগণ ও কতকগুলি পাইকের অসদুপায়ে অর্থ লাভ করে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ঐ ট্যাক্স পুনরায় প্রবর্ত্তন করেন। লবণশিল্পের উন্নতির জন্য—ইহার উৎপাদন বাড়াইবার ও মূল্য কমাইবার জন্য—গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ২৩শে এপ্রিল গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি তাহাদের নিজের জমিতে লবণ উৎপাদন করিতে পারিবে, তজ্জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে না।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে প্রধানতঃ যানবাহনের অসুবিধার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে লবণ আসিতে পারে না, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রও নিজের অভাব মিটাইয়া তাহাকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারে না। সেজন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তানে লবণ দুর্ম্মূল্য হইয়া থাকে।

১১। সোরা (Saltpetre)

সোরাও একপ্রকার লবণ,—ইহা শিল্প-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশুর পচা মলমূত্র, মাটি ও কাঠের ছাই-এর সঙ্গে মিশাইয়া আমাদের দেশে দেশীমতে সোরা তৈয়ার করা হইত। বিহার, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর কয়েকস্থানে মাটি হইতেই সোরা পাওয়া যায়। সেই সোরা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। জমির সার, নাইট্রিক অ্যাসিড, বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সোরা দরকার হয়। পূর্ব্বে এদেশ হইতে ইউরোপে প্রচুর সোরা রপ্তানি হইত। কিন্তু এক্ষণে আমেরিকার চিলি দেশের আটাকামা মরু হইতে বিভিন্ন

দেশে স্বাভাবিক সোরার আমদানি হওয়ার জন্য এবং এখন এ্যামোনিয়া হইতে প্রচুর নাইট্রিক অ্যাসিড ও তাহা হইতে রাসায়নিক সোরা প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ভারতের সোরার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে গত মহাযুদ্ধে সোরার ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। **ভারতে** সোরা-উৎপাদক স্থান—**উত্তর-প্রদেশের** ফরাক্কাবাদ জেলা, পে. প. স্থ. (পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা), পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, বিহার, ও মান্দ্রাজ এবং **পাকিস্তানে**—পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধু। কয়েক বৎসরের উৎপাদন এইরূপ—

সাল	পরিমাণ (টন)	মূল্য (টাকা)
১৯৪৮	২,৯৭২	১১,৩১,৬২২
১৯৪৯	৬,৫৫৪	৩৪,৬৬,৬৫২

১৯৪৭ সালে ভারত হইতে ৬ লক্ষ ৩৪ হা. ৯৬০ টাকার সোরা রপ্তানি হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রধান খরিদ্দার। অন্য খরিদ্দার—চীন, সিংহল প্রভৃতি।

১২। জিপসম (Gypsum)

ইহাও একপ্রকার শিল্পপ্রয়োজনীয় লবণ। নানা বস্তুর ছাঁচ ও প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার জন্য যে-প্লাস্টার-অব-প্যারিস ব্যবহার করা হয়, তাহা এই জিপসমের গুঁড়া হইতেই প্রস্তুত করা হয়। জমির সার দিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়—এবং লবণ-সংসৃষ্ট দেশেই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, **ভারতে** প্রাপ্তিস্থান—**বিহারে**—ভাগলপুর জেলায় ; **উত্তরপ্রদেশে**—গাঢ়ওয়াল জেলায় ; **বিন্ধ্যপ্রদেশে**—সাধলে ; **কাশ্মীরে** ; **রাজস্থানে**—যোধপুর, বিকানীর ও যশল্মীর অঞ্চলে ; **সৌরাষ্ট্রে**—কাথিয়াবাড় অঞ্চলে ; **বোম্বাই রাষ্ট্রে**—বরোদায় এবং **মান্দ্রাজে**—ত্রিচিনোপল্লীতে। রাজস্থান প্রধান উৎপাদন-স্থান—প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ এখান হইতেই পাওয়া যায়।

পাকিস্তানে লবণের খনি-অঞ্চলেই উহা প্রচুর পাওয়া যায় ; যেমন,—**উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের** কোহাট জেলায় ও **পশ্চিম-পাঞ্জাবের** ঝিলাম, মিয়ানওয়ালি ও সাপুর জেলায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ইহা প্রচুর আছে, এবং আবশ্যক হইলে এখান হইতে আরও জিপসম সরবরাহ করা যায়।

১৯৪৭ সালে ৪ লক্ষ ৬৬ হা. ২৮৩ টাকার এবং ১৯৪৮ সালে ৭৮,৯৪৮, এবং ১৯৪৯ সালে ১,৩৯,৯৪৪ টন জিপসম পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের মূল্য যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৯৮ হা. ২৬১ টাকা ও ১১ লক্ষ ১৭ হা. ৯৭২ টাকা।

১৩। ব্যারাইট্স্ (Barytes)

ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ রং তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার চূর্ণ তেলের সহিত মিশাইয়া কাঠ বা লোহার উপর লাগাইলে ইহাদের ক্ষয় নিবারণ হয়। এদেশে ইহার প্রাপ্তিস্থান **—রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ** (অনন্তপুর, কাড্ডাপা, কুরনুল)। **পাকিস্তানে**—বেলুচিস্তান। **উৎপাদন-পরিমাণ**—১৯৪৮ সালে ২৩,১৪৩ টন, ও ১৯৪৯ সালে—২১,১১৮ টন। ১৯৪৭ সালে ৩ লক্ষ ২৯ হা. ৫৫৭ টাকার ও ১৯৪৮ সালে ৩ লক্ষ ৫৯ হা. ৯২৯ টাকার এবং ১৯৪৯ সালে ২ লক্ষ ৯০ হা. ৫৭৯ টাকার ব্যারাইট্স্ পাওয়া গিয়াছিল।

১৪। ইলমেনাইট (Ilmenite)

লোহা প্রভৃতিতে যে সাদা রং দিয়া আচ্ছাদন দেওয়া হয়, সেই সাদা রং তৈয়ার করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—টিটেনিয়ম অক্সাইড্। এই টিটেনিয়ম অক্সাইড্ ইলমেনাইট হইতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ **ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন স্টেটে, কুমারিকা অন্তরীপের নিকট সমুদ্রতীরে** কাল বালির আকারে ইলমেনাইট পাওয়া যায়। অন্য প্রাপ্তিস্থান—**বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, রাজপুতানা** ও **মাদ্রাজ। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইলমেনাইট-উৎপাদক ভারত-যুক্তরাষ্ট্র।** এখানে এই খনিজ উৎপন্ন হইয়াছিল—

১৯৪৪ সালে	১,০০,৭৯৪ টন	১৯৪৭ সালে	২,৬০,৯৫৫ টন
১৯৪৫ „	১,৭২,০৮৬ „	১৯৪৮ „	২,২৯,৪১৬ „
১৯৪৬ „	১,৮৫,০২৩ „	১৯৪৯ „	২,৫০,০২৩ „

১৯৪৭ সালে ৩১ লক্ষ ৫৯ হা. ২৭১ টাকার এবং ১৯৪৮ সালে ২৯ লক্ষ ৯ হা. ৪৫১ টাকার ইলমেনাইট পাওয়া গিয়াছিল।

১৫। মনাজাইট (Monazite)

এই খনিজও কুমারিকা অন্তরীপের নিকট সমুদ্রতীরে ইলমেনাইটের সঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়, এবং ইহার উৎপাদনেও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্ব্বোচ্চ। পৃথিবীর ৮৮% মনাজাইট ভারতবর্ষই প্রদান করে।

গ্যাসের আলো জ্বালিতে যে ম্যাণ্টেল দরকার হয়, সেই ম্যাণ্টেল তৈয়ার করিতে হইলে উহা প্রথমে সূতা দিয়া বুনিতে হয়, পরে উহা থোরিয়ম নাইট্রেট ও সিরিয়ম নাইট্রেটের জলে ভিজাইয়া শুকাইতে হয়। ইহার পরে ঐ ম্যাণ্টেল জ্বালাইলে সূতাটি পুড়িয়া যায় এবং সিরিয়ম ও থেরিয়ম অক্সাইডের আবরণটি শক্ত হইয়া থাকে। ইহাই উত্তপ্ত হইলে আলো দান করে। এই দুই নাইট্রেট মনাজাইট হইতে পাওয়া যায়। তাই মনাজাইটের এত আদর।

ভারতের **সর্ব্বপ্রধান মনজাইট-উৎপাদন-স্থান** ত্রিবাঙ্কুরের কুমারিকা অন্তরীপ সন্নিহিত সমুদ্রতীর। অন্যস্থান—**মহীশূর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার।**

১৬। ক্রোমাইট (Chromite)

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান ক্রোমাইট-উৎপাদক দেশ দক্ষিণ-রোডেশিয়া, তাহার পরে নব-ক্যালিডোনিয়া, তৎপরে রাশিয়া, তাহার পর তুরস্ক, এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করে ভারত ও পাকিস্তান। পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ক্রোমাইট পাওয়া যায় দক্ষিণ-রোডেশিয়া ও নব-ক্যালিডোনিয়া হইতে, আর $\frac{১}{১৫}$ অংশ ভারত-পাকিস্তান হইতে।

এই খনিজ খুব শক্ত ও খুব ভারী। এই খনিজের সঙ্গে লৌহ ও এ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড মিশ্রিত থাকে। ক্রোমাইটের অংশ শতকরা ৫০ ভাগ হইলে, তাহাই উৎকৃষ্ট ক্রোমাইট। লৌহ ও নিকেল প্রভৃতির প্রয়োজনমত অংশে ক্রোমাইট মিশাইলে উহাকে প্রয়োজনমত শক্ত ও ঘাতসহ করা যায়। ক্রোমাইটের ইট খুব তাপসহ বলিয়া চুল্লী গাঁথিতে উহা উৎকৃষ্ট। ইহার দ্বারা চামড়া রং করিয়া ক্রোম চামড়া করা হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে **প্রধান উৎপাদন-স্থান**—

(১) **মহীশূর,**—মহীশূর, হাসান, কডুর, চিতলদ্রুগ।

(২) **বিহার**—সিংহভূম, সরাইকেল্লা।

(৩) **উড়িষ্যা**—কেঁওনঝড়।

(৪) **বোম্বাই**—রত্নগিরি।

(৫) **মান্দ্রাজ**—সালেম।

পাকিস্তানে ক্রোমাইট। বেলুচিস্তানে—ঝবজেলা। এখানকার ক্রোমাইট উৎকৃষ্ট,—এবং ভারত-পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও বেশী ক্রোমাইট এখানে উৎখাত হয়। এই খনিজের প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। ইহার

উৎপাদন-পরিমাণ—১৯৪৮ সালে ২২,৫৫৫ টন, ও ১৯৪৯ সালে ১৯,৪১৬ টন ১৯৪৭ সালে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার, ১৯৪৮ সালে ৭ লক্ষ ৫ হা. ৯৬৩ টাকার এবং ১৯৪৯ সালে ৬ লক্ষ ২৫ হা. ৩০৬ টাকার ক্রোমাইট রপ্তানি হইয়াছিল।

পাকিস্তান হইতে বৎসরে মোটামুটি ১২ হাজার টন ক্রোমাইট পাওয়া যায়।

১৭। গন্ধক (Sulphur)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে গন্ধক নাই। পাকিস্তানে আছে,—বেলুচিস্তানের সিন্নি নামক স্থানে, এবং কোহ্ই-স্থলতান নামক আগ্নেয়গিরির কাছে চিত্রল স্টেটে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। কোহ্ই-স্থলতান গন্ধক-রপ্তানির প্রধানকেন্দ্র। খয়েরপুর ও জ্যাকোকাবাদেও গন্ধক মিলিতেছে। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত বৎসরে গড়ে ২২,১০০ টন গন্ধক প্রস্তর উত্তোলিত হইয়াছিল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে জাভা, জাপান ও সিসিলি প্রভৃতি স্থান হইতে গন্ধক আমদানি করিতে হয়। অনুমান করা হয় যে, পশ্চিম-পাকিস্তানে ২ লক্ষ টন গন্ধক সঞ্চিত আছে।

অন্যান্য খনিজ পদার্থ

নাম	প্রাপ্তিস্থান	১৯৪৮		১৯৪৯	
		উৎপাদন	মূল্য (টাকা)	উৎপাদন	মূল্য (টাকা)
১। এস্‌বেস্‌টস	বিহার (সরাইকেলা), মধ্যভারত (ঝাবুয়া), মান্দ্রাজ (কাড্ডাপা), মহীশূর, রাজপুতানা ; পাকিস্তান—চিত্রল, লাবাউল।	৮২ টন	৮,৮১৯	১৪৬টন	৮৯,৮২৫
২। কর্দ্দম (Clay)	বিহার, উ.-প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, বোম্বাই, মহীশূর, হায়দারাবাদ, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা।	৪১,২৪৩ টন	১১,১১,০৪৮	৪২,৩৯৬ টন	১১,৭৩,৭৮৬
৩। কাইনাইট (Kynite)	বিহার (সিংভূম, খরসোয়ান, ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেলা), মান্দ্রাজ (নেলোর), মহীশূর (হাসান)।	১২,৬০৫ টন	৫,৬৮,১৮২	১২,৮২৪ টন	১১,০৭,৮১৮
৪। গ্রাফাইট (Graphite)	মধ্যভারত (বেটুল), মহীশূর (কোলার), উড়িষ্যা (ঢেনকানল, কোরাপুট, সম্বলপুর)।	১,৬৪৯ টন	২,৬৪,৩৪৯	১,০৯৫ টন	১,২৪,৫১৯
৫। ফেল্ডস্‌পার (Feldspar)	আজমীঢ়, মধ্যপ্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বোম্বাই, মহীশূর।	৯৮৭ টন	১০,৪৬৬	৮৪৯ টন	১১,১০১ -
৬। ম্যাগ্‌নেসাইট (Magnesite)	মান্দ্রাজ (সালেম, ত্রিচিনোপল্লী, কইম্বাটুর), মহীশূর।	৪৮,৩২৭ টন	৬,৬১,০১৫	৯০,৫৬৪ টন	১৫,৫৩,৪৫৬
৭। হীরক (Diamond)	বিন্ধ্যপ্রদেশ (পান্না চরখারি), বিহারে (পালামৌ), মহীশূর (অনন্তপুর)।	২৪২৬ ক্যারাট	৪,১৭,৩৭৩	১,৬৩২ ক্যারাট	২,৭৪,৯৯৫
৮। চূণাপাথর (Limestone)	উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, যোধপুর। পাকিস্তান—সিন্ধু।	৪,০৫৭,৪৯৮ টন	১,৬০,২৮,৮২২	৪,১০১,৪৬৭ টন	১,৫৯,৫১,১৩৭
৯। রৌপ্য (Silver)	মহীশূর (কোলার)	১২,৭৯৭আ.	৬০,২৯১	১১,২৭৫ আ.	৫২,৭১৮

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শক্তির উৎস

কয়লা

প্রয়োজনীয় দ্রব্যহিসাবে পাথুরিয়া কয়লা অতুলনীয়। গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ইহা সর্ব্বপ্রধান, এবং শিল্পদ্রব্য-উৎপাদনে যে-সকল দ্রব্য হইতে শক্তি সংগ্রহ করা হয় কয়লা তাহাদের মধ্যে নানা কারণে মূল্যবান্;—কারণ ইহা প্রচুর সংগ্রহ করা যায়, এবং ইহার মূল্যও, একমাত্র জলশক্তি ব্যতীত, অন্য শক্তি অপেক্ষা কম।

কয়লা-সম্বন্ধে এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ৩১৬ পৃষ্ঠায় ইহার উৎপত্তি-বিবরণ বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে, এবং আরও বলা হইয়াছে, ইহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) পীট, (২) লিগ্‌নাইট (৩) বিটুমিনাস্ ও (৪) এন্‌থ্রাসাইট। পৃথিবীর কোন্ অংশে কিরূপ কয়লা উৎপন্ন হয়, তাহাও সেখানে বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল ভারতবর্ষে কয়লা-সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়লা-উৎখাতকারী দেশ (১৯৪৯ সালে) আ. যুক্তরাষ্ট্র, তারপরে রুশিয়া, যুক্তরাজ্য, সার-সহ জার্ম্মানি, পোলণ্ড, ফ্রান্স, ও জাপানের পরে ভারতের অষ্টম স্থান। সে স্থানও নগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে কয়লা উঠে ৪৩০,৬১৯ সহস্র মে. টন, জাপানে উঠে ৩৮০৬৫ সহস্র মে. টন, আর ভারতে উঠে ৩১,৯৬২ সহস্র মে. টন। ঐ বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে কয়লা উৎখাদিত হইয়াছিল মোটামুটি ১৬৩ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন।

কয়লা-সম্পদ্—সমগ্র পৃথিবীতে মোটামুটি ৪ লক্ষ ৫২ হা. ৮৭০ কোটি মেট্রিক টন কয়লার ভাণ্ডার ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে। তন্মধ্যে রুশিয়া বাদে এশিয়াতে আছে ৩৩ হা. ২শত ৩০ কোটি মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে ৬ হা. ২১৪ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ভারতবর্ষের অংশ। কিন্তু ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানিক Cyril S. Fox সাহেবের মতে ভারতবর্ষে ভূগর্ভে ৬০০০ কোটি টন সকল প্রকার কয়লার ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই পরিমাণ হইতে শতকরা কুড়িভাগ ছাই, ও খারাপ কয়লা বাদ দিলে এবং মাত্র ১০০০ ফিটের অনধিক গভীর স্থানের হিসাব ধরিলে ভারতের কয়লা-ভাণ্ডারের ভাল কয়লার পরিমাণ ২,০০০ কোটি টন মাত্র হয়। এই স্থানে স্মরণ রাখা আবশ্যক আবিষ্কৃত খনির কয়লা গণনাক্রমে হিসাব করিয়া এই অঙ্ক অনুমান করা হয়। আবার নূতন খনি আবিষ্কৃত হইলে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

ফক্স সাহেবের হিসাবক্রমে ভারতে নিম্নলিখিত রূপ কয়লা সঞ্চিত আছে—

গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডে খনিভেদে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ*

(কোটি টন)

	কয়লা-ক্ষেত্র	মোট সঞ্চিত ভাণ্ডার	উৎকৃষ্ট কয়লা
১।	দার্জ্জিলিং ও পূর্ব্ব-হিমালয় প্রদেশ	১৫	২
২।	গিরিডি, দেওঘর ও রাজমহল পাহাড়	৩৫	১৩
৩।	রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো ও করণপুরা	২,৫০০	১,০০০
৪।	শোণ-উপত্যকা (আওরাঙ্গা হইতে উমারিয়া ও সোহাগপুর)	১,০০০	২,০০০
৫।	ছত্রিশগড় ও মহানদী (তালচের)	৫০০	১২০
৬।	সাতপুরা অঞ্চলে মোপানি হইতে কনহান এবং পেঞ্চ উপত্যকা	১৫০	২৫
৭।	ওয়ার্দ্ধা-গোদাবরী—ডয়ারোরা হইতে বেদাদানুরু	১,৮০০	৬৪০
	মোট	৬,০০০	২,০০০

উপরি-উক্ত ২,০০০ কোটি টন উৎকৃষ্ট কয়লার মধ্যে ৫০০ কোটি টন সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অত্যুচ্চ তাপ উৎপাদনের যোগ্য। এই ৫০০ কোটি টনের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে এক হাজার ফিট্ গভীর অংশ পর্য্যন্ত ৩৫০ কোটি টন, এবং তন্নিম্নে এক হইতে দুই হাজার ফিট্ অংশ পর্য্যন্ত স্থানে ১৫০ কোটি টন কয়লা অবস্থিত বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভারতের কয়লাক্ষেত্র।—ভূতাত্ত্বিকগণ কয়লার প্রাচীনতা হিসাবে ভারতের প্রধান কয়লা-ক্ষেত্র দুই ভাগে ভাগ করিযাছেন—(১) গণ্ডোয়ানা কয়লার ক্ষেত্র, এবং (২) টার্সিযারি (Tertiary) কয়লার ক্ষেত্র। টার্সিয়ারি যুগ ৬ কোটি বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইযাছে, এবং এক্ষণে টার্সিয়ারি-পরবর্ত্তী যুগ চলিতেছে। স্থতরাং টার্সিয়ারি যুগের কয়লা আধুনিক, এবং গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডেরক য়লা অতিপ্রাচীন—২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বের।

গণ্ডোয়ানা-পর্য্যায়ের কয়লা পাওয়া যায়—

(১) পশ্চিমবঙ্গে—রাণীগঞ্জ ও দার্জ্জিলিং।

রাণীগঞ্জে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৮৬৮ কোটি টন, বৎসরে ভারতের এক-চতুর্থাংশ কয়লা এখানে উৎখাত হয়। দার্জ্জিলিং-এ তিনধারিয়া হইতেও কয়লা পাওয়া যায়।

* ভারতের পণ্য।

ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র অঞ্চল
কয়লাক্ষেত্র- , রেলপথ
পথ , রাজ্যের সীমানা
গোমো
কাত্রাসগড়
ধানবাদ
কুসুন্দা
লয়াবাদ
মালকেরা
খরখরি
ঝরিয়া
চন্দ্রপুরা
জামুনিয়াতাড়
তালগরিয়া
বেরমো
সুদামদি
ভোজুদি
সাঁওতালদি
রুকনি
আনারা
জয়চণ্ডীপাহাড়
আদ্রা
ইন্দ্রবিল
মুরাদি
দামোদর
আসানসোল
রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র
সীতারামপুর
কুলটি
বরাকর
সালানপুর
শ্রীঅতুল

৩৬নং চিত্র
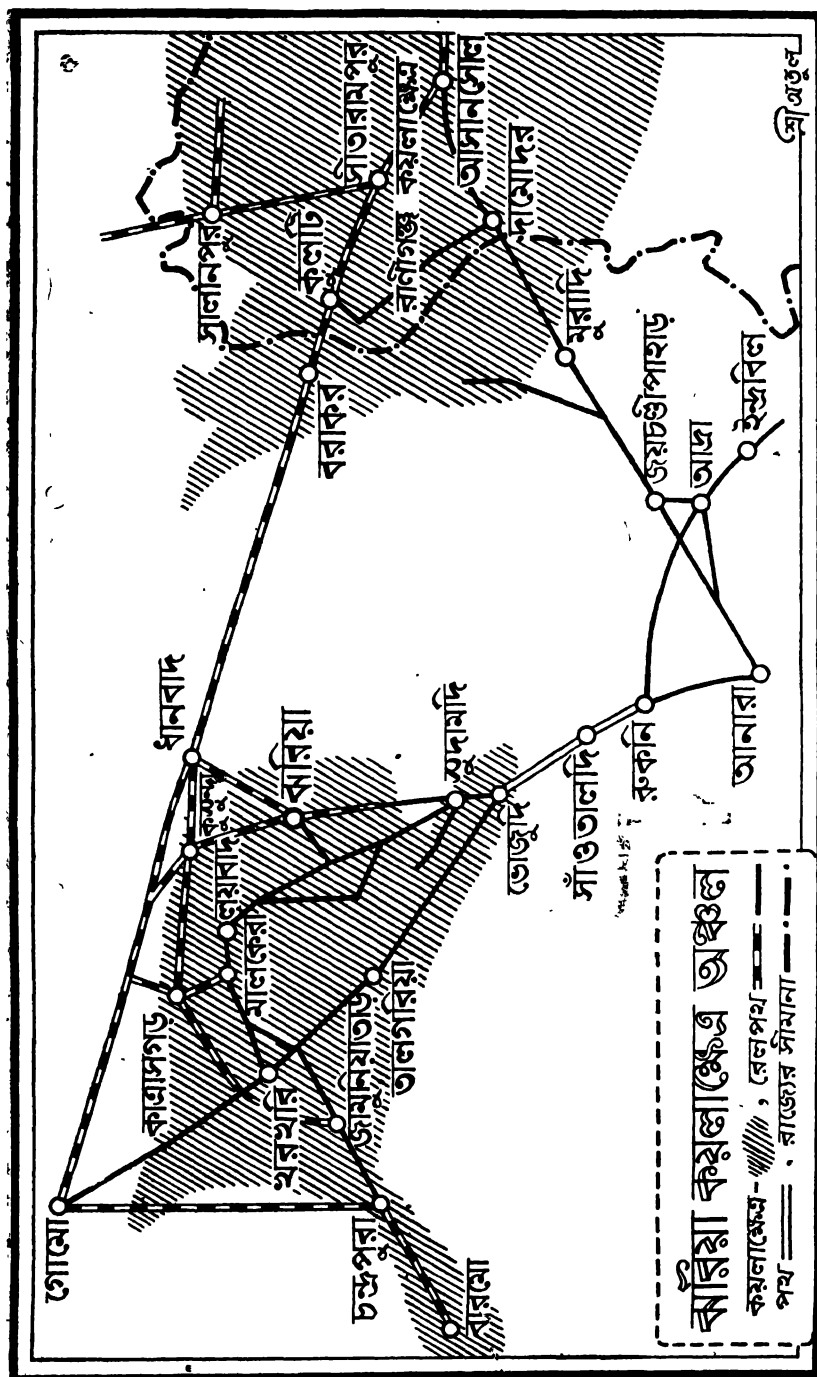
(২) বিহারে—(ক) ঝরিয়া-বলয়—ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো, করণপুরা, (খ) গিরিডি (হাজারিবাগ), (গ) রাজমহল পাহাড়।

এই সকল খনি দামোদর-উপত্যকায় অবস্থিত। এই খনির মধ্যে ঝরিয়া-বলয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—এখানে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ—১ সহস্র ফিটের মধ্যে ৩১২ কোটি ২০ লক্ষ টন, এবং তৎপরে ২ সহস্র ফিটের মধ্যে ৪২০ কোটি টন। গিরিডির সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ২ কোটি টন। রাজমহলের পরিমাণ ৫ কোটি টন। ভারতবর্ষে কয়লা-উৎপাদনে বিহারের স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভারতের ৮২ শতাংশ কয়লা প্রতি বৎসর এখান হইতে উৎখাত হয়।

(৩) উড়িষ্যায়—তেলচের এবং রামপুর (রায়গড় হিঙ্গির) কয়লা-ক্ষেত্র।

তেলচরের ক্ষেত্র ব্রাহ্মণী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত,—ইহার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১০ হইতে ১৫ কোটি টন। তেলচর হইতে মোটামুটি ১·৫৮ এবং রামপুর হইতে ০·১৬ শতাংশ কয়লা উৎখাত হয়।

(৪) মধ্য-ভারত—সোহাগপুর (রেওয়া), উমারিয়া ;—এই অঞ্চলে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ—৪০৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন। এখান হইতে ১·১৯ শতাংশ কয়লা উৎখাত হয়।

(৫) মধ্যপ্রদেশ—(১) ওয়ার্দ্ধা উপত্যকায় বল্লারপুর, ওয়ারোরা প্রভৃতি।
(২) সাতপুরা উপত্যকায়—মোহপানি, সাপুব প্রভৃতি ও পেঞ্চ উপত্যকার খনি।
(৩) ছত্রিশগড় অঞ্চল।

এই অঞ্চলে পেঞ্চ উপত্যকা সর্ব্বপ্রধান। এখান হইতে মোটের উপর ৪·৮৯ শতাংশ কয়লা পাওয়া যায়।

(৬) হায়দারাবাদ—সিঙ্গরেণী, তন্দুর, ষষ্ঠী প্রভৃতি। এখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খনি সিঙ্গরেণী, তৎপরে তন্দুর। এখান হইতে ৪·২৭ শতাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়।

গণ্ডোয়ানা-অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্রগুলিই প্রধান, এবং এখান হইতে ৯৮ শতাংশেরও অধিক কয়লা প্রতি বৎসর উৎখাত হয়। ইহা প্রধানতঃ বিটুমিনাস্ কয়লা। কেবল হিমালয় অঞ্চলের ও রাণীগঞ্জের সালানপুর খনির কয়লার কতকাংশ এন্থ্রাসাইট্।

টার্সিয়ারি-পর্য্যায়ের কয়লা পাওয়া যায়—

(১) আসামে—খাসী ও জয়ন্তীপর্ব্বত, নাগাপর্ব্বত, মাকুম ও লখিমপুর খনি।

(২) রাজপুতানায়—বিকানীর।

এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত—

(৩) পশ্চিম-পাঞ্জাবে—ঝেলাম, মিয়ানওয়ালি ও সাপুর। **(৪) বেলুচিস্তানে, (৫) কাশ্মীর।**—এই টার্সিয়ারি অঞ্চলের কয়লা প্রধানতঃ লিগ্‌নাইট্—কতকাংশে বিটুমিনাস্।

কোক-কয়লা।—গ্যাস ও ধাতুশিল্পের জন্য বিটুমিনাস্-কয়লা কোক--কয়লায় পরিণত করা হয়। এই কোক-কয়লা গৃহস্থের চুল্লীতেও ব্যবহার করা হয়। কাঠের সহিত কাঠ-কয়লার যে সম্পর্ক প্রকৃত পক্ষে কয়লার সহিত কোক-কয়লার সেই সম্পর্ক। কিন্তু বিটুবিনাস্-কয়লা মাত্রই কোক-কয়লায় পরিণত হয় না। সাইরিল ফক্স্ সাহেবের মতে, ভারতে কোক-কয়লার উপযুক্ত বিটুমিনাস্ কয়লা মাত্র ১৭০ কোটি টন আছে। তন্মধ্যে—সহস্র ফিট্ গভীরতার মধ্যে ১১২ কোটি টন এবং তন্নিম্নে দুই সহস্র ফিট্ পর্য্যন্ত ৫৮ কোটি টন মাত্র।
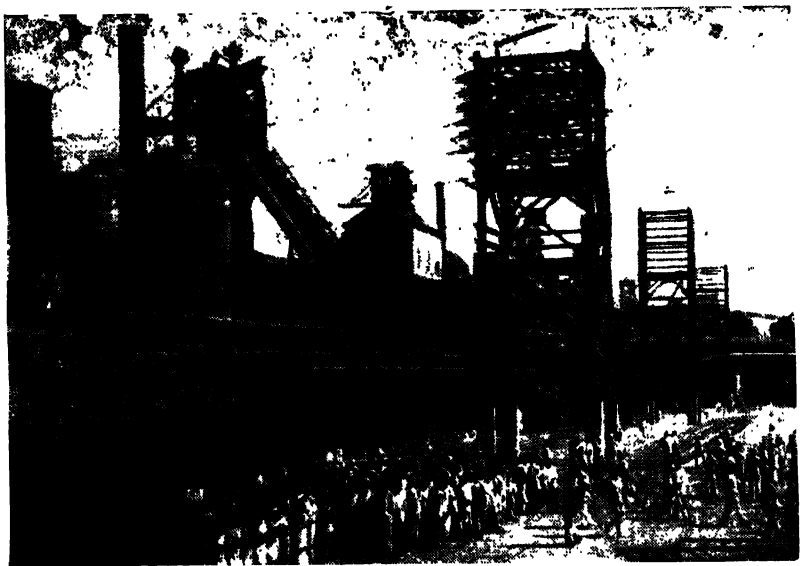
৩৭নং চিত্র।—কোক-চুল্লী

প্রধানতঃ উন্মুক্ত স্থানে পোড়াইয়া জলন্ত কয়লাতে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইলে যে-কয়লা পড়িয়া থাকে তাহাই কোক-কয়লা। **কোক-চুল্লী** (coke oven) **নামক বিশেষ** চুল্লীতে কয়লা উত্তপ্ত করিয়া গ্যাস বাহির করিয়া দিলে তাহা কোকে পরিণত হয়। পাশ্চাত্যদেশে শেষোক্ত উপায়েই কোক-কয়লা করা হয়। ভারতবর্ষে

কয়েকটি লৌহঢালাই কারখানা ও গ্যাস কোম্পানির কারখানা ব্যতীত সর্ব্বত্রই প্রথমোক্ত উপায়ে কোক-কয়লা করা হয়।

উৎপাদন।—একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে, ১৮৩৯ সালের হিসাবে, দেখা যায় যে, সে-বৎসর ৩,৬০০ টন কয়লা উৎখাদিত হইয়াছিল। ইহার পরে ক্রমশঃ উৎখাদিত কয়লার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০০ খৃঃ অব্দে ৬১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৯২ টনে উঠিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ এইরূপ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, এবং যুদ্ধকালে কয়লার চাহিদাও বিশেষ বাড়িয়া যায়।

৩৮নং চিত্র।—কয়লাখনির গভীরতা;—নীচে জলপ্লাবনের জন্য খনির কার্য্যে অসুবিধা।
Courtesy : Amit Chaudhury

সেজন্য ১৯১৯ সালে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ হয় ২ কোটি ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৭ টন। ইহার পরে (১) যুদ্ধের চাহিদা একেবারে কমিয়া যায়, (২) মালগাড়ীর সংখ্যাও কমিয়া যায়, (৩) মজুরের মজুরি কমিয়া যায়, এবং (৪) খনিগর্ভে স্বতঃসম্ভূত অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই সকল কারণে ১৯২০ সালে উৎখাত কয়লার পরিমাণ (১,৭৯,৬২,২১৪ টন) কমিয়া যায়। এই সময়ে বিদেশী কয়লার আমদানি আরম্ভ হয়। পর বৎসরই উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ কিছু বাড়ে বটে, কিন্তু ১৯২২ সালে ঝরিয়া-ক্ষেত্রে বন্যা হয়। সেজন্য ১৯২১ সালে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টন কয়লা পাওয়া গেলেও ১৯২২ সালে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন কয়লা উঠে। কিন্তু মোটের উপর এই সময়ে কয়লার উৎপাদন

কম থাকে, এবং ক্রমশঃ উৎপাদন বাড়িলেও ১৯২৭ সাল পর্য্যন্তও উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ১৯১৯ সালের পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন ছিল। ১৯২৮ সালে উৎখাত কয়লা ১৯১৯ সালের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প বেশী হইল। ১৯৩০ সালে দেশের আর্থিক অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া উঠিল। সেজন্য অনেক খনির কাজ বন্ধ হইয়া গেল, এবং ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত কখনও কম কখনও বেশী হইলেও, মোটের উপর খনির কাজ কমিয়া গেল, উৎখাত কয়লার পরিমাণও কমিল। ১৯৩৭ হইতে কয়লার পরিমাণ উর্দ্ধমুখী হইল।

১৯৪৯ সালে কয়লার উৎপাদন*

স্টেট	উৎপন্ন কয়লা (সহস্র টন)	মোট কয়লার শতকরা যত অংশ	মূল্য (সহস্র টাকা)
১। বিহার	১,৭৩,৪১	৫৪'৭	২৪,৭৩,৯০
২। প. বঙ্গ	৮৮,০৩	২৭'৭	১৩,৪৩,১৫
৩। মধ্যপ্রদেশ	২৯,৪৩	৯'৩	৪,৩৩,১১
৪। হায়দারাবাদ	১০,৯২	৩'৫	২,৫১,৮৫
৫। বিন্ধ্যপ্রদেশ	৬,৬০	২'১	৯২,২৬
৬। উড়িষ্যা	৩,৯৭	১'৩	৬০,১৪
৭। আসাম	৩,৮৬	১'২	৯৩,২৫
৮। রাজস্থান	৬৭	০'২	৭,৮২
৯। কাশ্মীর	২	—	৭৬
মোট	৩,১৬,৯৫	১০০.০	৪৭,৫৬,৩৬

ব্যবহার।—শিল্পোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে কয়লার চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে, এবং শিল্পোন্নতি না হইলে কয়লার চাহিদা আর বাড়িবে না। (১) রেল-ইঞ্জিনে ও কারখানায়, (২) বিদ্যুৎ-সরবরাহ-কেন্দ্রে, (৩) লৌহশিল্প-কেন্দ্রে, (৪) সিমেণ্ট-শিল্পে, (৫) তুলার কলে, (৬) পাটের কলে, (৭) রাসায়নিক দ্রব্য-উৎপাদনে, (৮) কাগজের কলে, (৯) ইষ্টক পোড়াইতে, ও (১০) ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে এবং আরও কয়েকটি ছোট-ছোট কারণে ইহার আবশ্যক হয়। ইহা ব্যতীত অল্পাংশ রপ্তানি করা হয়। নিম্নে পাঁচ বৎসরের **মাসিক** গড়পড়তা হিসাব† দেওয়া গেল—

* Indian Minerals

† Monthly Abstract of Statistics, Gov.. of India,

বৎসর	উত্তোলিত কয়লা সহস্র টন	রেলপথ-সংক্রান্ত কারণে সহস্র টন	বিদ্যুৎ-সরবরাহ হেতু সহস্র টন	লৌহ-শিল্পে সহস্র টন	সিমেণ্ট-শিল্পে সহস্র টন	তুলার কলে সহস্র টন
১৯৪৭	২৫,৯৮	৯৬৫	১১৮	২৬৩	৬৭	১৫৯
১৯৪৮	২৪,৮৫	৭৯৬	১৬০	২৩৯	৫৬	১৫৬
১৯৪৯	২৬,২১	৮৪১	১৭৪	২৭৯	৬২	১৫০
১৯৫০	২৬,৬৬	৮২৫	১৮৭	৩০২	৭৭	১৩৯
১৯৫১	২৮,৫৯	৮৯৯	১৮৯	৩২১	১০০	১৩৩

বৎসর	পাটশিল্পে সহস্র টন	রাসায়নিক দ্রব্য-উৎপাদনে সহস্র টন	কাগজ-শিল্পে সহস্র টন	ইষ্টক-শিল্পে সহস্র টন	ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে সহস্র টন	অন্যান্য সহস্র টন	রপ্তানি সহস্র টন
১৯৪৭	৪৩	১২	২৬	৩৭	১৭	২৯৬	১১৫
১৯৪৮	৫৩	১২	৩৪	৫৭	১৯	৩২০	১৪৬
১৯৪৯	৪৮	১২	৩৬	১০২	২৩	৩৮৫	১২৭
১৯৫০	৪৮	১৬	৩৮	১৪৩	৩০	৪১২	১৪০
১৯৫১	৪১	১৫	৪০	১০৯	২৬	৪১১	২১৪

উপরি-লিখিত তালিকা হইতে বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রতি বৎসর কয়লার কিরূপ বণ্টন হয়, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব বুঝিতে পারা যায়। স্থানীয় শিল্পের জন্য মোটামুটি প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত শতাংশ কয়লা ব্যবহৃত হয়—

শিল্প	দেশের কার্য্যে ব্যবহৃত মোট কয়লার শতকরা অংশ	শিল্প	দেশের কার্য্যে ব্যবহৃত মোট কয়লার শতকরা অংশ
রেলগাড়ী	৩২	সিমেণ্ট	২
লৌহ ও ইস্পাত	১১	আভ্যন্তরীণ স্টিমার	২
কার্পাস	৭	ইঞ্জিনিয়ারিং	২
বিদ্যুৎ-সরবরাহ	৬	কাগজ	১
ইষ্টকাদি নির্ম্মাণ	৪	রাসায়নিক দ্রব্য	১
পাট	২	অন্যান্য	৩০

১০০%

ভারতবর্ষে কয়লা-উত্তোলন ক্রমশঃ বাড়িয়াছে বটে, এবং তাহাতে খনির কার্য্যও ক্রমশঃ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু খনির উন্নতি, খনি-সংরক্ষণ, কয়লার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সময়ে-সময়ে এবিষয়ে কমিটি প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা নানা উপদেশও দিয়াছেন, কিন্তু উন্নতি-সম্পর্কে খুব বেশী কাজ হয় নাই। এস্থলে খনির উন্নতির সহায়ক কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

কয়লাশিল্পের উন্নতির অন্তরায় ও প্রতিকার

১। ভারতবর্ষে বিভিন্ন কয়লাখনির পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ পার্থক্য আছে। খনিগুলি অধিকারী-ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—**(১) খাস খনি।**—রেল কোম্পানী, লৌহশিল্প কোম্পানি প্রভৃতি নিজেরা খনি কিনিয়া, নিজেরাই

৩৯নং চিত্র।—ভূগর্ভের আলোড়নে খনির কয়লাস্তরের স্থানচ্যুতি।
Courtesy : Amit Chaudhury

কয়লা তোলাইয়া নিজেদের কাজেই সেই কয়লা ব্যবহার করেন। **(২) কোম্পানির খনি।**—কোন-কোন কোম্পানি কয়লার খনি কিনিয়া বা ইজারা লইয়া কয়লার ব্যবসায় করেন। যদিও তাঁহারা আবশ্যকমত প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। খাদের উন্নতি করা বা ভবিষ্যৎ উন্নতি তাঁহাদের চিন্তার বাহিরে। ভারতে এখনও বিদেশী, প্রধানতঃ ইংরাজ, কোম্পানিই

এগুলির অধিকারী। সুতরাং তাঁহাদের খনির ভবিষ্যৎ দেখিবার দরকারই থাকে না। **(৩) ব্যক্তিগত খনি।**—এই সকল খনি কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা পরিবার-বিশেষের সম্পত্তি। সাধারণতঃ এই সকল খনি ছোট—যাঁহারা ইহার স্বত্বাধিকারী তাঁহারা উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না, উপযুক্ত লোক রাখিতে পারেন না, যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করিতেও পারেন না। কখনও-কখনও একই ব্যক্তির নানা ব্যবসায় থাকে,—তিনি কোন ব্যবসায়েই ভাল নজর দিতে পারেন না! এই সকল কারণে খনির কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, ও খনিরও ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়।
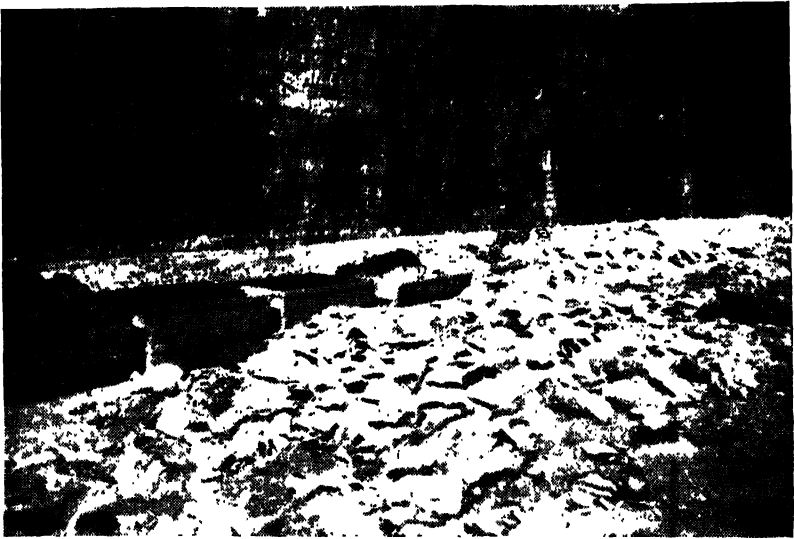
৪০নং চিত্র।—কয়লাখনির অভ্যন্তর ;—বৃষ্টিতে খাদের পার্শ্ব হইতে ভগ্ন প্রস্তরস্তূপ ও মাটি প্রভৃতি তলদেশে জমা হইয়াছে।

Courtesy : Amit Chaudhury

২। ডাঃ ওয়াডিয়া Mining, Geological and Metallurgical Institute of India-র ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, খনিজ দ্রব্যের সেলামীর সামঞ্জস্যের অভাব খনিজ শিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত। সুতরাং যাঁহার জমিদারীতে খনি থাকে, তিনিই সেই খনির স্বত্বাধিকারী, তিনিই কাহাকেও কোন সর্ত্তে খনি ইজারা দেন। এই সকল সর্ত্ত একই প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ভারতের অন্য অংশে খনিগুলি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। খনি হইতে যে-কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহার টন প্রতি একটা মূল্য গবর্ণমেণ্ট পাইয়া থাকেন। এই মূল্যের হার

বঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন জমিদারের খনিতে বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেক স্থলে ইহা সমগ্র ইজারাকালের জন্য একই। কিন্তু অন্যত্র ইহা নানা কারণে সময়ে-সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট সময়েও বিভিন্ন হয়। ইহাতে ইজারাদারগণ নিজের-নিজের ইজারার জন্য দেয় টাকার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই খনির কাজ চালান।

এই সকল খনির আর এক অসুবিধা এই যে, ইহাদের ইজারাকাল সমান নহে। কেহ-কেহ চল্লিশ, কেহ পঞ্চাশ, কেহ বা তদ্রূপ কোন সময়ের জন্য ইজারা লইয়া থাকেন। যাহাই হউক তাঁহারা সেই অল্প সময়ের মধ্যে খনির কয়লা নির্ম্মমভাবে তুলিয়া থাকেন ও খনির ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দেন।

এই সকল বিষয়ের প্রতিকার হওয়া দরকার,—এবং সর্ব্বত্র একই নিয়মে একই হারে ইজারা দেওয়া দরকার।

৩। কয়লার ব্যবসায়ের আর এক অন্তরায় যানবাহন। যানবাহনের সুবিধা না থাকিলে খনির কার্য্য বাড়িবে না। ভারতবর্ষে কয়লাশিল্পের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৭৭৪ সালে রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লার খাদের কিছু কার্য্য হইলেও এই শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। কারণ, তখন দামোদর নদীদ্বারা নৌকাপথে কয়লা চালান দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অবশেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ ১৮৫৫ সালে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইলে রাণীগঞ্জ-অঞ্চলে কয়লাখনির কার্য্য বাড়িয়া যায়। ইহার পরে ঝরিয়া অঞ্চলেও ১৮৯৪ সালে রেলপথ বিস্তৃত হইলে তবে সে-অঞ্চলে কয়লাখনির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ও রেলপথ-বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে খনির কার্য্য বাড়িয়াছে। ভারতের অন্য-অন্য অংশেও রেলপথ-বিস্তৃতির সহিত খনির কার্য্যের বিস্তৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলপথের মাশুল-হ্রাসও কয়লাশিল্পের উন্নতির ও খনির বৃদ্ধির অন্য কারণ।

১৯২৪ সালে এদেশে **ভারতীয় কয়লা কমিটি** (Indian Coal Commitee) স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সালে এই কমিটি কয়লাশিল্পের উন্নতি ও রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য যে-পরামর্শ দেন, তাহাতে অন্য উপদেশের সহিত ইহা বলিয়াছিলেন যে, রেল কোম্পানি ও পোর্টকমিশন কয়লা-চলাচলের, ও কয়লা বোঝাই করার সুবিধা করিলে, ও মাশুল হ্রাস করিয়া দিলে কয়লার ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে।

৪। ১৯২০ সালে মিস্টার টি. রীজ খনির উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা-গ্রহণের উপদেশ দেন :—১। কয়লাখনির সরকারী নিয়ন্ত্রণ, ২। কয়লার ব্যয়-সংক্ষেপ, ৩। কয়লার ব্যয়-সংরক্ষণ, ৪। কয়লার অপচয়-নিবারণ, ৫। আবশ্যকমত মালগাড়ী সরবরাহ, ৬। খনি হইতে কয়লা অপসারিত হইলে খনি বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা।

১৯২৯ সালে ও তাহার পরে এই মর্ম্মে কতক বিধিব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু কয়লার অপচয়-নিবারণকল্পে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া দরকার যে, কেহ যেন ইচ্ছামত কোন বিশেষ শ্রেণীর কয়লা খরিদ করিতে না পারে, এবং কোন-কোন শ্রেণীর কয়লা যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎখাত করা নিষিদ্ধ থাকে। কোক--প্রজনক কয়লা প্রভৃতি রক্ষা করার জন্য ইহা বিশেষ দরকার। কয়লা-সম্পদের পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে হইলে, ও খনির দুর্ঘটনা দূর করিতে হইলে, খনির খালি অংশ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট বালুদ্বারা খনির খালি স্থান পূরণ করার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কয়লা-খনি-নিরাপত্তা (Coal Mines Safety—Stowing Act) আইন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই আইনেরও উন্নতি দরকাব। বালুকা দ্বারা খালি অংশ পূর্ণ করিবার জন্য উপরি-উক্ত রীজ সাহেব টন প্রতি আট আনা শুল্ক আদায়ের উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় কয়লাক্ষেত্র কমিটি (Indian Coalfield Committee) প্রতি টন কয়লার উপর একটাকা দুই আনা, এবং প্রতি টন শক্ত কোকের উপর একটাকা শুল্ক সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আরও অনেক করিবার আছে।

৫। ১৯২৫ সালের ৩১ আইন (Act XXXI of 1925) অনুসারে কয়লার শ্রেণীবিভাগ কমিটি (Coal Grading Board) রপ্তানিযোগ্য কয়লার গুণানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে শ্রেণী-অনুসারে মান নির্ণয় করা সহজ হয়। এই শ্রেণী-নিরূপণকল্পে প্রথমতঃ কয়লাকে উদ্বায়ী ধূমের (Volatile) তারতম্যানুসারে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। ১। নিম্ন উদ্বায়ী (Low Votatile), ২। উচ্চ উদ্বায়ী (High Volatile)। তৎপরে ছাই, ও উত্তাপ-শক্তির অস্তিত্ব অনুসারে প্রত্যেক প্রধান শ্রেণীকে চারিটি অপ্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—(ক) বিশেষ শ্রেণী (Selected grade), (খ) প্রথম শ্রেণী (Grade I), (গ) দ্বিতীয় শ্রেণী (Grade II) ও (ঘ) তৃতীয় শ্রেণী (Grade III)। উৎকৃষ্ট শ্রেণীতে ছাই-এর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনতম থাকে, এবং উত্তাপ-শক্তির তাপাঙ্ক (Calories) উচ্চতম থাকে।

৬। ভারতবর্ষে এখনও কয়লা হইতে উপদ্রব্য (by-product) প্রস্তুত করার বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই। এক্ষণে এদেশে আলকাতরা, পীচ, বেনজল, এ্যামোনিয়া, ন্যাপথলিন, ক্রিওজেট প্রভৃতি মাত্র প্রধান উপদ্রব্য। কিন্তু কয়লার উপদ্রব্যের সংখ্যা অতি-প্রচুর। ভারতে উপদ্রব্য প্রস্তুত করার তিনটি মাত্র কারখানা আছে। সম্প্রতি সার তৈয়ার করার জন্য বিহারে আরও একটি কারখানা বসিয়াছে।

৭। ভারতে সমস্ত কয়লার খনি গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লইয়া জাতীয় সম্পত্তিতে

পরিণত (Nationalise) করিবেন এইরূপ একটি ধূয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কয়লাক্ষেত্র কমিটি (Indian Coalfield Committee) ইহার বিরোধী। হঠাৎ এতবড় প্রতিষ্ঠানের জাতিয়ীকরণ অপেক্ষা ইহার কর্ম্মব্যবস্থা উন্নত করার এবং মূল্য- ও ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যাই এখন বেশী।

আমদানি।—বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে কয়লা আমদানি করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কয়লার ব্যবসায়ে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার এক কারণ এই যে, কয়লা আমদানি করায় আমাদের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ স্বার্থ ছিল,—ইহাতে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের কয়লা-বিক্রয়ের বাজাররূপে নির্দ্দিষ্ট রাখা যাইত, এবং কয়লা আনিবার জন্য জাহাজ-ভাড়া আদায় করিয়াও প্রচুর লাভ করা যাইত। সুতরাং কয়লার আমদানি-মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতে-বাড়িতে ১৮৭৭-৭৮ সালে এক কোটি টাকায় উঠিয়া যায়। ১৮৯৫-৯৬ সালে পর্য্যন্ত আমদানি-মূল্য এক কোটি টাকার ঊর্দ্ধে ছিল, তাহার পরে কোটির নিম্নে নামিয়া যায়। ১৯১২-১৩, ও ১৯১৩-১৪ সালে ইহা অল্প সময়ের জন্য আবার কোটির ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং তাহার পরে আবার কমিতে থাকে। কিন্তু ১৯২২ সালে ঝরিয়া-ক্ষেত্রে বন্যা ও বৃষ্টি, এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে ধর্ম্মঘটের জন্য এদেশে উৎখাতন কমিয়া যায়। সেজন্য ঐ বৎসর ৫ কোটি টাকা অপেক্ষা বেশী টাকার, এবং পর বর্ষে ৩ কোটি টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার কয়লা আমদানি করিতে হয়। ১৯২৫-২৬ হইতে আমদানি কয়লার মূল্য আবার এক কোটি টাকার নীচে নামে। এক্ষণে আমদানি-অঙ্ক একেবারে কমিয়া গিয়াছে।

১৯৪৯-৫০ সালে—৬৯ হাজার টাকা
১৯৫০-৫১ „ —২৫ „ „

রপ্তানি।—রপ্তানি-ক্ষেত্রে ভারতের কয়লার বিশেষ স্থান নাই। কারণ, ভারতের কয়লা গুণে এরূপ হীন যে, দায়ে না পড়িলে কেহ ভারতের কয়লা কিনিতে চায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে কয়লা-রপ্তানির উল্লেখ থাকিলেও ১৮৮৮-৮৯ সালের পূর্ব্বে রপ্তানি-মূল্য লক্ষ টাকায় পৌঁছে নাই,—প্রায়ই কয়েক সহস্র, বা কয়েক শত টাকায় পর্য্যবসিত ছিল,—এমন কি ১৮৮০-৮১ সালে ৫১ টাকায় ১টন মাত্র কয়লা রপ্তানি করা হইয়াছিল। ১৮৮১-৮২ সালে কোন রপ্তানিই নাই। ১৮৯২-৯৩ সাল হইতে রপ্তানি-মূল্যের অঙ্ক বাড়িতে-বাড়িতে ১৯২০-২১ সালে রপ্তানি-মূল্য কোটি (১,৫০,১২,৮৬০) টাকা অতিক্রম করে, কিন্তু পর বৎসরেই অর্থাৎ ১৯২২ সালে আবার নামিয়া যায়। ভারতের অদৃষ্টে ১৯২২ সাল কয়লার ব্যবসায় সম্পর্কে দুঃসময়। ইহা আমদানি সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ১৯২১-২২ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্য্যন্ত

কয়লা-রপ্তানি-মূল্য আর কোটি মুদ্রায় পৌছে নাই। **এই সময়ে বর্ম্মার বিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হেতু** ১৯৩৮-৩৯ হইতে ১৯৪১-৪২ **পর্য্যন্ত** কয়লা-রপ্তানি আবার বাড়িয়া কোটি মুদ্রা অতিক্রম করে। কিন্তু তাহার পরে আবার পড়িয়া যায়। ভারত-বিভাগের পরে পাকিস্তান কয়লা লইতেছে, এবং উহা রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইতেছে। সেজন্য রপ্তানি-অঙ্ক এক্ষণে বেশী হইতেছে।

১৯৪৮ সালে মোট রপ্তানি মূল্য ৩ কো. ৭৫ ল. ১২ হা. টাকা।
১৯৪৯ „ „ „ „ ৪ „ ২৩ „ ৮৪ „ টাকা।
১৯৫০ „ „ „ „ ৩ „ ৪২ „ ৬০ „ টাকা।

ঐ কয় বৎসরে পাকিস্তানে রপ্তানি করা কয়লার মূল্য—

১৯৪৮—৮১,৪৮,০০০ টাকা।
১৯৪৯— ৩,৯৬,১২,০০০ „
১৯৫০— ৪,৯২,০০০ „

অন্য রপ্তানি স্থান—মর্ম্মাগাও, (গোয়া), রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি।

পেট্রলিয়ম (Petroleum)

কি দৈনিক জীবনযাপনে—কি যুদ্ধকার্য্যে, পেট্রলিয়মজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার অতিশয়োক্তি হয় না। কিন্তু পেট্রলিয়ম-উৎপাদনে ভারতের দৈন্য অত্যন্ত বেশী। ১৯৩৭ সালের পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মদেশ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখন পৃথিবীর পেট্রল-উৎপাদন-তালিকায় তাহার সম্মানজনক স্থান ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশ ভারতসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পৃথিবীর পেট্রলিয়ম তৈলের তালিকায় তাহার নাম একেবারে নিম্নদেশে পড়িয়াছে। সাধারণ হিসাবে তাহার বার্ষিক প্রয়োজন ৫০ কোটি গ্যালনের, কিন্তু তাহার মোটামুটি বার্ষিক উৎপাদন ৬ কোটি গ্যালন মাত্র।

১৯৪৮ সালে এবং ১৯৪৯ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীর ০'০৬ শতকরা অংশ মাত্র তৈল উৎপাদন করিয়াছিল।

এক্ষণে **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের** উত্তর-পূর্ব্ব কোণে **আসাম** প্রদেশে অবস্থিত **লখিমপুর জেলায় ডিগ্‌বয় ও পশ্চিম-পাকিস্তানের** উত্তর-পশ্চিম কোণে **পশ্চিম-পাঞ্জাবের** অন্তর্গত **আটক জেলা** হইতে মাত্র তৈল উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে আসামের খনিই অপেক্ষাকৃত বড়।

আসামের তৈল-কেন্দ্র।—আরাকান হইতে যে টার্সিয়ারি শৈলবলয় উত্তর-আসামের ভিতর গিয়াছে, তাহারই এক অংশে ডিগ্‌বয় তৈলখনি অবস্থিত। তাহারই

অন্য অংশে কাছাড় জেলায় বদরপুর ও মাসীপুর নামক স্থানদ্বয়ে তৈলের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তৈল-উৎপাদন হইতেছে না। ডিগ্‌বয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১৮০ মাইল পর্য্যন্ত তৈলের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়।

ডিগবয়ের তৈল মোমপ্রধান। ইহা আসামেই পরিষ্কৃত হয় এবং কলিকাতা অঞ্চলে প্রেরিত হয়। পেট্রলিয়ম হইতে এখানে নানা উপদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। যেমন, পেট্রল, লুব্রিকেটিং তৈল, প্যারাফিন তৈল, মোম, কেরোসিন, অপরিষ্কৃত কেরোসিন, প্রভৃতি।

উৎপাদন

১৯৪৭ সালে ৬৫,১৯২,০০০ গ্যালন।
১৯৪৮ „ ৬৫,৬০৮,০০০ „
১৯৪৯ „ ৬৬,৭১১,০০০ „

পাকিস্তান সমেত

১৯৪৬ সালে ৭৬,৭৬২,০০৯ গ্যালন।
১৯৪৫ „ ৮২,৬৯৫,০০০ „
১৯৪৪ „ ৯৭,৪৫৩,০০০ „

পাকিস্তানের তৈল।—পশ্চিম-পাঞ্জাবের আটক জেলার থাউর ও ধুলিয়ান—এই দুই তৈলক্ষেত্র হইতে প্রধানতঃ পাওয়া যায়। এখানকার তৈল রাওয়লপিণ্ডিতে পরিষ্কৃত হয়। এক্ষণে পাঞ্জাবের ঝিলাম জেলায় এক তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এখানে মোটামুটিভাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের তৈলের এক-তৃতীয়াংশ তৈল পাওয়া যায়।

সমগ্র পৃথিবীর সঞ্চিত খনিজ তৈলের পরিমাণ ২,১৯,৬৫০ লক্ষ ব্যারেল (১ ব্যারেল = ৩৫ গ্যালন)। তন্মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে ১১১০ লক্ষ ব্যারেল তৈল সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

তৈলের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার।—ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর মোটামুটি ৫০ কোটি গ্যালন তৈলের প্রয়োজন আছে। সুতরাং প্রায় ৪৩ কোটি গ্যালন তৈলের জন্য ভারতকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, এবং ইরাণ, ইরাক, আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও প্রভৃতি স্থান হইতে তৈল আমদানি করিতে হয়। তৈলের অভাব কমাইবার জন্য নিম্নলিখিতভাবে চেষ্টা করা উচিত :—

অন্য কোন দ্রব্য হইতে এ্যালকোহল (Power alcohol) প্রস্তুত করিয়া তাহা

খনিজ তৈলের পরিবর্ত্তে জ্বালানিকার্য্যে, বা খনিজ তৈলের সহিত মিশাইয়া শক্তিপ্রজনন-কার্য্যে, ব্যবহার করিলে তৈলের অভাব কতক কমিতে পারে।
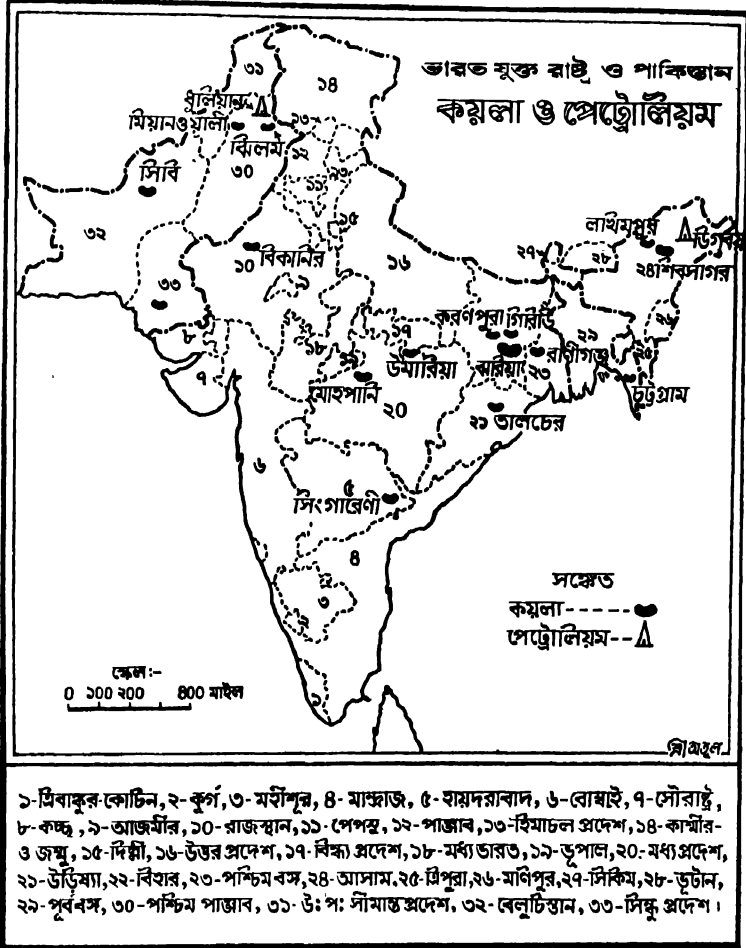
৪১নং চিত্র।

এই সম্পর্কে ভারতে বিশেষ সার্থক চেষ্টা হইয়াছে। ঝোলাগুড় হইতে এ্যালকোহল-শক্তি প্রস্তুত করার জন্য মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। চিনির কারখানা হইতে ঝোলাগুড় লইয়া সুরাসার প্রস্তুত করিলে জ্বালানি তৈলের কার্য্য ইহার দ্বারা চলিতে পারে।

ভারতে ও পাকিস্তানে

প্রদেশভেদে খনিজদ্রব্য

আসাম—পেট্রলিয়ম, কয়লা।

বঙ্গদেশ—কয়লা, লৌহ, লবণ, ফেলড্‌স্পার।

বিহার—কয়লা, লৌহ, অভ্র, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট, মনাজাইট, চুনাপাথর, বক্‌সাইট, স্বর্ণ, ক্রোমাইট, গ্রাফাইট, কাইনাইট, এস্‌বেস্‌টস্‌, ব্যারাইট্‌স্‌, কর্দ্দম, টাংস্টেন, সোরা, ফেল্‌ড্‌স্পার।
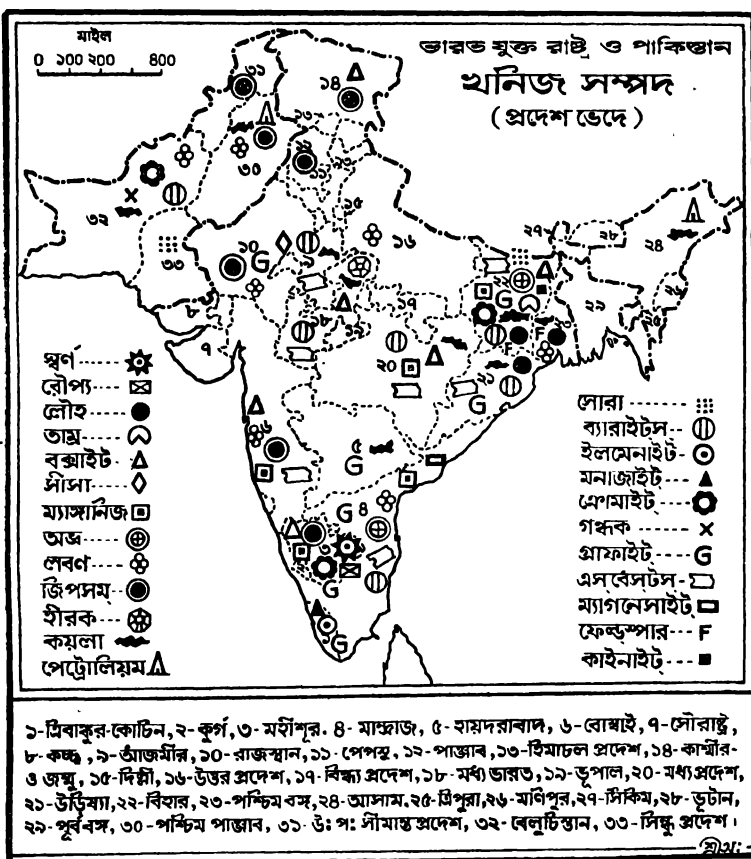
৪২নং চিত্র

উড়িষ্যা—কয়লা, লৌহ, গ্রাফাইট, এস্‌বেস্‌টস্‌, ক্রোমাইট, ব্যারাইট্‌স্‌, ম্যাঙ্গানিজ, লবণ।

উত্তরপ্রদেশ—লবণ, বেলেপাথর, সোরা, ইলমেনাইট।

মধ্যপ্রদেশ—লৌহ, বক্সাইট, গ্রাফাইট, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, ব্যারাইট্স্, এস্বেস্টস্, চূনাপাথর, টাংস্টেন।

পাঞ্জাব—লবণ, পেট্রলিয়ম, কয়লা, জিপসম্, সোরা (পূর্ব্ব ও পশ্চিম)।

কাশ্মীর—জিপসম্, বক্সাইট, তাম্র, ইলমেনাইট।

কচ্ছ—লবণ।

সৌরাষ্ট্র—লবণ, জিপসম্।

সিন্ধু—লবণ, সোরা, চূনাপাথর।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—জিপসম্, এস্বেস্টস্।

বেলুচিস্তান—কয়লা, ব্যারাইট্স্, ক্রোমাইট, গন্ধক।

মধ্যভারত—কয়লা, বক্সাইট, ব্যারাইট্স্, এস্বেস্টস্।

রাজস্থান—লবণ, ব্যারাইট্স্, অভ্র, জিপসম্, ইলমেনাইট, কয়লা, গ্রাফাইট, এস্বেস্টস্।

বোম্বাই—লবণ, লৌহ, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, গ্রাফাইট, ক্রোমাইট, এস্বেস্টস্, জিপ্সম্।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—মনাজাইট্, ইলমেনাইট, গ্রাফাইট, অভ্র, লবণ।

মহীশূর—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, ক্রোমাইট, গ্রাফাইট, ব্যারাইট্স্, মনাজাইট, এস্বেস্টস্, ম্যাগ্নেসাইট।

হায়দারাবাদ—কয়লা, গ্রাফাইট, স্বর্ণ।

মান্দ্রাজ—লৌহ, তাম্র, জিপসম্, লবণ, ম্যাগ্নেসাইট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বকসাইট, এস্বেস্টস্, ইলমেনাইট, মনাজাইট, গ্রাফাইট, ক্রোমাইট।

ভারত-ইউনিয়নে জলের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি-প্রজনন ও তাহার বিস্তৃত ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ—

(১) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে তৈলের উৎপাদন অতি কম, এবং তৈল ও কয়লাযোগে যে-শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহাও প্রচুর নহে, এবং তাহা উৎপাদন ও যথাস্থানে প্রেরণও অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সাধ্য।

(২) এখানে প্রধানতঃ কয়লা হইতে শক্তি উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এদেশে

বঙ্গ ও বিহার ভিন্ন অন্যত্র কয়লা বেশী উৎপন্ন হয় না। সুতরাং কয়লার অঞ্চল হইতে দূরাঞ্চলে কয়লা-প্রবহন অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সাধ্য।

(৩) ভারতে কয়লা হইতে প্রধানতঃ শক্তি উৎপাদন করিয়া রেলগাড়ী চালানো, কল চালানো, সহরে আলো দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু কয়লাখনি চিরস্থায়ী নহে। (পৃথিবী—৩৩৩ পৃ.) একদিন ইহা নিঃশেষ হইয়া যাইবেই; এবং গৃহস্থের ব্যবহারে ও অন্য অনেক রকমে ইহার আবশ্যকতাও বেশী। অন্যতঃ, জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত। সুতরাং যতদূর সম্ভব জল হইতে শক্তি উৎপাদন করিয়া কয়লা সঞ্চিত রাখাই উচিত। এমন কি, যে-অঞ্চলে কয়লা অধিক পরিমাণে আছে, সে-অঞ্চলেও জলশক্তি-উৎপাদন সম্ভব হইলে শক্তি-উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার যথাসম্ভব নিষিদ্ধ করিয়া জলের ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

(৪) এদেশে কৃষির জন্য জলসেচনের বিশেষ দরকার আছে, এবং নদীর জল আবদ্ধ করিয়া বহুস্থানে জলসেচন-কার্য্য চলিতেছে। অনেক স্থলে জলচক্রাদি (৩৩৪ পৃ.) স্থাপন দ্বারা একই স্থান হইতে জলসেচন ও শক্তি-উৎপাদন দুই কার্য্যই সহজে করা যাইতে পারে।

(৫) জলের দ্বারা গতি-উৎপাদক শক্তি-প্রজননে কয়লা ও খনিজ তৈল অপেক্ষা খরচ কম পড়ে।

ভারতের জলশক্তি।—ভারত নদীমাতৃক দেশ। ইহার নদীতে প্রতি সেকেণ্ডে ২৩ লক্ষ ঘনফুট জল প্রতিবর্ষে সরবরাহ হয়। কিন্তু কৃষি ও অন্যান্য কারণে ইহার মধ্যে মাত্র প্রতি সেকেণ্ডে ১,৩৩,০০০ ঘনফুট জল অর্থাৎ মাত্র ছয় শতাংশ প্রতি-বৎসর ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ৯৪ শতাংশ জল বৃথা সমুদ্রে মিশিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও ভূগর্ভে যে-জল আছে, প্রতি সেকেণ্ডে তাহার ৩০ হাজার ঘনফুট জল মাত্র সেচনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দরকার হইলে ভূতল হইতে আরও বহুল পরিমাণে জল পাওয়া যাইতে পারে। ভারতের এত জলসঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও মাত্র ন্যূনাধিক ৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের জলসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার হইলে ২।৩ কোটি কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

এক্ষণে ভারত-পাকিস্তানে (১) শিল্পসৃষ্টির জন্য, (২) জলসেচনের জন্য, ও (৩) সহরে নানা প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে।

জলবিদ্যুৎ-জননের স্থান।—জলবিদ্যুৎ-জননের জন্য কিরূপ স্থান প্রয়োজনীয় তাহা এই পুস্তকের পৃথিবী-খণ্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কোন স্থানে জলবিদ্যুৎ-জননক্ষেত্র স্থাপনের পূর্ব্বে ভাল করিয়া হিসাব করা উচিত যে, যে-নদী হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার অববাহিকা হইতে

কত জল নদীতে পড়ে, উহার গড়ে কত অংশ ঐ নদী দিয়া প্রবাহিত হয়, কত অংশ বাষ্পে পরিণত হয়, এবং কত অংশই বা মাটিতে শুষিয়া যায়,—বৎসরের কোন্ সময়ে বেশী বৃষ্টি হয় ও নদীতে সর্ব্বাপেক্ষা জলের পরিমাণ ও জলস্রোত বেশী হয় এবং বৎসরের কখনই বা নদীতে কম জল থাকে। ভারত ইউনিয়নে বৎসরের মাত্র একই সময়ে, জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহে বেশী বৃষ্টিপাত হয়; অন্য সময়ে কিছু বৃষ্টিপাত হইলেও তাহার পরিমাণ কম। আবার সকল বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সমান নহে। সেজন্য এখানে নদীতে সকল সময়ে জল-সরবরাহ একরূপ থাকে না। ইহাতে জলপ্রবাহের গতির ইতরবিশেষ হয়। এ-কারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনক্ষেত্রে বাঁধ দিয়া জলসঞ্চয়-আধারের সৃষ্টি করিয়া জলসঞ্চয় করিয়া রাখা, ও তাহা হইতে জলের স্রোত শীত-গ্রীষ্ম উভয় কালেই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা, হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পার্ব্বত্য ও পাহাড়-অঞ্চলে অনেকস্থলে, বিশেষতঃ হিমালয় ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলে, বৃষ্টিপাত বেশী—নদীও খরস্রোতা; সেজন্য এই সকল স্থানের নদী জলবিদ্যুৎ-জননের উপযোগী। এজন্য ভারতের জলবিদ্যুৎ-জননের জন্য এই স্থানই নিরূপিত হইয়াছে। সেইজন্য এক্ষণে হিমালয়-সন্নিহিত কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব্ব--পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব (প.) এবং পশ্চিমঘাট-সন্নিহিত বোম্বাই, মহীশূর ও মান্দ্রাজ এদেশে শ্রেষ্ঠ জলবিদ্যুৎ-জননস্থান।

দ্বিতীয়তঃ—জলবিদ্যুৎ-জননক্ষেত্র এমনস্থলে স্থাপিত হওয়া উচিত, যে-অঞ্চলে খনিজ পদার্থ বেশী উৎপন্ন হয়, এবং যেখানকার মাটিতে কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা বেশী। তাহা হইলে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে খনিজদ্রব্য-অবলম্বনে শিল্পের, ও উপযোগী মাটি অবলম্বনে কৃষির, উন্নতি সম্ভব হইবে।

বিদ্যুৎ-জননে হিমালয়প্রদেশ।—পর্ব্বত যদি অতি উচ্চ ও বরফাচ্ছন্ন হয়, এবং তাহা যদি হিমবাহের আবাসস্থল হয়, তবে গ্রীষ্মকালে ঐ বরফ গলিলে যে অবিরাম জলস্রোত হয় তাহাতে বিদ্যুৎ-জননের সুবিধা হয়। আবার এইরূপ স্থানে যদি বৃষ্টিপাত বেশী হয়, তবে বিদ্যুৎ-জননের সুবিধা অধিকতর হয়। এই হিসাবে হিমালয় প্রদেশ বিদ্যুৎ-জননের একটি প্রকৃষ্ট স্থান,—কত অধিক পরিমাণে যে বিদ্যুৎ--শক্তি এখানে প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু হিমালয় সম্বন্ধে অসুবিধাও আছে। ভারতবর্ষ মৌসুমি বায়ুর দেশ, এখানে গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়েই বরফ গলে। শীতকালে বৃষ্টিও নাই, বরফও গলে না। সেজন্য এ-অঞ্চলে বারমাসই বিদ্যুৎ-জনন কার্য্য চলে না। এইজন্যই ভারতের এত বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও এখানে বিদ্যুৎ-জনন আশানুরূপ নহে।

ভারতবর্ষের জলশক্তি

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হয় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষি হইতেই তাহার অধিবাসীদের অন্নসংস্থান হইত। ক্রমে লোকবৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু শিল্পের কোন চেষ্টা হইল না। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টেরও এই দেশকে কাঁচামাল-উৎপাদক দেশ,—ও তাহাদের মাতৃভূমিতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বাজারস্বরূপ রাখাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৯০২ খৃঃ অব্দে কোলার স্বর্ণখনির প্রয়োজনে কাবেরী নদীতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইল। অবশেষে জনমতের চাপে ১৯১৮ সালে এদেশে জলবিদ্যুৎ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইল; ১৯২১ সালে ঐ অনুসন্ধানের ফল বাহির হইলে জানা গেল, এদেশে ১২৬ লক্ষ কিলো ওয়াট (K. W.) বিদ্যুৎশক্তি-জননের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রাজনীতিক কারণে এই প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়া ১৯১৫ সালে টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং খপোলীতে, ১৯২২ সালে অন্ধ্ ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোং ভিবপুরিতে, এবং ১৯২৭ সালে টাটা পাওয়ার কোং ভিরাতে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত করেন। এই তিনটি জাম্‌সেদ টাটার-ই কোম্পানি। এই তিনটি কোম্পানি ১৯২৯ সালে মিলিত হইয়া টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সি নাম গ্রহণ করে। ১৯৪২ সালের হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষে (ভারত ও পাকিস্তানে) প্রচ্ছন্ন জলশক্তি-সম্পদ্ আনুমানিক ৫৫ লক্ষ কিলো ওয়াট ছিল। কিন্তু এই অনুমান সকলে গ্রহণ করেন না। কাহারও-কাহারও মতে ভারতে ২৭০ লক্ষ কি. ও. প্রচ্ছন্ন জলশক্তি আছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে ৩,৭৩,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়;—ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকারে মোট যত শক্তি আবশ্যক, ইহা তাহার $\frac{১}{২৫০}$ অংশ মাত্র।

এক্ষণে ভারতবর্ষে (ভারত ও পাকিস্তানে) নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা **হইতেছে** এবং কোন-কোন কেন্দ্রে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ও জলসেচন—এই দুই কার্য্যও সম্পন্ন হইতেছে :—

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র

প্রদেশ	কেন্দ্রের নাম	যে-নদী বা জলাশয় হইতে উৎপন্ন	উৎপাদন-স্থান	উৎপাদন-শক্তি কি. ও.
হিমাচল প্রদেশ	মণ্ডী	উল নদী	যোগীন্দর নগর	৪৮,০০০
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	অমৃতসর	বারিদোয়াব প্রপাত	অমৃতসর	৫২৫
	ভাখ্‌রা	শতদ্রু	ভাখ্‌রা	১৬০,০০০
উত্তরপ্রদেশ	উচ্চ গঙ্গাকেন্দ্র	উচ্চ গঙ্গাখালের প্রপাত	বাহাদুরাবাদ, নীরগজনি, চিতোর, সালওয়া, পালরা, সুমেরা	২০,০০০
কাশ্মীর	বারামুল্লা	ঝেলাম	বুনিয়ার	
বোম্বাই	লোনাভ্‌লা	লোনাভ্‌লা (জলাশয়)	খপোলি	৪৮,০০০
	অন্ধ্র-উপত্যকা	অন্ধ্র নদী	ভিবপুরী	৪৮,০০০
	নীলামূলা	নীলামূলা	ভীরা	৮৭,০০০
মান্দ্রাজ	পাইকারা	পাইকারা	কইম্বাটুর	৪০,০০০
	মেটুর*	কাবেরী	মেটুর	৪২,০০০
	পাপনাশম্	তাম্রপর্ণী	অগস্ত্যমন্দির	১৭,৫০০
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	পল্লীবসল	মুদ্রাপুঝা	পল্লীবসল	৯,০০০
মহীশূর	কাবেরী	কাবেরী	শিবসমুদ্রম্	৪২,০০০
	”	সিমসাপ্রপাত	সিম্‌সা	১৬,০০০
	জগ	সারাবতী নদী (জগপ্রপাত)		৪৮,০০০
		পাকিস্তানে		
উ.-প. সী.প্রদেশ	মালাকান্দ	সোয়াত	পেশোয়ার	২০,০০০

* জলসেচন ও জলবিদ্যুৎ-প্রজনন-কেন্দ্র।

মাইল
0 ১০০ ২০০
আলাকান্দ
পেশোয়ার
ঝিলাম
বুনিয়ার
শ্রীনগর
যোগীন্দ্রনগর
পাকিস্তান
বাহাদুরাবাদ
নিরগজান
চিতৌরা
সালাওয়া
বুনবাসা
দিল্লী
ভোলা
চন্দৌসি
পালরা
সুমেরা
হারদুয়াগঞ্জ
যমুনা নং
গঙ্গা নং
ভারত যুক্তরাষ্ট্র
নর্মদা নং
ভিরপুরী
বোম্বাই
খপোলি
ভীরা
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপ-সাগর
জগ
শিমসা
মান্দ্রাজ
শিবসমুদ্রম
মেটুর
পাইকারা
ময়ার
কাবেরী
পল্লীবশাল
পাপনাশন
জল বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থান
৩২
২৪
১৬
৭৬

৪৩ নং চিত্র

প্রধান-প্রধান প্রচলিত জলবিদ্যুৎশক্তি-কেন্দ্র

হিমাচল প্রদেশ—

১। **মণ্ডী বা উল্‌নদী বিদ্যুৎশক্তি জনন-ব্যবস্থা** (Mandi or Uhl River Hydro-Electric Scheme)। দৌলাধার পর্ব্বতের ৬,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত বিপাশা নদীর উপনদী উল ও লাম্বাদাগ—এই নদীদ্বয়ের জল ব্রৎ নামক স্থান হইতে ৩ মাইল দীর্ঘ পর্ব্বত-সুড়ঙ্গ দিয়া রানা নদীর উপরিস্থিত মণ্ডীরাজ্যের যোগীন্দরনগর-কেন্দ্রে আনিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এই কেন্দ্রের কার্য্য ১৯২৬ সালে আরম্ভ হয় ; ইহার বিদ্যুৎজনন-শক্তি ৪৮,০০০ কি. ও. এবং ভবিষ্যতে এখানে ১,৪৯,০০০ কি. ও. শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। এখানকার শক্তিতে বৈদ্যুৎ তারযোগে ৬০ খানি নগর ও গ্রামের কলকারখানায় ও মিউনিসিপাল সহরে, শক্তি ও আলো প্রদান করা হয়, এবং এন. ডব্লিউ. রেলের পাবলিক ওয়ার্কসপের কারখানায় বৈদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। বরফগলা জলে ও বৃষ্টির জলে ইহার কার্য্য চলে।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাব—

১। **অমৃতসর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র।** বারিদোয়াব খালের একটি প্রপাত হইতে গৃহীত জলের সাহায্যে অমৃতসরে শক্তিসঞ্চয় করা হয়। এখানে ৫২৫ কি. ও. শক্তি উৎপাদন করা যায়। এতদ্ব্যতীত পাতিয়ালা, সিমলা ও ধারিওয়ালে ছোট-ছোট বিদ্যুৎ-জনন কেন্দ্র আছে।

২। ভাখ্‌রা কেন্দ্র (৬০ পৃ. দেখ)

উত্তরপ্রদেশ—

১। **উচ্চ গঙ্গাখালের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রসমূহ** (Ganges Canal Hydro-Electric Grid)। পূর্ব্বে (৬২ পৃ.) উচ্চ গঙ্গার জলসেচন-খাল সম্পর্কে যে জলপ্রপাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার দশটির মধ্যে বাহাদুরাবাদ, নীরগজনি, চিতোর, সালাওয়া, ভোলা, পালরা, ও সুমেরা—এই সাতটি স্থানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যবস্থা করিয়া গ্রিড্ (Grid) ব্যবস্থায় চন্দৌসি ও হারদুয়াগঞ্জে ৩৮,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া মহম্মদপুর, ও হারদুয়াগঞ্জে নূতন যন্ত্র স্থাপন করিয়া আরও ২০ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি-জননের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই গাঙ্গেয় বিদ্যুৎজনন-ব্যবস্থা দ্বারা প্রায় একশত সহরে ও শিল্পকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় ; এবং জলের স্বল্পতা বা অন্য কারণে জলসেচনের অসুবিধা হইলে জলের অভাব পূরণ করার জন্য যে বৈদ্যুৎ পাম্প-(দমকল)-সংযুক্ত নলকূপ খনন করিয়া খালে জল বৃদ্ধি করা হয়, সেই দমকলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

কাশ্মীর—

১। **বারামুল্লা জলবিদ্যুৎজনন-কেন্দ্র।**—বারামুল্লা হইতে ১৪ মাইল দূরে বুনিয়ার নামক স্থানে ঝেলাম নদীর জলের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। এখানে ২০ হাজার অশ্বশক্তির বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং তদ্দ্বারা বারামুল্লা ও শ্রীনগরে আলোকদান, কলকারখানা চালানো প্রভৃতি কার্য্য হয়। ইহার উপনদী কিষেণ গঙ্গার উপরে মুজঃফরাবাদ বিদ্যুৎজনন-কেন্দ্র হইতে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

বোম্বাই—

বোম্বাই-ব্যবস্থা।—টাটা কোম্পানির দ্বারা বোম্বাই রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত তিনটি বিদ্যুৎজনন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জল-বিদ্যুৎজনন ব্যবস্থা। এগুলি পশ্চিমঘাটের উপরে অবস্থিত। পশ্চিমঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে মৌসুমি বায়ুপ্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেজন্য শীতকালে বৃষ্টিপাত না হইলেও গ্রীষ্মে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিলে শীতকালে সেই জলে কল চালানো যায়। বিশেষতঃ এখানকার পর্ব্বত শীতকালে বরফাচ্ছন্ন হওয়ার মত উচ্চ নহে। সেজন্য শীতকালে কল চালানোর কোন অসুবিধা হয় না।

১। **লোনাভ্‌লা-ব্যবস্থা।**—ইহা পশ্চিমঘাটের ভোরঘাট গিরিপথের উপর অবস্থিত। এখানে মৌসুমের জল লোনাভ্‌লা, বলওয়ান ও সিরাভতা নামক তিনটি বৃহৎ জলাশয়ে সঞ্চিত করিয়া খালযোগে উহা প্রথমে খান্দালায় এবং তৎপরে সেখান হইতে নলযোগে খপোলি জলবিদ্যুৎশক্তিজনন-কেন্দ্রে লইয়া গিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। এখান হইতে ৪৮,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন হইতে পারে।

২। **অন্ধ্র-ব্যবস্থা।**—উপরি-উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার দুই বৎসর পরে টাটা এণ্ড সন্‌সের প্রতিষ্ঠিত নূতন কোম্পানির দ্বারা উপরি-উক্ত জলাশয়গুলির উত্তরে অন্ধ্র নদীর উপরে ঠোকারবাদি নামক স্থানে একটি ১৯০ ফিট উচ্চ বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করা হয় এবং সেখান হইতে ভিবপুরি বিদ্যুৎজনন-কেন্দ্রে নলযোগে জল আনিয়া জলবিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থাদ্বারা উপরি-উক্ত লোনাভ্‌লা-ব্যবস্থার কার্য্য বিস্তৃততর হইয়াছে। এখানেও ৪৮,০০০ কি. ও. শক্তি জন্মানো যায়।

৩। **নীলামূলা-ব্যবস্থা।**—ইহার পরে টাটাদিগের অপর একটি কোম্পানি উপরি-উক্ত দুইটি ব্যবস্থার কার্য্য ও পরিধি বিস্তৃততর করিবার জন্য বোম্বাই সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে নীলামূলা নদীর উপরে মুলসি নামক স্থানে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া সেই জলের সাহায্যে বিদ্যুৎ-জননের জন্য ভীরা নামক স্থানে নূতন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে ৮৭,০০০ কি. ও. শক্তি উৎপন্ন করা যায়।

উপরি-উক্ত তিনটি ব্যবস্থা টাটা কোম্পানির তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানদ্বারা স্থাপিত হইলেও এক্ষণে টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক সিস্টেম নামে একত্রীভূত হইয়া বিদ্যুৎ-জনন ও বিদ্যুৎ-বিতরণ কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। এই তিনটি ব্যবস্থার দ্বারা উৎপন্ন শক্তিতে বোম্বাই সহরের সমস্ত কলকারখানায়, ট্রামে ও ইলেকট্রিক কোম্পানিতে, বি. বি. সি. আই. ও জি. আই. পি. রেলপথদ্বয়ের কতকাংশে, ও পুনাসহরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়।

মান্দ্রাজ—

জলবিদ্যুৎশক্তি-প্রজননে মান্দ্রাজের স্থান বোম্বাই-এর পরেই দ্বিতীয়। এখানে তিনটি ব্যবস্থা প্রধান—(১) পাইকারা, (২) মেটুর, (৩) পাপনাশম্।

১। **পাইকারা-ব্যবস্থা।**—ইহাদ্বারা নীলগিরি পর্ব্বত হইতে আগত পাইকারা নদীর জল গ্লেনমর্গান ও মুকুর্ত্তি নামক স্থানে সঞ্চয় করিয়া কইম্বাটুর, ইরোড, নেগাপট্টম্, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, কালিকট্ট, কানানুর প্রভৃতি স্থানে শিল্পদ্রব্যের কলকারখানায় ও সহরে, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। মান্দ্রাজে ইহাই সর্ব্বপ্রধান বিদ্যুৎ-সরবরাহ--ব্যবস্থা। ইহার আরও বিস্তৃতি সম্পূর্ণ হইলে ইহা হইতে ৪০,০০০ কি. ও. শক্তি উৎপন্ন হইবে।

২। **মেটুর-ব্যবস্থা।**—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেটুর নামক গ্রামে কাভেরি নদীর উপর "স্ট্যান্‌লি" নামে এক বৃহৎ বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া সেই **জল সেচন করা হয়।** এই বাঁধের উচ্চতা ১৭৬ ফিট। এত বড় বাঁধ পৃথিবীতে আর নাই। এখানকার সঞ্চিত জলের কিছু অংশ লইয়া বাঁধের অল্পদূরে জননকেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। ইহা ইরোড নামক স্থানে—পাইকারা-ব্যবস্থার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভেলোর, তিরুবর্ণমালাই, নেগাপট্টম্, সালেম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, চিত্তুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

৩। **পাপনাশম্-ব্যবস্থা।**—পশ্চিমঘাটের পাদদেশে তিন্নেভেলী জেলার তাম্রপর্ণী নদীর পাপনাশম্ প্রপাতের জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। জলপ্রপাতটির ছয় মাইল উপরে একটি ১৭০ ফি. উচ্চ বাঁধ দিয়া একটি জলাধার করিয়া সেখানে জলসঞ্চয় করা হয় এবং সেই জল অগস্ত্য মন্দিরের নিকটস্থ শক্তি-উৎপাদনগৃহে লইয়া সেখানে শক্তি প্রজনন করা হয়। ইরোড নামক স্থানে এই শক্তি-বিতরণ-পথ পাইকারা ও মেটুর বিতরণ-পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা তিউতিকোরিন, কয়েলপট্টি, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে শক্তি বিতরণ করা হয়।

ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন—

পল্লীবসল- (Pallivasal) ব্যবস্থা।—ত্রিবাঙ্কুরের মুদ্রাপুঝা (Mudrapuzha) নদীর জলপ্রপাত অবলম্বনে এখানে ২০,০০০ কি. ও. শক্তি উৎপাদন করা হয়।

মহীশূর—

১। **মহীশূর-ব্যবস্থা।**—কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের জন্য ১৯০২ সালে এখান হইতে ৯২ মা. দূরে শিবসমুদ্রম্ নামক স্থানে কাভেরি নদী বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদনগৃহ স্থাপন করিয়া সেখানে শক্তি উৎপাদন করা হয়। ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম বিদ্যুৎপ্রজনন-ব্যবস্থা। এখান হইতে মহীশূর, বাঙ্গালোর ও অন্য ২২৫টি সহরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য মহীশূর সহরের নিকট কৃষ্ণরাজাসাগর নামক স্থানে জল সঞ্চয় করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে থাকে। ইহাতে এখন এখানে ৪২,০০০ কি. ও. শক্তি উৎপাদন করা হয়। এই নদীর সিমসা প্রপাত অবলম্বনে আরও একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে। তাহা হইলে এই ব্যবস্থার দ্বারা সর্ব্বসমেত ৫৯,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে।

২। **জগ-ব্যবস্থা।**—সারাবতী (Trib of Krishna) নদীর জগ বা গেরসপ্পা (Gersoppa) জলপ্রপাত অবলম্বনে ১২০,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার দ্বারা মান্দ্রাজ বোম্বাই ও মহীশূর এই তিন স্টেটই উপকৃত হইবে। এক্ষণে এই ব্যবস্থার নূতন নাম হইয়াছে **মহাত্মা গান্ধী জলবিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান।**

দ্রষ্টব্য।—এই অঞ্চলে মহীশূরে জগপ্রপাত-ব্যবস্থার সহিত শিবসমুদ্রম্-ব্যবস্থার এবং মান্দ্রাজে পাইকারা-ব্যবস্থার সহিত পাপনাশম্-ব্যবস্থার গ্রিড্ সিস্টেমে যোগাযোগ আছে। এক্ষণে ত্রিবাঙ্কুরের পল্লীবসল-ব্যবস্থা ও মহীশূরের ব্যবস্থার সহিত মান্দ্রাজের ব্যবস্থার সংযোগ হইলে, এই অঞ্চলে সবগুলি মিলিয়া একই বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থার অন্তর্ভূত হইবে।

পাকিস্তানে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।—মালাকন্দ-ব্যবস্থা।—মালাকান্দ জলসেচন খাল (৫৭ পৃ.) আরও বাড়াইয়া একটি স্বাভাবিক জলপ্রপাতের সহিত যুক্ত করিয়া জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার উৎপাদন-শক্তি

১০,০০০ কি. ও.। ইহার দ্বারা পেশোয়ার, মর্দ্দান, রিশালপুর, নৌসেরা প্রভৃতি সহরে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হইবে।

ভারত ও পাকিস্তানে নূতন পরিকল্পনা

পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম-পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রদেশগুলিতে বহুস্থানে বিদ্যুৎ-জননযন্ত্র বসাইবার পরিকল্পনা আছে। এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে ভারত ও পাকিস্তান বিদ্যুৎজননবিষয়ে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়ার পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে।

বহুমুখী নদী-ব্যবহার-পরিকল্পনা

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদীবহুল স্থান শস্যশ্যামল হয়, এইমাত্র আমরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু নদী যে কত রকমে আমাদের উপকার সাধন করিতে পারে, এবং সে উপকার যে কত মহান্, তাহার অনুমানও আমরা করিতে পারি না। যদিও আমরা বলিয়া থাকি যে, নদী হইতে জলসেচনপ্রথা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না, এবং সেজন্য চোলরাজগণ কর্তৃক তাঞ্জোরের **কোলরুন** নদীতে বাঁধের, এবং ফিরোজসাহ্ তোগলকের **যমুনা খালের**, এবং আকবর ও শাজাহান বাদশাহের দ্বারা খনিত লাহোরের **হাস্‌লি খালের** উদাহরণ দিয়া থাকি, তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, রাজপুরুষগণের মধ্যে ভবিষ্যৎকালের এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ না থাকায়, আমরা নদীর এই শক্তির কথা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। এক্ষণে নদীর শক্তি আমরা দুইটি মাত্র কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া থাকি—(১) জলসেচন ও (২) বিদ্যুৎ-উৎপাদন। বহুবিস্তৃত পাঞ্জাবের খালগুলির দ্বারা আমরা জলসেচন ব্যতীত কিছুই করি নাই। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম্, এবং উত্তর-পশ্চিম বোম্বাই প্রদেশের টাটা কোম্পানি-প্রতিষ্ঠিত খপোলি প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে আমরা কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াছি। ইহার পরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে একই গঙ্গা নদী হইতে উদ্ভূত উচ্চ-গঙ্গাখালের জলে জলসেচন ও বিদ্যুৎপ্রজনন—দুইই করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু নদীর উপকারশক্তি এখানেই সীমাবদ্ধ নহে। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে টেনেসী ও কলোরেডো প্রভৃতি নদী হইতে বহুপ্রকার উপকারপ্রাপ্তির অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টও তদনুসারে ভারতের নদীগুলিকে বহুপ্রকারে কার্য্যকরী করিবার জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা-অনুযায়ী নদীর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণদ্বারা **জলসেচন, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, নৌকাচালন,**

জলপথে ভ্রমণ, বন্যানিবারণ, মৎস্যের চাষের উন্নতি, ম্যালেরিয়া--নিবারণ, বনসংরক্ষণ প্রভৃতি সমস্তই সম্ভব হইবে।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি, জলসেচন ও নৌ-চালন কমিশন (The Central Water--power, Irrigation and Navigation Commission) নদী-উন্নয়নের জন্য ছোট-বড় ১৩৫টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহাতে ৫৯০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহাতে ১৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন সম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহারা নিম্নলিখিত ১২টি পরিকল্পনা সর্ব্বাগ্রে সম্পূর্ণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ৪৩৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ১ কোটি একর জমিতে জলসেচন করা যাইবে। কিন্তু এই বারটির মধ্যে কয়েকটির মাত্র কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কয়েকটির কার্য্য অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং কয়েকটির কার্য্য আরম্ভই হয় নাই।

প্রধান দ্বাদশটি বহুমুখী নদী-ব্যবহার-পরিকল্পনা*

প্রদেশ	পরিকল্পনার নাম	মোট আনুমানিক ব্যয়	পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে যত সহস্র একর জমিতে জল-সেচন হইবে	পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে যত সহস্র কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবে
বিহার ও প. বঙ্গ	দামোদর	৬৭ কো. ৯০ লক্ষ	৯০০	৩৭৩
পশ্চিমবঙ্গ	ময়ূরাক্ষী	১৫ " ৫০ "	৬০০	৪
মধ্যভারত ও রাজস্থান	চম্বল	২৮ " ০ "	৭০০	১৫০
মধ্যপ্রদেশ	(বিদ্যুৎ-জনন পরিকল্পনা)	১২ " ৬৩ "	×	
উত্তরপ্রদেশ	সার্দ্দাজলবিদ্যুৎ	১১ " ২১ "	×	৪১
মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা	মাচকুণ্ড	১৭ " ৯৭ "	×	১০৩
উড়িষ্যা	হীরাকুণ্ড	৪৭ " ৮১ "	১০৯৫	×
বোম্বাই	কাকরাপারা	১২ " ১৬ "	৬৬	২৪
মান্দ্রাজ-হায়দারাবাদ	তুঙ্গভদ্রা	৬০ " ৭৯ "	২৫০	২১
মহীশূর	লক্কাওয়াল্লি	১৮ " ×	১৮০	১৩
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	ভাক্‌রা-নঙ্গল	১৩২ " ৯১ "	৩০০০	৪০০
	হারাইক	১৩ " ৮০ "	×	×

* Records and Statistics, *Quarterly Bulletin of the Eastern Economist*, Vo. 12, No. 4.

ইহাদের মধ্যে কয়েকটির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দামোদর-পরিকল্পনা

দামোদর নদ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ জেলার ৩,০০০ ফুট উচ্চ খামারপাত নামক পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম জেলার উপর দিয়া পূর্ব্বমুখে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বর্দ্ধমান সহর পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে আসিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে, তৎপরে হুগলী ও হাওড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতার অল্পদূর দক্ষিণে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে।

এই নদীর প্রথমাংশ ছোটনাগপুর মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানে ইহার তিনটি উপনদী আছে—বোকারো, কোনার ও বরাকর। এই তিনটি বিহার প্রদেশের নদী। আবার, এই মালভূমি ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খনিজ দ্রব্যের আধার—ইহাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়লাক্ষেত্র।
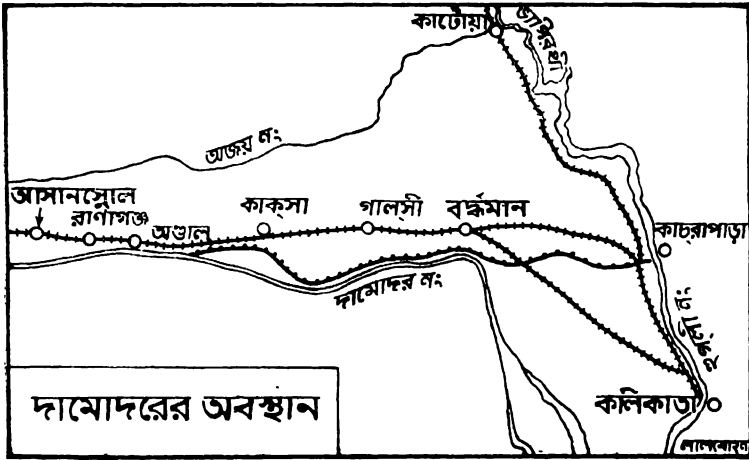
৪৪নং চিত্র

দামোদরের শেষাংশ বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রথমাংশ অত্যন্ত স্রোতস্বতী, এবং শেষাংশে স্রোতের গতি কম। তাই মালভূমির মাটি বৃষ্টির জলের প্রবাহে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ও দ্রুতগামী দামোদরের স্রোতে বাহির হইয়া, বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেখানে স্রোতোবেগ কম বলিয়া ঐ মাটি নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়াছে। সমতল ভূমির মাটিও ধুইয়া আসিয়া নদীতে পড়িয়াছে,—ইহাতে ক্রমশঃ নদীর তলদেশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, এবং নদীর মোহানা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেজন্য এই নদীর অববাহিকায় অতিরিক্ত

বৃষ্টিপাত হইলে নদীর প্রথমাংশ হইতে যখন জল বেগে নামিয়া আসে, তখন তাহা শেষাংশের উচ্চ তলদেশে পদে-পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্কীর্ণ নদীমুখ দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে পারে না। এইজন্য দামোদরে বৎসরে-বৎসরে বন্যা লাগিয়াই আছে। এই বন্যা বেশী হইলে এ-অঞ্চলের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যায়,—লোকজন গরুবাছুর ভাসিয়া যায়, এমন কি রেলপথ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।

১৯৪৩ সালের ভীষণ বন্যার পরে একটি বন্যা-অনুসন্ধান কমিশন (Flood Enquiry Commission) বসে এবং এই কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী-উপত্যকা কর্তৃপক্ষের (Tennessee Valley Authority) অনুকরণে দামোদর-উপত্যকা কর্পোরেশন (D. V. C.) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কর্পোরেশনের নির্দ্দেশক্রমে একটি বহুমুখী নদী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রথমে ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু সে-ব্যয় অপ্রচুর হইবে মনে করিয়া উহার পরিমাণ বাড়াইয়া ৬৭ কোটি ৯০ লক্ষ করা হইয়াছে। ইহাতে যে কেবল বন্যানিরোধ হইবে তাহা নহে, বহুভাবে এই নদী উপকার সাধন করিবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী—

(১) দামোদর নদের প্রথম অংশে ছোটনাগপুর মালভূমির উপর ক্রমান্বয়ে আয়ার, বার্মো ও পাঞ্চেৎ পাহাড়—এই তিন স্থানে **তিনটি,**—বোকারো উপনদীর উপর **একটি,**—কোনার উপনদীর উপর **তিনটি,**—এবং বরাকর উপনদীর উপর **তিনটি**— এই **দশটি** বাঁধ দেওয়া হইবে। ইহাদের মধ্যে বরাকর নদীর উচ্চাংশে সর্ব্বপ্রথম যে-বাঁধ দেওয়া আছে উহার নাম তিলায়া বাঁধ,—ইহাই সর্ব্ববৃহৎ বাঁধ। ইহা ১৩৫০ ফিট দীর্ঘ ও ১২০ ফিট উচ্চ। বাঁধগুলি দ্বারা যে-জলাশয় নির্ম্মিত হইবে তাহাতে ৪৭ লক্ষ একর ফুট জল আবদ্ধ থাকিতে পারে, অর্থাৎ ৪৭ লক্ষ একর জমির উপর এক ফুট জল রাখিতে যত জলের দরকার হয়, এই জলাশয়ে তত জল ধরিয়া রাখা যায়।

(২) প্রত্যেক বাঁধের সহিত একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্র থাকিবে। বারমো নামক স্থানে যে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র থাকিবে তাহা কলিকাতা, জামসেদপুর ও অপরাপর কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়া একটি Grid System রচনা করা হইবে।

এই বহুমুখী পরিকল্পনা সার্থক হইলে—

(৩) স্রোতের জল নিয়ন্ত্রিত হইবে ও বন্যার ভয় বিদূরিত হইবে।

(৪) ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি-প্রজননদ্বারা দেশের নব-নব শিল্প বৃদ্ধি করা, ও নিকটবর্ত্তী সহরে আলোকদান করা যাইবে।

(৫) সহরাঞ্চলে জল সরবরাহ করা যাইবে।

দামোদর পরিকল্পনা
স্কেল:-
মাইল 0 ১0 ২0 40 মাইল
সংকেত
হ্রদ
সেচের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি
বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জল)
,, ,, (কয়লা)
সংকেত
বাঁধ
রাজ্যের সীমানা
গয়া
বিহার
সাওতাল পরগণা
পশ্চিম বঙ্গ
হাজারীবাগ
পালামৌ
রাঁচী
মানভূম
বাঁকুড়া
মেদিনীপুর
বর্দ্ধমান
হুগলী
হাওড়া
গিরিধী
বরাকর নং
কুলটি
কোনার নং
হাজারীবাগ
বোকারো নং
দামোদর নং
রাঁচী
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
দামোদর নং
রাণীগঞ্জ
বর্দ্ধমান
দ্বারকেশ্বর নং
হাওড়া
কলিকাতা
রূপনারায়ণ নং
হলদি নং
ভাগীরথী নং
জলঙ্গী নং
হুগলী নং

৪৫নং চিত্র
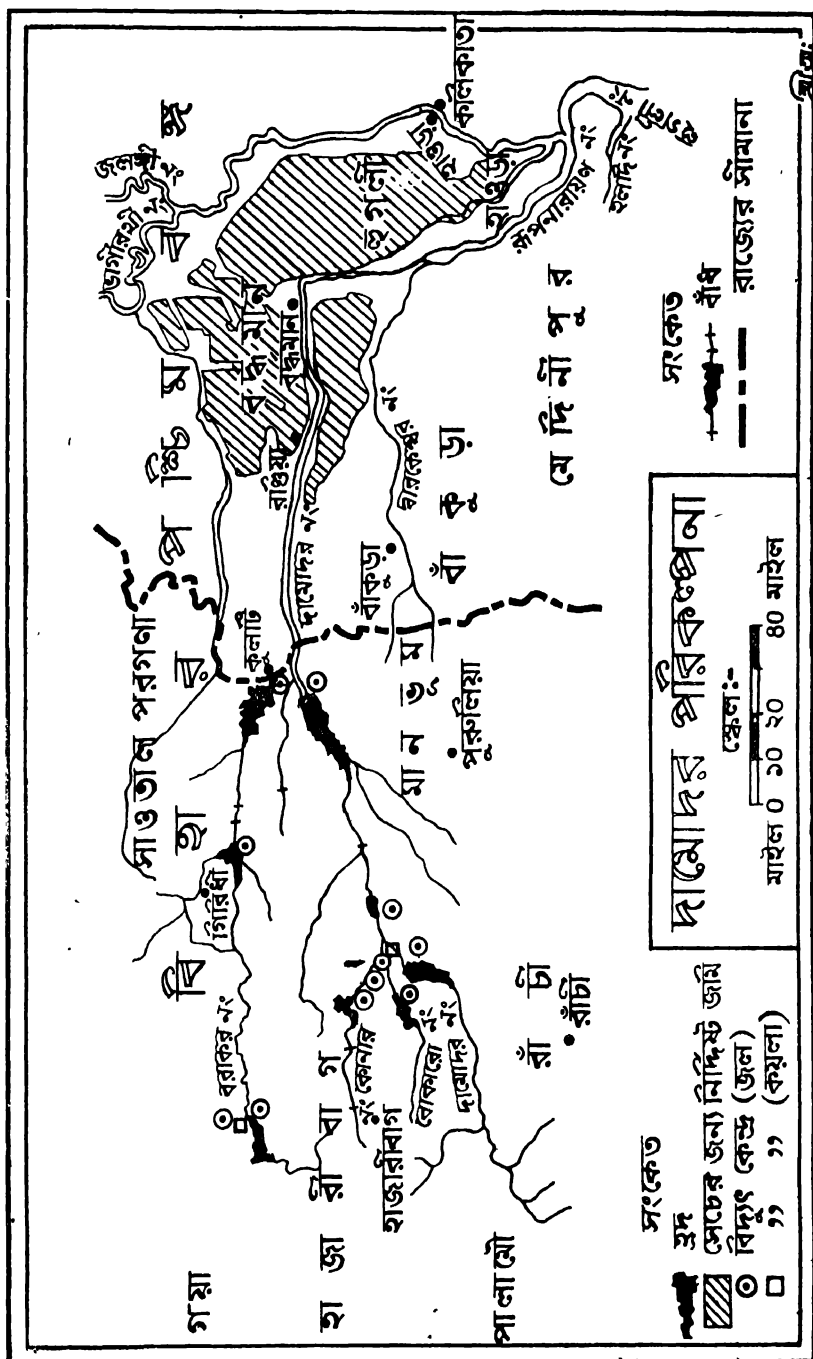
(৬) নিকটবর্তী জেলাগুলির অংশ সমেত ৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইতে পারিবে এবং তাহাতে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইবে।

(৭) পশুচারণভূমি বৃদ্ধি পাইবে এবং পশুর উন্নতি হইবে ও সংখ্যা বাড়িবে।

(৮) যে-সকল জলাশয় সৃষ্টি করা হইবে তাহাতে বিপুল মৎস্যের চাষ করা সম্ভব হইবে।

(৯) বনসৃষ্টির ব্যবস্থা হইবে,—তাহাতে জমির ক্ষয় নিবারিত হইবে।

(১০) নৌচলাচল দ্বারা যাতায়াত সহজ হইবে।

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী বা মোর নদী সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর মহকুমায় উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত
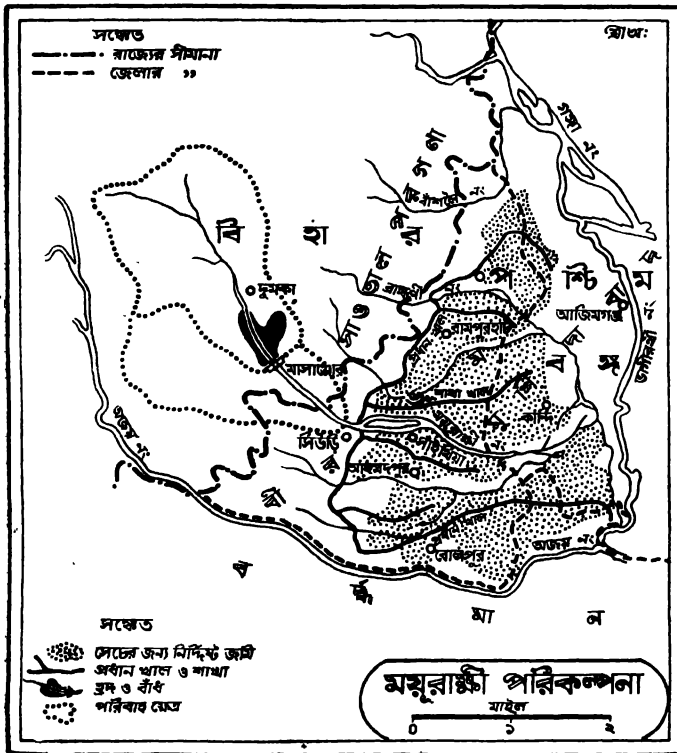
৪৬নং চিত্র

হইয়াছে। এই নদীর তলদেশও পলিমাটির দ্বারা উন্নীত হইয়াছে,—এবং এই নদী যে-অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত আছে, সেখানে শস্যহানি ও শস্যাভাব নিত্যবস্তুর মধ্যে

পরিগণিত হইয়াছে। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরে মোর-উন্নয়ন--পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা আরম্ভ হয়, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভীষণ অন্নাভাবের ফলে ১৯৪৬ সালে এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে—

(১) মোর নদীর উপর মাসানঝোর গ্রামে একটি ২,১৭০ ফিট দীর্ঘ ও ১৫৫ ফিট উচ্চ বাঁধ দিয়া একটি জলাধার সৃষ্টি করা হইবে। এই জলাধারও দামোদরের জলাধারের ন্যায় বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) বাঁধের একধারে একটি অতিরিক্ত জলনির্গমনের দ্বার থাকিবে, এবং জলসেচনের জলপ্রবাহ-নিয়ন্ত্রণের জন্য ছয়টি কপাটকল (Sluice gate) থাকিবে।

(৩) এইস্থানে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) এই স্থানের ২০ মাইল নীচে,—সিউড়ি হইতে ২মা. উত্তরে তিলপাড়া নামক স্থানে ১,০১৩ ফিট লম্বা একটি জলবিতরণ বাঁধ থাকিবে, এবং সেখান হইতে দুইটি প্রধান খাল ও শাখাখাল কাটিয়া জলসেচন হইবে।

এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে—

(১) ৬ লক্ষ একর খারিফশস্যের, এবং এক লক্ষ কুড়ি হাজার একর রবিশস্যের জমিতে জলসেচন হইবে। ইহাতে ৯০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য বেশী পাওয়া যাইবে।

(২) ৪,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে।

(৩) অন্য-অন্য নূতন পরিকল্পনার সম্ভাবনা হইবে, এবং অন্য উপায়ে অর্থাগম হইবে।

মহানদী-পরিকল্পনা

মহানদী মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার নদী। ইহার উপনদীগুলির নাম—**সেওনাথ, খারান, হাস্‌দো, মাণ্ড, জঙ্ক, ইব ও টেল।**

ছত্রিশগড়ের মালভূমির উপরে মহানদীর প্রথম অংশ,—ইহার অর্দ্ধেক জলসঞ্চয়--অববাহিকা এই অঞ্চলেই অবস্থিত। বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে খুব বেশী নহে,—গড়ে বৎসরে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ একর ফিট মাত্র। সেওনাথ ও খারান ব্যতীত অন্য উপনদীগুলি খরস্রোতা। সেজন্য তাড়াতাড়ি সমস্ত জল মহানদীতে আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই অঞ্চলে শস্য-উৎপাদন ঋতুর প্রথমভাগে বন্যা হয় ও শেষভাগে জলাভাবে খাদ্যশস্য-উৎপাদন দুরূহ হয়।

মহানদীর গতির মধ্যভাগে নদী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। হীরাকুণ্ড হইতে মহানদী দুইটি সঙ্কীর্ণ শাখায় বিভক্ত হইয়া সম্বলপুরে আসিয়া মিশিয়াছে, এবং সম্বলপুর, শোনপুর

ও টিকেরপাড়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইব ও টেল এই অংশেরই উপনদী। এই অংশে লোকবসতি কম,—কারণ জমি উঁচুনীচু, এবং নদীতে বন্যা আসে।

মহানদীর ব-দ্বীপ-অঞ্চলেও ভীষণ বন্যা আসে। প্রকৃতপক্ষে মহানদী-অববাহিকায় বন্যা প্রায়ই দুর্দ্দশা আনয়ন করে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। অবশেষে এক বহুমুখী মহানদী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বন্যানিরোধ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, নৌ-চালন প্রভৃতি সহজসাধ্য হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে—

(১) নিম্নলিখিত উপনদীগুলির উপর বাঁধ দেওয়া হইবে:—

(ক) টেল নদীর উপর—শোণপুর হইতে ৫৮ মা. উপরে।

(খ) ইব „ „ —৩০ মাইল উপরে।

(গ) মাণ্ড „ „ —৫৯ „ „ ।

(ঘ) হাস্‌ডো „ „ —৫৯ „ „ ।

(ঙ) জঙ্ক „ „ —১৬ „ „ ।
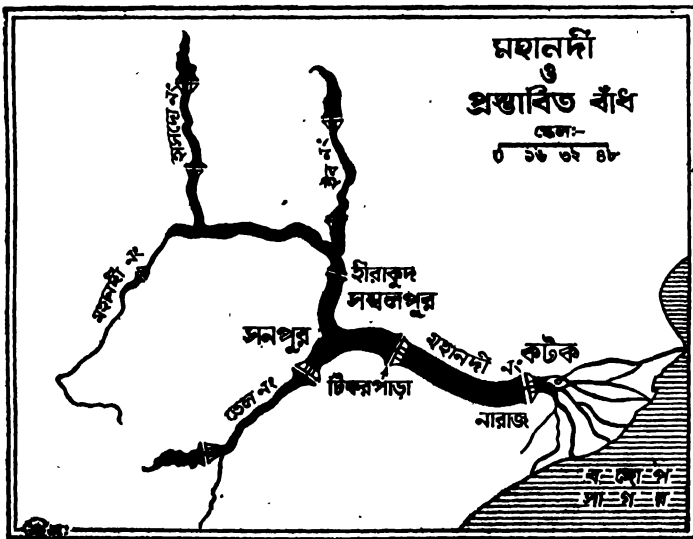
৪৭ নং চিত্র

এই বাঁধগুলির দ্বারা বন্যানিরোধ করা সম্ভব হইবে এবং এই সকল বাঁধের সঙ্গে যে-জলাধার থাকিবে তাহাতে ৯০,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যাইবে।

(২) মহানদী নদীর উপরে—হীরাকুণ্ড, টিকের পাড়া ও নারাজ—এই তিন স্থানে বাঁধ দিয়া জলাধার গঠিত হইবে। ইহাতে বন্যানিরোধ ও জলসেচন হইবে, এবং ২ লক্ষ

কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে। উপনদী ও মহানদী—এই দুইয়ের উপর স্থাপিত জলাধারগুলি হইতে মোট ২ লক্ষ ৯০ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি প্রজনন হইবে।

(৩) মহানদীতে ছোট-ছোট নৌকা সাধারণতঃ হাস্‌ডো পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু বৎসরের সকল সময় ইহা সম্ভব হয় না। যে-সকল জলাধার সৃষ্টি করা হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ- ও নির্গমন-দ্বার রাখিলে ছত্রিশগড় পর্য্যন্ত বড় নৌকা সর্ব্বসময়ে যাইতে পারিবে।

(৪) উড়িষ্যার বনজ ও খনিজ সম্পদ্‌ বৃদ্ধি পাইবে।

এই পরিকল্পনার মধ্যে হীরাকুণ্ড বাঁধের কাজ আগে হইবে, তাহার পরে টিকের-পাড়া ও নারাজ বাঁধের কাজ হইবে। এইগুলি শেষ হইলে উপনদীগুলির বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনাটি সুবিপুল ; ইহার অববাহিকা দামোদরের অববাহিকার ছয় গুণ।

কুশী-পরিকল্পনা

কুশী নেপাল ও বিহারের নদী ; হিমালয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া ইহা রাজমহলের নিকট গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। ইহা এভারেস্ট শৃঙ্গের নিকটস্থ হিমক্ষেত্রে জন্মিয়াছে।

কুশী অতি ভয়াবহ নদী। গত ২০০ বৎসরের মধ্যে ইহা পশ্চিমদিকে প্রায় ৭০ মা. সরিয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে নেপালে প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল ও বিহারে প্রায় ৩,০০০ বর্গমাইল জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে,—বহুস্থান বিলে পরিণত হইয়াছে,—বহু পরিত্যক্ত নদীপথের বদ্ধ জল মশকের জন্মস্থান হইয়াছে ও ম্যালেরিয়া চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রবল বৃষ্টিপাতে ও বরফগলা জলের প্রবাহে কুশীতে হঠাৎ বন্যা আসে ; ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩০ ফিট জল বাড়িয়া যায় এবং বন্যার জল দুই কূল ছাপাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইহাতে বহু নগর ও গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং কখনও-কখনও ২০ মা. স্থান জলমগ্ন করিয়া সমুদ্রের আকার ধারণ করে। এই সময়ে প্রবল স্রোতে বহু মাটি ও বালি গঙ্গায় আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে হঠাৎ এমন ছোট-ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয় যে, কুশীর মুখে গঙ্গায় নৌ-চলন বিপদসঙ্কুল হয় ; বন্যার অবসানে বন্যাপীড়িত স্থান কোথাও বালিতে ঢাকিয়া যায় এবং কৃষিভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে।

কুশীর অববাহিকায় কোন স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, কোথাও জলের অভাবে শুকাইয়া যায়,—দারভাঙ্গা, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় জলাভাবে প্রায়ই ফসল নষ্ট হয় ও প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়।

কুশী পরিকল্পনা
অরুণ কুশী
সূর্য্য কুশী
তরুণ কুশী
তমুর
ছাত্রা
সপ্তকুশী
কমলা নং
কুশী নং
পুর্ণিয়া
গঙ্গা নং
মুঙ্গের
ভাগলপুর
গঙ্গা নং

৪৮ নং চিত্র
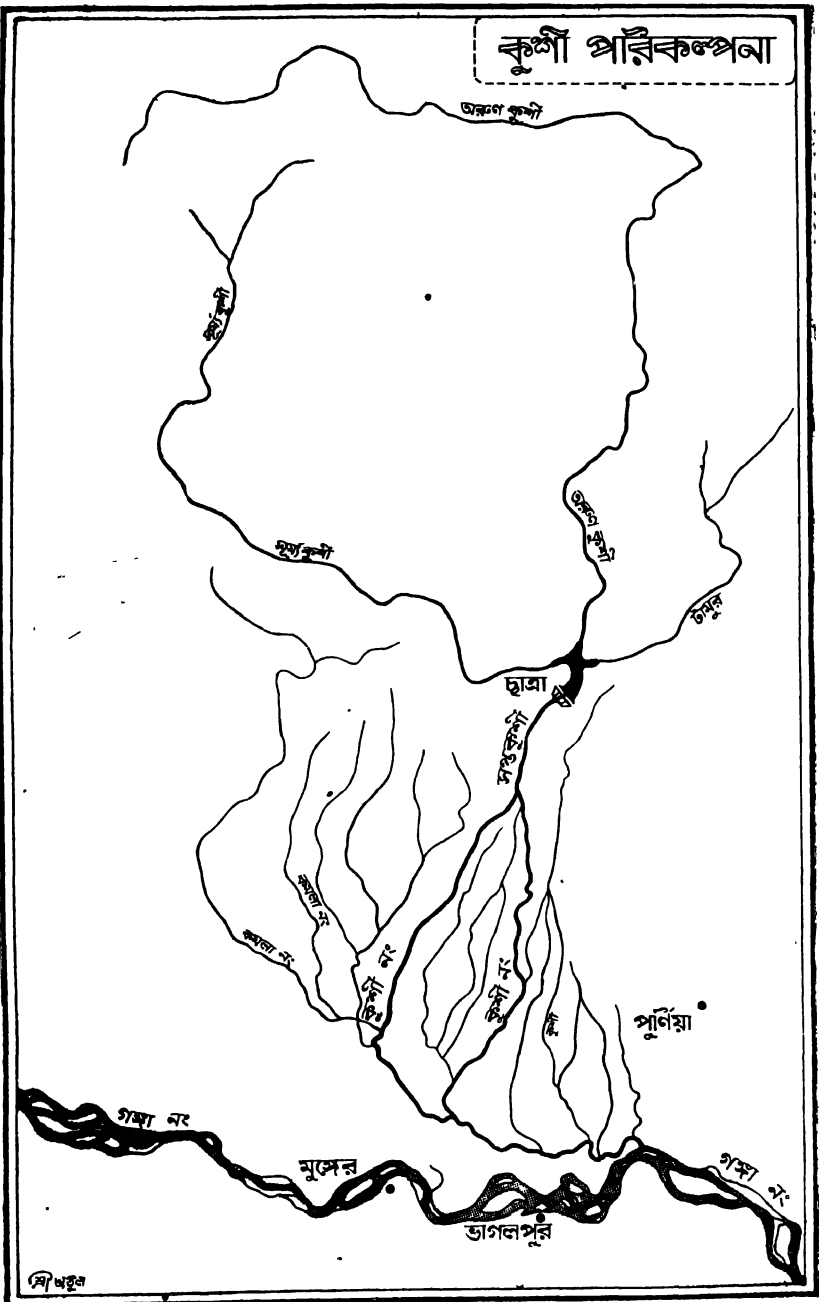
এই দুর্দ্দশার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে কুশীর জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এই পরিকল্পনা অনুসারে—

(১) নেপালে বরাহক্ষেত্র মন্দিরের প্রায় দেড় মাইল উপরে ছাত্র গিরিখাতে একটি বাঁধ দিয়া ১০৬ লক্ষ একর ফিট জলসঞ্চয় করিয়া জলসেচন ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা হইবে এবং মাটি ও বালির সংরক্ষণে সহায়তা করা যাইবে।

(২) নেপালে যেস্থানে কুশী সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার কিছু নিম্নে জলবিতরণ বাঁধ দিয়া সেখান হইতে খাল কাটিয়া জলসেচন হইবে।

(৩) নেপাল-বিহার সীমানার নিকট আরও একটি বিতরণ-বাঁধ হইবে। সেখানেও জলসেচনের খাল হইবে, এবং অধিকন্তু নৌ-চালন-নিয়ন্ত্রণ-দ্বার (gate) থাকিবে।

এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে—

বন্যা-নিরোধ, পলি-নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, জল-নিষ্কাশন, জলসেচন, জলমগ্ন জমির উদ্ধার, ম্যালেরিয়া-নিবারণ, নৌ-চালন, জলবিদ্যুৎ-প্রজনন, ও মৎস্যের চাষ সম্ভব হইবে, এবং কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত জলপথে যাওয়া যাইবে।

গোদাবরী-পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনার অন্য নাম **রামপদ-সাগর-পরিকল্পনা**। জলসেচন, বিদ্যুৎ-প্রজনন ও বন্যা-নিবারণও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনুসারে গোদাবরীর ব-দ্বীপ-অংশে রামপদ-সাগরের নিকট একটি ৪২৮ ফিট উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইবে,—তাহাতে ৪৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৭৫ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ-উৎপাদন সম্ভব হইবে।

এতদ্ব্যতীত ছোট-বড় বহু পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) তিস্তা-পরিকল্পনা।—কালিম্পং-এর নিকটে বাঁধ দিয়া ৪-৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৩ লক্ষ কি. ও. বিদ্যুৎ-শক্তি প্রজনন হইবে।

(২) গঙ্গা-বাঁধ-পরিকল্পনা।—ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলের নিকটে তিলডাঙাতে একটি বৃহৎ বাঁধ দেওয়া হইবে। তাহাতে ভাগীরথী, জলঙ্গী, এবং মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি পদ্মার শাখানদীগুলিতে জলস্রোত বৃদ্ধি পাইবে। হুগলী নদীতে পলিপড়া বন্ধ হইবে, কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে, কলিকাতা হইতে পাটনা পর্য্যন্ত সহজে জলপথে যাতায়াত করা যাইবে, এবং কৃষিজমিতে জলসেচন করা যাইবে। এই পরিকল্পনা এখনও কল্পনামাত্রই রহিয়াছে।

(৩) শোণ-পরিকল্পনা।—শোণ-এর রিহান্দ উপনদীর উপরে পিপারা নামক

স্থানে বাঁধ দিয়া রেওয়া স্টেট অঞ্চলে জলসেচন ও দেড়-লক্ষ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে।

(৪) বেতোয়া- ও কেন-পরিকল্পনা।—এখানে জলসেচন-ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে আছে। আরও জলসেচনের ও আড়াই হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ প্রজননের ব্যবস্থা হইবে।
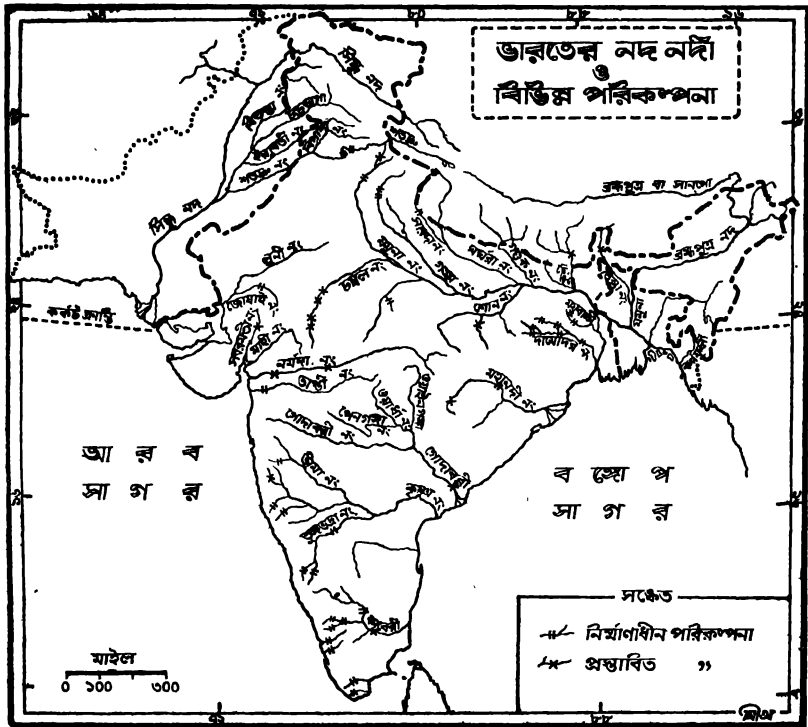
৪৯নং চিত্র

(৫) নর্ম্মদা- ও তাপ্তী-পরিকল্পনা।—এই দুইটি নদী অবলম্বনে এক বৃহৎ বহুমুখী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা অন্যতম বৃহৎ-বহুমুখী নদী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা হইবে।

(৬) মাহি-নদী-পরিকল্পনা।—এই নদীতে বাঁধ দিয়া একটি বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করিয়া জলসেচন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে।

(৭) তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা।—তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর একটি বাঁধ দিয়া হায়দারাবাদ ও মান্দ্রাজে জলসেচন হইবে ও ৩৮ হাজার কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে।

(৮) কাক্‌রাপাড়া-পরিকল্পনা।—সুরাটের ৫০ মা. উপরে তাপ্তী নদীর উপরে বাঁধ বাঁধিয়া ও খাল কাটিয়া ৫ লক্ষ ৬২ হা. একর জমিতে জলসেচন ও ৪৮ হা. কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে। ইহাতে দেড় লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন হইবে।

(৯) কৃষ্ণা-পেন্নার-পরিকল্পনা।—কৃষ্ণা নদীর জল বাঁধিয়া রায়লাসীমা অঞ্চলের ৪০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন ও আড়াই লক্ষ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

(১০) লক্কাবল্লী-পরিকল্পনা।—ভদ্রা নদীতে বাঁধ বাধিয়া একলক্ষ আশি হাজার একর জমিতে জলসেচন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলিবে।

(১১) কয়না-পরিকল্পনা।—সাতরা জেলায় জলকাওয়াছিতে কয়না নদীতে বাঁধ দিয়া সিংলি, মিরাজ ও শোলাপুর জিলায় জলসেচন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

(১২) মাচকুন্দ পরিকল্পনা।—মাচকুন্দ নদীতে ডুডুমা প্রপাতের জল আবদ্ধ করিয়া মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যার জন্য ১৭,৩৫০ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে,—কাহারও সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করা স্থির হইয়াছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পনা

(১) থল-পরিকল্পনা।—সিন্ধুনদের উপরিস্থিত মিয়ানওয়ালি ও কালাবাই হইতে খাল কাটিয়া সিন্ধুসাগর দোয়াবে ১ লক্ষ ২০ হা. একর জমিতে জলসেচন হইবে, এবং ৬,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎ প্রজনন হইবে।

(২) কর্ণফুলী-পরিকল্পনা।—চট্টগ্রামের এই নদীটি অবলম্বন করিয়া বিদ্যুৎ-প্রজনন, জলসেচন ও বন্যা-নিবারণ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ*

দেশ	লোকসংখ্যা কোটি	জলবিদ্যুৎশক্তি লক্ষ কি. ও.
সোভিয়েট রুশিয়া	১৭.০০	২২৪
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১৩.৩০	১৪৫
ক্যানাডা	১.০০	৭৭
সুইজর্লণ্ড	·৪০	২৪
নিউজিলণ্ড	·১০	৫
ভারতবর্ষ	৩৩.০০	৫

দ্রষ্টব্য। ভারতে অনুসৃত জলশক্তি-প্রজনন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ভারতের জলশক্তি হইবে ১৪৫ লক্ষ কিলো ওয়াট্।

---

* ডানলপ হাউস হইতে প্রকাশিত *Our Lifelines* পুস্তকে মুদ্রিত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী এন. ভি. গাড্‌গিল-প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সর্জ্জনশিল্প

(Manufacturing Industries)

ভারতের খনিশিল্প ও সর্জ্জনশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা—ইহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ,—ইহার সুবিধা ও অসুবিধা—ডাঃ ওয়াডিয়ার অভিমত।—বর্ত্তমান যুগে শিল্পোপজীবী জাতিসকলই জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। শিল্প অবলম্বন করার পরই জাপান জগতে উন্নত জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। চীন এক বৃহৎ দেশ,—তাহার লোকসংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু শিল্পে উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়াই জগৎসমাজে সে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে নাই। জগতে ভারতবর্ষের স্থান উচ্চে নহে। সুদূর অতীত যুগে চীন ও ভারত জগদ্বরেণ্য ছিল,—তখন তাহাদের লোকসংখ্যা কম ছিল,—ধরিত্রীবক্ষে শস্যোৎপাদন করিয়াই জনসাধারণ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিত ও জ্ঞানবিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারিত এবং দেশে-বিদেশে অন্ন ও জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া ভারত ভুবনমনমোহিনী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে গুপ্তধনের সন্ধান না পাইলে জাতির ভরণপোষণই সম্ভব হয় না। তাই এযুগে খনিজ সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া শিল্প সৃষ্টি করিতে না পারিলে জীবনই দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

কয়লা ও নানাপ্রকার ধাতু—বিশেষতঃ লৌহ—ইহাদের যথাযোগ্য ব্যবহারের উপরেই শিল্পসৃষ্টি প্রধানতঃ নির্ভর করে। ভারতের এই সম্পদ অতি প্রচুর না থাকিলেও শিল্পসৃষ্টি করিয়া জগৎসভায় দাঁড়াইবার পক্ষে প্রচুর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারত ১৯৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পরাধীন ছিল। বিদেশী শাসকবর্গ, নিজেদের দেশে শিল্পসৃষ্টি করিবার জন্য যে-সকল খনিজ উপাদান আবশ্যক, তাহাই মাত্র সংগ্রহ করিবার জন্য এদেশে খনির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিদেশের স্বার্থে ও বিদেশীর অর্থে দেশের খনিজ সম্পদ্ উত্তোলন করিয়া বিদেশে রপ্তানি করাই এতদিন আমাদের 'খনিশিল্প' ছিল। এইরূপে ক্রমশঃ আমাদের খনিসম্পদ অপহৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ১৯০৭ সালে জামসেদপুরে টাটা কোম্পানি লৌহশিল্পের কারখানা স্থাপন করিলে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্পের বীজ উপ্ত হইল।

বর্ত্তমান অবস্থা।—১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হইলে ঐ বৎসরই স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খনির কার্য্য-পরিচালনার ভবিষ্যৎনীতি বিঘোষিত হইল। ইহাতে

আশার আলোক দেখা দিল বটে, কিন্তু ইহার সফলতার পথে নানা সাময়িক অন্তরায় আসিয়া জুটিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ ভূতাত্ত্বিক ডাঃ ওয়াডিয়া, ভারতবর্ষের খনি (Mining), ভূতত্ত্ব (Geological) এবং ধাতুশোধন সম্বন্ধীয় (Metallurgical) প্রতিষ্ঠানের (Institute) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক সাধারণ সভায় বলিয়াছেন যে, এক্ষণে শিল্পোন্নতির প্রথম অন্তরায় হইয়াছে **নানারূপ নিয়ন্ত্রণ।** নিয়ন্ত্রণবশে কোন কার্য্যই প্রসারতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

দ্বিতীয় অন্তরায়—**খনির বিলি-বন্দোবস্তের বিভিন্ন নীতি।**—ভারতবর্ষের খনিগুলির অধিকারী কতক গবর্ণমেণ্ট, কতক জমিদার, কতক সাধারণ বে-সরকারী লোক। এই সকল অধিকারীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্বার্থে বিভিন্ন হারে খাজনা লইয়া খনি বন্দোবস্ত করেন, এবং খনিমুখে উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে যে-সেলামী (royalty) লইয়া থাকেন তাহাও বিভিন্ন। এই সকল খাজনা প্রভৃতির হার গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত হার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং হার-বিষয়ে কোন সামঞ্জস্য নাই।

শিল্পোন্নতির তৃতীয় অন্তরায়—**ইন্ধন, যন্ত্রপাতি, ও সাজ-সরঞ্জামাদি প্রাপ্তির অসুবিধা**; এবং ডাঃ ওয়াডিয়ার মতে চতুর্থ অন্তরায়—**আমদানি ও রপ্তানির অনুমতিপত্রের অসুবিধা।** যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম আমদানি করিবার অনুমতি দেন শিল্পের মন্ত্রী, কিন্তু রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করেন বাণিজ্যের মন্ত্রী। এইরূপ দ্বৈত নীতির ফলে নানা অসুবিধা ঘটে। অনেক স্থলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনভিজ্ঞ করিয়াই রাখা হয়। যেমন, শ্রমমন্ত্রী খনি-সম্বন্ধে আইন নির্দ্ধারণ করেন, এবং খনিগুলির পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু খনির কার্য্যে অভিজ্ঞ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বা খনিবিভাগের (Bureau of Mines) দফ্‌তরখানার ইহাতে কোন কর্ত্তৃত্বই নাই।

শিল্পোন্নতির পঞ্চম অন্তরায় হইয়াছে—**ট্যাক্সের গুরুভার।** নানাদিকে গুরুতর ট্যাক্সের চাপে লোকে নূতন প্রেরণায় নিরুৎসাহ হইয়াছে।

খনিজ সম্পদ আন্তঃপ্রাদেশিক প্রয়োজনীয় বস্তু।—ডাঃ ওয়াডিয়া আরও বলিয়াছেন যে, খনিশিল্পে এক প্রাকৃতিক সম্পদ্ উদ্ধৃত হয়,—এবং এই খনিজ সম্পদ্ দেশের সকল প্রদেশের এবং বিদেশের আন্তর্জাতিক প্রযোজন সিদ্ধ করে। সুতরাং খনিশিল্পকে প্রাদেশিক বিষয়বস্তু মনে করা উচিত নহে,—ইহাকে আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় বলিয়া গণ্য করিয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের বৃহৎ শিল্পগঠনের জন্য যে-সকল খনিজ দ্রব্যের প্রয়োজন, এখানে তাহার কোন-কোনটি প্রচুর পরিমাণে আছে, কোন-কোনটির ন্যূনত্ব এবং কোন

-কোনটির অভাব আছে। ভারতে খনিজ দ্রব্যের কোন্-কোন্টি সুলভপ্রাপ্য, কোন্-কোন্টিরই বা বিশেষ অভাব, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ডাঃ ওয়াডিয়াও তাঁহার অভিভাষণে এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,— শিল্পসৃষ্টিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় বস্তু কয়লা ও লৌহের মধ্যে লৌহ অতিরিক্তই আছে বলা যায়, এবং কয়লার প্রাচুর্য্যও মোটামুটি মন্দ নহে,—ম্যাঙ্গানিজ, টিটানিয়াম, থোরিয়াম এবং অভ্র আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করাও চলে, —এলুমিনিয়াম, ম্যাগ্নেশিয়ম্, নাইট্রেট, চূনাপাথর প্রভৃতি অপ্রচুর নহে ;—কিন্তু টিন, দস্তা, তামা, সীসা, রৌপ্য, গন্ধক, গ্রাফাইট এবং সর্ব্বোপরি পেট্রলিয়ম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ভারতে বিশেষ অভাব আছে। অবশেষে ডাঃ ওয়াডিয়া বলিয়াছেন— লাডকের নিকট গন্ধক, এবং কারওয়ারের নিকট পাইরাইট পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

বর্ত্তমান প্রয়োজন।—শিল্পসৃষ্টির পক্ষে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন বিজ্ঞানী- -দিগের সাহায্যে খনিদ্রব্যের সুষ্ঠু ব্যবহার। এক্ষণে খনিজ প্রস্তরের অভাব অপেক্ষা গুরুতর চিন্তার বিষয় কোক-কয়লার অভাব,—ইহা এদেশে কমই আছে, এবং তাহাও অসুবিধাজনকভাবে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং শিল্পসৃষ্টির জন্য এক্ষণে সুলভ জলবিদ্যুৎশক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই, এবং বিহার প্রভৃতি স্থানের কয়লাক্ষেত্র হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে কোন শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইলে জলবিদ্যুৎশক্তি-সুলভ স্থান নিরূপণই এক্ষণে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে-কয়েকটি বহুবৃত্তিক ও বিদ্যুৎজননী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জলবিদ্যুৎ- -উৎপাদনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। শিল্পপতিগণের পক্ষেও এক্ষণে এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করা উচিত, এবং অদূর ভবিষ্যতে খনিজ শিল্পকেন্দ্রস্থাপনের জন্য অর্থ, সামর্থ্য ও পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখিয়া শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

ডাঃ ওয়াডিয়া খনিজ দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার এবং দেশের শিল্পোন্নতিসম্পর্কে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণকল্পে আরও বলিয়াছেন,—এক্ষণে আমাদের ধাতুশোধনসম্পর্কীয় (Metallurgic) শিল্পের বিস্তার করিতে হইবে। লৌহ-ম্যাঙ্গানিজ (Ferro- -Manganese) এদেশে প্রস্তুত করিতে হইবে,—এদেশের এলুমিনিয়ম ও ম্যাগ্নেশিয়ম সম্পদের রপ্তানিযোগ্যভাবে প্রচুর উদ্ধার ও ব্যবহার করিতে হইবে,—তাড়িত-ধাতু- -নিষ্কাশন (Electro-Metallurgic) ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি করিতে হইবে,— অধিগম্য প্রস্তর হইতে প্রচুর টিটানিয়াম বাহির করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে লবণ ও ক্ষার-পদার্থ ও জমির উর্ব্বরতাসাধক নাইট্রেট ও ফস্ফেট-সংক্রান্ত রাসায়নিক

সারদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, অভ্রখনি-সন্নিহিত আবর্জ্জনাস্বরূপ পরিত্যক্ত অভ্রস্তূপের সদ্ব্যবহার এবং কয়লা হইতে ক্ষরণসাপেক্ষ উপ-উৎপাদন (by-products) প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষভাবে মন দিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—খনিসম্বন্ধীয় কার্য্য ও ধাতুশোধন-শিল্পবিজ্ঞানে আমাদের যুবকগণকে অবিলম্বে শিক্ষাদান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের শিল্পোন্নতি দুরূহ কার্য্য সন্দেহ নাই,—কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যও ধীরতা, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত সম্পাদন করিতে হইবে,—ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ আর উপেক্ষা করা উচিত নহে,—ইহাতে সুষ্ঠু ও অবিলম্বিত মনোযোগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্প

লৌহশিল্প—লৌহশিল্পে ভারতের অতীত গৌরব।— ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীতে লৌহশিল্পই সর্ব্বপ্রধান শ্রমশিল্প এবং অন্য শিল্পপ্রচেষ্টার দ্বারস্বরূপ। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ এই শিল্পে সবিশেষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। লৌহপ্রস্তর হইতে লৌহশোধন, উপযুক্ত উত্তাপপ্রয়োগে লৌহের সংযোগ-সাধন, ইস্পাত-প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি লৌহসংক্রান্ত কার্য্যে ভারত যখন অপূর্ব্ব দক্ষতা লাভ করিযাছিল, তখন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি যে ইহার সমকক্ষ ছিল তাহার কোন পরিচয় নাই। অন্ততঃ, ভারতের নানাস্থানে, এবং পৃথিবীর কোন-কোন অংশের শিল্পদ্রব্যে, ভারতের লৌহশিল্পে অপূর্ব্ব দক্ষতার যে-পরিচয় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই উন্নত শিল্পযুগেও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। ডামস্কস তরবারী পৃথিবী-বিখ্যাত, কিন্তু তাহার ইস্পাত যোগাইত ভারতের হায়দারাবাদ ;— দিল্লীর কুতব মিনারের নিকটবর্ত্তী লৌহস্তম্ভটি ৪১৫ খৃ. অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল,— ইহার উচ্চতা ২৩ ফি. এবং ওজন ছয় টন ;—ইহা এখনও সম্পূর্ণ কলঙ্কহীন,—ইহা দেখিয়া বর্ত্তমানকালে লৌহশিল্পে অগ্রগণ্য পাশ্চাত্ত্য জগৎ প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্প-প্রতিভার কথা ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ লৌহশিল্পসম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি লৌহখনিপ্রধান প্রদেশের স্থানে-স্থানে প্রাচীনকালের লৌহসংক্রান্ত কারখানার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যভারতের মালবস্থিত ৪৩ ফি. ৮ ই. দীর্ঘ লৌহস্তম্ভ, রাজপুতানার আবু-পাহাড়স্থিত স্তম্ভ, প্রাচীন মন্দিরাদির মধ্যে নানারূপ থাম বা ছড় প্রভৃতি, ভারতের লৌহশিল্প-সংস্রবে অভিজ্ঞতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ

উত্তরভারতে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লৌহমল বা গাদ এখনও প্রাচীন লৌহশিল্পের পরিচয় দিতেছে।

কালধর্ম্মে ভারতের সে-গৌরব নষ্ট হইয়াছে,—ভারত ভুলিয়া গিয়াছিল যে, কোন কালে তাহার লৌহশিল্প, এমন কি লৌহসম্পদ্, ছিল। আবশ্যকীয় ইস্পাতের জন্য সে একেবারে পরপ্রত্যাশী হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে ভারতের এই অভাবের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে,—লৌহশিল্পে তাহার উন্নতির আশার রেখাপাত হইয়াছে।

খনি।—লৌহ-খনি।—ভারতে যে-সকল লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে যে,—

(১) বিহারের সিংহভূম, এবং উড়িষ্যায়—কেওনঝর, ময়ুরভঞ্জ ও বোনাই অঞ্চলে প্রচুর লৌহসম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,—ভারতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খনি-অঞ্চলে লৌহ-প্রাচুর্য্যও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহার আরও এক বিশেষত্ব এই যে, পর্ব্বতের উপরে (৫০নং চিত্র) এই লৌহ প্রচুর সঞ্চিত আছে,—গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশের মত খনি

ভারতে লৌহের অবস্থিতি

৫০নং চিত্র
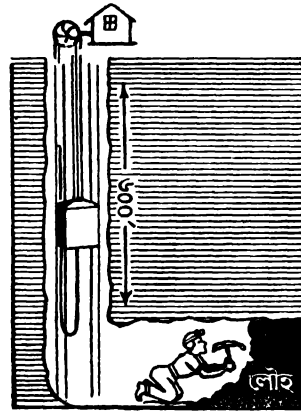
গ্রেটবৃটেনে লৌহের অবস্থিতি

৫১নং চিত্র

খুঁড়িয়া (৫১নং চিত্র) লৌহ সংগ্রহ করিতে হয় না,—খনিকার্য্যে অশিক্ষিত সাধারণ শ্রমিক দিয়াই লৌহ কাটিয়া বাহির করা যায়—আবার এখানকার লৌহপ্রস্তরে লৌহের অংশও বেশী।

কয়লার খনি।—কয়লাখনির অবস্থিতিসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। আসাম, কাশ্মীর, রাজপুতানা, হায়দারাবাদ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে অল্পবিস্তর কয়লার খনি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়লার খনি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের দামোদর-উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত।

(২) ধাতুশোধনের জন্য সাক্ষাৎভাবে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোক-কয়লা। এই কোক-কয়লা প্রাপ্তির প্রধান স্থান—এই অঞ্চলের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিড়ি ও বোকারো কয়লাখনি।
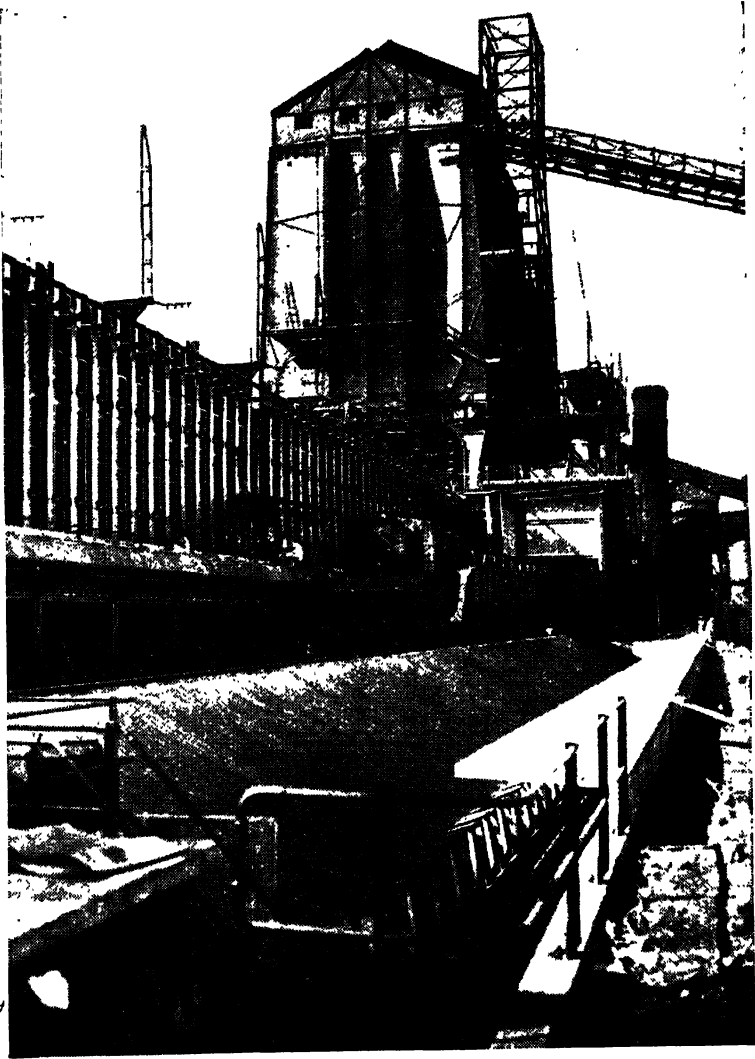
৫২নং চিত্র।—লৌহ-প্রস্তর গালাইবার চুল্লী (Blast Furnace)

(৩) লৌহ গলাইবার জন্য আবশ্যক বিদ্রাবক—**চুণাপাথর ও ডলোমাইট** এই অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী স্থানেই পাওয়া যায়। (৪) **সিলিকা, ও ম্যাঙ্গানিজ**

প্রভৃতি অন্য যে-সকল খনিজ দ্রব্য এই শিল্পের জন্য আবশ্যক, তাহাও নিকটে নিকটেই পাওয়া যায়। (৫) এই শিল্পের জন্য যে-সকল তাপসহনক্ষম (refractory) ধাতু দরকার তাহাও এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত (৬) এই অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর কর্ম্মপ্রার্থী, সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। এই সকল কারণে বঙ্গ-বিহারের খনি-অঞ্চল লৌহশিল্পের সবিশেষ উপযোগী।

লৌহশিল্পের পুনরুত্থানের ইতিহাস।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এখন লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্পই অন্যতম প্রধান শিল্প;—ইহাতে ৭৭ হাজার লোক খাটে, এবং ৪০ কোটি টাকা এই শিল্পে নিয়োগ করা হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, এদেশে পাশ্চাত্ত্য প্রথায় এই শিল্পের ১৭৭৯ সালে **প্রথম চেষ্টা** করেন,—মট্টি ও ফার্কার (Mottee & Farquhar),—তাঁহারা বীরভূমের লৌহ-অঞ্চলের ইজারা লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিফলমনোরথ হন।

ইহার বহু পরে, ১৮৩০ সালে মিষ্টার জে. এম. হীথ নামে মান্দ্রাজের এক অবসরপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী পোর্টো নোভো নামক স্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে লৌহশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হইল বলিয়া ১৮৬৭ সালের পর এই কোম্পানি আর চলিল না।

ইহার পরে বীরভূমে কয়েকবার লৌহশোধনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ ফললাভ হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। লৌহশিল্পসম্পর্কে ১৮৭৪ সালে **তৃতীয় চেষ্টা** করে বরাকর লৌহ ফাউণ্ড্রি (Barakar Iron Foundry)। কুল্‌টিতে ইহার কারখানা স্থাপিত হয়, এবং ইহা এই ব্যবসায়ে বেশ সফলতাও লাভ ঘটে। কিন্তু ১৮৮৭ সালে ইহা বরাকর আয়রন ও স্টীল কোম্পানির হস্তগত হয়, এবং দুই বৎসর পরেই ইহার নানা পরিবর্ত্তন ঘটে, ও ইহা ১৮৮৯ সালে বেঙ্গল আয়রন এণ্ড স্টীল কোং (Bengal Iron and Steel Co.) এবং পরে ১৯১৯ সালে ইহা বেঙ্গল আয়রন কোং (Bengal Iron Co.) নামে পরিচিত হয়। এই কারখানাই ভারতে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য প্রথায় কাঁচা লৌহ (pig iron) প্রস্তুত করিবার সফল কারখানা। ইহার পরে ১৯১৮ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোম্পানি আসানসোল হইতে মাত্র ৪ মা. দূরে **হীরাপুরে** গঠিত হয়, এবং ১৯৩৬ সালে বেঙ্গল আয়রন কোং ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এইস্থানে স্থাপন করার অনেক সুবিধা ছিল। যেমন—

(১) ইহা কয়লা-অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য কয়লা আনিবার কোন খরচ নাই।

(২) লৌহখনি ইহার কিছু দূরে অবস্থিত বটে, কিন্তু সে-দূরত্ব খুব বেশী নহে। বিশেষ, কয়লা আনিবার কোন খরচ না থাকাতে লৌহ আনিবার জন্য যে বেশী খরচ হয় তাহা বিশেষ ক্ষতিকর নহে।

(৩) ম্যাঙ্গানিজ ও ডলোমাইট এখান হইতে বিশেষ দূরে অবস্থিত নহে। ম্যাঙ্গানিজ আসে মধ্যপ্রদেশ হইতে, চূণাপাথর ও ডলোমাইট আসে বিস্‌রা ও গাংপুর হইতে।

(৪) কলিকাতা-সন্নিহিত লোহার বাজার ও কলিকাতা বন্দর নিকটেই অবস্থিত।

(৫) দামোদর হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইবার সুবিধা আছে।

(৬) শ্রমিক এ-অঞ্চলে প্রচুর ও সুলভ।

কিন্তু ভারতে এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিহারের জামসেদপুরের **টাটা কোম্পানি।** বোম্বাইয়ের ধনকুবের জে. এন. টাটা লৌহখনির সন্ধানে যখন মধ্যপ্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার অধীন গোবরডাঙ্গা গ্রামের পি. এন. বসু নামে গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগের জনৈক ভূতাত্ত্বিক তাঁহাকে উড়িষ্যার গুরুমহিষানির পাহাড়ের লৌহসমৃদ্ধ উচ্চাংশে অফুরন্ত লৌহভাণ্ডার দেখাইয়া দেন। এই লৌহসম্পদের সন্ধান পাইয়া এবং এই অঞ্চলে

৫৩নং চিত্র।—টাটা কোম্পানির কারখানা (জামসেদপুর)

লৌহশিল্পগঠনের নানা সুবিধা দেখিয়া জে. এন. টাটা মধ্যপ্রদেশে লৌহশিল্পের কারখানা-স্থাপনের কল্পনা পরিত্যাগ করেন, এবং কোম্পানি গঠন করিয়া ১৯০৭ সালে সিনিতে কারখানা স্থাপন করেন। এই স্থানে জমিসংক্রান্ত অসুবিধা হইলে ইহা সাক্‌চি নামক এক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই সাক্‌চি-ই এক্ষণে টাটানগর বা জামসেদপুর। ১৯০৮ সালে এই কারখানার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং প্রথমে ১৯১১ সালে

কাঁচা লৌহ প্রস্তুত হয়, পরে ১৯১২ সালে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইহাই ভারতে লৌহশিল্পের পুনরুত্থান-যুগের **প্রথম ইস্পাত নির্ম্মাণ**। গত ৪০ বৎসরে টাটা কোম্পানি লৌহশিল্পে অপূর্ব্ব সফলতা লাভ করিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডে শ্রেষ্ঠ লৌহ-কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি টাটাজি এই অঞ্চলে লৌহশিল্পস্থষ্টির নানা স্থবিধা দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, লৌহশিল্পস্থষ্টির পক্ষে বঙ্গ-বিহারের এই কয়লা-অঞ্চল আদর্শ স্থান। প্রকৃতপক্ষে জামসেদপুরে কারখানা স্থাপন করিয়া তিনি শিল্পোন্নতির বিশেষ স্থবিধা করিলেন। যেমন,—

(ক) ইহার জন্য আবশ্যক লৌহপ্রস্তরের প্রাপ্তিস্থান গুরুমহিষানি, স্থলাইপেত, নোয়ামুন্দি, বাদাম পাহাড় অঞ্চল মাত্র ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

(খ) ইহার কয়লাপ্রাপ্তির স্থান—ঝরিয়া-অঞ্চল। ইহা মাত্র ১১২ মাইল দূরবর্ত্তী।

(গ) ইহার জন্য ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট ও চুনাপাথর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পাওয়া যায়। এইসকল দ্রব্য প্রাপ্তির খনি ন্যূনাধিক ১১০ মাইল অপেক্ষা দূরবর্ত্তী নহে।

এইসকল নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে শিল্প-উপাদান আনিবার খরচ কম।

(ঘ) ইহার মাত্র ১৫২ মাইল দূরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। ইহা ভারতে শ্রেষ্ঠ বন্দর। স্থতরাং রপ্তানির পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হইল। তদুপরি কলিকাতার চতুর্দ্দিকেও একটি লৌহের বাজার ছিল। সেই বাজার লক্ষ্য করিয়া এবং অতিরিক্ত লৌহ কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি করার বিশেষ স্থবিধা অনুভব করিয়া টাটানগরে কারখানা স্থাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক মনে হইল।

(ঙ) বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই অঞ্চলে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া অবস্থিত। স্থতরাং কারখানায় জন্য শিল্প-উপাদান আনিবার ও কারখানা হইতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দেশের অন্যত্র ও রপ্তানি জন্য বিশাখাপত্তন বন্দরে পাঠাইবার বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে।

(চ) নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থান হইতে স্থলভে বিস্তর শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে।

(ছ) শিল্পকারখানাব জন্য নিকটবর্ত্তী খরখৈ ও স্থবর্ণরেখা নদী হইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইতেছে।

হীরাপুর ও টাটানগর এই দুই স্থানের কোম্পানিরই নিজ-নিজ লৌহ, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির খনি আছে।

এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য লৌহ-কারখানা আছে;—উহা মহীশূরের অন্তর্গত **ভদ্রাবতী লৌহ-কারখানা**। ইহার জন্য—

(১) লৌহ পাওয়া যায় বাবাবুদান পাহাড়ের কেম্মাগুন্ডি খনি হইতে। ইহা মাত্র ২৫ মা. দূরে অবস্থিত।

(২) কোক-কয়লার পরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী বন হইতে কাঠকয়লা এবং জগ জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়। কারণ, এ-অঞ্চলে কোক-কয়লার অভাব।

(৩) চূণাপাথর মাত্র ১৪ মা, দূরবর্ত্তী ভাণ্ডিগুণ্ডা হইতে পাওয়া যায়।

এইসকল কারণে ইহারও অবস্থিতি লৌহশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহা ব্যতীত কয়েকটি ছোট-ছোট কারখানা আছে। উহাদের সংখ্যা প্রায় ১৩২টি হইবে।

যে-লৌহদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা সম্পূর্ণ হইলে মূল্য হয় ৭৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ভারত গবর্ণমেণ্ট মধ্যপ্রদেশে একটি ও উড়িষ্যায় আর একটি লৌহ-কারখানা স্থাপনের জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। মান্দ্রাজে লৌহ আছে, কিন্তু ইন্ধনের অভাব আছে। তবে এই জলবিদ্যুৎশক্তির যুগে মান্দ্রাজেও একটি লৌহ-কারখানা অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

লৌহশিল্পে ভারতের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। বিপদের সঙ্গেও সম্পদ্ জড়িত থাকে,—দুই মহাযুদ্ধই অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লৌহশিল্পেরও উন্নতিবিধানে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে, এই শিল্পের শিশু অবস্থায়, ইহার উন্নয়ন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করেন, এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ২৩ বৎসর যাবৎ এই শিল্প এই সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই শিল্পের উন্নতিসাধনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সেজন্য ইহার উন্নতিও দ্রুত হইয়াছিল।

লৌহ-উৎপাদন।—ভারতের লৌহ-উৎপাদনের পরিমাণ :—

লৌহ	১৯৪৭ (হাজার টন)	১৯৪৮ (হাজার টন)	১৯৪৯ (হাজার টন)	১৯৫০ (জানু. হইতে জুন—হাজার টন)
কাঁচা লৌহ (Pig Iron)	১৩২০	১৪০৫	১৫২৮	৭৫৩
ইস্পাত (পিণ্ড ও ঢালাই) (Ingots and Castings)	১২৫৬	১২৫৬	১৩৫৩	৬৮৭
পাকা ইস্পাত (Finished Steel)	৮৯৩	৮৫৬	৯৩০	৪৭৭

এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—ভারী ও পাতলা কড়ি প্রভৃতি গঠন কার্য্যের লৌহদ্রব্য, ভারী রেলের পাটি ও পাটিসংক্রান্ত দ্রব্য, টিন প্লেট, লোহার তার, ছড় (bar), লাঠি (rod), তার, চাকা, স্প্রিং প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের ২৫% অংশ মাত্র আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। অবশিষ্ট আমদানি করিতে হয়।

১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালে (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ) লৌহদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি এইরূপ :—

	১৯৪৯-৫০		১৯৫০-৫১	
	আমদানি টন	রপ্তানি (সহস্র টাকা)	আমদানি টন	রপ্তানি (সহস্র টাকা)
(ক) যন্ত্রপাতি	১,০৫৫,২১৮	৫,১২১	৮,৪৩,৯৫১	৬,২৪৯
(খ) লৌহ ও লৌহদ্রব্য	১,৩৭,০২৩	১৫,৯৩৯	১,৭৬,৪৯১	১৪,৮৭২
(গ) যানবাহন	২,৩৪,৫৬৮	৭,৫৭৬	২,৩৯,২৫৬	৬,৭৫৫

১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে যুক্তরাজ্য হইতে আমদানি হইয়াছে :—

(ক) লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য	,,	,,	৬,০৮৩ পা.
(খ) যন্ত্রপাতি	,,	,,	২৬,০৪৬ ,,
(গ) গাড়ী, জাহাজ ও আকাশযান	,,	,,	১৮,২৮২ ,,

কাঁচালোহ ও ইস্পাত আমরা আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও চীনে রপ্তানি করিয়া থাকি। কলিকাতা ও বিশাখাপত্তন হইতে এই রপ্তানিদ্রব্য প্রেরিত হয়।

লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্পের ভবিষ্যৎ।—ভারতে ইস্পাতশিল্পের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে—এই দেশেই এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইহার যেরূপ বিক্রয়-স্থান আছে, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট লৌহের অভাব দূর করিবার জন্য ও ঐ শিল্পের উন্নতিকল্পে যেসকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, যদি এদেশের কয়লা- ও লৌহ-ভাণ্ডার সুরক্ষিত থাকে,—যদি তাহার অপব্যয় না হয়,—তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহদ্রব্য-উৎপাদক দেশ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানে লৌহের সর্জ্জনশিল্প গড়িয়া উঠে নাই।

অপর অ-লৌহ ধাতুর শোধনাত্মক শিল্প

(Other Non-ferrous Metal Industries)

অ-লৌহ ধাতু (Non-ferrous Metals).—লৌহ ব্যতীত অন্য যে-সকল ধাতু বিশেষ প্রয়োজনে লাগে, তাহাদের মধ্যে দস্তা, সীসা, টিন, নিকেল, তাম্র ও এলুমিনিয়ম প্রধান। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এই অ-লৌহ ধাতু-সম্পদে একেবারে দরিদ্র। এদেশে কেবল দুইটিমাত্র অ-লৌহ ধাতু-প্রস্তর কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়, ও তাহাদের নিষ্কাশনের মোটামুটি ব্যবস্থা আছে—(১) **তাম্র** ও (২) **এলুমিনিয়ম**।

(১) তাম্র।—বর্ত্তমান বিদ্যুৎশক্তির যুগে তাম্রের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী ;—কারণ তাম্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎবাহী (conductor) ধাতু। বিদ্যুৎবাহী তার নির্ম্মাণে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এইরূপ তার-নির্ম্মাণের জন্য যেরূপ নির্ম্মল তামার দরকার, ভারতে সেরূপ নির্ম্মল তামা প্রস্তুত হয় না। তামার অন্য একটি গুণ এই যে, ইহাতে শীঘ্র কলঙ্ক পড়ে না। সেজন্য জলের নল প্রস্তুত করিতে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

তাম্র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই একাদশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাম্রদ্রব্য।—তাম্র হইতে কলিকাতা, আলিগড়, দিল্লী ও বোম্বাই সহরে তামার ও পিতলের তার প্রস্তুত হয়। এই সকল তার জরিরূপে ব্যবহৃত হয়। ঘাটশিলায় তামার ও পিতলের চাদর প্রস্তুত হয়।

(২) এলুমিনিয়ম।—পূর্ব্বেই বক্সাইট শীর্ষক বর্ণনায় বলা হইয়াছে, বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়ম বাহির করিয়া লওয়া হয়। বক্সাইট হইতে প্রথম প্রস্তুত করা হয় **এলুমিনা**। তৎপরে তাহা হইতে প্রস্তুত করা হয় **এলুমিনিয়ম।** ভারতবর্ষে বক্সাইট প্রচুর আছে। ৪ টন বক্সাইট হইতে ২ টন এলুমিনা এবং ২ টন এলুমিনা হইতে ১ টন এলুমিনিয়ম হয়।

এলুমিনিয়ম দ্রব্য।—এদেশে মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৯১২ সালে প্রথম এলুমিনিয়ম বাসন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার কারখানা হইয়াছিল। রপ্তানি-করা এলুমিনিয়মের চাদর ও ছড় কাটিয়া এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। কারণ তখন এদেশে এলুমিনা বা এলুমিনিয়ম প্রস্তুত হইত না। মান্দ্রাজের এই এলুমিনিয়ম-দ্রব্যাদি বাহির হইবার পরে শীঘ্রই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি সহরে কুটিরশিল্পের আকারে ছোট-ছোট এলুমিনিয়ম দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখানা গড়িয়া উঠিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এলুমিনিয়ম-সংক্রান্ত নানাদ্রব্য নির্ম্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং বহু প্রয়োজন-সাধনোপযোগী নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল;—রবারক্ষেত্রে আঠা ধরিবার পাত্র, চাক্ষেত্রে চা খুঁটিবার পাত্র, জলের বোতল, বাজীর জন্য এলুমিনিয়মের গুঁড়া, আকাশযানের চৌবাচ্চা প্রভৃতি কত রকম ব্যবহার যে বাড়িয়া গেল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ ধরণের এলুমিনিয়মের কারখানা আছে দুইটি—**(১) ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়ম কোং ও (২) এলুমিনিয়ম করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া।**

(১) ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়ম কোং (Indian Aluminium Co.)।—বেলুড়ে ১৯৪১ সালে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া সেখানে প্রথমে রপ্তানি-করা এলুমিনিয়ম পিণ্ড হইতে এলুমিনিয়মের পাত, ছড় প্রভৃতি প্রস্তুত আরম্ভ করা হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে এলুমিনিয়ম দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেজন্য এলুমিনিয়ম পাতের বিস্তর চাহিদা ছিল। আবার চায়ের বাক্সের ভিতরে আচ্ছাদন দিতেও এলুমিনিয়মের পাতলা পাতের খুবই দরকার ছিল। ইহার পরে এই কোম্পানি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাষ্ট্রের অন্তর্গত অলওয়া (Alwaya) নামক স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়া এলুমিনা হইতে এলুমিনিয়ম পিণ্ড প্রস্তুত করিতে লাগিল। ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষে প্রথম এইস্থানে এলুমিনিয়ম পিণ্ড প্রস্তুত হইল। যদিও এই অঞ্চলে দূর হইতে বক্সাইট আনিতে হয়,

তথাপি সুলভপ্রাপ্য পল্লীবসল জল-বিদ্যুৎক্ষেত্র হইতে সুলভে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায়, এবং শ্রমিকও সুলভ বলিয়া এই স্থানে এই কারখানা স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচিত হইল। এক্ষণে বেলুড়ে এখানকার পিণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে। বেলুড় কারখানা এক্ষণে এত বড় হইয়াছে যে, ইহা কোন অংশে উত্তর-আমেরিকার এই প্রকার কোন কারখানা হইতে হীন নহে।

এখানে এলুমিনিয়ম পিণ্ড প্রস্তুত করা হইতেছিল বটে, কিন্তু ইহার জন্য এলুমিনা আসিত ক্যানাডা হইতে। এই অভাব দূরীকরণের জন্য বিহার প্রদেশে মুরী রেল স্টেশনের নিকট একটি এলুমিনা প্রস্তুত করার কারখানা এই কোম্পানিই স্থাপন করিয়াছে। ১৯৪৭ সাল হইতেই এখানে এলুমিনা প্রস্তুত করা চলিতেছে। সুতরাং এক্ষণে বক্সাইট-প্রস্তর হইতে এলুমিনা, এলুমিনা হইতে এলুমিনিয়ম পিণ্ড, ও তাহা হইতে এলুমিনিয়ম পাত ও ছড় ও শেষে তাহা হইতে এলুমিনিয়ম দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি সমস্ত স্তরের কাজই ভারতে হইতেছে।

(২) এলুমিনিয়ম করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া (The Aluminium Corporation of India, Ltd.)—১৯৪৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার নিকটবর্ত্তী অনুপনগর নামক স্থানে স্থাপিত হয়। ১৯৪৪ সালে এখানে বক্সাইট-প্রস্তর হইতে ধাতু-নিষ্কাশন ও এলুমিনা প্রস্তুত আরম্ভ হয়;—১৯৪৫ সালে এলুমিনিয়ম পিণ্ড ও এলুমিনিয়মের চাদর ও পাত প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকে। সুতরাং এখানে ধাতুশোধন হইতে পাত-প্রস্তুতকরণ পর্য্যন্ত এলুমিনিয়ম-সংক্রান্ত সকল স্তরের কাজই হইয়া থাকে। এখানে ৩,৫০০ হইতে ৪,০০০ হাজার টন এলুমিনা ও ২,০০০ টন পিণ্ড প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইতে পারে।

এই দুটি কোম্পানি হইতে বৎসরে নিম্নলিখিতরূপ এলুমিনিয়ম পিণ্ড পাওয়া গিয়াছে;—

১৯৪৬ সালে	৩,২০০ টন
১৯৪৭ „	৩,২০০ „
১৯৪৮ „	৩,৪০০ „
১৯৪৯ „	৩,৫০০ „

এই দুইটি ভিন্ন এলুমিনিয়মের ছোট-ছোট কারখানা আরও আছে। যুদ্ধের সময় অনেক ছোট-ছোট নূতন-নূতন কারখানা হইয়াছিল; যেমন—Aluminium Manufacturing Co., Ltd., Calcutta; Anant Shivaji Desai, Bombay; Lallubhai Amichand, Bombay; Aluminium Production Co. of India, Ltd. প্রভৃতি। ইহারা নানাপ্রকার ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিত।

১৯৪৮ খৃঃ অব্দে মধ্যপ্রদেশে সেখানকার গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় একটি এলুমিনিয়ম কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ কারখানা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিতেছে। এই স্থানে যেমন প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়, তেমনি অপকৃষ্ট কয়লা দিয়া শক্তি-উৎপাদনেরও সুবিধা আছে।

রক্ষণ-শুল্ক।—এলুমিনিয়ম শিল্পের উন্নতিকল্পে আমদানি এলুমিনিয়মের উপর রক্ষণ-শিল্প স্থাপিত হইয়াছে।

আমদানি।—ভারতে এলুমিনিয়ম ও এলুমিনিয়ম-সংক্রান্ত দ্রব্য নিম্নলিখিতরূপ আমদানি হইয়াছে :—

এলুমিনিয়ম আমদানি

	১৯৪৭-৪৭ (টন)	১৯৪৭-৪৮ (টন)	১৯৪৮-৪৯ (টন)
এলুমিনিয়ম ধাতু	৭,৩৬৫	২,৬৪২	৩৩০
এলুমিনিয়ম চাদর, পাত প্রভৃতি	৪,৩৪২	৯,৩৫২	৯,১২৩

ভারতে উৎপন্ন এলুমিনিয়ম—উপরি-উক্ত দুইটি কোম্পানি হইতে ভারতে নিম্নলিখিতরূপ এলুমিনিয়ম উৎপন্ন হইয়াছে ;—

ভারতে উৎপন্ন এলুমিনিয়ম

সাল	ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়ম কোং (টন)	এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (টন)	আমদানি সমেত ব্যবহৃত এলুমিনিয়মের মোট পরিমাণ (টন)
১৯৪৩	১,২৭২	×	১,২৮৮
১৯৪৪	১,৬০৯	২০০	৩,১৬৯
১৯৪৫	১,৩৪৪	৯০০	৬,৮১৬
১৯৪৬	১,৮০০	১২০০	১৩,৩০০

সীসা।—কলিকাতা অঞ্চলে অল্প পরিমাণে সীসার চাদর ও পাতলা পাত প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে বোম্বাই সহরে একটি সীসার নল প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। বিহারে কাত্রাসগড় অঞ্চলেও একটি সীসক-শোধন কারখানা হইয়াছে।

কার্পাস বয়নশিল্প

ভারতে কার্পাস বয়নশিল্প সম্বন্ধে জাতি-সংসদের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কমিটি বলিয়াছেন যে, কি মূলধনের পরিমাণ হিসাবে, কি শ্রমিক বিনিয়োগে, কিংবা কি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে, ভারতে কার্পাস বয়নশিল্পই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ শিল্প। ইহার মূলধন—১০০ কোটি টাকা,—৫ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে কাজ করিয়া থাকে,—এবং উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যের মূল্য মোটামুটি হিসাবে ৪০০ কোটি টাকা। অন্ততঃ, ভারতীয় শিল্পসমূহের প্রধানতঃ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থপ্রসূ শিল্প,—পৃথিবীর শিল্পে ইহার স্থান দ্বিতীয়, এবং টেকো ও তাঁতের সংখ্যা হিসাবে ইহার স্থান পঞ্চম। কেবল ভারত বিভাগের পরে পাটই কয়েক বৎসর প্রধান অর্থপ্রসূ শিল্প হইয়াছিল।

প্রাচীনত্ব।—ভারতের এই কার্পাসবস্ত্র নির্ম্মাণশিল্প বহু প্রাচীন;—কার্পাস, কার্পাসসূত্র ও কার্পাসবস্ত্রের জন্মস্থানই ভারতবর্ষ। ঋগ্‌বেদে কার্পাস-বস্ত্রের উল্লেখ আছে, মহেঞ্জো-দারোর ধ্বংসস্তূপে কার্পাসবস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং খৃস্টের জন্মের চারি সহস্র ও তদধিক বৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষ কার্পাসবস্ত্র-বয়নে দক্ষ ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। পরবর্ত্তী যুগে ভারতের কার্পাসবস্ত্র ইউরোপে রপ্তানি করা হইত। দক্ষিণ-ভারতে কালিকটের বস্ত্র হইতেই **ক্যালিকো** নামের কাপড় হইয়াছে। মসলিপত্তনের ছিট ইউরোপে সাদরে ব্যবহৃত হইত। ভারতের মস্‌লিন কাপড়ও ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছিল। ঢাকার তিন প্রকার মস্‌লিন জগৎবিখ্যাত হইয়াছিল। তাহাদের এক প্রকারের নাম আব্‌-ই-বাৱান অর্থাৎ স্রোতের জল, দ্বিতীয় প্রকার—বাফ্‌ট্‌-ই-হাৱা অর্থাৎ উপ্ত বায়ু, এবং তৃতীয় প্রকার—সাদ-ই-নাম অর্থাৎ সান্ধ্য শিশির। কার্পাস-বয়নশিল্পের এই উন্নতির যুগেও পৃথিবীর কোন দেশই আজও এই মস্‌লিনের মত বস্ত্র বা ইহার সূতার মত সূত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই। সে-সময়ে ইহা ছিল কুটীরশিল্প,—তাঁতীর তাঁতে ও আঙ্গুলের টিপে ইহার সৃষ্টি হইত।

অধঃপতন,—শিল্পের বিলোপ।—সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ কেবল নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুত করে নাই, বহু বস্ত্র বিদেশে, বিশেষতঃ ইউরোপে, রপ্তানি করিয়াছে। খৃস্টপূর্ব্ব পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে কার্পাসদ্রব্য প্রেরিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ভারতের ক্যালিকো সৌখীন দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন ম্যাঞ্চেস্টারে বস্ত্রবয়ন চলিতেছে। বিনাশুল্কের বাণিজ্যে সহজে ম্যাঞ্চেস্টার ভারতের বস্ত্রকে ইংলণ্ডের বাজার হইতে হঠাইতে পারে নাই;—শেষে আইনের সাহায্যে বিতাড়িত করিয়াছিল। এই সময়ে সুরাট ও ব্রোচ

বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর ছিল। তখন নর্মদা ও তাপ্তীর উপত্যকায় কার্পাস জন্মিত, এবং এই অঞ্চলে প্রস্তুত বস্ত্র সুরাট বন্দর দিয়া ইউরোপে চালান যাইত। কালক্রমে নদীমুখ মজিয়া গেল, বাণিজ্য-জাহাজও বৃহত্তর হইল। তাই এ-অঞ্চলের বাণিজ্য-তৎপরতা বোম্বাই-এ চলিয়া গেল। বোম্বাই বন্দর ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিল।

প্রাচীন ভারতের অত্যুন্নত কার্পাসশিল্পের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, (১) ইহার পরে ইংলণ্ডে বয়ন-যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, এবং বাষ্পীয় ও জলশক্তিতে সেই যন্ত্র চালিত হইতে লাগিল। ইহাতে ইংলণ্ডে এত অল্পমূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল যে, তাহার সহিত বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা ভারতের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। (২) ভারতের বস্ত্র ইংলণ্ডে সেখানকার মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৫০-৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রীত হইত। বিলাতের মিলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ হইলে, বৃটিশরাজ অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক বসাইয়া সেদেশে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানি অসম্ভব করিয়া দিয়াছিল। (৩) ভারত তখন বিদেশী ইংরাজের অধীন,—ভারতে বাষ্পশক্তি উৎপাদনের ও যন্ত্রনির্ম্মাণ বা পরিচালনের কোন চেষ্টাই হইল না। বরং এই শিল্প দমন করিবার জন্য ভারতের তদানীন্তন বণিক্-শাসনকর্ত্তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বয়নশিল্প নষ্ট করিবার জন্য এদেশে কৃষিকার্য্যের প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া শিল্পপ্রচেষ্টা নষ্ট করিয়া দিল। প্রকৃতপক্ষে এদেশের কার্পাসশিল্প নষ্ট করিবার জন্য বণিকবৃত্তি-সম্পন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে-অত্যাচারের স্রোত বহাইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও তাহাদের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের বয়নশিল্প ক্রমশঃই হটিতে লাগিল,—ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া হইতে ভারতীয় বস্ত্র বিতাড়িত হইল,—শেষে বিদেশী বস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত দেশের মধ্যেই হারিয়া গেল,—ভারতের বয়নশিল্পের লোপ হইল,—ক্রমশঃ সে তাহার বয়নশিল্পের কথা ভুলিয়াই গেল।

বয়নশিল্পের পুনরুত্থান।—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ড চীন দেশে সুতা চালান দিতে আরম্ভ করে। সেই বাণিজ্যের মধ্যে বোম্বাই-অঞ্চলের পার্শীরা আংশিকভাবে প্রবেশ করে। এই সময়ে ১৮১৮ সালে ইংরাজদিগের মূলধনে কলিকাতার নিকটে এ-অঞ্চলের তুলা হইতে সুতা করিবার জন্য হাওড়া জেলায় ফোর্ট গ্লস্টার মিল স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে বাউড়িয়া তুলার কল নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে বোম্বাই-অঞ্চলের পার্শীরা ব্যবসায়োপযোগী অর্থসঞ্চয়েও সমর্থ হন,—চীনের সহিত ব্যবসায়ে তাঁহাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সূত্র-

-বাণিজ্যের সহিত সংস্রব থাকাতে কার্পাসশিল্পের যন্ত্রাদি বিলাত হইতে আনানোও তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইল। তা-ছাড়া, সমগ্র ভারতে বোম্বাই-অঞ্চলের জনসাধারণের বিশেষতঃ পার্শীদিগের মধ্যে ব্যবসা-প্রবণতা চিরদিনই অধিক ছিল। এজন্য কয়াসজি মামাভাই ডাবর নামে জনৈক পার্শী ১৮৫১ সালে বোম্বাই শহরে এক কার্পাসসূত্র নির্ম্মাণের কল স্থাপন করিলেন। ১৮৫৪ সালে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য চীনের সহিত সূতার বাণিজ্য চালাইবার আকাঙ্ক্ষায়ই এই কল স্থাপিত হইয়াছিল,— দেশের কার্পাসদ্রব্যের অভাব নিবারণের জন্য নহে। কিন্তু ইহাই পরিশেষে এই কার্পাসশিল্পের বীজস্বরূপ হইয়াছিল, এবং কালধর্ম্মে ইহারই চারা বৃহৎ মহীরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই সময়ে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ (American Civil War) আরম্ভ হয়। ইহাতে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে কার্পাস-রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। এজন্য ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রচুর তুলা প্রেরিত হইতে থাকে, এবং তুলার দামও অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাতে এদেশে ব্যবসায়ী পার্শী-সমাজ প্রবল ধনী হইয়া উঠে, এবং ইহাতে তুলার কারখানা বিস্তারের সুবিধা হয়। তখন কারখানার পর কারখানা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। প্রথমে বোম্বাই সহরে, পরে আমেদাবাদে, তৎপরে শোলাপুরে মিল বসিল, —ইহার পরে ক্রমশঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হায়দারাবাদ, মহীশূর, মান্দ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানে মিল ছড়াইয়া পড়িল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিলের সংখ্যা ছিল ১৯৩। এদিকে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান, চীনের কার্পাসসূত্রের বাণিজক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং ক্রমশঃ ভারতকে হঠাইয়া দিল। এতদিন ভারত সূত্র প্রস্তুত করার কথাই ভাবিত, এক্ষণে সে দেশে বস্ত্রের অভাব-দূরীকরণের দিকে মন দিতে বাধ্য হইল, এবং সূত্রনির্ম্মাণের পরিবর্ত্তে বস্ত্রনির্ম্মাণে মনোযোগী হইল। বঙ্গদেশের স্বদেশী আন্দোলন এই সময়ে কার্পাস-শিল্পকে অনেকাংশে রক্ষা করে।

প্রথম মহাযুদ্ধকালে এই শিল্পের বিস্তর উন্নতি হইল,—ব্যবসায়িগণ বিশেষ লভ্যাংশ পাইল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইহার কিছু অবনতি হইল। কিন্তু ১৯২১ হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে মিলের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। ১৯২৯ সালে জাপান বস্ত্রব্যবসায়--ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইল। তখন আত্মরক্ষার জন্য ভারতে সংরক্ষণ-শুল্কের প্রবর্ত্তন হইল। ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপান ও ইংলণ্ড দুইজনেই যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়া গেল। ইহাতে সেই সময়ে প্রায় শতাধিক নূতন মিল সৃষ্ট হইল,—সূতার উৎপাদন দ্বিগুণ, ও বস্ত্রের উৎপাদন তিনগুণ বাড়িল, এবং আমদানিও একেবারে কমিয়া গেল। জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার

বাজারগুলিতে ভারতের কার্পাসের চাহিদা বাড়িয়া গেল। লোকে ভাবিল, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের ন্যায় এবারও ভারতের কার্পাসশিল্পের বিস্তৃতি ঘটিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। কারণ,—(১) মিলগুলি সেনা-বিভাগের কার্য্যের জন্য লিপ্ত হইতে বাধ্য হইল; এবং (২) গবর্ণমেণ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও অতিরিক্ত লাভের ট্যাক্স ও অন্যান্য ট্যাক্স বসাইয়া মিলমালিকগণের লাভের আশা নষ্ট করিয়া দিলেন, ইহাতে তাহাদের উৎসাহ নষ্ট হইয়া গেল।

কার্পাস-শিল্পের উন্নতি।—নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কার্পাসশিল্পের যে কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে ;—

১নং তালিকা

ভারতে কার্পাসশিল্পের ক্রমোন্নতি*

খৃ অব্দ	মিলের সংখ্যা	টেকোর সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা
১৮৫৫	১	২৯,০০০	×
১৮৬৬	১৩	৩০৯,০০০	৩,৪০০
১৮৮০	৫৬	১৪,৬১,০০০	×
১৮৯০	১৩৭	৩২,৭৪,১৯৬	২৩,৪১২
১৯০০	১৯৩	৪৯,৪৫,৭৮৩	৪০,১২৪
১৯১০	২৬৩	৬১,৯৫,৬৭১	৮২,৭২৫
১৯২০	২৫৩	৬৭,৬৩,০৭৬	১১৯,০১২
১৯৩৯	৩৮৯	১,০০,৫৯,৩৭০	২০২,৪৬৪
১৯৪৯	৪১৬	১,০৫,৩৩,৭৯৯	১৯৭,৮০৭
১৯৫০	৪২৫	১,০৫,৮৫,০০০	১৯৯,৭৭৫

* Indian & Pakistan Year Book 1951

তুলার কল।—প্রদেশভেদে মিলগুলি নিম্নলিখিতভাবে অবস্থিত :—

২নং তালিকা

প্রদেশভেদে মিলগুলির অবস্থান (১৯৫০*)

স্টেট	মিলের সংখ্যা
[বোম্বাই সহর ও দ্বীপ	৬৫
আমেদাবাদ	৭৪
বোম্বাই স্টেটের অন্যান্য স্থানে	৭১]
বোম্বাই স্টেটে মোট	২১০
মান্দ্রাজ	৭৮
পশ্চিম বঙ্গ	৩০
উত্তরপ্রদেশ	২৯
মধ্যভারত	১৭
রাজস্থান	১০
মহীশূর	১০
মধ্যপ্রদেশ	১১
দিল্লী ও পাঞ্জাব	১১
কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর	৭
হায়দারাবাদ	৬
পণ্ডিচেরী	৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৩
পাকিস্তান	১৪
মোট	৪২৯

কিন্তু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস বয়নশিল্প সংক্রান্ত আরও ছোট-বড় অনেক কারখানা প্রভৃতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে তাহাদের সংখ্যা লিখিত আছে ২২৪৬ মাত্র।

বোম্বাই,—ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।—উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও সর্ব্বপ্রথম তুলার কারখানা বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজের কার্পাসবস্ত্র বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তথাপি বোম্বাই স্টেট এক্ষণে কার্পাসশিল্পে প্রধান স্থান অধিকার

* Indian & Pakistan Year Book 1951

করিয়াছে। মোটামুটি অর্দ্ধেক কার্পাসদ্রব্য বোম্বাই স্টেটে প্রস্তুত হয়। কোন স্থানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিচার করা দরকার—(১) অবস্থান, (২) মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা, (৩) শ্রমিক (৪) কাঁচামাল পাইবার সুবিধা, (৫) পরিবহনের সুবিধা ও (৬) বিক্রয়স্থান।

অবস্থান।—(১) সুরাট বন্দরের অবনতি হইলে, নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদী মজিয়া গেলে, এবং বিশেষভাবে এই সময়ে বাণিজ্য-জাহাজগুলির আয়তন বৃদ্ধি হইলে,—বোম্বাই দ্বীপ বন্দররূপে গৃহীত হয়। বন্দর করিবার পক্ষে এ-অঞ্চলে এরূপ সুবিধাজনক স্থান আর ছিল না।

(২) বোম্বাই বন্দর সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিম উপকূলে, শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়,—ও বাণিজ্যপ্রধান ইউরোপের নিকটবর্ত্তী বন্দর এবং ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যপথে অবস্থিত প্রধান স্থান। সেজন্য ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে যে কার্পাস-সূত্রের বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জন্য বোম্বাই অঞ্চলের লোকে,—বিশেষতঃ পার্শী সম্প্রদায়,—বাণিজ্যকুশল ও ধনী হইতে পারিয়াছিল।

(৩) ইংলণ্ডে তুলা রপ্তানির ইহাই প্রধান বন্দর হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালে যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তুলা-রপ্তানি বন্ধ হয়, তখন ইংলণ্ডের কার্পাসশিল্পের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, এবং এজন্য বোম্বাই বন্দর ক্রমশঃ প্রসিদ্ধ তুলা-বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। তাই তুলার কল নির্ম্মাণকল্পে প্রথমে বোম্বাই সহরই নিরূপিত হইয়াছিল।

(৪) বিলাত হইতে মিলের যন্ত্রপাতি আনিবার পক্ষে এই স্থানই ইউরোপের নিকটতম উপযুক্ত বন্দর।

(৫) **মূলধন।**—বোম্বাই অঞ্চলের পার্শী সম্প্রদায় তুলাসংক্রান্ত ও অন্যান্য বাণিজ্যে অর্থসঞ্চয় করিয়া বিশেষ ধনী হইয়াছিল, ও ইংলণ্ডের ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের সংস্রবে ব্যবসায়-কার্য্যের মূল তথ্য জানিতে পারিয়াছিল, এবং ব্যবসায়সূত্রে ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণের সংস্রবে আসিয়া সহজে কল স্থাপনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার ও তাহা আনিবার অনুমতি জোগাড় করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। এই পার্শী-সম্প্রদায়ই প্রথম সূতার কল স্থাপন করে। সেজন্য তাহারা বোম্বাই সহরই যোগ্যস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিল।

(৬) **শ্রমিক।**—বোম্বাই স্টেট ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশ হইতে সুলভ শ্রমিক সংগ্রহ করা সহজ হইয়াছিল।

(৭) **কাঁচামাল।**—বোম্বাই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিই তুলা-উৎপাদনের প্রধান

স্থান। তদুপরি বোম্বাই তুলা-রপ্তানির প্রধান বন্দর ছিল বলিয়া কলের জন্য এখানে তুলাপ্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা ছিল।

(৮) **পরিবহন।**—সে-সময়ে বোম্বাই-এর সহিত ইউরোপের বাণিজ্য-সম্পর্ক এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, উৎপন্ন কার্পাসদ্রব্য বা তৎসংক্রান্ত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে ইহাই উপযুক্ত স্থান ছিল।

(৯) **অন্যান্য।**—তখন কার্পাস সূত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য আর্দ্র বাতাসের আবশ্যকতা ছিল। সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া বোম্বাই-এর জলবায়ু কার্পাসশিল্প গঠনের উপযোগীই ছিল।

বোম্বাই স্টেটের মধ্যে কার্পাস-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান **আমেদাবাদ**। কারণ,—প্রাচীনকালে এই অঞ্চলেই কার্পাস-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং এই অঞ্চলেই তাঁতের কার্য্যে দক্ষ বয়নশিল্পী যথেষ্ট ছিল;—এই অঞ্চলেই কার্পাস উৎপন্ন হয়,—ইহা সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, সুতরাং আমদানি-রপ্তানির সুবিধা এখানে প্রচুর ছিল,—এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার স্থানও ইহার চারিদিকে ছিল, কারণ তখন এ-অঞ্চলে কল স্থাপিত হয় নাই। অধিকন্তু মূলধন সংগ্রহের পক্ষেও আমেদাবাদ উপযুক্ত স্থান। এইজন্য বোম্বাই সহরের বাহিরে কল স্থাপনের প্রয়োজন হইলে আমেদাবাদই মনোনীত করা হইয়াছিল। এক্ষণে সমগ্র ভারতে আমেদাবাদ কার্পাসশিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর।

অন্যান্য স্থানে কার্পাস-শিল্প।—বোম্বাই স্টেটের আমেদাবাদের পর **মধ্যপ্রদেশের** রাজধানী নাগপুরে কার্পাস কল স্থাপিত হয়। বোম্বাই স্টেটের বাহিরে এই প্রথম কল স্থাপিত হইল। প্রাচীনকালে মধ্যপ্রদেশ সোনালী সূতার বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুতরাং এস্থানে তাঁতীর অভাব ছিল না। এইস্থানে বিস্তর তুলা উৎপন্ন হয়, এখানকার শ্রমিক সুলভ ও সহজপ্রাপ্য, মাল আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে রেলপথের ও সংযোগ আছে। সর্ব্বোপরি এখানে কয়লার খনি আছে। সেজন্য এস্থলে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে কার্পাস-শিল্প।—মান্দ্রাজে ও মহীশূরে তাঁতশিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। কথিত আছে, ভারতের তাঁতশিল্পে যত সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হয় মান্দ্রাজে। প্রকৃতপক্ষে তাঁতশিল্পের সূতা সরবরাহের জন্যই এ-অঞ্চলে, বিশেষতঃ তিন্নেভেল্লী, মান্দ্রাজ ও কইম্বাটুর প্রভৃতি জেলায়, প্রথম সূতার কল স্থাপিত হইল। কিন্তু কয়লার অভাবে এ-অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এবং জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনই এ-অঞ্চলে কার্পাস-শিল্প প্রতিষ্ঠার মূল। এখানকার জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-স্থানগুলির মধ্যে অনেকগুলি তুলা-উৎপাদন-অঞ্চলে

বা তৎসন্নিকটে অবস্থিত। এজন্য ঐরূপ স্থানেই অনেক কল স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাজে শ্রমিক সস্তা।

মহীশূর—রাষ্ট্রের রাজধানী বাঙ্গালোরে কয়েকটি কল আছে। এখানে শ্রমিক—সুলভ ও প্রচুর, মূলধনের সম্ভাবনা বেশী, কাঁচামাল সন্নিকটেই পাওয়া যায়, কাঁচামাল আমদানির ও উৎপন্নদ্রব্য রপ্তানির সুবিধা বিস্তর, এবং সর্ব্বোপরি জলবিদ্যুৎ-শক্তির জন্য সস্তায় কল চালাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। সেজন্য এখানে কতকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ—প্রাচীনকাল হইতেই তাঁতশিল্পে বিশেষ অগ্রসর। তাঁতবস্ত্রের আবশ্যকতাও এ-অঞ্চলে বেশী। এ-অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী নহে বলিয়া সাধারণের নিকট তাঁতবস্ত্রই শীতবস্ত্র। এখানে কলগুলি কয়লা-অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী হাবড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রধানতঃ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বন্দর কাঁচা তুলা ও কলের যন্ত্রপাতি আমদানির, উৎপন্ন বস্ত্র-রপ্তানির, শ্রেষ্ঠ বন্দর। ভাগীরথী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিবার ও পাঠাইবার পক্ষে সুবিধাজনক, এবং কলিকাতা সহর উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয়ের একটি শ্রেষ্ঠ বাজার। ইহার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ, এবং এখানকার শ্রমিকও সুলভ ও সহজপ্রাপ্য। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সহর আবার বহু ধনীর ও ব্যবসায়ীর সঙ্গমস্থল;—সুতরাং এখানে মূলধনের অভাব হয় না। কিন্তু এখানে তুলার বিশেষ অভাব,—পশ্চিম ভারত হইতে বা বিদেশ হইতে রেল ও জলপথে তুলা আনাইয়া এখানে কাজ চালাইতে হয়। এই বাধার জন্য এদেশে কার্পাসশিল্পের প্রয়োজনানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

উত্তরপ্রদেশে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, এখান হইতে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে জিনিষ রপ্তানির বিশেষ সুবিধা। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতের, বিশেষ বাণিজ্যপ্রধান উত্তর-ভারতের, কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা কানপুরের উন্নতির অন্যতম কারণ, এবং এই কারণেই উত্তরপ্রদেশে প্রথম কল স্থাপিত হয় কানপুরে। উত্তরপ্রদেশে কয়লা নাই, কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি আছে,—প্রচুর শ্রমিক আছে, তুলাও এখানে কিছু উৎপন্ন হয়, এবং পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করা যায়,—সেজন্য উত্তরপ্রদেশে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে।

পাকিস্তানে

তুলা প্রচুর জন্মে,—উচ্চশ্রেণীর আমেরিকীয় তুলা পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রচুর জন্মে। সমগ্র পৃথিবীতে যত তুলার আমদানি হয়, তাহার ১/৬ অংশ এই পাকিস্তান হইতেই

হয়। পাকিস্তান হইতে যত তুলা বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪৭৮ পা. ওজনের প্রায় দশলক্ষ বস্তা ভারতীয় কলে ব্যবহৃত হয়।

ভারত-বিভাগের সময়ে পাকিস্তানে ১৪টি মাত্র কল ছিল—তাহার ৯টি ছিল পূর্ব্ববঙ্গে এবং ৪টি পশ্চিম পাঞ্জাবে ও ১টি সিন্ধুদেশে। পাকিস্তানের উৎপন্ন তুলার পক্ষে ইহা নগণ্য। এক্ষণে করাচী, বহব্বলপুর ও লায়ালপুরে তিনটি কলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই আরও ৪টি কলে কাজ আরম্ভ করা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে ৫ হাজার টেকুর একটি বৃহৎ কল বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

পাঞ্জাবে—প্রচুর উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে। কিন্তু সেখানে কার্পাস-শিল্প বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে,—(১) এখানে কয়লা নাই, এবং জলবিদ্যুৎ-শক্তিও বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই, (২) ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে ব্যবসায়িগণ প্রায়ই হিন্দু ছিল, এবং এখনকার ভারত- যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিত। সেজন্য শিল্প প্রায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

উৎপাদন।—নিম্নে কয়েক বৎসরের উৎপাদন* দেওয়া হইল,—

খৃঃ অব্দ	বস্ত্র (১০ লক্ষ গজ)	সূতা (১০ লক্ষ পাউণ্ড)
১৯৪৬	৩৯০৯	১৩৬৭
১৯৪৭	৩৭৩২	১২৯৬
১৯৪৮	৪৩১৯	১৪৪৫
১৯৪৯	৩৯০৬	১৩৫৯
১৯৫০	৩৬৬৭	১১৬৮

আবশ্যকের তুলনায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ কম। অন্ততঃ ভারতের তুলার আঁশ ছোট। লম্বা আঁশের তুলা পাঞ্জাবে হইত;—তাহাও এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। সেজন্য মিশর, সুদান, দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকা, ব্রাজিল ও আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে এদেশে তুলা আমদানি করিতে হয়। পাকিস্তানও এখন বিদেশী রাজ্য,—সেখান হইতেও তুলা আমদানি করিতে হয়। দেশের এই অভাব দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী তুলার উৎপাদন-বৃদ্ধির নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে তুলার অভাব বিদূরিত হইবে।

রপ্তানি।—নিজের দেশের মধ্যে বিক্রয় করা ছাড়াও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—মধ্য প্রাচ্য, ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে কাপড় রপ্তানি করে। পাকিস্তানও এক্ষণে ভারতের খরিদ্দার। পাকিস্তানের সহিত ভারতের যে-বন্দোবস্ত হইয়াছে, তদনুসারে

* Indian & Pakistan Year Book 1951

ভারত ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই মাস হইতে ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৪০ হাজার বস্তা কলে প্রস্তুত মোটা কাপড়, ২০ হাজার বস্তা মধ্যম শ্রেণীর কাপড়, ১৫ হাজার বস্তা সরু সূতার কাপড়, এবং ১৫ হাজার বস্তা সূতা দিবে ; এবং তৎপরিবর্ত্তে পাকিস্তান ৪ লক্ষ বস্তা তুলা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেষ্টায় এই শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইহার পুনরুন্নতির চেষ্টা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার উন্নতির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ ফললাভ হইতেছে না। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য এদেশে কোন--কোন শিল্পে উন্নতি হইয়াছে,—কলে বস্ত্রবয়ন বাড়িয়াছে,—সুতরাং তাঁতশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। কলের আধিক্যের সহিত তাঁতের লঘুতার নিকট সম্বন্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও সূতার অভাবে তাঁতশিল্পের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। সূতার অভাব ও দ্রব্যমূল্য এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁতবস্ত্রের বিক্রয় ও উৎপাদন কমিয়া গেল। বিশেষতঃ ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের ফলে পাকিস্তানের বাজারের সুবিধা অনেকাংশে লোপ পাইল। তদুপরি ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ভারতের বস্ত্র খরিদ করা বন্ধ করিয়া দিল। ইহার জন্য ভারতের তাঁতবস্ত্র বিক্রয় কমিয়া গেল,—এবং সে-সময় তাঁতীরা যে-পরিমাণ সূতা পাইত, তাহারও সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হইল।

তাঁতশিল্পের বিশেষতঃ তন্তুবায়গণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৩ সালে এক কমিটি বসাইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত সময়ে-সময়ে তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার কোন উন্নতিই হয় নাই। প্রস্তাব হইয়াছিল,—

(১) মিলগুলি কাপড় বুনিবে না, কেবল সূতা প্রস্তুত করিবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, তাহাতে বৃহৎ বয়নশিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে।

(২) তাঁতগুলি ১০নং পর্য্যন্ত সূতার কাপড় প্রস্তুত করিবে, মিলগুলি ইহার উচ্চ সংখ্যার সূতার বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। কিন্তু একটু পরিপক্ক বিবেচনার ফলে বুঝা গেল,—এরূপ মোটা সূতার কাপড়ের খরিদ্দার কম, ইহাতে তাঁতশিল্পের ক্ষতি হইবে।

(৩) মিলে প্রস্তুত সকল রকম সূতার উপর ট্যাক্স বসিবে, এবং সেই অর্থ তাঁতী ও তাঁতের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। প্রস্তাব মাত্রেই কলের মালিকগণ প্রতিবাদ করিলেন, সুতরাং ট্যাক্স আর বসানো হইল না। ট্যাক্স বসিলে,—তাহার সম্পূর্ণভাবে আদায় হইলে,—ও তাহার সদ্ব্যয় হইলে—কিছু সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(৪) জাপানের অনুকরণে, মিলেরও তাঁতশিল্পের অঞ্চল বিভিন্ন হইবে। নির্দ্দিষ্ট তাঁত-অঞ্চলে কেহ মিল স্থাপন করিতে পারিবে না। কলের মালিকগণ স্বীকার করিলে ইহাতে প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা আছে।

পাটশিল্প

পাটশিল্প—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্প ;—অর্থপ্রসূ শিল্প হিসাবে সাধারণ হিসাবে কার্পাস-শিল্পের পরেই ইহার স্থান। এদেশে ইহার আমদানি নাই,—এদেশ হইতে সর্ব্বত্র ইহার রপ্তানি আছে। সুতরাং ইহা এদেশে বিদেশ হইতে অর্থ লইয়া আসে। ইহা বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের একচেটিয়া সম্পদ্‌ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, যদিও পৃথিবীর অন্য কয়েকটি দেশে পাট জন্মে (পৃ. ২২৮ পৃ.), উৎপাদন, পরিমাণ বা বাণিজ্যদ্রব্য হিসাবে তাহা নগণ্য ;—পৃথিবীর শতকরা ৯৭ অংশ পাটদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয়। ১৯৪৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, পাট ও পাটদ্রব্যের মূল্য স্বরূপ ভারতবর্ষ ১৪৭ কোটি টাকা পাইয়াছিল, ঐ বৎসর মোট রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য ছিল ৪২৮ কোটি টাকা। ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার শ্রমিক পাটের কলে কাজ করে। পারিশ্রমিক ইহাদিগকে প্রায় ১৬ কোটি টাকা দিতে হয়। ইহা ছাড়াও পাটের কল সংক্রান্ত নানা কাজে প্রায় ৬ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। পাটের চাষী বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পাট বিক্রয় করে। **বাণিজ্য দ্বারা ভারত যত ডলার উপার্জ্জন করে, তাহার শতকরা ৬০ অংশ পাট ও পাটদ্রব্য রপ্তানির দ্বারা পাওয়া যায়।** তাই পাটকে বলা হয়—golden fibre,—**স্বর্ণতন্তু**।

ভারতে পাট-উৎপাদন।—ভারতবর্ষে পাঁচটি মাত্র স্টেটে পাট জন্মে,—তন্মধ্যে বঙ্গদেশই শ্রেষ্ঠ ;—১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৪৯ একর পাটের জমি আছে, তাহার ৪৫·৩ শতক পাটের জমি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ভারত-বিভাগের পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গদেশে যে পাটের জমি ছিল তাহা সমগ্র ভারতের ৭৮ শতাংশ। ১৯৪৯ সালের হিসাবে সমগ্র ভারতের পাটের জমি ১০৬৮ একর, পশ্চিমবঙ্গের জমি ৪২৩ একর ;—সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০ শতাংশ ;—সমগ্র পাকিস্তানের জমি—১৫৫৯ একর,—ভারতের মোটামুটি ১½ গুণ। সমগ্র পাকিস্তানে একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে পাট আছে। অবিভক্ত বঙ্গের মোটামুটি ৭৫ শতাংশ জমি পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ১৯৪৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সমগ্র ভারতের ১·৩ গুণ পাট জন্মিয়াছে অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের ৫৫ শতাংশ পাট জন্মিয়াছে।

পূর্ব্বকথা।—পাট বঙ্গদেশের একচেটিয়া সম্পদ্ হইলেও, প্রাচীনকালে পাটের কোন মূল্য ছিল না। তখন প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে-ঘরে টাকুতে পাটের মোটা সুতা কাটা হইত, এবং সেই সুতায় প্রয়োজনমত দড়ি প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থালীর কাজ করা হইত। পাটের প্রয়োজন এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাকে কুটীরশিল্প বলা চলে না। ইহার পরে, ক্রমশঃ হাতের তাঁতে চট, এবং শস্যাদি চিনি ও লবণ প্রভৃতি চালান দিবার থলে, এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হইল। পরে কুটীর-শিল্পরূপে ইহার উন্নতি হইলে ১৮৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিদেশে পাট ও পাটদ্রব্য রপ্তানি হইতে লাগিল। ১৮৫০-৫১ সালে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, উ. আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়াতে ৪৪ লক্ষ টাকার পাট, চট ও থলি রপ্তানি করা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্কটলণ্ডের ডাণ্ডি সহরে পাট পাঠাইয়া তাহা হইতে কোন শিল্পদ্রব্য হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা চালাইতে লাগিল। ইহার বিবরণ পৃথিবী-খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। পরীক্ষায় সফলকাম হইয়া তাহারা ফ্লাক্সের (flax) কলে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে লাগিল;—ভারতবর্ষেও এই পাটদ্রব্য আমদানি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রতিযোগিতায় ভারতে পাটশিল্প আহত হইল, কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়া গেল।

ভারতে পাটশিল্প।—১৮৫৪ সালে জর্জ অক্‌ল্যাণ্ড বঙ্গদেশে, রিষড়া গ্রামে সর্ব্বপ্রথম চটকল স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিশ্বম্বর সেন (Bysumber Sen) নামে জনৈক বাঙ্গালী এই কল স্থাপনে অর্থসাহায্য করিয়া ভারতে পাটশিল্পের ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৫৯ সালে বরাহনগরে প্রথম বিদ্যুৎচালিত কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পরে ইউরোপীয় বণিকগণ এই লাভজনক ব্যবসায় অধিকার করিয়া হুগলী নদীর দুই পার্শ্বে চটকল স্থাপন করিয়া ডাণ্ডির বাবসায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ডাণ্ডিতে এখন পাটের কেবল সূক্ষ্ম সূত্রের ও বিশেষ ধরণের দ্রব্য প্রধানতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কলিকাতার সন্নিকটে এখন ১০৯টি চটের কল আছে;—৪টি আছে মান্দ্রাজ স্টেটে,—১টি উড়িষ্যায়; ৩টি বিহারে,—৩টি উত্তর প্রদেশে, এবং ১টি মধ্য প্রদেশে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গে সমগ্র ভারতের ৮৯ শতাংশ চটকল অবস্থিত। হুগলী নদীর তীরে ৫৫ মা. দীর্ঘ ও ২ মা. প্রশস্ত স্থানে এই কলগুলি অবস্থিত। টিটাগড়, জগদ্দল, বজবজ, শিবপুর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থান চটকলের জন্য বিখ্যাত। কলিকাতা সন্নিহিত ১০৯টি পাটকলের মধ্যে ৭৭টি চট ও হেসিয়ান তৈয়ারির কল ও ৩২টি চাপ দিয়া গাঁইট বাঁধার কল।

কিন্তু এইস্থলে বলা আবশ্যক ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে **হাতে প্রস্তুত পাটদ্রব্য**

একেবারে উঠিয়া যায় নাই। এখনও মালদহ জেলায় ধান্য ও চাউল বহনের জন্য এবং রংপুর জেলায় তামাক চালান দেওয়ার জন্য হাতে প্রস্তুত মোটা সূতায় পাটের বস্ত্র, এবং চট প্রস্তুত করিয়া থলে প্রস্তুত করা হয় ;—এখনও স্থানে-স্থানে দড়ি, চেয়ারের চট, চটের ব্যাগ, বসিবার চট প্রভৃতি হাতে প্রস্তুত করা হয়।

এক্ষণে দুইটি বিষয় বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ ;—(১) কলিকাতার সন্নিহিত হুগলী নদীর দুই তীরই পাটশিল্পের কেন্দ্র হইল কেন? এবং (২) পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মানো সত্ত্বেও সেখানে একটিও পাটের কল নাই কেন?

পাটশিল্পে কলিকাতা-কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধির ও পূর্ব্ববঙ্গে পাট-কল না থাকার কারণ।—হুগলী নদীর দুই ধারেই চটের কল এত বেশী হইয়াছে যে, কতকটা সেই কারণেই ইহা জার্ম্মানির **রাইন-অঞ্চলের সহিত তুলনীয়**। এখানে পাট-শিল্পের এইরূপ শ্রীবৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ এই যে,—(১) পাটশিল্প প্রধানতঃ ইউরোপীয় বণিকদের করতলগত। পাটশিল্পের উন্নতির প্রাক্কালে কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল বলিয়া তাহারা কলিকাতার সন্নিকটেই নানাপ্রকার শিল্পস্থাপন আরম্ভ করিয়াছিল।

(২) কলিকাতা বন্দর তখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য সেখান হইতে পাট রপ্তানি করার সুবিধা ছিল।

(৩) পাটকলের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই বঙ্গ ও বিহার,—তখনকার বঙ্গ-প্রদেশ,—হইতে পাওয়া যাইত। পূর্ব্ববঙ্গে কয়লা নাই।

(৩) কলিকাতায় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ লওয়ার এবং ব্যাঙ্কের সহিত আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল।

(৪) কাঁচা পাট সংগ্রহের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গই নিঃসন্দেহ প্রধান স্থান ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে একেত প্রচুর পাট জন্মিত, তদুপরি উৎকৃষ্ট পাট ঢাকা, মৈমনসিং, ত্রিপুরা ও রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানেই জন্মিত। পশ্চিমবঙ্গের পাট পূর্ব্ববঙ্গের পাটের তুলনায় অপকৃষ্ট। রেলযোগে কলিকাতায় এই সকল পাট আনিবার নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা ছিল। নদী-বহুল পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাট আনিবার সময়ে রেলগাড়ী হইতে স্টিমারে, আবার স্টিমার হইতে রেলগাড়ীতে পাট নামাইতে ও তুলিতে হইত। এইরূপ ওঠা-নামা পরিশ্রম-অসুবিধা- ও ব্যয়বহুলতা-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে চটকল স্থাপন করিলে এই অসুবিধা দ্বিগুণ হইত ;—একবার কয়লা ও যন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতা-অঞ্চল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে লইতে হইত, আবার উৎপন্ন পাটদ্রব্য বিদেশে চালান দিবার জন্য কলিকাতায় আনিতে হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া কলিকাতায় চটকল স্থাপনই বণিকগণ শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন।

হুগলী নদীতীরে
পাটের কল
পাটের কল
রেলপথ
বাঁশবেড়িয়া
হালিসহর
বন্দেল
নৈহাটি
কাকিনাড়া
জগদ্দল
চন্দননগর
ভাটপাড়া
ভদ্রেশ্বর
বৈদ্যবাটী
শ্যামনগর
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
রিষড়া
খড়দহ
কোন্নগর
বালি
বরানগর
বেলুড়
ঘুশুড়ি
সালকিয়া
উল্টাডাঙ্গা
হাওড়া
রামকৃষ্ণপুর
নারিকেলডাঙ্গা
রাজগঞ্জ
শিবপুর
বেলিয়াঘাটা
সাকরাইল
শিয়ালদহ
গার্ডেনরীচ
মাণিকপুর
বাউড়িয়া
চেঙ্গাইল
বজবজ
উলুবেড়িয়া
বিরলাপুর
শ্রীঅতুল
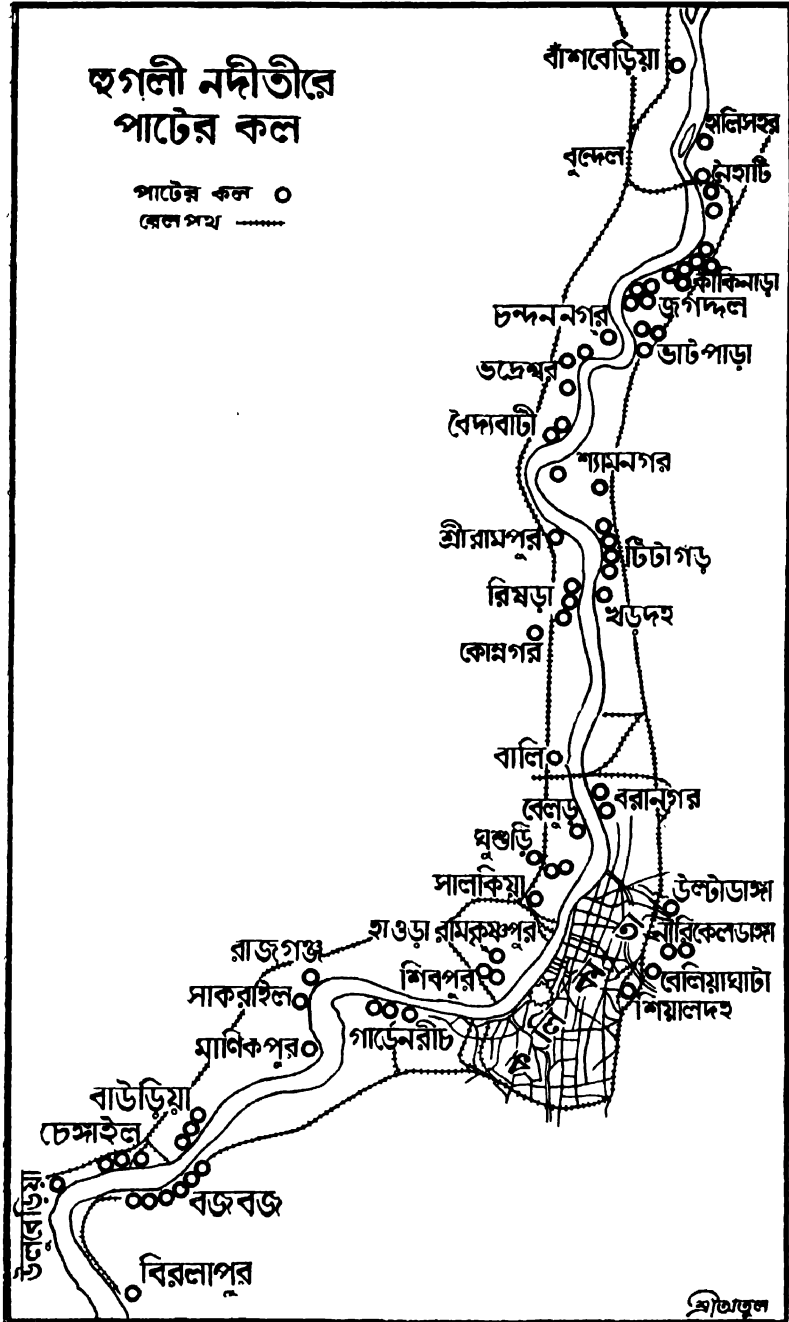
(৫) শ্রমিক হিসাবেও কলিকাতা-অঞ্চলে বিশেষ স্নবিধা ছিল। উত্তর ভারতের শ্রমিক এখানে প্রচুর আসিয়া থাকে। একেত শ্রমিক স্নলভ ছিল, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ শ্রীরামপুর-অঞ্চলে তাঁতশিল্পে অভিজ্ঞ বহু শ্রমিক পাওয়া যাইত।

এই সকল কারণে পাটের শিল্প কলিকাতা-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পাটশিল্পের উন্নতি।—পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা প্রধানতঃ এদেশের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে শস্য, লবণ, চিনি, সিমেণ্ট প্রভৃতি চালান দিবার উপযোগী থলে, এবং তুলা ও বস্ত্র প্রভৃতি প্যাক করিবার চট প্রস্তুত করিবার উপযোগী তন্তু,—পাট ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের নাই বলিয়া এবং সেরূপ দ্রব্যাদি থাকিলেও পাটদ্রব্যের মূল্য তুলনায় অত্যন্ত কম বলিয়া, পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশে পাটদ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাছাড়া, কলিকাতা পাট-উৎপাদন-স্থানে অবস্থিত বলিয়া, এবং অস্ট্রেলিয়া, ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রভৃতি স্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বলিয়া, কলিকাতার পাটশিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতে ও ডাণ্ডির পাটশিল্পের অবনতি হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে ডাণ্ডি এক্ষণে পাট দ্বারা নূতন-নূতন দ্রব্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে, এবং সূক্ষ্ম সূত্রের হেসিয়ান ও ত্রিপল প্রস্তুত করিতেছে, এবং তুলা, রেশম, ও শণ প্রভৃতি তন্তুর সহিত পাটতন্তু মিশ্রিত করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। স্নতরাং সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশগুলি এক্ষণে পাটদ্রব্যের জন্য প্রধানতঃ ভারতের মুখাপেক্ষী। আবার দুইটি মহাযুদ্ধের প্রয়োজনেও ভারতের পাটশিল্পের উন্নতি দ্রুত হইয়াছে।

অন্যদেশের পাটশিল্প।—এই প্রসঙ্গে বলা দরকার,—ভারতে পাট জন্মিলেও পাটদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পপ্রধান দেশই ভারত হইতে পাট লইয়া পাটশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জার্ম্মানি, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়ম, উ. ও দ. আমেরিকা, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলণ্ড, জাপান, অস্ট্রিয়া, রুশিয়া প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রায় ৬০ শতাংশ পাটদ্রব্য সরবরাহ করে ভারত যুক্তরাষ্ট্র।

ভারত-বিভাগে পাটশিল্পের অবস্থা।—ভারত-বিভাগের ফলে পাটশিল্পক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নানা সমস্যার সমাবেশ হইয়াছে। যেমন,—(১) পাটের অধিকাংশ উৎপন্ন হয় পাকিস্তানে। ১৯৪৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব্ববঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৩৩২ গাঁইট পাট,—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল ১০৪৭ গাঁইট পাট;—স্নতরাং সমগ্র বঙ্গের উৎপন্ন পাটের ৭৬ শতাংশ উৎপন্ন হইয়াছিল পূর্ব্ববঙ্গে। অথচ সমস্ত পাটের কলগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

(২) ভারত-বিভাগের ফলে প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন বাণিজ্য-

-চুক্তির ফলে পাট-রপ্তানি ভালই চলিতেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আমদানির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, পাটকলগুলি সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিতে হইল।

(৩) স্টার্লিং মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হইলে তাহার সহিত সমতা রক্ষার জন্য ভারত যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করিল, কিন্তু পাকিস্তান করিল না,—তখন অবস্থা আরও গুরুতর হইল। ইহাতে পাটের মূল্য বাড়িয়া গেল,—পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন-মূল্যও বাড়িল। সুতরাং পাট আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

(৪) পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমকালে এক নূতন সীমান্ত-ট্যাক্সের প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহাতেও পাটের আমদানি-রপ্তানির বাধা ঘটিল।

(৫) পাটপ্রাপ্তির অসুবিধাহেতু বঙ্গের পাটকলগুলি ৬ মাসের জন্য শতকরা ১২½টি তাঁতের কাজ বন্ধ করিয়া দিল,—পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষ কমিয়া গেল।

এই সময়ে যুক্তরাজ্য পাকিস্তান ও অন্যস্থান হইতে পাট কিনিয়া অধিক পাটদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিতে থাকে।

এই গোলযোগের পরিসমাপ্তির জন্য পাকিস্তানের সহিত ভারতের কয়েকটি বন্দোবস্ত হইয়াছে। হয়ত ইহাতে সাময়িক সুবিধা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অবিভক্ত ভারতে **রপ্তানিদ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ ছিল কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য।** পৃথিবীর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক্ষণে "ডলার" সংগ্রহের প্রয়োজন অধিক। আমেরিকা পাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। সুতরাং ডলার উপার্জ্জনে পাটশিল্পের স্থান অতি উচ্চে। পশ্চিমবঙ্গ স্টেটেও মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে পাটের উপর। চাষী, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক—এখানে সকলেরই কোন-না-কোন রূপে পাটের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য পাটশিল্পকে পরনির্ভরতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রতিকার।—পাটশিল্পের স্বাধীনভাবে উন্নতির জন্য—পাটের চাষ ও জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়াইতে হইবে। ইহার জন্য জমিতে প্রচুর সার দেওয়া ও উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়। অধিকতর জমিতে পাট বপন করানোও কাহারও-কাহারও অভিমত। কিন্তু ভারতে খাদ্যবস্তুর যেরূপ অভাব তাহাতে "খাবার বাড়াও" বলিবে কিংবা "পাট বাড়াও" বলিবে তাহা সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত। ইহার উপরে আবার "তুলা বাড়াও"—এই আদেশও আছে। মেস্তা পাটের উৎপাদন বাড়াইলেও পাটশিল্পের সুবিধা হইতে পারে। অবিভক্ত ভারতের ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতে মোটামুটি ৪০০ পা. বস্তার ৬ লক্ষ বস্তা গৃহস্থের ব্যবহারের

জন্য এবং ৬৩ লক্ষ বস্তা রপ্তানির জন্য, ২২ লক্ষ বস্তা চটকলের জন্য দরকার। যদি ভারত যুক্তরাষ্ট্র ন্যূনপক্ষে ৬০ লক্ষ বস্তা পাট ও মেস্তা পাট উৎপাদন করিতে পারে, এবং ১০ লক্ষ বস্তা পাকিস্তান হইতে সংগ্রহ করিতে পারে, তবে যথোপযুক্ত পাট ও পাটদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া লাভবান হইতে পারে।

ভারত সরকারের প্রচেষ্টা।—ভারত সরকার পাটের চাষবৃদ্ধির জন্য ও পাট সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণার জন্য পশ্চিম-বঙ্গে ২টি, আসামে ১টি, বিহারে ১টি ও উড়িষ্যায় ১টি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং একারণে ২৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উত্তর-প্রদেশ ও মালাবারে পাটচাষ নূতন আরম্ভ হইয়াছে এবং দিল্লীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাটচাষের চেষ্টা চলিতেছে। পাটের বদলে কোন বিকল্প তন্তুরও চেষ্টা এদেশে চলিতেছে। এ-সম্বন্ধে উত্তর-প্রদেশে কিছু সাফল্যলাভও হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন, তাঁহাদের পরিকল্পনা সফল হইলে আগামী বৎসরে ৫০ লক্ষ বস্তা পাট ও ১০ লক্ষ বস্তা মেস্তাপাট উৎপন্ন হইতে পারিবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আশুধান্যের জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে আশুধান্যের যে ক্ষতি হইবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহা পূরণ করিবেন। যাহা হউক, অধিক পাট উৎপাদন দ্বারা পাটশিল্পের সংরক্ষণ-চেষ্টা বিশেষ অংশে সফল হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পাটের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ২১,৯৬,০০০ বেল পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এক্ষণে নিশ্চয়ভাবে বলা যায়, ১৯৫১-৫২ সালেই শতকরা ৩৪·২ একর বেশী জমিতে পাট হইতেছে, এবং ৪১·৭ শতাংশ বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ১৪৫৩৯৪৪ একর জমিতে পাট হইয়াছিল, এবং প্রতি বেল ৪০০ পা. হিসাবে ৩৩,০১,২৯৬ বেল পাট জন্মিয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে পাটের জমি বাড়িয়া—হইয়াছিল,—১৯,৫১,১৪৮ একর, এবং পাট হইয়াছিল ৪৬,৭৭,৫৪১ বেল।

পাট-উৎপাদন।—কয়েক বৎসরের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ এইরূপ—

পাটের উৎপাদন

লক্ষ বস্তা ;—প্রতি বস্তা ৪০০ পা.

	১৯৩৯-৪০	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১ (আন্দাজ)
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	১৮·৫৯	১৪·৬৩	১৬·৯৬	২০·৫৫	৩১·১৭	৩২·৯০
পাকিস্তান	৭৮·৭৯	৫৫·২৭	৬৮·৪৩	৫৪·৭৯	৩৩·৩২	৪৩·৫৬

পাটের জমি

সাল	সহস্র একর
১৯৪৭-৪৮	৬৫১
১৯৪৮-৪৯	৮৩৪
১৯৪৯-৫০	১১৬৩
১৯৫০-৫১	১৪৪৯

রপ্তানি।—নিম্নে কয়েক বৎসরের পাটদ্রব্যের মোট রপ্তানি পরিমাণ দেওয়া হইল—

	হেসিয়ান	চট	মোট
	(১০০০ টন)		
১৯৪৭ ৪৮	৪'৬৬৩	৪'১৭০	৮'৮৩৩
১৯৪৮-৪৯	৪'০২৮	৪'১০০	৮'১২৮
১৯৪৯-৫০	২'৬৪১	৩'৬৬৯	৬'৩১০
১৯৫০-৫১ (জুলাই-মার্চ)	২'১৫৮	২'৯১৭	৫'০৭৫

আ. যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, আর্জেণ্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শিল্পপ্রবণ দেশে ইহা প্রেরিত হয়। এই পাটদ্রব্য নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণে রপ্তানি করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে পাটের রপ্তানি-পরিমাণ

(ক) হেসিয়ান

সহস্র টন

দেশ	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৭-৪৮	১৮৪৮-৪৯
আ. যুক্তরাষ্ট্র	২২০	২৪০	২২০
ক্যানাডা	২০	৩৫	২৫
যুক্তরাজ্য	৭০	৬০	৭০
আর্জেণ্টিনা	৭৫	৪৫	৭০
অস্ট্রেলিয়া	১৫		
অন্য দেশ	৫০	৬০	৬০

(খ) চট

সহস্র টন

দেশ	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯
যুক্তরাজ্য	২০	২০	২০
অস্ট্রেলিয়া	৫০	১০০	৮০
অন্য দেশ	৪২০	২৬০	৩৫০

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-পরিমাণে
পাট ও পাটশিল্পের শতকরা অংশ

	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৮-৪৯
পৃথিবীতে রপ্তানির	২৪%	৪১%
আ. যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির	৫৪%	৬০%

রপ্তানি দ্বারা প্রাপ্ত শুল্ক

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুলাই, ১৯৫০ হইতে গৃহীত)

লক্ষ টাকা

সাল	কাঁচাপাট	পাটজাতদ্রব্য
১৯৪৫-৪৬	৯০	১৭১
১৯৪৬-৪৭	১৮৪	২৭১
১৯৪৭-৪৮	২৮৮	৬৩৫
১৯৪৮-৪৯	১২৩	৬৩৫

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে-পাট ও পাটদ্রব্য প্রেরিত হয়, তাহাতেই বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের ৬০ শতাংশ ডলার অর্জ্জন করা হয়। ক্যানাডা দেশে রপ্তানি--করা পাট ও পাটদ্রব্য হইতে সে-দেশ হইতে প্রাপ্ত আমদানি-দ্রব্যের মূল্য শোধ হইয়া যায়। আর্জ্জেন্টিনা হইতে যে-খাদ্য আসে পাটদ্রব্য বিক্রয় করিয়াই সে-মূল্য শোধ করা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বাণিজ্যে পাটই বাণিজ্য-সাম্য বজায় রাখার প্রধান কারণ*।

পাট-শিল্পের ভবিষ্যৎ।—শিল্পসৃষ্টির দিক্ হইতে কাঁচা পাটের অভাব, ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিকার না হইলে যে ইহার অর্থকরী শক্তি নষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাট সম্বন্ধে আরও ভয়ের কারণ আছে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাট-রপ্তানিকারক দেশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র।

* **The Industries of India (Jute), published by Burmah Shell.**

শিল্পপ্রধান দেশমাত্রই পাট ও পাটদ্রব্যের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। সেজন্য **পাটের চাষ বা পাটজাতীয় অন্য দ্রব্যের চাষ অন্যদেশে আরম্ভ করিয়া, বা একটি অনুকল্প** বাহির করিয়া ভারতের পাটের ব্যবসায় নষ্ট করিবার জন্য বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলে একটি বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা বৃদ্ধি পাইবার আরও কারণ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পাটের রপ্তানি-শুল্ক ছিল টন প্রতি ৩৪ টাকা। সেই শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০ টাকায় উঠিয়াছিল। সম্প্রতি আমেরিকা পাটদ্রব্য খরিদ করিতেছে না। সেজন্য শুল্ক প্রথমে ৭৫০ টাকায় ও পরে ২৭৫ টাকায় নামিয়াছে। এই সকল কারণে পাট প্রভৃতির চাষের জন্য অন্যদেশে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতের পাটের ক্ষতির চেষ্টায় বিদেশে পাট প্রভৃতির চাষ।—পৃথিবীতে পাটের তুল্য আরও কয়েকটি দ্রব্য আছে,—যেমন,—**মেস্তা পাট, বিম্‌লি পটম** বা দাক্ষিণাত্য পাট (পৃ. ২৩৬ পৃ.), **কেনাফ, স্টক্‌রু** ও **কঙ্গো পাট**। ইহাদের মধ্যে মেস্তা ও বিম্‌লি পাট ভারতেই হয়। পাট বা পাটজাতীয় এই সকল তন্তুপ্রদ গাছের কোনটি-না-কোনটির চাষ করিয়া পাটের অভাব ঘুচাইবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে নানাচেষ্টা চলিতেছে। এইগুলির চাষ করিয়া এখন মোট ২৫ হাজার হইতে ৩৮ হাজার টন তন্তু উৎপাদন করা হইতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ নিতান্ত কম। সেজন্য এখনও পাটের মর্য্যাদা কমে নাই।

যে-সকল দেশ পাট বা পাটজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ভারতের পাটের ব্যবসায় নষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে, দুইটি কারণে তাহারা সফলকাম হইতে পারিতেছে না।—কাহারও-কাহারও মতে পাটচাষে সফলতার প্রধান অন্তরায় (১) **পাটের বীজের অভাব।**—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান পাটের বীজ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। সেজন্য যে-সকল স্থানে পাট-চাষের পরীক্ষা চলিতেছে সে-সকল স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিতে বিশেষ বিলম্ব হইবে। কিন্তু এই কারণ বিশেষ যুক্তিসহ নহে। যদি বীজ পাইলেই পাটচাষ সম্ভব হইত, তবে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশেই পাট জন্মানো যাইত। অন্য কারণ (২) **সুলভ শ্রমিকের অভাব**—পাটের জমি পরিষ্কার রাখার জন্য এবং পাটের কাঠি হইতে পাটের তন্তু ছাড়াইবার জন্য বহু শ্রমিকের দরকার। শ্রমমূল্য কম না হইলে পাটের দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মত অন্যদেশে শ্রমমূল্য সুলভ নহে। সেজন্য পাটের চাষে সফলতা হইতেছে না।

(৩) কাঠি হইতে পাটের আঁশ ছাড়াইবার কৌশলও সকল শ্রমিকের আয়ত্ত নহে। সেজন্যও পাটের চাষ সকল স্থানে করা সম্ভবপর হইতেছে না। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে কলে আঁশ ছাড়াইবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এক্ষণে নিম্নলিখিত দেশগুলিতে পাটের বা পাটজাতীয় দ্রব্যের চাষের চেষ্টা হইতেছে ;—

(১) পাটের চাষ।—ভারত-পাকিস্তানের বাহিরে, **ব্রাজিলের** পাটের চাষই প্রধান। এখানে ৪০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হয়। কিন্তু পাটের চাষ বাড়াইবার বা সফল করিবার প্রধান অন্তরায় সুলভ শ্রমিকের অভাব।

ইন্দোচীনের অন্তর্গত **আনাম** ও **টংকিন** দেশে, এবং **ফর্ম্মোজা** ও **মাঞ্চুরিয়া** দেশেও অল্প পাট জন্মে।

দক্ষিণ আমেরিকার **পেরু** দেশের আমাজন-অঞ্চলেও পাটের চাষের চেষ্টা হইতেছে।

উগাণ্ডা, নাইজিরিয়া, স্বর্ণ উপকূল, বৃটিশ গায়েনা ও **উত্তর বোর্নিও**-তে গ্রেটবৃটেনের দরকারে পাটের চাষের চেষ্টা চলিতেছে। এখন কেবল উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়ার চেষ্টায় চাষের পরীক্ষা চলিতেছে।

অস্ট্রেলিয়াতেও পাটের চায করা হইতেছে। কিন্তু এখানেও সুলভ শ্রমিকের অভাব।

(২) স্টকৃরুর চাষ—দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে, এবং ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে হয়। স্টকৃরু-তন্তুর মূল্য বেশী পড়িতেছে। কিন্তু বিদেশী বীজে যেরূপ ফসল হইতেছে, তাহাতে দাম কম পড়িবার সম্ভাবনা। ১৯৫০-৫১ সালে ২০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল, এবং ৫০০ হইতে ১০০০ টন স্টকৃরু পাওয়া গিয়াছিল।

(৩) কেনাফের চাষ—কেনাফ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয় **রুশিয়া** দেশে। কিন্তু রুশিয়ায় যে কি পরিমাণে কেনাফ জন্মে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে প্রতি বৎসরেই রুশিয়া পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা যেরূপ কম পরিমাণে পাট কিনিতেছে, তাহাতে মনে হয়, রুশিয়া কেনাফের চাষে বিশেষ সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে। **পারস্য** দেশেও কেনাফ জন্মে। কিন্তু তাহারও উৎপাদন-পরিমাণ জানা যায় না।

কেনাফের চাষের আরও চেষ্টা চলিতেছে **বেলজীয় কঙ্গো** দেশে। এখানে এই চাষে সফলতা অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা আছে।

(৪) কঙ্গো পাট—১৯২৯ সাল হইতে **বেলজীয় কঙ্গো** দেশে জন্মিতেছে। এক্ষণে প্রায় ১৫ হাজার টন আঁশ উৎপন্ন হয়, এবং আ. যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি করা হয়। **ফরাসী নিরক্ষীয় আফ্রিকাতে**ও কিন্তু কঙ্গো পাট জন্মিতেছে।

পাটের প্রতীক।—পাটের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কোন-কোন স্থলে **পাটের বদলে কাগজের থলে** ব্যবহার করা আরম্ভ হইয়াছে, এবং পাট

অপেক্ষা কম মূল্যের দ্রব্য হইতে থলে প্রস্তুত করা সম্ভব কিনা তাহারও গবেষণা চলিতেছে। ইহাতে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে।

ভারতের পাটদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, প্রভৃতি নানাদেশ পাটশিল্পে প্রাধান্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের ম্যানহ্যাটন নামক স্থানে এক বিপুলায়তন পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। ভারত হইতে সমগ্র বৎসরে যত থলে রপ্তানি হয়, ঐ কলে প্রায় তত থলে উৎপন্ন হইবে—মাত্র ২০ লক্ষ কম। পাকিস্তান হইতে ঐ সকল দেশে পাট সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে না। পাকিস্তানও পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটি বড়-বড় কল বসাইবার আয়োজন করিতেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভারতের পাটশিল্পকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিলে ভারতের পাটশিল্প নষ্ট হইবে, ভারতীয় চাষীর দুর্দশার সীমা থাকিবে না, ভারতের পক্ষে ডলার মুদ্রা অর্জ্জন দুঃসাধ্য হইবে, ভারতের রাজস্ব কমিয়া যাইবে এবং ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এক বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিবে।

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এখন হইতে পাটের মূল্য যাহাতে আপত্তিজনক না হয় তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত এবং যাহাতে পাট হইতে প্রস্তুত থলে ও চট প্রভৃতির রপ্তানি বন্ধ হইলেও পাট হইতে অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাটশিল্প রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

পাকিস্তানে পাটশিল্প।—পাকিস্তানে চটকল নাই। সুতরাং কাঁচা পাটই তাহার পণ্যদ্রব্য। এই কাঁচা পাটের রপ্তানি ভারতে কমিয়া গেলে, বা বন্ধ হইলে, উহার জন্য বিদেশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে। পাট পাকিস্তানেও অর্থকরী পণ্য। সেজন্য পাট-রপ্তানির জন্য তাহাকে সুবন্দোবস্ত করিতেই হইবে। এজন্য তাহারা চট্টগ্রাম বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, খুলনা জেলায় চাল্না নামক স্থানে একটি ছোট বন্দর করিয়া সেখানে পাট সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নলিখিত স্থানে দশটি পাটকল স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে;—নারায়ণগঞ্জে ৪টি,—১৯৫২-৫৩ সালে ইহাদের ৩টির ও ১৯৫৪-৫৫ সালে একটির কার্য্য আরম্ভ হইবে,—খুলনায় ২টি—১৯৫৪-৫৫ সালে ইহাদের কার্য্য আরম্ভ হইবে—চট্টগ্রামে ৩টি—এগুলিরও ১৯৫৪-৫৫ সালে কার্য্য আরম্ভ হইবে,—এবং গোবাসালে ১টি—ইহার কার্য্যও ১৯৫৪-৫৫ সালে আরম্ভ করা হইবে। এই সকল মিল দেশীয় ও বিদেশীয় মূলধনে স্থাপিত হইবে।* কিন্তু পাটকল স্থাপনের প্রধান বাধা পরিচালন-শক্তি;—সেখানে কয়লারও অভাব এবং জলবিদ্যুৎশক্তিরও উন্নতি হয় নাই।

---

* Amrita Bazar Patrika Supplement—26-6-52 হইতে গৃহীত।

চিনি-শিল্প

চিনি-শিল্প।—গুরুত্ব হিসাবে চিনি-শিল্প তুলা- ও পাট-শিল্পের পরেই ভারতের শিল্পসমূহের মধ্যে গুরুত্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চিনি-উৎপাদনে পৃথিবীতে কিউবার পরে ইহার দ্বিতীয় স্থান, এবং পৃথিবীর ইক্ষুজাত চিনির শতকরা ২৬ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়। কৃষিদ্রব্যই এই শিল্পের উপাদান। সুতরাং এই শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দরিদ্র চাষী পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপকৃত হয়।

বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্রিক উপায়ে চিনি প্রস্তুত করার জন্য, ১৯০৩ সালে বিহারে সর্ব্বপ্রথম চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সাল হইতে এদেশে বিদেশী চিনি আমদানি আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে জার্ম্মানি হইতে বীট চিনি আসিত। কিন্তু এদেশেও খেজুর ও ইক্ষুর গুড় হইতে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইত;—তখন খেজুর-গুড়-উৎপাদক জেলাগুলিতে প্রায় গ্রামে-গ্রামে গুড় নীরস করিয়া, ও সেই গুড় একপ্রকার শেওলা দিয়া ঢাকা দিয়া খেজুর-চিনি প্রস্তুত করা হইত। বঙ্গদেশে খেজুর-চিনিই উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইত। উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করা হইত। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে এদেশে ইক্ষুর চাষ হইত, তাহার প্রমাণ আছে,—এমনকি ইক্ষুর যে জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ তাহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। জাভা ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করা চিনির শ্বেত বর্ণ, দানাদার আকার ও স্বল্প মূল্য এ-দেশের প্রথম অবস্থার দেশী চিনির উপরে বজ্রাঘাত করিল; এবং ক্রমে-ক্রমে দেশী চিনি লুপ্ত হইয়া গবেষণার বিষয়ীভূত হইল।

জাভা প্রভৃতি দেশের আমদানি-করা চিনির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশের চিনির কলে প্রস্তুত চিনি বিশেষ মাথা তুলিতে পারিল না। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯০৩ সাল হইতে ১৯৩২-৩৩ সাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩০ বৎসরে মাত্র ৫৬টি চিনির কলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে আমদানি চিনির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য হইলে চিনি-শিল্পের এমন দ্রুত উন্নতি হইল যে, পৃথিবীর শিল্পোন্নতির ইতিহাসে সেরূপ উন্নতির কচিৎ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহার বৃত্তান্ত পরে দেওয়া হইবে।

আমদানি চিনি।—চিনির আমদানি ১৯০০ খৃঃ অব্দের পরে ক্রমশঃ বাড়িল। ১৯১০-১৪ সালের আমদানি চিনির পরিমাণ গড় হিসাবে প্রায় সওয়া সাত লক্ষ টন হইল,—ইহার মূল্য দিতে হইল কিঞ্চিদধিক ১২ কোটি টাকা। ইহার পরে প্রথম মহাযুদ্ধে চিনির মূল্য বাড়িয়া গেল। সুতরাং তখন আমদানির পরিমাণ কম,—কিন্তু প্রদত্ত মূল্য বেশীই হইল। ১৯১৪-১৮ সালের গড় হিসাবে দেখা যায়,—আমদানি চিনির গড় বার্ষিক পরিমাণ কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ টন বটে, কিন্তু মূল্য দিতে হইল প্রায়

সাড়ে তের কোটি টাকা। ইহার পরে আমদানির পরিমাণ পুনরায় উর্দ্ধগামী হইল, এবং ১৯২৯-৩০ সালে উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছিল।

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি।—১৯৩২ সালে টেরিফ-বোর্ড বা শুল্ক-সমিতি (Tariff Board)-র পরামর্শ ক্রমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে চিনিশিল্প-সংরক্ষণ-আইন পাশ করাইয়া লইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেন, তাহার ফলে চিনি-শিল্পের যেরূপ উন্নতি ও চিনি-আমদানির যেরূপ পতন হইল, তাহার তালিকা নিম্নের বিবরণ হইতে পাওয়া যাইবে,—

চিনির কল, উৎপাদন ও আমদানি*

সাল	কলের সংখ্যা	উৎপাদন সহস্রটন	আমদানি সহস্রটন	সাল	কলের সংখ্যা	উৎপাদন সহস্রটন	আমদানি সহস্রটন
১৯৩৩-৩৪	১১২	৪৫৪	৩৮২	১৯৪২-৪৩	১৫০	১০৭১	×
১৯৩৪-৩৫	১৩০	৫৬৯	৩১৩	১৯৪৩-৪৪	১৫১	১২১৬	×
১৯৩৫-৩৬	১৩৫	৯১৯	১৩৯	১৯৪৪-৪৫	১৪০	৯৫৩	×
১৯৩৬-৩৭	১৩৭	১১১০	২৯	১৯৪৫-৪৬	১৪৫	৯৪৪	×
১৯৩৭-৩৮	১৩৬	৯৩১	২১	১৯৪৬-৪৭	১৪০	৯০১	×
১৯৩৮-৩৯	১৩৯	৬৫১	৩৪২	১৯৪৭-৪৮	১৩৪	১০৭৫	২০
১৯৩৯-৪০	১৪৫	১২৪২	৩৬	১৯৪৮-৪৯	১৩৪	১০৩০	×
১৯৪০-৪১	১৪৮	১০৯৫	২৮	১৯৪৯-৫০	১৩৯	৯৭৫	×
১৯৪১-৪২	১৫০	৭৭৮	৪০	১৯৫০-৫১	১৩৯	১১১৪	৬৫

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিনিসংরক্ষণ-আইন চিনি-শিল্পে যে-যুগান্তর আনিয়াছে,—তাহা অবর্ণনীয়। সমাজের প্রত্যেক স্তরে ইহার উপকার অনুভূত হইয়াছে। ১৯৫২ সালে মার্চ্চ মাসে অমৃতবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-বিষয়ক পরিশিষ্টে শ্রী এস্. পি. নাগ লিখিয়াছেন যে, গত ১৯ বৎসরে যে-টাকার চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই টাকার মধ্যে ইক্ষুর ব্যাপারী পাইয়াছিল—৪৩০ কোটি টাকা,—ইক্ষু-চাষী পাইয়াছিল—৪১৬ কোটি টাকা, এবং অবশিষ্ট ১৪ কোটি টাকা পাইয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার।

১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ সংরক্ষণ-শুল্ক বন্ধ হইবার শেষ তারিখ। কিন্তু তখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সেই সময় টেরিফ বোর্ডের পরামর্শে ঐ সংরক্ষণ-নীতি প্রথমে ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং পরে ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চ

* Indian & Pakistan Year Book

পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। এই সংরক্ষণ-আইনের বলে এই সময়ে সংরক্ষণ-শুল্ক, দেশের মধ্যে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুল্ক (Excise duty), অধিক মাশুল (Surcharge) প্রভৃতি লইয়া আমদানি চিনির উপর হন্দর প্রতি ১২ টাকা ৯ আনা ৭ পাই শুল্ক আদায় করা হইত। দেশ স্বাধীন হইবার পরে ভারত সরকার দুই বার এই শুল্ক না উঠাইয়া অটুট রাখিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে যখন ঐ শুল্ক উঠাইয়া দিবার সময় আবার আসিল, তখন ভারত সরকার ঐ সংরক্ষণ-শুল্ক উঠাইয়া দিয়া ঠিক ঐ পরিমাণ শুল্ক অন্য নামে আদায় করিতে লাগিলেন। ভারত সরকার বলিলেন সংরক্ষণ-শুল্ক উঠিয়া গেল, কিন্তু হন্দর প্রতি উক্ত ১২ টাকা ৯ আনা ৭ পাই শুল্ক আদায় করা হইবে, এবং তাহার নাম হইবে রাজস্ব কর (Revenue duty)।

২৬৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিনির আমদানি ও উৎপাদনের তালিকা অনুসারে, চিনি-সংরক্ষণ--নীতি গৃহীত হইবার পরে, চিনির উৎপাদন বাড়িতে-বাড়িতে ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া ১২ লক্ষ টন হইয়াছিল। ইহাই ভারতের চিনি-শিল্পের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন। যুদ্ধের পরে চিনিব উৎপাদন কমিতে-বাড়িতে ১৯৫০-৫১ সালে ১১ লক্ষ টন হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের জনপ্রতি হিসাব অপেক্ষা এখানে জনপ্রতি কম চিনি ধরিয়াও ১৩ লক্ষ টন চিনির দরকার। সুতরাং ১৮ বৎসর সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে রাখিয়াও ভারতের চিনির কল হইতে প্রয়োজনীয় চিনিও পাওয়া যাইতেছে না, চিনির মূল্যও বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না, এবং নিজশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ভারতের চিনিশিল্প সাহসও পাইতেছে না।

জনপ্রতি চিনির ব্যবহার—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান দেশে চিনির ব্যবহার জনপ্রতি নিম্নলিখিতরূপ ছিল—

জনপ্রতি চিনির ব্যবহার

অস্ট্রেলিয়া	১১৬ পা.	জার্ম্মানি	৫২ পা.
যুক্তরাষ্ট্র	১০৬ „	দঃ আফ্রিকা সম্মেলন	৪৭ „
আ. যুক্তরাষ্ট্র	৯৭ „	ব্রাজিল	৩৪ „
কিউবা	৮৮ „	জাপান	৩৩ „
হলণ্ড	৬৪ „	যবদ্বীপ (জাভা)	১১ „
ফ্রান্স	৫২ „	ভারতবর্ষ	৭ „

চিনির কল—চিনির কল ভারত যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত স্টেটগুলিতে নিম্নলিখিত সংখ্যায় অবস্থিত,—

প্রদেশভেদে চিনির ও চিনি-সংক্রান্ত কলের সংখ্যা (১৯৫১)

স্টেট	কলের সংখ্যা	স্টেট	কলের সংখ্যা
উত্তরপ্রদেশ	৭৫	পূ. পাঞ্জাব	২
বিহার	৩২	মান্দ্রাজ	১৮
প. বঙ্গ	৪	বোম্বাই	১৫
	অন্যান্য	২২	

উপরি-উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, উত্তর-প্রদেশ চিনি-উৎপাদনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান,—এবং দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত—বিহার। এই দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত স্টেট একত্রে **শ্রেষ্ঠ চিনি-উৎপাদন কেন্দ্রের** সৃষ্টি করিয়াছে। এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ চিনি-উৎপাদন স্থান হইবার প্রধান কারণ এই যে,—ভারতের ইক্ষুর ৬০ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে এবং ১২ শতাংশ বিহারে উৎপন্ন হয়। **ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু--উৎপাদন-স্থান।** সুতরাং কাঁচা মাল প্রাপ্তির পক্ষে ইহাই সুবিধাজনক স্থান। বিশেষতঃ চিনির কল স্থাপনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় কাঁচা মাল প্রাপ্তির সুবিধা। কারণ ইক্ষু মাড়াই করিবার সময় যত বেশী টাট্‌কা থাকে, রসে চিনির অংশ ততই বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া, বহুদূর হইতে ইক্ষু আনিতে হইলে উৎপাদন-খরচা বেশী হয়। সেজন্য ইক্ষু-ক্ষেত্রের সন্নিকটেই চিনির কল স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার চিনির কল-স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থকরী শিল্পগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশে একমাত্র চিনিশিল্পই নির্ভরযোগ্য। সেজন্য যত শীঘ্র এদেশে চিনিশিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা যায়, এত শীঘ্র অন্য স্টেটে সংগ্রহ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষুর রসে চিনির অংশ বেশী।

এই সকল কারণে এই অঞ্চল **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিনি-অঞ্চল**। ভারতের উৎপন্ন চিনির মোটামুটি ৫৫ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে ও ৩৫ শতাংশ বিহারে উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে—চিনির কল বেশী নহে। ইহার প্রধান কারণ—(১) **ইক্ষু কম জন্মে।** এখানকার জলবায়ু ও মাটি হিসাবে এখানে ইক্ষুর চাষ অধিকতর ব্যাপক হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হওয়ার কারণ ১২৬ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে চিনি বেশী না হইবার অন্য কারণ এই যে, (২) পাট এখানে প্রধান অর্থপ্রসূ শিল্প,—সেজন্য মূলধন, জমি ও উৎসাহ—সমস্তই পাট-শিল্পে নিয়োজিত হয়।

ইহার তৃতীয় কারণ এই যে, (৩) পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ কম। চতুর্থ কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,—(৪) ইক্ষুক্ষেত্র এখানে এক অঞ্চলে অধিক পরিমাণে নাই,—ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে দূরে-দূরে অবস্থিত এবং ইক্ষুও সর্ব্বত্র এক জাতীয় নহে। এরূপ স্থলে চিনির কল স্থাপনের অসুবিধা আছে। এইরূপ নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গে চিনিশিল্প পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই।

চিনি-শিল্পের অন্যান্য কথা—চিনি-শিল্প সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা জানা দরকার। চিনি তিন উপায়ে প্রস্তুত করা হয়,—(১) আধুনিক কারখানায় গুড় কিনিয়া পরিশোধন করিয়া চিনি প্রস্তুত করা হয়; (২) ইক্ষু হইতে খোলা পাত্রে "রাব্" করিয়া, তাহা হইতে চিনি উৎপাদন হয়; এবং (৩) ইক্ষু হইতে "ভ্যাকুয়াম"- -পদ্ধতিতে চিনি প্রস্তুত করা হয়।

চিনি সম্বন্ধে আরও এক কথা এই যে, ভ্যাকুয়াম-পদ্ধতিতে চিনি প্রস্তুত করিলে যে-সকল আবর্জ্জনা পরিত্যক্ত হয়, তাহাই কল চালাইবার ইন্ধনরূপে ব্যবহার হইবার করিবার পক্ষে যথেষ্ট,—ইহার জন্য কয়লা বা বিদ্যুৎশক্তির দরকার হয় না। সুতরাং চিনির কল স্থাপন করিবার সময়ে ইন্ধন সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করিতে হয় না।

পাকিস্তানে চিনি-শিল্প—ভারত বিভক্ত হইলে ৪টি চিনির কারখানা পূর্ব্ববঙ্গে ও ৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে পড়িয়াছে। পাকিস্তানের মোট প্রয়োজন দুই লক্ষ টন চিনির, কিন্তু এখানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২৫ হাজার টন চিনি। চিনির অভাব পূরণের জন্য উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের **মর্দ্দন** নামক স্থানে একটি ৫০ হাজার টন চিনির কল স্থাপিত হইতেছে। এত বড় চিনির কল সমগ্র এশিয়ায় আর নাই। বলা বাহুল্য, পেশোয়ার উপত্যকায় ভাল ইক্ষু জন্মে।

দ্রষ্টব্য—১৯৫০-৫১ সালে ভারত ও পাকিস্তানে গুড়-পরিষ্করণ কারখানা সমেত ১৬৮টির মধ্যে ১৪৮টি কারখানায় কাজ হইয়াছিল*।

কাচ-শিল্প

কাচ-শিল্প।—১৮৯২ খৃঃ পাঞ্জাবের ঝিলম সহরে ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান উন্নত প্রণালীর কাচ-শিল্প প্রথম আরম্ভ হয়। তৎপরে দ্বিতীয় কারখানা হয় টিটাগড়ে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে, এই শিল্পের প্রচলন ছিল তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দেখাইয়াছেন যে, স্তূপখননকালে অনেক স্থলে কাচের চুড়ি, মালার গুঁটি

* List of Sugar Mills in India and Pakistan—Published by Indian Sugar Mill Association, Calcutta.

ও নকল মুক্তা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া ফিরোজাবাদ-অঞ্চল কাচের চুড়ি-নির্ম্মাণের কেন্দ্রস্থল আছে।

কাচ-শিল্পের উন্নতির ধারা—উপরি-উক্ত কারখানা দুইটির মধ্যে প্রথমটিতে ভারতে সর্ব্বপ্রথম বোতল-নির্ম্মাণ আরম্ভ করা হয়। কিন্তু এই দুইটি কারখানা বেশী দিন চলে নাই। তাহা হইলেও ইহারা যে ভারতে বর্ত্তমান প্রণালীতে কাচদ্রব্য গঠনের দ্বার মুক্ত করিয়াছিল তাহা অকুণ্ঠিতভাবে বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার পরেই এদেশে নানাস্থানে কাচের কারখানা স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে, এবং অন্যান্য অনেক শিল্পের মত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই শিল্পের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে।

১৯০০ খৃঃ অব্দে এদেশে ৩টি মাত্র কাচের কারখানা ছিল,—১৯১৪ সালে ছিল ১৬টি। এই সময় যুদ্ধ বাধিলে বিদেশী রপ্তানি বহুলাংশে কমিয়া যায়। সেই অবকাশে কারখানাগুলির সংখ্যা বাড়িয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে হয়—২০টি। যুদ্ধের অবসানে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে কাচ-শিল্পের সহায়তাকল্পে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চুড়ি, কৃত্রিম মুক্তা প্রভৃতির আমদানি দ্রব্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা আমদানি-শুল্ক ধার্য্য করেন। কিন্তু তাহাতেও কাচ-শিল্পের বিশেষ সুবিধা হইল না;—শিল্পপতিগণ শিল্পসংরক্ষণ আইন করিয়া কাচ-শিল্প-দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিতে ১৯২৭ সালে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে-অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তবে, আমদানি-দ্রব্যের উপর ধার্য্য শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে কাচের কারখানার সংখ্যা ১৯৩২ সালে হইল ৫৪টি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে কাচের কারখানার সংখ্যা হইল ১০১টি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান আমদানি-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইল। আমদানি-দ্রব্য একেবারে কমিয়া গেল। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাচ-শিল্পকে অনেকটা ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া গেল। যুদ্ধান্তে কাচের কারখানার সংখ্যা হইল ১৭৪টি। ১৯৫০ সালে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২৪টি হইল,—ইহার মধ্যে ৯৩টিতে চুড়ি, মালার গুঁটি ও নকল মুক্তা তৈয়ার করা হয়। বলা-বাহুল্য কাচের চুড়ির আদিভূমি ফিরোজাবাদ,—সেজন্য উত্তরপ্রদেশেই কাচের চুড়ির কারখানা অধিক পরিমাণে আছে। এক্ষণে ভারতে অন্য কারখানাগুলির অধিক সংখ্যক কারখানায় বোতল, শিশি, সোডাজলের বোতল, চোঙ্, নল, গোল কাচ, চিম্‌নি, টেবিলের দ্রব্যাদি, প্রভৃতি বহু প্রকারের কাচদ্রব্য প্রস্তুত হয়। তিনটি মাত্র কারখানায় কাচের পাত ও চাদর প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এদেশে কত প্রচুর কাচদ্রব্য আমদানি করিতে হয়, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে,—

কাচের আমদানি

কাচদ্রব্য	১৯৪৬-৪৭		১৯৪৭-৪৮		১৯৪৮-৪৯	
	সহস্র-হন্দর	সহস্র টাকা	সহস্র-হন্দর	সহস্র টাকা	সহস্র-হন্দর	সহস্র টাকা
চুড়ি		২২৫		৪৪৬		×
শিশিবোতল প্রভৃতি	৩	৭৭	৯	২৬০	৬	১৭৬
ফানেল, গোলক প্রভৃতি	×	১৫১	×	২৬৩	×	২৮১
টেবিল সজ্জা	×	২৭০৮	×	১২০৩৫	×	২২৩
কাচের চাদর	১৫৪	৩৯৪২	২৭৯	৯৬৬৪	৩৫৭	১০০৭৯
অন্যান্য	৭৮	১৩৬৮	৩২৩	১৮০৩	৩০	৫০৮

কারখানা—কাচ-শিল্পের কারখানাগুলি নিম্নলিখিতরূপে বিভিন্ন স্টেটে অবস্থিত—

প্রদেশভেদে কাচের কারখানা

স্টেট	চুড়ির কারখানা	কাচ ও কাচ-দ্রব্যের কারখানা	মোট	স্টেট	চুড়ির কারখানা	কাচ ও কাচ-দ্রব্যের কারখানা	মোট
উ. প্রদেশ	৯০	২৪	১১৪	বোম্বাই	×	৩২	৩২
প. বঙ্গ	×	৩৪	৩৪	মান্দ্রাজ	৩	৪	৭
বিহার	×	৮	৮	দিল্লী	×	৩	৩
উড়িষ্যা	×	১	১	পূ. পাঞ্জাব	×	৭	৭
মধ্যপ্রদেশ	×	৬	৬	অন্যান্য	×	১২	১২

কাচ-শিল্পের উপাদান।—কাচ-শিল্পের জন্য দরকার লাগে—বালি, সোহাগা, সোডা এ্যাস (ক্ষারদ্রব্য), ডলোমাইট, চুনাপাথর, লবণ, সোরা, গন্ধক, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, ও রং করার দ্রব্য। ইহার মধ্যে এদেশে প্রচুর বালি আছে। কিন্তু একরকমের বালি একত্রে একস্থানে প্রচুর পাওয়া যায় না,—বিদ্যুৎ-চুম্বক যোগে ধুইয়া বালি ঠিক করিয়া লইতে হয়। সোহাগা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। সোডা-এ্যাস বিহারে পাওয়া যায়, আমদানিও করিতে হয়। গন্ধক অল্প পরিমাণ আমদানি করিতে হয়। অন্যান্য দ্রব্য এদেশেই পাওয়া যায়। পরিচালন--শক্তির জন্য বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কয়লা ব্যবহৃত হয়।

কাচ-উৎপাদন।—এক্ষণে এদেশে **কাচের চাদর** নিম্নলিখিতরূপ উৎপন্ন হইতেছে,—

সাল	উৎপন্ন কাচের চাদর (বর্গ ফিট)	সাল	উৎপন্ন কাচের চাদর (বর্গ ফিট)
১৯৪৬	৮৭,৩৫,৬০৪	১৯৪৮	৬২,৫৪,১৩১
১৯৪৭	৫৪,১৮,৯৭৬	১৯৪৯	৩৪,৫১,২৬১

পাকিস্তানে কাচ-শিল্প।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাকিস্তানের পশ্চিম-পাঞ্জাবে ঝিলম সহরে একটি কাচের কারখানা আছে। এক্ষণে পাকিস্তানে ৫টি কারখানা আছে ঃ—তাহার মধ্যে ৩টি আছে পশ্চিম-পাকিস্তানে, এবং ২টি পূর্ব্ববঙ্গে। আরও দুইটি নূতন কারখানা স্থাপিত হইবে,—তাহাদের একটি অতিশীঘ্র স্থাপিত হইবে চট্টগ্রামে, এবং অপরটি হইবে করাচীতে।

কাগজ-শিল্প

কাগজ-শিল্প বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৭ অব্দে বঙ্গদেশে কলিকাতার অনতিদূরে বালি গ্রামে এক কাগজের কল স্থাপিত হয়। এই কাগজ প্রথমে ডিমাই আকারে প্রস্তুত হইত, এবং তাহার রং ছিল বাদামী। এই কাগজ এরূপ প্রচলিত ছিল যে, এখনও বাদামী রংএর ডিমাই আকারের কাগজ যেখানেই প্রস্তুত হউক না কেন, তাহাকে "বালির কাগজ" বলে। কাগজ-শিল্প অতি ধীরে-ধীরে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ১৯৪৯ সালেও মাত্র ২৪টি কাগজের কল সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে—৫টি, উত্তর প্রদেশে—৪টি, বোম্বাই স্টেটে—৮টি, বিহারে—১টি, উড়িষ্যায়—১টি, মান্দ্রাজে—২টি, মহীশূরে—১টি, কুর্গে—১টি ও কোচিন-ত্রিবাঙ্কুরে—১টি।

কিন্তু কাগজ-শিল্প সংক্রান্ত কল ও কারখানা সমগ্র ভারতযুক্তরাষ্ট্রে এক্ষণে (১৯৫০-৫১) আছে ৯৪টি—পশ্চিমবঙ্গে—২৬, বিহারে—৩, উড়িষ্যায়—১, উঃ প্রদেশে—৭, পূঃ পাঞ্জাবে—১, বোম্বাই-এ—৩৫, মান্দ্রাজে—৭, বিন্ধ্যপ্রদেশে—১, মধ্যভারতে—৩, হায়দারাবাদে—২, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে—২, মহীশূরে—১, ভূপালে—৪, দিল্লীতে—১।

কাগজের উপাদান।—ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনলণ্ড, রুশিয়া প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তর আমেরিকায়,—বিশেষভাবে ক্যানাডায়,—**পাইন** ও **ফার** জাতীয় নরম কাঠের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে এই সকল স্থান, বিশেষতঃ ক্যানাডা ও ফিন্‌লণ্ড, হইতে কাগজের জন্য মণ্ড আমদানি হয়। কিন্তু এক্ষণে

উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে যে **সাবাই ঘাস** জন্মে তাহা হইতে এবং বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। **ছেঁড়া কাপড়** বা **কাগজের টুকরা** হইতেও নিকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। হিমালয় অঞ্চলে যে পাইন জাতীয় গাছ আছে, তাহা হইতেও মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে, এবং অল্প পরিমাণে হইতেছে। কিন্তু হিমালয় অঞ্চলের মণ্ডের উপর নির্ভর করিতে গেলে মণ্ডের উপকরণ আনিবার খরচ বেশী পড়ে। সেজন্য সেই অঞ্চলে মণ্ড প্রস্তুত করার কল স্থাপন করা বিধেয়। কিন্তু সে-অঞ্চলে কল চালাইবার কয়লা নাই। ঐসকল অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া গেলে সহজে কাগজের কল স্থাপন করা যাইবে। ডালমিয়া নগরে একটি যে নূতন কল স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে **আকের ছিবড়া** হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ কলে **খড়** হইতেও কাগজ প্রস্তুত হয়।

উৎপাদন।—ভারতবর্ষে ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের উৎপাদন নিম্নলিখিতরূপ—

কাগজ ও কাগজের বোর্ডের উৎপাদন

সাল	কাগজ-কলগুলির উৎপাদন-শক্তি	উৎপন্ন কাগজ
	টন	টন
১৯৪৬	১,০৫,০০০	১,০৫,৯৯৩
১৯৪৭	”	৯৩,০৯০
১৯৪৮	”	৯৭,৯০৫
১৯৪৯	১,১০,০০০	১,০৩,১৯৪
১৯৫০	১,৩৬,৮০০	১,০৮,৯০০
১৯৫১	”	১,১০,০০০

অন্যান্য শিল্পের মতই দুইটি মহাযুদ্ধ কাগজ-শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে কাগজের অভাব বাড়িলে কাগজের কয়েকটি নূতন কল স্থাপিত হয়, এবং কলগুলি এত অধিক কাগজ উৎপাদন করিতে বাধ্য হয় যে, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ইহাতে উৎপাদন কমিয়া যায়। তদুপরি যুদ্ধের পরে আমদানি বৃদ্ধি পাইলে এখানকার উৎপাদন কমিয়া যায়।

১৯২৬ সালে "বাঁশের কাগজ সংরক্ষণ আইন (Bambo Paper Industry Protection Act)" পাশ হইলে বাঁশের মণ্ডের প্রতি কাগজের কলের নির্ভরশীলতা বাড়িয়া যায়; এবং ১৯৩২ সালে কাগজের উপর সংরক্ষণ-শুল্ক বসে ও আমদানি-মণ্ডের উপর উচ্চ কর স্থাপিত হয়। ইহাতে বাঁশের মণ্ডের প্রচলন বাড়িয়া যায়, ও এদেশে

প্রায় সকলরকম কাগজ বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে এদেশের কলসমূহে বাঁশের মণ্ড প্রধান উপাদান হইয়াছে।

১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত কাগজ-সংরক্ষণ আইন বলবৎ থাকে,—কয়েক প্রকারের কাগজ, —সংরক্ষণ-আইনের আশ্রয়ে, এবং কয়েক প্রকার বাহিরে থাকে। যাহা হউক সংরক্ষণ--নীতির ফলে ১৯৪৬ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহার পরে বঙ্গদেশে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশই কাগজ-নির্ম্মাণের প্রধান স্থান। সেজন্য কাগজের উৎপাদন আবার কমিতে থাকে। ইহার পরে ১৯৪৭ সালে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ হইলে কাগজের কলগুলি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পড়ে বটে, কিন্তু মণ্ড-উৎপাদন-উপাদান-অঞ্চল পাকিস্তানে পড়ে। সুতরাং মণ্ডের উপাদানের অভাব, উপাদান আনিবার ব্যয়াধিক্য, আমদানি মণ্ডের অভাব এবং অতিরিক্ত উৎপাদন-মূল্য ও কোম্পানির অংশের অতি অল্প লাভের জন্য কাগজের উৎপাদন কমিয়া গেল।

এই সময়ে বিদেশেও কাগজের মূল্য বাড়িয়া, গেল। সেজন্য টেরিফ বোর্ডের উপদেশ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কাগজের মূল্য বাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। আরও তিনটি নূতন কল বসিতেছে। ইহাদের একটিতে কেবল খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইবে। এদেশে এখনও খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হয় না।

ভারতের নিরক্ষরতা—নিম্নের হিসাব দেখিলে ভারতের লোকে যে বার্ষিক কত কম কাগজ ব্যবহার করে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

আ. যুক্তরাষ্ট্র—	মাথা পিছু—	৩০০ পা.	যুক্তরাজ্য—	মাথা পিছু	১৫০ পা.
ক্যানাডা	„	১৭৫ পা.	ভারত	„	১'৪ পা.

পাকিস্তানে—কাগজের কল নাই। চট্টগ্রামে একটি কাগজের কলস্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে। ঐ কলে প্রত্যহ ১০০ টন কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এক্ষণে প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকার কাগজ পাকিস্তানে আমদানি করা হয়।

সিমেণ্ট-শিল্প

সিমেণ্ট-শিল্প—ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সিমেণ্টের ব্যবহার ছিল কিনা বলা যায় না। বর্ত্তমান যুগে বর্ত্তমান উন্নত প্রণালীতে ১৯০৪ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রথম সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু এই কারখানা বেশী দিন চলে নাই। ইহার পরে দ্বিতীয় কারখানা স্থাপিত হয় পোর বন্দরে ও তৃতীয়টি হয় কাটনিতে। ১৯১৪

সালে সিমেণ্টের কারখানার সংখ্যা ছিল—৩টি। এই কারখানাগুলির প্রজনন-শক্তি ছিল মাত্র ৯৫০ টন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছে, সিমেণ্ট-শিল্পও তেমনি এই দুই মহাযুদ্ধের নিকট ঋণী। প্রথম মহাযুদ্ধকালে আমদানি বন্ধ হওয়াতে যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজন তৎকালীন ৩টি কারখানা মিটাইয়াছিল। যুদ্ধের পরে
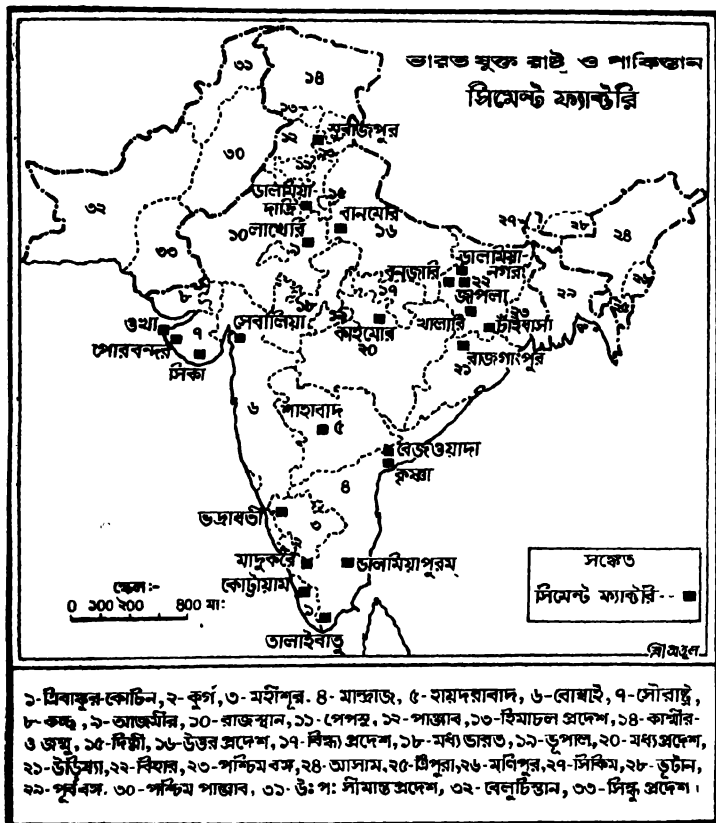
৫৫নং চিত্র

সিমেণ্ট কারখানার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, এবং ১৯২৪ সালে উহার সংখ্যা হইল—১০টি, এবং ইহাদের প্রজনন-শক্তি বাড়িয়া হইল ২½ লক্ষ টন। এই সময়ে সিমেণ্টের আমদানি পুনরায় আরম্ভ হইল, এবং এদেশে সিমেণ্টের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেজন্য কারখানাগুলির মধ্যে মূল্য কমাইবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। ইহাতে সিমেণ্ট-কারখানাগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল,—এমন কি কয়েকটি

কারখানা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে কারখানাগুলি সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া সিমেণ্ট-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিল। গবর্ণমেণ্ট সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিলেন না বটে, কিন্তু আমদানি সিমেণ্টের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সিমেণ্ট-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইল না। তখন কারখানাগুলি একতাবদ্ধ হইয়া কয়েকটি সঙ্ঘ সৃজন করিল। ইহাতে দাম কমাইবার প্রতিযোগিতা দূরীভূত হইল,—এবং বিক্রেয় সিমেণ্টের জন্য সর্ব্বত্র একইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। তাহাতেও বিশেষ উন্নতি হইল না। অবশেষে ১৯৩৬ সালে তদানীন্তন ১১টি কারখানার মধ্যে শোন উপত্যকার পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট কারখানা ব্যতীত বাকী ১০টি একত্র হইয়া এসোসিয়েটেড্ সিমেণ্ট কোং নাম গ্রহণ করিয়া তাহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি দুইটি দলে প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। ১৯৪০ সালে শেষোক্ত দলের সহিত এই দলের একটি বন্দোবস্ত হয়।

১৯৩৯ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কারখানার সংখ্যা ছিল ২১টি এবং তাহাদের প্রজনন-শক্তি ছিল—২৬ লক্ষ টন। ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে সিমেণ্টের প্রয়োজন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ১৯৪৭ সালে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ২৩টি হইল।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের ফলে ৫টি কারখানা পাকিস্তানের অংশে পড়িল, এবং ১৮টি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে রহিল। ইহাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি নূতন কারখানা স্থাপিত হইল, এবং সিমেণ্ট কারখানাগুলির প্রজনন-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ২৯ লক্ষ টন হইল।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে সিমেণ্ট-কারখানার সংখ্যা।—বর্ত্তমান সময়ে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশে ২৪টি সিমেণ্ট কারখানা আছে,—

প্রদেশভেদে সিমেণ্ট-কারখানার সংখ্যা (১৯৪৯)

প্রদেশ	সংখ্যা	প্রদেশ	সংখ্যা
মধ্যপ্রদেশ	১	মাদ্রাজ	৬
মধ্যভারত	১	রাজস্থান	১
বিহার	৫	হায়দারাবাদ	১
পে. প. স্ব.	৩	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ...	১
সৌরাষ্ট্র	৩	মহীশূর	১
গুজরাট	১		

১৯৫০-৫১ সালে কারখানার সংখ্যা কমিয়া ২৩টি হইয়াছে।

সিমেণ্টের উপাদান।—সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত

উপাদানগুলির দরকার হয়,—চুনাপাথর, জিপ্‌সাম, কয়লা ও মাটি। ইহাদের মধ্যে চুনাপাথরের দরকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী;—১ টন সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে প্রায় দেড় টন চুনাপাথর লাগে। সেজন্য এদেশের কারখানাগুলি প্রায়ই চুনাপাথরের অঞ্চলেই স্থাপিত হইয়াছে। কয়লার প্রয়োজন দুই প্রকার;—কয়লা সিমেণ্টের একটি উপাদান। ১ টন সিমেণ্টের প্রায় ১/৩ ভাগ কয়লা। এতদ্ব্যতীত যন্ত্র-পরিচালনের জন্য কয়লা বা জলবিদ্যুৎ-শক্তির আবশ্যক হয়। কিন্তু নিকৃষ্ট কয়লায় কল-পরিচালনা কার্য্য হইলেও সিমেণ্ট প্রস্তুত করার জন্য উৎকৃষ্ট কয়লার দরকার। এরূপ কয়লা বঙ্গ-বিহারের কয়লা--ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। সুতরাং কয়লার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কারখানা-স্থাপন সবস্থলে সম্ভবপর নহে। চুনাপাথরের অভাব এদেশে নাই। জিপ্‌সাম এক্ষণে বিকানীর অঞ্চলে এবং অন্যত্র প্রচুর (৫৬নং চিত্র, ২৮৭ পৃঃ) পাওয়া যাইতেছে। কয়লার কারখানায় যে-শ্রমিক আবশ্যক সেইরূপ সাধারণ শ্রমিক দ্বারাই কাজ চলিতে পারে।

ভারতের সিমেণ্ট-কারখানাগুলি বন্দরগুলি হইতে, এমন কি বিক্রয়-স্থল হইতে, দূরে অবস্থিত। ইহা ব্যবসায়ের পক্ষে অসুবিধাজনক।

সিমেণ্টের উৎপাদন।—গত কয়েক বৎসরে সিমেণ্টের উৎপাদন এইরূপ:

সিমেণ্টের উৎপাদন (টন)

১৯৪৪	১৬,৫৯,৪৬৬	১৯৪৮	১৫,৫০,৯০৭
১৯৪৫	১৬,৫৫,৭৫০	১৯৪৯	২১,০২,৪২৫
১৯৪৬	১৫,৩৭,৪৭২	১৯৫০	২৬,১৪,১৮৫
১৯৪৭	১৪,৪৭,৬৬০	১৯৫১	২৮,১৫,০০০

উপরি-উক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, ১৯৪৪ সালের পর হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত উৎপাদন কম হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যন্ত্রগুলির ক্ষয়ক্ষতি,—যুদ্ধকালে অতিরিক্ত চালনায় যন্ত্রগুলির ক্ষয় সাধিত হইয়াছিল; তাহাতে উৎপাদন-শক্তি কমিয়া গিয়াছিল। ইহার অন্য কারণ কয়লার অভাব।

১৯৪২ সালে সিমেণ্ট-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সময় যুদ্ধের জন্য বহুসংখ্যক আকাশযানের বন্দর প্রস্তুত করার প্রয়োজন ঘটে। সুতরাং যুদ্ধের জন্য উৎপন্ন সিমেণ্টের ৯০ অংশ আলাদা রাখা হয়। অবশিষ্ট ১০ অংশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য, ও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে এই নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যায়। কিন্তু নূতন নিয়ন্ত্রণের আদেশ হয়,—ইহাতে স্থির হয়,—প্রদেশগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সিমেণ্ট পাইয়া আবশ্যক-মত বণ্টন করিবে।

সিমেণ্টের আমদানি।—এদেশের সিমেণ্টের উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত সিমেণ্টের আমদানি কমিয়া যাইতেছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে আমদানির পরিমাণ ছিল—৪৯ হা. ১ শত টন ; যুদ্ধকালে আমদানি বাড়িয়া ১৯৪৮-৪৯ সালে হয় ১ লক্ষ ৪০ হা. টন। কিন্তু এখন কমিয়া যাইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ১৮ হাজার টন সিমেণ্ট আমদানি হইয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া ও জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে সিমেণ্ট আমদানি হয়।

সিমেণ্ট-শিল্পের ভবিষ্যৎ।—সিমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা, ও প্রয়োজনীয়তা-বোধ এদেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। অথচ, সাধারণ লোকে প্রয়োজন-মত সিমেণ্ট পাইতেছে না,—পাইলেও তাহা দুর্ম্মূল্য। সেজন্য সিমেণ্টের উৎপাদন বেশী হওয়া দরকার। দেশের মধ্যে যেরূপ শিল্পসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতেও সিমেণ্টের বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া এখনও সিমেণ্ট বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিতেছে না। ইরাক ও ইরাণে এবং মালয় ও যবদ্বীপে কিছু সিমেণ্ট রপ্তানি হইত। এখনও অতিরিক্ত সিমেণ্ট দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় রপ্তানি করা যাইতে পারে।

পাকিস্তানে সিমেণ্ট-কারখানা—পাঁচটি আছে ;—তাহার মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানে আছে ৪টি,—তাহা হইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয় ;—এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে আছে ১টি,—তাহা হইতে সিমেণ্ট উৎপন্ন হয় ৭½ লক্ষ টন। পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পারস্য প্রভৃতি দেশে সিমেণ্ট রপ্তানি হয়। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উৎপাদন আরও বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প*

পূর্ব্বকথা।—অতি প্রাচীনকালে যে ভারতীয়গণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমুদ্রগামী জাতি ছিল, এবং ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ পশ্চিমে—রোম, গ্রীস, মিশর ও পারস্য উপসাগর প্রভৃতি স্থানে, এবং পূর্ব্বে—ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও ও চীন প্রভৃতি স্থানে যাইত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। তখন বাণিজ্য-জাহাজ ছিল কাষ্ঠ--নির্ম্মিত, এবং তাহা পাইলভরে চলিত। ভারতেও ঐরূপ বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হন, এবং পরিশেষে এদেশের সম্রাট্ হইয়া বসেন, তখনও তাঁহারা এদেশের বাণিজ্য-জাহাজ ব্যবহার

---

* মহামান্য ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী কে. সি. নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতা এবং ইণ্ডিয়ান ও পাকিস্তান ইয়ার বুক অবলম্বনে রচিত।

করিতেন। ১৮৮০ সালে ভারত সাম্রাজ্যের গভর্ণর-জেনারেল ইংলণ্ডে জানাইয়াছিলেন যে, কলিকাতার বন্দরে বিলাত ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-চালানোর জন্য ১০ হাজার টনী বাণিজ্য-নৌকা আছে। কালক্রমে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ও জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প উঠিয়া গেল। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, (১) ভারতে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের বৃটিশ-স্বার্থ-সহায়ক, এবং ভারতীয় বণিক-স্বার্থের বিরোধী কঠোর ও আপত্তিজনক সামুদ্রিক আইনের জন্য এদেশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য লোপ পাইয়া গেল। (২) ভারতের রাজশক্তি এদেশে বাণিজ্য-পোতের নির্ম্মাণ অসম্ভব করিয়া তুলিলেন। এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে এদেশে লৌহ-নির্ম্মিত ও বাষ্প-পরিচালিত জাহাজ প্রচলিত হইলে, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও পাইল-চালিত জাহাজ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গেল।

ভারতে বড় জাহাজ-নির্ম্মাণ উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু বড় জাহাজ হইতে মাল নামাইবার, বা জাহাজে মাল তুলিবার, বা জাহাজে আনীত মাল নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার উপযোগী ছোট-ছোট ষ্টিমার, মোটর লঞ্চ, প্রভৃতি প্রস্তুত হইত, এবং কলিকাতার কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানি এই সকল নির্ম্মাণে অগ্রণী ছিল।

অন্যান্য অনেক শিল্প যেমন মহাযুদ্ধকালের প্রয়োজন বশতঃ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্পও তদ্রূপ মহাযুদ্ধের কারণে এদেশে আরব্ধ হইতে পারিয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দেখা গেল, ইংলণ্ড, ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে-সকল দেশ যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করে, সেই সকল দেশ নিজেদের বা অন্যদেশ হইতে প্রাপ্ত নির্দ্দেশ মত জাহাজ-নির্ম্মাণে এত ব্যস্ত যে, ভারতের জন্য জাহাজ-নির্ম্মাণের স্থান দুর্লভ হইয়া উঠিল। ইহাতে এদেশে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনাদি আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে কয়েক প্রকার বড় ধরণের জাহাজ-নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইল। কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচী বন্দরের কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানি এই কার্য্যে লিপ্ত হইল। লৌহ, কাষ্ঠ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য এই কার্য্য ব্যাহত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু এইরূপ কার্য্যে ভারতের জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প যে অগ্রসর হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয়দের বড় জাহাজ-নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টা।—এই সময়ে ১৯৪১ সালে সিন্ধিয়া নাভিগেশন কোম্পানি জাহাজ-নির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়া বিশাখাপত্তনে জাহাজ-নির্ম্মাণ-ক্ষেত্র স্থাপন করিল। যুদ্ধকালে গবর্ণমেণ্ট ভারতে জাহাজ-নির্ম্মাণের আবশ্যকতা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্যের অন্যতম অংশীদার, সিন্ধিয়া স্টীম নাভিগেশন কোম্পানিও ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয়দিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নতি করিতে হইলে এদেশে জাহাজ-নির্ম্মাণ

করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। ইহারই ফলে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী জাহাজ-নির্ম্মাণের জন্য বিশাখাপত্তনে প্রথম জাহাজ-নির্ম্মাণ-ক্ষেত্র নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করা হইল।

১৯৪২ সালে যুদ্ধের মহামারীবশতঃ এই কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, এবং ১৯৪৩ সালে ইহার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ সালে আংশিক শেষ করা হইল। কালক্রমে এই ক্ষেত্রে ৮০০০ হইতে ১০,০০০ হাজার টনী আটখানি জাহাজ একসঙ্গে নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ সিন্ধিয়া কোম্পানির ৮ হাজার টনী প্রথম জাহাজ **জল-উষা** জলে ভাসিয়াছিল, এবং ইহার পরে **জল-প্রভা** ও **জল-প্রকাশ** জলে ভাসিয়াছে। ভারতে বড় জাহাজ-নির্ম্মাণের ইহাই এক্ষণে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এখানে যে-জাহাজ তৈয়ারি হইয়াছে তাহার ইঞ্জিন ও কোন-কোন উপাদান ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছে।

ভারতীয়দিগের বাণিজ্য-জাহাজ।—Reconstruction Policy Sub-Committee on shipping-এর বিবৃতি-অনুসারে ভারতীয়দিগের বাণিজ্য-জাহাজের পরিমাণ এইরূপ :—

১৯৩৯ সালে	১৪০,০০০ টন
১৯৪৬ „	১২৭,০০০ „
১৯৪৮ „	৩৫০,০০০ „

—১৯৪৬ হইতে ১৯৪৮—এই দুই বৎসরের বাণিজ্য-জাহাজের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। কমিটি আশা করেন ১৯৫৪ সালে ভারতের বাণিজ্য-জাহাজের মালবহনশক্তি ২০ লক্ষ টন হইবে। কিন্তু ইহা বলা দরকার, বাণিজ্য-পোতের এক্ষণে যেরূপ মালবহনশক্তি দরকার, ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের বর্ত্তমানে তাহা নাই।*

ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের অসুবিধা।—ভারতীয় নৌ-বহর গঠনের প্রধান অসুবিধা এই যে,—ইহার জন্য যেরূপ নৌ-চালনায় দক্ষ লোকের দরকার, ভারতে তাহা পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড হইতে নৌ-শিল্পদক্ষ লোক আনাইয়া এই কার্য্য চালাইতে হয়। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে "ডফ্‌রিন" নামে একখানি জাহাজে পোতচালনাবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। তাহার পর হইতে এক্ষণে অল্পসংখ্যক দক্ষ লোক পাওয়া যাইতেছে।†

* ১৯৪৫ সালে আ. যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-পোতের মালবহনশক্তি ৩,৪১,২৬,০০০ ;—যুক্তরাজ্যের—১,৪৬,০১,০০০ ; নরওয়ের—২৪,৮২,০০০ ; হলণ্ডের—১৪,১৩,০০০ টন।

† বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী কে. সি. নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

নাবিক।—পৃথিবীতে ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নাবিক পাওয়া যায়। কিন্তু জাহাজের কার্য্যে ইহাদের আবশ্যকতা যতই থাকুক না কেন, ইহাদের অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করিতে হইত। ইহাদের বেতন অত্যন্ত কম ছিল, এবং কার্য্যের সর্ত্তও ভাল ছিল না। এক্ষণে ইহাদের উন্নতি হইতেছে,—ইহাদের সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, এবং উন্নত বেতন ও অন্যান্য সুখসুবিধারও ব্যবস্থা হইতেছে।

জাহাজ-নির্ম্মাণ-স্থান হিসাবে বিশাখাপত্তনের উপযোগিতা—(১) বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক ও সুগভীর এবং ডল্‌ফিন নাসিকাকৃতি অন্তরীপ দ্বারা ঝড় হইতে সুরক্ষিত। (২) জাহাজ-নির্ম্মাণের স্থান (Yard) বন্দরের সহিত যুক্ত, এবং বন্দরের পয়ঃপ্রণালীতে প্রায় ১৪ হাজার টন জাহাজ রাখিবার পক্ষে উপযুক্ত জল আছে। (৩) ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে আবশ্যকীয় কাষ্ঠ ও লৌহ পাওয়া যায়। যদিও এখন জামসেদপুর হইতে লৌহের পাত আনানো হয়, তথাপি ভবিষ্যতে এখানে লোহার কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল হইতে আবশ্যকীয় কাষ্ঠ পাওয়া যাইতে পারে। (৪) এখানে জাহাজ তৈয়ার হয় বটে, কিন্তু এখন ইঞ্জিন তৈয়ার হয় না। বিদেশ হইতে ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি বন্দরে আনিলে জাহাজ-নির্ম্মাণস্থানে আনিবার বিশেষ সুবিধা আছে। (৫) বিশাখাপত্তন স্বাস্থ্যকর স্থান,—সুতরাং পরিশ্রমী ও স্বাস্থ্যবান্ শ্রমিক পাওয়া যায়। (৬) ইহা রেলপথ দ্বারা পশ্চাদ্ভূমির নানা স্থানের সহিত সংযুক্ত। (৭) এই স্থান বেশ বিস্তৃত,—কার্য্যক্ষেত্র অনায়াসেই বাড়ানো যায়।

কলিকাতার উপযোগিতা।—জাহাজনির্ম্মাণস্থান হিসাবে কলিকাতাও যে উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই,—ইহার বন্দর পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত; এখানে শ্রমিক সুলভ ও সহজপ্রাপ্য, এবং লৌহঅঞ্চলও ইহার নিকটে আছে,—ছোট-ছোট ষ্টিমারাদি নির্ম্মাণের কারখানাও এখানে বহুদিন হইতে আছে। কিন্তু এখানে জাহাজ-নির্ম্মাণস্থান স্থাপনের প্রধান অন্তরায়—এই বন্দরের প্রবেশপথের অনুপযোগিতা;—এই বন্দরে বড়-বড় জাহাজ আনিবার জন্য বহুব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা সকল-সময় প্রস্তুত রাখিতে হয়, এবং কখনও-কখনও তিথি-নক্ষত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য নানা জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। ভবিষ্যৎ এখনও নির্ণীত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় এখানে জাহাজ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

রেলওয়ে ইঞ্জিন-নির্ম্মাণ-শিল্প

ভারতে রেলগাড়ীর জন্য প্রায় ৭০০০ ইঞ্জিন দরকার হয়। কিন্তু এই সকল ইঞ্জিন চিরদিনই বিদেশ হইতে কিনিয়া আনা হইত। গত মহাযুদ্ধে বহু ইঞ্জিন নষ্ট হইলে, দেখা গেল, বিদেশ হইতে যুদ্ধকালে ইঞ্জিন আনাইবার সম্ভাবনা কম। সেজন্য এখানে ইঞ্জিন-তৈয়ারির কারখানা স্থাপনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইল। যুদ্ধের পরে বিদেশ হইতে ৮৬৩টি ইঞ্জিন আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখানেও দুইটি ইঞ্জিন-তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে,—

(১) **টাটা লোকোমোটিভ কারখানা**—ইহা জামসেদপুরে অবস্থিত। এখানে ১০০টি বয়লার তৈয়ারির ব্যবস্থা আছে, এবং ভবিষ্যতে ইঞ্জিন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা আছে।

যুদ্ধকালে ১৯৪৩ সালেই এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ভারতে রেল-ইঞ্জিন--তৈয়ারির প্রথম কারখানা। টাটা কোম্পানির বিস্তৃত লৌহশিল্পের সুবিধা পাওয়া যাইবে বলিয়া এই কারখানা তাহার অঙ্গীভূত করিয়া যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইঞ্জিন-নির্ম্মাণের উপকরণাদির জন্য নূতন ব্যবস্থার দরকার হয় নাই।

(২) **চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা**।—এই কারখানা পশ্চিম--বঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমার মিহিজাম গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। মিহিজাম ই. আই. রেলপথে একটি রেল-ষ্টেশন, আসানসোল হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। মিহিজামের নাম বদ্‌লাইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাম অনুসারে "চিত্তরঞ্জন" রাখা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের এই কারখানায় বৎসরে ১২০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি বয়লার প্রস্তুত হইতে পারিবে। দুই দল শ্রমিকে পালাক্রমে কাজ করিলে আরও বেশী হইবে।

চিত্তরঞ্জনে রেল-ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপনের **উপযোগিতা** এই যে,—(১) এই স্থান বঙ্গ ও বিহারের কয়লাখনির সন্নিকটে অবস্থিত; (২) বিহার ও উড়িষ্যার লৌহখনিও অদূরবর্ত্তী; (৩) সাঁওতাল পরগণায় বলিষ্ঠ ও সুলভ শ্রমিক সহজপ্রাপ্য, এবং (৪) ইহা রেল স্টেশনের উপরে অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য।—এই কারখানাটি প্রথমে কাঁচড়াপাড়ায় স্থাপন করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কাঁচড়াপাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তানের সীমা-সন্নিকটে অবস্থিত এবং কয়লা ও লৌহখনি হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

মোটর-গাড়ী-শিল্প

আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারিজন লোকের একখানি মোটর গাড়ী আছে, যুক্তরাজ্যে আছে প্রতি ২০ জনের একখানি—ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ২৩৯০ জনের জন্য একখানি গাড়ী মিলিতে পারে। ১৯৪৯ সালে এদেশে সকল রকমের মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল—২৬৯,৬৬৯ ;—তন্মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য্য গাড়ী—১৩৩,৩৯৯ ; যাত্রী বহনের 'বাস' গাড়ী—৩৭৮৮২ ; মাল টানিবার লরী—৭২৯২৬ ; মোটর সাইকেল—২২৮১০ ; এবং অন্যান্য ২৬৫১ খানি। এখনকার যুগে মোটর গাড়ী একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ;—কি যাত্রিবহনে, কি মালবহনে ইহার প্রয়োজন প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে ;—ইহা এক্ষণে সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ভারতের যে বহু মোটর গাড়ীর প্রয়োজন আছে,—তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এদেশে মোটর গাড়ী প্রস্তুত করার কোন কারখানা নাই। বহুদিন হইতেই এদেশে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য কারখানা-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন দিনই সে-চেষ্টা অনুমোদন করেন নাই। তবে এদেশে কয়েকটি মোটর-নির্ম্মাণ-কারখানা আছে, সেখানে বিদেশ হইতে মোটর গাড়ীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনিয়া এখানে জুড়িয়া মোটর গাড়ী প্রস্তুত করা হয়। ইহাকেই আমাদের দেশে মোটর-গাড়ী-শিল্প বলা হয়। এইরূপ কারখানা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল দুইটি,—(১) **জেনারাল মোটর্‌স্ কর্পোরেশন** (ভারত) **লিমিটেড**, ও (২) **ফোর্ড মোটর্‌স্**, এবং যুদ্ধকালে ও যুদ্ধের পরে হইয়াছে চারিটি—

(৩) **হিন্দুস্থান মোটর্‌স্ লিঃ,**
(৪) **প্রিমিয়ার আউটোমোবাইল্‌স্ লিঃ,**
(৫) **অশোক মোটর্‌স্ লিঃ,**
(৬) **বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন।**

(১) জেনারাল মোটর্‌স্ কর্পোরেশন (ভারত) **লিঃ**—ভারতের কারখানাগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ১৯২৮ সালে বোম্বাই নগরে স্থাপিত হয়, এবং প্রধানতঃ মোটর গাড়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়িয়া মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ইহার কার্য্য এক্ষণে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে ইহা **কমার্শিয়াল বডি বিল্ডিং কর্পোরেশন** নামে গাড়ীর কাঠাম-নির্ম্মাণের এক শাখা-কারখানা স্থাপন করে, এবং যুদ্ধোপযোগী গাড়ীর কাঠাম প্রস্তুত করিতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে ইহাই যুদ্ধ-গাড়ী সরবরাহের প্রধান কারখানা ছিল।

এই কারখানা এত বড় যে, এদেশে প্রতি বৎসর যত গাড়ী বিক্রয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক এই কারখানায় দেহ লাভ করে।

(২) **ফোর্ড কোম্পানি**তেও মোটরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে প্রায় ৪০ রকমের গাড়ীর সৃষ্টিকার্য্য চলে। ইহারও কারখানা বোম্বাই সহরে অবস্থিত।

(৩) **হিন্দুস্থান মোটর্‌স্ লিমিটেড্** (Hindustan Motors Ltd.) ১৯৪২ সালে উত্তর কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়ায় স্থাপিত হয়। ইহা ভারতীয়দিগের কোম্পানি এবং শিল্পপতি বিড়লা ব্রাদার্সের চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয়। গ্রেট বৃটেনের মরিস মোটর্‌স্ (Morris Motors), এবং আ.-যুক্তরাষ্ট্রের স্টুডিবেকার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (Studebaker Export Corporation) হইতে, বন্দোবস্ত ক্রমে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনিয়া এখানে তাহা জুড়িয়া মোটর গাড়ী প্রস্তুত করা হয়। এই কারখানায় প্রস্তুত গাড়ীর নাম—স্টুডিবেকার, চ্যাম্পিয়ন, হিন্দুস্থান ১০ প্রভৃতি।

(৪) **প্রিমিয়ার আউটোমোবাইল্‌স্** (Premier Automobiles) **লিঃ** ভারতের অন্যতম শিল্পপতি শেঠ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের চেষ্টায় ১৯৪৪ সালে বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট সহরের চ্যারিস্‌লার কর্পোরেশনের সহিত চুক্তিক্রমে এখানে উক্ত কর্পোরেশনের সহায়তায় এক্ষণে ইহা গাড়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দেওয়ার কাজ করিতেছে। উক্ত কর্পোরেশনের সহায়তায় ক্রমে-ক্রমে এই কারাখানাতে গাড়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করা হইবে।

(৫) **অশোক মোটর্‌স্ লিঃ** (Ashok Motors Ltd.) ১৯৪৭ সালে মান্দ্রাজের নিকট ইন্নোর নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টিন মোটর কোম্পানি (Austin Motor Co. Ltd.) এবং অষ্টিন মোটর এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (Austin Motor Export Corporation)-এর সহিত চুক্তিক্রমে তাহাদের নিকট হইতে ঐ কোম্পানিতে নির্ম্মিত মোটরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখানে আনিয়া জুড়িয়া মোটর গাড়ী প্রস্তুত করিতেছে।

(৬) কানপুরের **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন** (British India Corporation) ও তাহাদের সহায়ক **পেনিনসুলার মোটর কর্পোরেশন** (Paninsular Motor Corporation) ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হয়। ইহারা হাড্‌সন গাড়ী, ছোট মরিস গাড়ী, মরিস বাস ও লরী এবং রেনোঁ গাড়ী প্রভৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া বিক্রয় করে। কলিকাতা ইণ্টালি অঞ্চলে ইহার প্রধান আফিস। ইহা ছাড়া আরও ৫।৬টি কারখানাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়িবার কাজ হয়। **দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর**

এক্ষণে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ হাজার "যাত্রী" গাড়ী ও "ট্রাক" গাড়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোগ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে।*

মোটর-গাড়ীর অন্যান্য কথা—মোটর-গাড়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া এদেশে যে-সকল গাড়ী প্রস্তুত হয়, তাহার মূল্য মোটামুটি বিদেশ হইতে আমদানি--করা সেইরকম পূর্ণ গাড়ীর মূল্য অপেক্ষা ⅙ অংশ কম হয়। কারণ, এই সকল গাড়ীর বাণিজ্যশুল্ক ও ইনস্যুরেন্স প্রভৃতি দিতে হয় না।

এদেশে এক্ষণে মোটর-গাড়ীর সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সম্পূর্ণ গাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইবে, বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, এখানে ইহার উপকরণ সকলই পাওয়া যায়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এদেশীয় অনেক শ্রমিক এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং অভিজ্ঞ কারিগরের কর্ত্তৃত্বাধীনে অদূর ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ব্যোমযান নির্ম্মাণ-শিল্প

(Aircraft Industries)

যুদ্ধকালে ব্যোমযানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ না থাকিলেও দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোন জাতির পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও নিতান্ত কম নহে। ধীরে-ধীরে ইহা রেলগাড়ীর স্থান অধিকার করিতেছে। দ্রুতগমনের জন্য দূরগামী যাত্রী এখন রেলগাড়ী অপেক্ষা বিমান-গাড়ীই বেশী পছন্দ করে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইহার গুরুত্ব দ্রুত বাড়াইয়া দিয়াছে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারত ও মহীশূর গবর্ণমেণ্টের মিলিত চেষ্টায় ও একটি বে-সরকারী কোম্পানির পরিচালনায় মহীশূরের বাঙ্গালোর সহরে হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট্ ফ্যাক্টারি (Hindusthan Aircraft Factory) স্থাপিত হয়। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, এই অঞ্চলের বিদ্যুৎশক্তি, ও উৎকৃষ্ট ইস্পাত ও অন্য কাঁচামালের সুবিধার জন্যই বাঙ্গালোর উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে উপরি-উক্ত বে-সরকারী কোম্পানির সমস্ত অংশ ভারত ও মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়া উহার নাম দেন হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট্ কর্পোরেশন। পোতগুলির জীর্ণসংস্কার, অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন, ও বিদেশ হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনাইয়া সংযোগ-সাধনই ইহার কার্য্য।

* ১৯৫০ সালে পৃথিবীতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ "যাত্রী" গাড়ী ও "ট্রাক" তৈয়ার হইয়াছে। তাহার মধ্যে উত্তর আমেরিকায়—৮৩ লক্ষ ৯৩ হা. ৮১৮ ;—আ. যুক্তরাষ্ট্র—৮০,০২,৭৮২, যুক্তরাজ্যে—৭,৮৫,২১৭।
Amrita Bazar Supplement—15. 5. 52.

ইংলণ্ডের পার্শিভাল এয়ারক্রাফ্‌ট কোম্পানির নিকট হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনাইয়া এখানে তাহাদের সংযোগসাধন করিয়া ব্যোমযান-নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। পরে যাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এখানে প্রস্তুত করা যায়, তাহার চেষ্টা হইবে। এই কারখানায় শিক্ষক ব্যোমপোত (Trainer Aircraft)ও প্রস্তুত হইতেছে।

দামোদর-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে আসানসোল-অঞ্চল ব্যোমপোত নির্ম্মাণের আরও উপযোগী স্থান হইবে। কারণ, নিকটের বিদ্যুৎশক্তি, লৌহ এবং আসানসোল অঞ্চলের ও বেলুড়ের এলুমিনিয়ম পাত হইতে সহজে উপকরণ সংগ্রহ করা যাইবে।

রাসায়নিক শিল্প
(Chemical Industries)

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য-উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বড়ই পশ্চাৎপদ। যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইহার উন্নতিকল্পে কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, এদেশে যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও তখনকার গবর্ণমেণ্ট নিজের দেশের স্বার্থবোধে এদেশে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির জন্য কখনও মনোযোগ দেন নাই। ইহাতে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে। কারণ,—(১) ইহা অনেক শিল্পের মূল বলিয়া সেই সকল শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, (২) জমির উর্ব্বরতাবর্দ্ধক সার প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এবং (৩) দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহার যে প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ হয় নাই।

রাসায়নিক দ্রব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—(১) **গুরু পরিমাণে উৎপাদন--সাপেক্ষ অমার্জ্জিত রাসায়নিক দ্রব্য** (Heavy Chemicals), ও (১) **লঘু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ সুমার্জ্জিত রাসায়নিক দ্রব্য** (Fine Chemicals)।

(১) গুরু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ অমার্জ্জিত রাসায়নিক দ্রব্য।—এই দ্রব্য একসঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়, এবং ইহা অসংস্কৃত ও স্থূলভাবেই প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে খরচও 'বেশী পড়ে না। অন্য অত্যাবশ্যকীয় অনেক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হয়,—এবং কৃষির উন্নতিকল্পে ইহার দরকার খুব বেশী। এক্ষণে সিন্ধ্রিতে সার প্রস্তুত করা হইতেছে। তাহার বিবরণ পরেই বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—সাধারণ এসিড (acid), সোডা, পটাশ প্রভৃতি দ্রব্য এবং জমির উর্ব্বরতাবর্দ্ধক সার প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে,—(ক) সালফিউরিক এসিড্ ও তাহার সাহায্যে প্রস্তুত-করা অন্যান্য দ্রব্য, এবং (খ) অনেক প্রকারের ক্ষার দ্রব্য (soda) ও তাহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি। এতদ্ব্যতীত, এলম্ (ফিট্‌কারী), এপসম সল্ট (Epsom salt), কপার সালফাইড (Copper sulphide), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid), ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড (Calcium chloride) প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

(২) **লঘু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ সুমার্জ্জিত দ্রব্যাদি**।—ঔষধাদি, ফটোগ্রাফ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, রং, বার্ণিশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দ্রব্যাদি যত্ন সহকারে ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং ইহা পরিমাণে অল্প করিয়া প্রস্তুত করা হয়। এসিটিক এসিড, এল্‌কোহল, কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড, গ্লিসিরিণ, বেন্‌জিন, ক্রিয়োজোট তৈল, ন্যাপথালিন, ফেনল প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (Organic Chemicals), এবং ক্যাফিন্, এমিটিন, মরফিন, কুইনাইন, স্যানটোনিন, স্ট্রিকনিন, মেফাক্রিন, ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়ম, গ্লুকোনেট প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত ঔষধ ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বোম্বাই প্রদেশে একটি পেনিসিলিন প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১০ কোটি ইউনিট পেনিসিলিন প্রস্তুত হইবার আশা আছে। ভারতবর্ষে কুইনাইন তৈয়ার হয়—দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ৪৫০০ ফিট উঁচু রংবি উপত্যকায়। রংবির এই চাষ মংপুতে বিস্তৃত হইয়াছে। অন্য উৎপাদন-স্থান—নীলগিরি। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে গড়ে লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ভারতের উৎপাদন পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৪ ভাগ মাত্র,—জাভায় হয় ৯০ ভাগ। ভারতবর্ষের নিজের জন্য যে কুইনাইনের দরকার, তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এদেশে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট কুইনাইনের জন্য যবদ্বীপের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। এক্ষণে কুইনাইন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। এদেশে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

এক্ষণে ভারতে প্রায় ২৮টি রঞ্জন-দ্রব্যের কারখানা আছে।

কলিকাতা, বোম্বাই, মহীশূর ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুণায় একটি বৃহৎ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

রাসায়নিক সারশিল্প।—জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সার বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেজন্য আমাদের দেশে পশুর মলমূত্র ও মৃতদেহ, হাড়, কাঠের ছাই ও মৎস্য প্রভৃতি জমির সার বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশে পেরুর পক্ষিপুরীষ ও চিলির সোরা-ও জমির মূল্যবান্ সাররূপে বহুকাল হইতে বহুদেশে

ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার পরে ১৮৪০ সালে গ্রেটবৃটেন সর্ব্বপ্রথম **এমোনিয়া সালফেট** নামক উপ-উৎপাদন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে-ক্রমে দেশ-বিদেশে ইহার উপকারিতা স্বীকৃত হয় ও ইহা প্রচলিত হইয়া যায়। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ইহা ব্যবহার করে প্রথম ১৮৯৫ সালে। এদেশেও কিছুদিন হইতে ইহা ব্যবহৃত
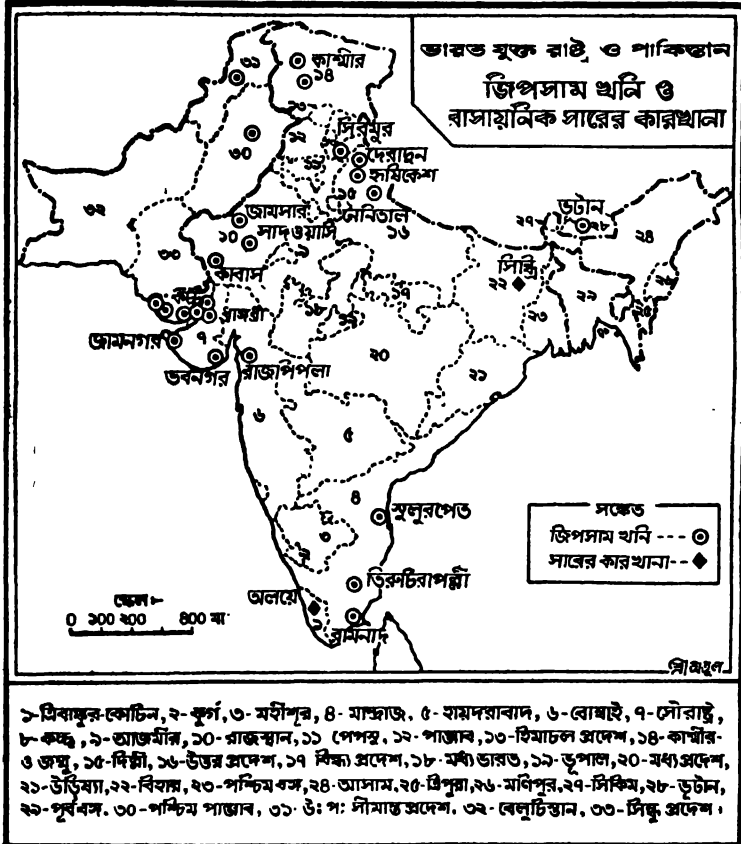
৫৬নং চিত্র

হইতেছে, এবং প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে চারি লক্ষ টন এমোনিয়া সালফেট আমদানি করা হইতেছে। ধান, গম, আলু, ইক্ষু প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই সার দিলে ফলন মোটামুটি ৪০ হইতে ৬০ শতাংশ বাড়িয়া যায়।

সিন্ধ্রি কারখানার পরিকল্পনা।—১৯৪৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশে এই রাসায়নিক সার প্রস্তুত করার সম্ভাবনা বিচার করিবার জন্য একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করেন, এবং সেই সমিতির উপদেশ অনুযায়ী বিহার

প্রদেশের অন্তর্গত ধানবাদ মহকুমার অন্তর্বর্ত্তী ধানবাদ হইতে ১৪ মা. দূরে ঝরিয়া কয়লা-খনি অঞ্চলে দামোদরের গোবাই উপনদীর তীরে সিন্দ্রি নামক স্থানে ইহার কারখানা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেন।

ভারতে প্রথম রাসায়নিক সারের কারখানা।—এই সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই রাসায়নিক সার—এমোনিয়া সালফেট—প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হয়, এবং সেখানে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার টন এই সার প্রস্তুত হইতেছে। ইহাই ভারতে রাসায়নিক সারের প্রথম কারখানা। সেখানে এমোনিয়া সালফেট সার প্রস্তুত করিতে যে-জিপসাম দরকার হয়, মান্দ্রাজের তিরুচিরাপল্লী-অঞ্চল হইতেই তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সিন্দ্রি।—সিন্দ্রির গঠনকার্য্য এতদিনে শেষ হইয়াছে, এবং ১৯৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর হইতে এখানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভারতের রাসায়নিক সারের **দ্বিতীয় কারখানা** এবং **এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।** প্রথমে ইহা দৈনিক ৩০০ টন সার উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাস হইতে এই কারখানায় প্রতিদিন ১০০০ হাজার টন সার উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। এই কারখানা হইতে বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টন সার উৎপাদন করিবার কল্পনা করা হইয়াছে।

সার-উৎপাদনের মূল দ্রব্য।—সহস্র টন এমোনিয়া সালফেট প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়,—(১) ২০০০ টন **জিপসাম,** (২) **নাইট্রোজেন** ও **কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড** ও (৩) **হাইড্রোজেন।** শেষোক্ত হাইড্রোজেন উৎপাদন করিতে লাগে—৬০০ টন **কোক-কয়লা,** এবং এই কার্য্যের জন্য যে-বিদ্যুৎশক্তির দরকার হয়, তাহার জন্য আবশ্যক হয় ৮০০ টন **কয়লা।**

এই কারখানার পক্ষে সিন্দ্রির উপযোগিতা।—এই সার প্রস্তুত করার জন্য সিন্দ্রি উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কারণ, ইহাতে যে-পরিমাণ কয়লা লাগে, তাহাতে কয়লা-ক্ষেত্র বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার অবস্থিতি প্রয়োজনীয়। সেইজন্য ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র ইহার উপযুক্ত স্থান। আবার এই কারখানার কার্য্যে প্রত্যহ ১২ মিলিয়ন গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা ও প্রয়োজনমত জল একই স্থানে পাওয়া যায় এরূপ স্থান বিরল। কিন্তু ঝরিয়া অঞ্চলে দামোদর নদী থাকাতে কিছু সুবিধা হইয়াছে, এবং ইহারই গবাই উপনদীর উপরে এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। গবাই নদীতে বাঁধ দিয়া জলাশয় সৃষ্টি করিয়া সেখান হইতে ইহাতে জল সরবরাহ করার সুবিধা করা হইয়াছে। ইহার জন্য জিপসাম আসে রাজপুতানার বিকানীর, যোধপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে।

উৎপন্ন সারের প্রচুরতা।—সাধারণতঃ এক একর জমিতে সার দিতে ২১/২ হন্দর এমোনিয়া সালফেট লাগে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, দৈনিক সহস্র টন এমোনিয়া সালফেট উৎপন্ন হইলে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আবশ্যকীয় সারের এক-সপ্তমাংশ মাত্র সার পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে-অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহার দ্বারা দেশের এক-চতুর্থাংশ মাত্র খাদ্যাভাব পূর্ণ হইবে। সুতরাং এ-দেশে সার-কারখানার আরও প্রয়োজন আছে।

দেশলাই-শিল্প

১৮৯৫ সালে আমেদাবাদ সহরে প্রথম দেশলাই-এর কল স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে ১৯২২ সালে আমদানি-করা দেশলাই-এর উপর রাজস্ব-কর (revenue duty) স্থাপিত হয়। ইহাতে এদেশের কলে দেশলাই বেশী তৈয়ারি হইতে থাকে, এবং ১৯২৬ সালে এদেশে দেশী দেশলাই বেশ প্রচলিত হইয়া পড়ে। ১৯২৮ সালে রাজস্ব--কর রক্ষণ-শুল্কে পরিণত হয়। ইহাই এদেশে দেশলাই-শিল্পের সমৃদ্ধির কারণ।

সুইডিশ-দিগের দেশলাই কারখানা।—সুইডেনের দেশলাই-ই ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রক্ষণ-শুল্কের জন্য তাহাদের ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানি নামে এক সুইডেন-দেশীয় কোম্পানি এখানে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বেরেলি, অম্বরনাথ প্রভৃতি স্থানে দেশলাই-এর কারখানা স্থাপন করিল। এখন এই কোম্পানি ভারতবর্ষে আবশ্যক দেশলাই-এর ৪/৫ অংশ সরবরাহ করে। এক্ষণে এদেশীয়দিগের পরিচালিত অনেক কলও সৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৫০টি দেশলাই-এর কল আছে। এই সকল কল হইতে ভারতে গত কয়েক বৎসরে নিম্নলিখিতরূপ দেশলাই উৎপন্ন হইয়াছে,—

১৯৪৭ সালে—৬১৮,০০০ পেটি*
১৯৪৮ „ ৫৩৩,০০০ „
১৯৪৯ „ ৬০৭,০০০ „

---

* ১ পেটি (Case)=৫০ গ্রোস (Gross) দেশলাইয়ের বাক্স।

প্লাস্টিক শিল্প

প্লাষ্টিক শিল্প।—বোধ হয় জগতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ও সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও ইহার প্রচলন খুব বেশী ছিল না। কিন্তু গত কুড়ি বৎসরে,—বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রসাদে—ইহা জগৎ জয় করিয়াছে ;—ইহা এখন পৃথিবীর সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বহু রাসায়নিক শিল্পের সহায়তায় ইহার মূল উপাদান প্রস্তুত হয়,—আবার ইহাই বহু শিল্প-সংগঠনের সহায়ক। গার্হস্থ্য জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে, শিল্প-যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত বহু দ্রব্যই প্লাস্টিকে প্রস্তুত করা হইতেছে। অতি ক্ষুদ্র আংটি হইতে, বিছানার চাদর, টেবিলের আবরণ, এমনকি ব্যোমযান ও মোটর-গাড়ী প্রভৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্লাস্টিকে নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার যে মূল উপাদান তাহা "প্লাস্টিক" (plastic) অর্থাৎ নমনীয়। তাই, যে-কোন ছাঁচে ফেলিয়া যে-কোন আকারের দ্রব্য ইহাতে প্রস্তুত হইতে পারে। আবার, ধাতুদ্রব্য, কাঠ ও পাথর অপেক্ষা ইহা সুলভ ;—এবং ইহা যেমন ভঙ্গপ্রবণ হইতে পারে, তেমনি শক্তও হইতে পারে। তাই প্লাস্টিকে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কাষ্ঠাদিতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি অপেক্ষা সুলভ, এবং কাঠিন্যে প্লাস্টিক-দ্রব্য ঐ সকল দ্রব্যে প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা হীন নহে। সেজন্য অনুমান করা যায়, এলুমিনিয়ম যেমন গৃহস্থালিতে ব্যবহারের ও অন্য অনেক প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পিতল-কাঁসাকে এক ধাক্কা দিয়াছে, ভবিষ্যতে প্লাস্টিকও সেইরূপ আর একটি গুরুতর ধাক্কা দিবে,—প্লাস্টিকের ব্যবহার দ্রুত বাড়িবে, এবং কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধাতুর ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে।

প্লাষ্টিক শিল্পের প্রবর্ত্তন।—প্লাস্টিক শিল্পের প্রথম উন্নতি হইয়াছিল শিল্পজীবী আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মাত্র ১২টি প্লাস্টিকের কারখানা ছিল। যুদ্ধকালে প্লাস্টিক দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইলে, এদেশে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু এই শিল্পের মূল উপাদান প্রস্তুত করিতে উন্নত রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজন। অথচ এদেশে রাসায়নিক শিল্প ততদূর উন্নত হয় নাই। সেজন্য সুবিধা পাইয়াও প্লাস্টিক শিল্প সবিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। তবে ইহা সত্য যে, মহাযুদ্ধকালে যে-প্রেরণা ইহা পাইয়াছিল, তাহার জন্যই শেষে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং মহাযুদ্ধকালেই ইহার উপাদান প্রস্তুত করার একটি রাসায়নিক কারখানাও এদেশে স্থাপিত হইয়াছিল।

উপাদান।—প্লাস্টিক শিল্পের উপাদান দুই শ্রেণীভুক্ত,—**(১) তাপ-নমনীয়** (Thermo-plastic), ও **(২) তাপ-সন্নিবিষ্ট** (Thermo-setting)। **ইহার উপাদানগুলিকে ইংরাজিতে বলে resin,—বাঙ্গালায় বলা যাক "রঞ্জন"।**

(১) যে সকল রজন তাপ দিলেই নরম হয়, ও শীতল হইলেই শক্ত হয়, তাহাদের বলা হয় **তাপ-নমনীয় রজন** (thermo-plastic resin)। এই শ্রেণীর কয়েকটি. রজন আছে ; যেমন—সেলুলোজ নাইট্রেট ও এসিটেট পলিস্টিরিন (Cellulose nitrate and Acitate polysterene) রজন, ভিনিল পলিমিটার্‌স্‌, ইথিল সেলুলোজ, মিথিল এক্রিটেট (Vinyl polymeters, Ethyl cellulose, Methyl acrytate) রজন, প্রভৃতি।

এই শ্রেণীর রজন দিয়া প্লাস্টিকের চাদর, নল, দণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

(২) যে-সকল রজন তাপ দিলে সম্পূর্ণভাবে শক্ত হয়, এবং আর গলে না, বরং ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাকেই বলা হয় **তাপ-সন্নিবিষ্ট রজন**। তাপ দ্বারা ইহার অণুগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়া জমাট বাঁধিয়া শক্ত হয়। ফেনল (Phenol), ইউরিয়া (Urea) প্রভৃতি, ফর্ম্মাল-ডিহাইড্ (Formal-dehyde)-এর সহিত ঘনীভূত করিয়া এই রজন প্রস্তুত করা হয়। এই রজনে প্রস্তুত দ্রব্য ভাঙ্গিলে তাহার ভগ্নাংশ আবার গলানো ও কাজে লাগানো যায়।

শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।—প্লাস্টিক দ্রব্য ইহার মূল উপাদান রজন হইতে তিন উপায়ে তৈয়ার করা হয়,—(১) **চাপদান** (Compression), (২) **প্রক্ষেপণ** (Injection), ও (৩) **বহিষ্করণ** (Extrusion)।

(১) তাপ-সন্নিবিষ্ট শ্রেণীর রজন গুঁড়ার আকারে লইয়া ছাঁচে দিয়া তাপ ও চাপ দিলে কতকগুলি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বিছানার চাদর, টেবিলের আবরণ, বেসিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এইরূপ চাপের দরকার হয়।

(২) চিনি ও প্যারাফিন-এর মত জিনিসে তাপ দিলে, তাহাদের অণুগুলি তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এইরূপ রজনকে গলাইয়া জলবৎ করিয়া লইয়া উহা জোরে ঠাণ্ডা ছাচের ভিতর প্রক্ষেপ করিতে হয় এই প্রক্রিয়ায় কাজ করিতে তাপ-নমনীয় রজন দরকার, ও ইহাতে চিরুণি, খেলনা প্রভৃতি ছোট-ছোট দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

(৩) কতকগুলি দ্রব্য প্রস্তুত করার সময়ে প্রক্ষেপণ-প্রক্রিয়ার মতই রজন গলাইয়া তরল করিয়া ঠাণ্ডা ছাঁচে ফেলা হয়, এবং চাপ দিয়া অনবরত ছাঁচ হইতে প্লাস্টিক দ্রব্য বাহির করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **বহিষ্করণ**। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করিবার সময় দুইপ্রকার রজনই ব্যবহৃত হয়। লম্বা-লম্বা তার আবরণ যুক্ত করিতে এই প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয়।

ভারতে প্লাস্টিক শিল্প।—এদেশে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি বড়-বড় সহরে প্রায় ৮০টি (১৯৫০ সালে) প্লাস্টিক শিল্পের কারখানা

আছে, এবং উহাতে ১৭০টি চাপ দিবার ও ১০০টি প্রক্ষেপণ-প্রক্রিয়ার এবং ২০০টি বহিষ্করণ-প্রক্রিয়ার যন্ত্র আছে। প্রায় ৬ কোটি টাকা এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়াছে এবং ১০ হাজার শ্রমিক এই কার্য্যে খাটিতেছে। এক্ষণে এই সকল কারখানার জন্য তাপ-নমনীয় রজন ৫ হাজার টন ও তাপ-সন্নিবিষ্ট রজন ৩ হাজার টন দরকার হয়।

উৎপাদন ও ভবিষ্যৎ।—এক্ষণে এদেশে প্রায় ২০০০ টন প্লাস্টিক দ্রব্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশ হইতে আমদানি করা প্লাস্টিক দ্রব্যের অংশ হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া আরও ৫০০ টন দ্রব্য এক্ষণে প্রস্তুত হয়। গত তিন বৎসরে ছাঁচে তৈরী প্লাস্টিক দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ এইরূপ,

সাল	লক্ষ গ্রোস
১৯৪৮	৩·৭৫
১৯৪৯	১০·১৮
১৯৫০	২২·৯৭

বর্ত্তমানে এই পরিমাণ প্লাস্টিক দ্রব্য চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং ইহার উপর প্লাস্টিক দ্রব্যের আমদানি হইলে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহার ব্যবহার এত দ্রুত বাড়িতেছে যে, এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া অনুমান করা হয়। তবে গবর্ণমেণ্ট যে ইলেকট্রিক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে দিতেছেন, এবং ইহার রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে এই শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবে। ইহার উন্নতি করিতে হইলে,—

(১) বিদেশ হইতে মূল উপাদান রজন না আনাইয়া এদেশে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) দক্ষ শিল্পী ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি আনাইয়া তাহার সাহায্যে কাজ করিতে হইবে।

(৩) বিদেশী প্লাস্টিক দ্রব্যের আমদানি রহিত করিতে হইবে।

(৪) ইলেকট্রিক দ্রব্যের আমদানি রহিত করিতে হইবে।

(৫) প্লাস্টিক দ্রব্যের পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

কুটীর-শিল্প

প্রাচীনকালে কুটীর-শিল্প।—ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে কুটীর-শিল্পে জগতে সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের দুই সহস্র বৎসর

পূর্ব্বেও যে ভারতের বস্ত্র দেশ-বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, একশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে যান্ত্রিক শিল্প বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই,—কুটীর-শিল্প-দ্রব্যই এদেশের অভাব মোচন করিত। কেবল তাহাই নহে, প্রাচীনকালে লৌহ, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্প এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্য যান্ত্রিক শিল্প ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কুটীর-শিল্প কাহাকে বলে?—কোন গৃহস্থ পরিবারে সেই পরিবারের কোন এক ব্যক্তির, বা একাধিক ব্যক্তির চেষ্টায়,—কোন প্রকার শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে,—যে-শিল্প গড়িয়া উঠে, তাহাকেই প্রধানতঃ **কুটীর-শিল্প** বলা হয়। কিন্তু এই সংজ্ঞা এক্ষণে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে;—এক্ষণে কোন পরিবার যদি বাড়ীতে কোন ছোট যন্ত্র স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎশক্তি-সাহায্যে ঐ কলে অল্প পরিমাণে কোন দ্রব্য উৎপাদন করে, তবে ঐ দ্রব্যকেও কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য বলা হইতেছে। জাপান প্রভৃতি স্থানে কোন-কোন দ্রব্য বড়-বড় কারখানায় প্রস্তুত হইলেও তাহার অংশবিশেষ কুটীরে উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে কুটীর-শিল্পের অবনতি।—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতেই এদেশে কুটীর-শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। যে-সকল কারণে এই শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহার কতকগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল;—

(১) এদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের স্বদেশের যান্ত্রিক শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে বিক্রয় করিবার জন্য, এবং শিল্প-উপাদান এদেশ হইতে স্বদেশে চালান দিবার জন্য, এদেশের কুটীর-শিল্প নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেজন্য, তাহারা কখনও আইন বলে, কখনও বা পশুশক্তিবলে এদেশের কুটীর-শিল্প নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

এইরূপে ভারতের ব্যবহার্য্য বস্ত্র, তাঁতবস্ত্রের সূতা, রেশম- ও পশম-দ্রব্য এবং ধাতু-দ্রব্য প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানি হইতে থাকে, এবং এদেশের তুলা, পাট, চা, চামড়া, ধাতুপ্রস্তর প্রভৃতি শিল্প-উপাদান, এমন কি প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাউল বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে।

(২) যান্ত্রিক শিল্পজাত দ্রব্য কুটীর-শিল্প-জাত দ্রব্য অপেক্ষা সুলভ। সেজন্য কুটীর-শিল্প প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) যান্ত্রিক শিল্পে যেমন সমবায়-প্রথায় কোম্পানি গঠিত হইয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করে, এবং কোম্পানি ব্যবসায় চালাইতে অক্ষম হইলে, যেমন সে-অর্থের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কোন দায়িত্ব থাকে না, কুটীর-শিল্পে সেরূপ হয় না। কুটীর-শিল্পের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে সুদ দিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, এবং ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইলে ঋণের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কুটীর-শিল্পের উন্নতির ইহা একটি বিশেষ অন্তরায়।

(৪) যান্ত্রিক শিল্প-কারখানা প্রস্তুত হইলে স্থানীয় কারিগরগণ অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিশ্চিত মাসিক বেতন লাভের আশায় কারখানার কার্য্যে যোগ দিয়াছিল।

(৫) প্রাচীন কালে রাজা, মহারাজা, বাদশাহ, নবাব, জমিদার ও রাজপুরুষগণের পৃষ্ঠপোষকতায় কুটীর-শিল্প উন্নতি লাভ করিত। কোন শিল্পী উচ্চমূল্যের কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিলে, তাহার খরিদ্দারের অভাব হইত না। কিন্তু এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ-দানের ক্ষমতা যে-শ্রেণীর লোকের ছিল, কালধর্ম্মে, তাহারা বিলুপ্ত হইতেছে। সুতরাং অনেকপ্রকার মূল্যবান্ কুটীর-শিল্প লোপ পাইয়াছে।

যে-শিল্পী মস্‌লিন বুনিত, এখন তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। তাজমহলের গঠন-প্রণালী এখন গবেষণার বিষয় হইয়াছে।

(৬) পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিদেশী অল্পমূল্যের দ্রব্যও সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌছিতেছে। সুতরাং গ্রামের কুটীর-শিল্পও তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আবার সহজ পরিবহনের ফলে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রাম্য শিল্পিগণের মহাজন ও দালালরূপে তাহাদের মুনফার অংশবিশেষ গ্রাস করিয়া তাহাদের লভ্যাংশ কমাইয়া দিতেছে। ইহাতে তাহাদের জীবিকার জন্য আর নিজ-নিজ শিল্পের উপর নির্ভর করা চলিতেছে না। অনেক কুটীর-শিল্প এইরূপেও উঠিয়া যাইতেছে।

এতদূর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এখনও কিছু-কিছু কুটীর-শিল্প বাঁচিয়া আছে। সকল দেশেই কুটীর-শিল্প অল্পবিস্তর বাঁচিয়া থাকেই। কারণ, যান্ত্রিকশিল্প যত লোকের জীবিকা নষ্ট করে, তত লোকের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। আবার, কখনও-কখনও কুটীর-শিল্পে যে-দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব, যান্ত্রিক শিল্পে তাহা সম্ভব নহে। ভারত অতি দরিদ্র দেশ। ইহার কতকাংশ কুটীর-শিল্পেই বাঁচিয়া থাকে। এদেশে কুটীর-শিল্পের স্থান এত উচ্চে ছিল যে, এই কুটীর-শিল্পই সম্মানজনক জীবন-যাপনের প্রধান উপায় ছিল, এবং তন্তুবায়, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি এই কুটীর-শিল্প-ক্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিগত পেশা-হিসাবে বংশপরম্পরাক্রমে এই সকল শিল্পী যে জন্মগত দক্ষতা লাভ করিত, এক্ষণে শিল্পশিক্ষালয়ে কয়েক বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়াও সে-দক্ষতা দুর্লভ। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে কোনরূপ বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে, সেই শ্রেণীর কুটীর-শিল্পী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

বর্ত্তমান কুটীর-শিল্প।—ভারতবর্ষে এখনও নানাপ্রকার কুটীর-শিল্প রহিয়াছে, এবং অত্যন্ত ন্যূনপক্ষে দুই কোটি লোক কুটীর-শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভারতের **সর্ব্বপ্রধান কুটীর-শিল্প কৃষি**। কৃষি ও কৃষকদিগকে অবলম্বন করিয়া আবশ্যকীয় নানাপ্রকার কুটীর-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন,—

কৃষি- ও কৃষক-সংক্রান্ত কুটীর-শিল্প।—**কার্পাস-সূত্র, কার্পাস-বস্ত্র, পাটের দড়ি, রেশম-বস্ত্র, পশম-সূত্র, পশমী দ্রব্য, বাঁশের দ্রব্য, বেতের দ্রব্য** প্রভৃতি চাষিগণ ও জমিশূন্য কৃষি শ্রমিকগণ তাহাদের **অবসর সময়ে নিজেদের ব্যবহারার্থ বা নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহার্থ** প্রস্তুত করে; এবং ইহাদেরই কেহ-কেহ রেশমকীট-পালন, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্য করে।

বয়নশিল্প।—উপরিলিখিত শিল্পগুলির মধ্যে বয়নশিল্পই প্রধান। তাঁতশিল্প ভারতের সকল স্টেটেই বিস্তর আছে। কারণ, যান্ত্রিক বস্ত্র নির্ম্মাণের পূর্ব্বে কুটীর-শিল্পই এদেশের বস্ত্র সরবরাহ করিত, এবং বস্ত্রের জন্য সূতা প্রস্তুত করিত। তাঁত-বস্ত্র এবং অন্য কতকগুলি মূল্যবান্ সৌখীন দ্রব্য ব্যতীত অন্য অধিকাংশ কুটীর-শিল্পদ্রব্য প্রায়ই নিজ-নিজ কেন্দ্রের জন্য প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু তাঁতবস্ত্রের বাজার বহুদূরব্যাপী ছিল। তাঁতশিল্পে ন্যূনপক্ষে এখনও দশলক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। ভারতের বয়নশিল্পে যত লোক নিযুক্ত আছে, তাহার শতকরা ৭৫ জন তাঁতশিল্পে কার্য্য করে। প্রায় কুড়ি লক্ষ তাঁতে প্রায় দুইশত কোটি গজ, অর্থাৎ প্রতি বৎসরে উৎপন্ন কাপড়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাপড় প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয়। এই তাঁতের মধ্যে শতকরা ৭৫ শতাংশ তাঁত কার্পাসবস্ত্র, ১৫ শতাংশ রেশম-বস্ত্র ও ৫ শতাংশ পশম-বস্ত্র, ১ শতাংশ রেয়ন-রেশম-বস্ত্র এবং ৪ শতাংশ অন্য-বস্ত্র-নির্ম্মাণে নিযুক্ত আছে। নানাপ্রকার বস্ত্রের মূল্য একত্র করিলে বৎসরে প্রায় ৭০ কোটি টাকার হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিক্রীত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাঁত চলে আসামে। আসামে বয়নকার্য্যে অভিজ্ঞতা স্ত্রীলোক-দিগের অন্যতম প্রধান গুণ। আসামের রেশমশিল্প প্রায় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। বঙ্গদেশে বীরভূম, মুরশিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় রেশমশিল্প এখনও খ্যাতির সহিত প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও মহীশূরও রেশমদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ফরাশডাঙ্গা, পাকিস্তানের ঢাকা, টাঙ্গাইল কার্পাস-বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। উত্তর-প্রদেশ ও কাশ্মীর, পাকিস্তানের পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উ. প. সীমান্ত প্রদেশ পশম-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

বেতের দ্রব্য, বাঁশের দ্রব্য, তালপাতার দ্রব্য প্রভৃতি অবশ্য সর্ব্বত্র হয় না। যেখানে যেরূপ কাঁচামাল পাওয়া যায় সেখানে সেইরূপ দ্রব্যই প্রস্তুত হয়। আসামে, ত্রিপুরায়, চট্টগ্রামে, পূর্ব্ববঙ্গে বেতের ও বাঁশের কাজ হয়। এলাহাবাদ ও কাশীতে বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ২৪ পরগণা ও খুলনায় ঘাসের মাদুর প্রস্তুত হয়। মেদিনীপুরে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মাদুর প্রস্তুত হয়;—তাহাকে কাটির মাদুর বলে। পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও

মালাবার অঞ্চলের খেজুর ও তালের পাতা হইতে বাক্স, পাখা, ব্যাগ প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গ্রাম্য সমাজের আবশ্যকীয় কুটীর-শিল্প।—কতকগুলি শিল্প গ্রামের লোকের নিত্যপ্রয়োজন সাধনের জন্য দরকার হয়, এবং এই সকল শিল্পজীবী গ্রাম্য সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গস্বরূপ : যেমন,—কুম্ভকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কলু প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকের জমিজমাও আছে, এবং কৃষিশিল্প ও জাতিগত শিল্প—দুই কাজই ইহারা করে। ভারতে বাটাকোম্পানি প্রভৃতি কোম্পানির কয়েকটি মাত্র চর্ম্মদ্রব্যের বৃহৎ কারখানা থাকিলেও, চর্ম্মশিল্প এখনও প্রায় মুচিজাতীয় একশ্রেণীর লোকের হস্তে আছে। প্রায় ২৪ লক্ষ লোক চর্ম্মশিল্পে নিযুক্ত আছে।

সূক্ষ্ম কুটীর-শিল্প।—তাঁতশিল্প, পশমশিল্প, রেশমশিল্প, ধাতুদ্রব্য, কাষ্ঠ- ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত খেলার দ্রব্য, গালার দ্রব্য, কাঠের দ্রব্য প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এই শ্রেণীর কতকগুলি শিল্প গ্রামের লোকের অভাব দূরীকরণের জন্য আবশ্যক হয়। কিন্তু ভাল-ভাল তাঁতবস্ত্র, গালিচা প্রভৃতি পশমদ্রব্য, উৎকৃষ্ট রেশম-বস্ত্র, পিতল ও তামার দ্রব্য, গালার ও কাচের চুড়ী প্রভৃতি কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে বা অন্যপ্রদেশে চালান দিবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। ইহার মধ্যে কয়েকটি শিল্পদ্রব্য বিদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভাল গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়—কাশী, মির্জাপুর, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রামে। পিতল ও কাঁসার দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ। গালার দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত বিহার ও ছোটনাগপুর। কাচের চুড়ীর প্রধান স্থান—উত্তর-প্রদেশের কয়েকটি গ্রাম। এই সকল শিল্পদ্রব্যের অনেকগুলি ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য সহরে কারখানা স্থাপন করা হয়।

বৃহৎ শিল্প ও কুটীর-শিল্প।—বর্ত্তমান ভারত সরকার কুটীর-শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং একটি বোর্ড নিযুক্ত করিয়া এ-সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাইয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু **কুটীর-শিল্পের আদৌ প্রয়োজন আছে কি? এজন্য অর্থব্যয় ও পরিচেষ্টার কোন সার্থকতা আছে কি?** কাহারও-কাহারও মতে এই বৃহৎ শিল্পের যুগে কুটীর-শিল্পের কোন স্থান নাই,—যেখানে বৃহৎ শিল্পের কারখানায় প্রতিদিন রাশি-রাশি শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, সেখানে ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় ফল কি?—বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু এই সকল বৃহৎ শিল্পের এই হিতৈষী সম্প্রদায় ভাবিয়া দেখেন না যে, এক-একটি বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে, কতশত শ্রমিক নিরন্ন হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট এই সকল নিরন্ন ব্যক্তির কিরূপে অন্ন সংস্থান করিতে পারিবেন! তাঁহারা আরও ভাবিয়া দেখিবেন,

কোন দেশই আজও যান্ত্রিক শিল্পে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পারে নাই। কুটীর-শিল্প মরে না, কোথাও মরে নাই। সমাজ-রক্ষণে ইহা অবশ্যম্ভাবী। যান্ত্রিক শিল্পের অন্যতম ধুরন্ধর গ্রেটবৃটেনে বহু সহস্র ব্যক্তি এখনও গৃহে থাকিয়া ক্ষুদ্র শিল্প অবলম্বনে জীবন যাপন করে। চর্ম্মশিল্প, ছুরিকাঁচি-শিল্প, পশমশিল্প, সীবনশিল্প, লেসশিল্প প্রভৃতি বহু শিল্প এখনও এক-একটি পরিবারের জীবনোপায়-স্বরূপ। পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্বত্রই এক্ষণে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে কুটীর-শিল্পের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। কুটীর-শিল্প জাপানের গৌরবের বস্তু। সুতরাং কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, সেই বিষয়েই সচেষ্ট হওয়া উচিত। বরং যাহাতে কুটীর-শিল্প যুগোপযোগী উন্নতপথে কর্ম্মপ্রণালী প্রবাহিত করিতে পারে, সেবিষয়ে মনোযোগী থাকা দরকার।

ভারতে কুটীর-শিল্প।—ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ ;—তাহার লোকসংখ্যাও অত্যন্ত বেশী ;—কুটীর-শিল্প এখানে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ;—এখানকার শিল্পী শিল্পদক্ষ, এবং কালোপযোগী পরিবর্ত্তন সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। শিল্প--উপকরণ এখানে চেষ্টা করিলেই সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু ইহার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সুব্যবস্থা করা দরকার ;—

(১) **অর্থ-সাহায্য।**—দরিদ্র শিল্পিগণ যাহাতে শিল্প-উপকরণ সংগ্রহের জন্য সহজেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে,—এজন্য তাহাদের যাহাতে কোন মহাজনের হাতে না পড়িতে হয়, বা কোনরূপ জামানত না দিতে হয়, সেজন্য সমবায়-সমিতি, বা সমবায়--ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়-সমিতি স্থাপন করা উচিত। এইরূপ ব্যাঙ্ক বা সমিতি যেন আবশ্যক--মত গবর্ণমেণ্টের নিকট সহজে অর্থসাহায্য পাইতে পারে।

(২) **শিল্প-উৎপাদন-দ্রব্য।**—শিল্পীরা যাহাতে সহজে উন্নত ধরণের কাঁচামাল প্রয়োজনমত পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বর্ত্তমান সময়ে সূতার অভাবে অনেক তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতে পারে না,—তাহারা আবশ্যক পরিমাণে বা প্রয়োজনানুরূপ সূতা পায় না। সুতরাং শিল্প-উপকরণ-সরবরাহের সুব্যবস্থা দরকার।

(৩) **শিক্ষা।**—ভারতের শিল্পী নিরক্ষর,—সুতরাং কূপমণ্ডুকস্বরূপ ;—তাহারা নিজ-নিজ শিল্পসম্বন্ধে কোথায় কিরূপ উন্নতি হইল, কোথায় চাহিদা বাড়িল, কোথায় কিরূপ মূল্য কমিতেছে, বাড়িতেছে,—এ-সকল বিষয়ে কোন সংবাদই রাখে না। একারণ তাহাদিগের জন্য শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, সাধারণ শিক্ষা, ও শিল্প-প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) **বাজার।**—শিল্পিগণ যাহাতে বাজারে জিনিষ বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত

পারিশ্রমিক পাইতে পারে এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এজন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সমবায়-বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করা ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা উচিত।
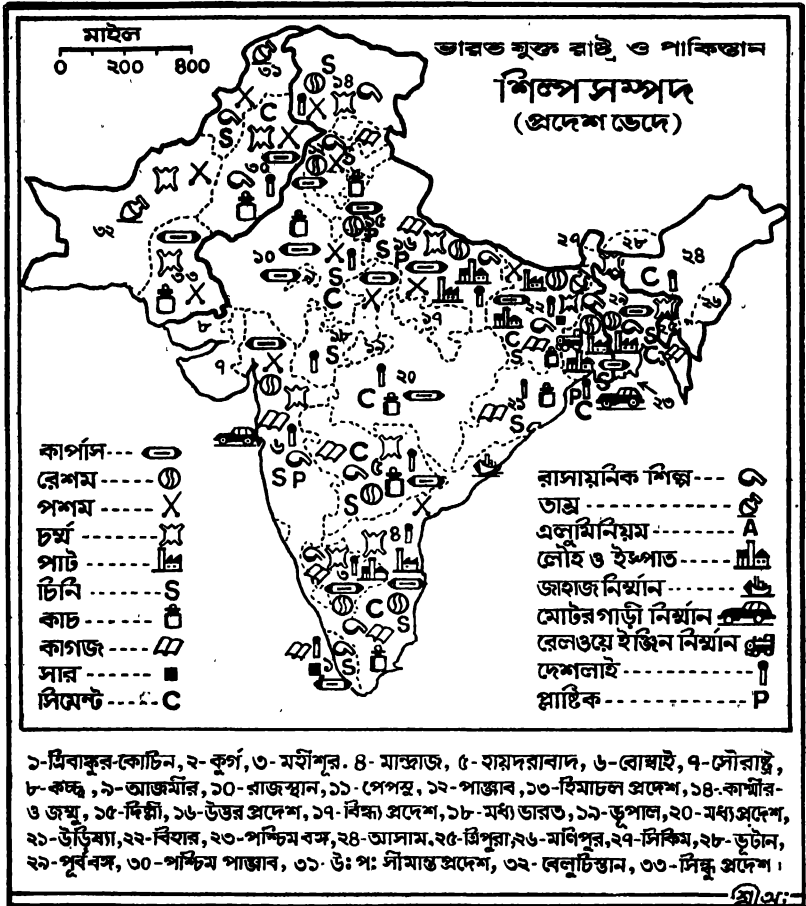
৫৭নং চিত্র

(৫) প্রদর্শনী।—দেশের শিল্পদ্রব্যের প্রচারার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাময়িক ও স্থায়ী প্রদর্শনী করা উচিত।

(৬) শক্তি-বিনিয়োগ।—যাহাতে বিদ্যুৎশক্তি সুদূর গ্রামে ও শিল্পাঞ্চলে সুলভে পাওয়া সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই শক্তির সাহায্যে গৃহস্থ-ঘরে ক্ষুদ্রভাবে যদি যান্ত্রিক শিল্প গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কুটীর-শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে।

(৭) পরিপূরক শিল্প।—কতকগুলি শিল্প কোন বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক স্বরূপ হওয়া উচিত। ঘড়ি, সাইকেল, গাড়ী প্রভৃতি যখন, বৃহৎ কারখানায় প্রস্তুত হয়, তখন তাহাদের কোন-কোন অঙ্গ যদি কুটীরশিল্পরূপে প্রস্তুত হয়, তবে উভয়ের পক্ষেই বিশেষ সুবিধা হয়।

(৮) রক্ষণ-শুল্ক।—কুটীর-শিল্প যদি আমদানি মালের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে না পারে, তবে রক্ষণ-শুল্ক বসাইয়া তাহাকে রক্ষা করা উচিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরিবহন-ব্যবস্থা

আদিকথা।—দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে পরিবহনের সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কি শিল্পোন্নতি, কি বাণিজ্যের প্রসারতা, কি দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনারোধ, অথবা কি রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা,—এই সমস্তই পরিবহনে সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে দেশের পরিবহন-ব্যবস্থা সমাহিত হয়,—

(১) **রেলপথ**
(২) **স্থলপথ**
(৩) **বিমানপথ**
(৪) **নদীপথ**

১। রেলপথ।—পৃথিবীর ইতিহাসে ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে ব্রাসেলটন হইতে স্টকটন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রথম যাত্রীবাহী রেলপথ স্থাপিত হয়, এবং পরে বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ অনুভূত হয়। ইহার পর হইতে ভারতসরকারও ভারতবর্ষে রেলপথ-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছিলেন। সেজন্য তিনটি প্রধান বন্দর ও তিনটি প্রেসিডেন্সির তিনটি প্রধান সহর অবলম্বন করিয়া ১৮৪৮ সালে ভারতে সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষামূলক খণ্ড রেলপথ সংস্থাপিত হয়। সেই তিনটি রেলপথ,—(১) বোম্বাই হইতে কল্যাণ,—গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ,—৩২ মাইল; (২) কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ,—দৈর্ঘ্যে ১২০ মাইল; (৩) মান্দ্রাজ হইতে আর্কোনাম,—মান্দ্রাজ রেলপথ,—৩৯ মাইল।

কিন্তু দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া ভারতবর্ষে রেলপথ-বিস্তারের কল্পনা হয়—

১৮৫৩ সালে। ঐ বৎসর তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারাল লর্ড ডালহৌসি এদেশে রেলপথ বিস্তারের জন্য এক আলোচনা-লিপি (minute) বিলাতে প্রেরণ করেন। এই স্মরণীয় লিপিতে তিনি বিশেষভাবে জানাইয়াছিলেন—(১) প্রেসিডেন্সিগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত যোগস্থাপনের জন্য, এবং (২) ভারতের অভ্যন্তর ভাগের সহিত বন্দরগুলির সংযোগসাধনের জন্য, দীর্ঘ রেলপথের দরকার। এইরূপ পরিকল্পনার ঐ সময়ে প্রয়োজনও ছিল। কারণ, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ,—ইহার কৃষিদ্রব্য ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি করিতে হইলে কৃষিকেন্দ্র হইতে বন্দরের সংযোগ দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্য অংশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভারতে বিক্রয় করিতে হইলে বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরের সহিত সংযোগ দরকার। সেজন্য বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনায় সহজেই সম্মতি দান করিলেন। শীঘ্রই আর এক ঘটনায় মহাদেশপ্রতিম ভারতবর্ষে রেলপথ-বিস্তারের আশু প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বে স্বীকৃত হইল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহকালে সৈন্য-চলাচলের অসুবিধা বিশেষভাবে অনুভূত হইল। সুতরাং অবিলম্বেই রেলপথ বিস্তার করা স্থিরসিদ্ধান্ত হইল।

কিন্তু রেলপথ-বিস্তারের জন্য এদেশে অর্থ সংগ্রহ করা তখন সম্ভবপর ছিল না। গবর্ণমেণ্টও তখন এত বেশী টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম ছিলেন না। সেজন্য কয়েকটি ইংরাজ যৌথ কোম্পানিকে বিস্তর সুবিধা দান করিয়া এই কার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। স্থির হইল,—

(১) গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত সর্ত্তাধীনে কোম্পানি জনসাধারণকে রেলগাড়ী ব্যবহার করিতে দিবেন, এবং মূল্যের হার বদলাইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইবেন।

(২) যে-স্থানের উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট কোম্পানিকে বিনামূল্যে ব্যবহার করিতে দিবেন।

(৩) কোম্পানির মূলধনের উপর শতকরা ৫৲ অপেক্ষা কম লাভ হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিয়া দিবেন, কিন্তু কোম্পানি অংশীদারগণের নিয়োজিত ধনমূলের উপর শতকরা ১০৲ টাকার বেশী ডিভিডেণ্ড দিলে গবর্ণমেণ্ট মাশুল কমাইয়া দিতে পারিবেন।

(৪) গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তের তারিখ হইতে প্রতি ২৫ বৎসর পরে কোম্পানির অংশগুলির তৎকালীন হারে মূল্য দিয়া রেল কোম্পানির স্বত্ব খরিদ করিয়া লইতে পারিবেন।

এতদনুসারে ১৮৫৯ সালে নিম্নলিখিত ৮টি কোম্পানি এদেশে পাঁচ হাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার পান,—

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

(২) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ কোম্পানি

(৩) ইণ্ডিয়ান ব্রাঞ্চ কোম্পানি (পরিশেষে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথ)

(৪) সিন্ধু-পাঞ্জাব-দিল্লী রেলপথ কোম্পানি (পরিশেষে নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ)

(৫) গ্রেট সাদার্ণ ইণ্ডিয়া কোম্পানি (পরিশেষে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ)

(৬) গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনস্থলা রেলপথ কোম্পানি

(৭) মান্দ্রাজ রেলপথ কোম্পানি

(৮) বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারত কোম্পানি

ইহার পরে আরও চারিটি কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল.—

(৯) ইণ্ডিয়ান মিড্ল্যাণ্ড (Indian Midland) ১৮৮২—১৮৮৫ ;—ইহা পরিশেষে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেলপথের সহিত যুক্ত হয়।

(১০) বেঙ্গল-নাগপুর কোম্পানি ১৮৮৩—১৮৮৭

(১১) সাউদার্ণ মহারাট্টা কোম্পানি ১৮৮২

(১২) আসাম-বেঙ্গল রেলপথ কোম্পানি ১৮৯১

ইহার পরে দেশীয় রাজ্যের মধ্যে হায়দারাবাদ, মহীশূর, বিকানীর ও যোধপুর রাজ্যের রেলপথগুলি, এবং কয়েকটি ছোট-ছোট রেলপথ গঠিত হইয়াছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে ক্রমশঃ ১৮৮৪ সালে ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথ, ১৮৮৫ সালে সিন্ধু-পাঞ্জাব-দিল্লী রেলপথ, ১৮৮৮ সালে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলপথ, ১৮৯০ সালে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ, এবং ১৯০০ সালে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেলপথ গবর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়া লন ; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিজের সম্পত্তি হইলেও এই সকল রেলপথ কোম্পানিরই পরিচালনাধীনে থাকে। ক্রমশঃ কোম্পানির পরিচালনার বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল হইয়া উঠে। ইহাতে ১৯২৩ সালে সমগ্র রেলপথগুলিকে রাষ্ট্রগত ও রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন করিবার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ রেলপথগুলি রাষ্ট্রসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন হইয়াছে। ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে কোন কোম্পানি--পরিচালিত বড় রেলপথ ভারতে নাই।

বিভক্ত ভারতের রেলপথ।—ভারত-বিভাগের পর ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে রেলপথগুলির যে-অংশ পড়িয়াছে তাহা সেই রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে। ভারত-বিভাগের ফলে তিনটি মাত্র রেলপথের কতকাংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে,—(১) উত্তর-পশ্চিম রেলপথের (North-Western Ry.) ৬৮৮১½ মাইলের মধ্যে ৫০২৬ মাইল ; (২) আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ৩৫৫৫ মাইলের মধ্যে

১৬১৩ মাইল; এবং (৩) যোধপুর-হায়দারাবাদ রেলপথের ১১২৬ মাইলের মধ্যে ৩১৯ মাইল পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের যে-অংশ ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে তাহার কতকাংশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত, কতক আউধ-ত্রিহুত রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছিল এবং কিয়দংশ আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ভারত-যুক্ত-রাষ্ট্রের অংশের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ভারত-যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশের নাম হইয়াছিল আসাম রেলপথ। ভারত বিভাগের পর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ৩৩,৯৮৪ মাইল এবং পাকিস্তানের অধীনে ৬,৯৫৮ মাইল রেলপথ আসিয়াছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান-প্রধান রেলপথ

(১) বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ (B.-N. R.)।—ইহার দৈর্ঘ্য ৩৩৮০ মাইল। ইহার একটি প্রধান পথ কলিকাতা হইতে নাগপুর, অপরটি ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছে। খড়্গপুর হইতে ইহার একটি শাখা আদ্রা হইয়া গোমো পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার আরও কয়েকটি শাখা আছে। সুতরাং এই পথে কলিকাতা বন্দরে ও নূতন জাহাজ-নির্ম্মাণ-বন্দর ভিজাগাপত্তনে মাল যাতায়াতের কাজ চলে। ইহার আদ্রা শাখা বিহারের ও উড়িষ্যার লৌহ, ও মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মান্দ্রাজের উপর দিয়া চলিয়াছে এবং ব্যবসায় ও শিল্প সম্পর্কে ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী।

(২) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ (E. I. R.)।—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মনিরত রেলপথ,—ইহার দৈর্ঘ্য ৪৩৫০ মাইল। ইহার প্রধান পথ কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং ভারত-বিভাগের ফলে ভূতপূর্ব্ব আসাম-বেঙ্গল রেলপথের মোটামুটি কলিকাতা (শিয়ালদহ) হইতে বাণপুর ও দর্শনা ষ্টেশনের মধ্যস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত অংশ,—শিয়ালদহ হইতে বনগাঁ পর্য্যন্ত অংশ, বনগাঁ-রাণাঘাট শাখা, এবং শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং ও বজবজ পর্য্যন্ত শাখাগুলি ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-প্রদেশ দিয়া ইহা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লাক্ষেত্র, ও শিল্পাঞ্চল ও বিহারের গিরিধি অঞ্চলের অভ্রক্ষেত্র এই রেলপথে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন-নির্ম্মাণ কারখানা ও ডালমিয়া নগর, কানপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি শিল্পস্থান এই রেলপথের উপরে অবস্থিত। আবার গাঙ্গেয় উপত্যকার কৃষিপ্রধান ও লোকবহুল অঞ্চল দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়াছে। সেজন্য ইহা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেলপথ। অভ্র, কয়লা, সিমেণ্ট, চিনি, পাট, চা,

চাউল, গম, তৈলবীজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি ও কলিকাতার বন্দরের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য এই পথে যাতায়াত করে।

(৩) **আসাম রেলপথ** (A.R.)।—১২৪৭ মাইল দীর্ঘ। আসামের পাণ্ডু হইতে তিনসুকিয়া হইয়া সৈখোয়াঘাট পর্য্যন্ত ও অপরদিকে লেডো পর্য্যন্ত ও অপর দিকে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত অংশ, আসামের দক্ষিণের তুল্লাবচেরা, বা লালাঘাট, বা মহিষাসান হইতে উত্তর দিকের অংশ, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত গিতালদহ হইতে উত্তরদিকের ও পূর্ব্বদিকের আসামের অন্তর্গত অংশ, এবং চাংড়াবান্ধা হইতে উত্তরদিকের অংশ ইহার অন্তর্ভূক্ত। আসামের খনিজ তৈল, চা, চূণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি ইহার রপ্তানি-দ্রব্য।

(৪) **আসাম সংযোজক রেলপথ** (Assam Link Rail)।—ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের রেলপথ,—উত্তরাংশের রেলপথ ও আসামের রেলপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সংযোগ পুনরায় গঠনের জন্য কিষণগঞ্জ ও শিলিগুড়ির মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ মাপের পথকে মধ্যম মাপে পরিবর্ত্তন ও স্থানে-স্থানে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাতে আসাম রেলপথের সহিত আউধ ও ত্রিহুত রেলপথের সংযোগ হইয়াছে। এই পথটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। একেত আসামের আমদানি ও রপ্তানির অন্য রেলপথ নাই, অন্যতঃ,—সীমান্ত প্রদেশ আসামকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সৈন্য চলাচলের এই পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই।

(৫) **ইষ্ট পাঞ্জাব রেলপথ** (E.P.R.)।—উত্তর-পশ্চিম রেলপথের ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশের এই নাম হইয়াছিল;—এক্ষণে ইহার নাম **পাঞ্জাব রেলপথ**;—ইহার দৈর্ঘ্য এক্ষণে ২৭৯৭·৮২ মাইল। ইহা পূর্ব্বপাঞ্জাবের রেলপথ,—ইহা এখানকার শিল্পাঞ্চলগুলির সহিত দিল্লীর সংযোগ সাধন করিতেছে। ইহার এক প্রধান লাইন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শেষ ষ্টেশন সাহারাণপুরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পথটি সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

(৬) **বোম্বাই-বরোদা ও সেন্‌ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ** (B.B. & C.I.)।—ইহা বোম্বাই, রাজপুতানা ও উত্তর-প্রদেশে জাল বিস্তার করিয়াছে। ইহা বোম্বাই বন্দরকে সুরাট, বরোদা, আমেদাবাদ, দিল্লী, মথুরা ও আগ্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৪০৪ মাইল। আমেদাবাদ প্রভৃতি কার্পাস শিল্পাঞ্চলের সহিত ইহার যোগ আছে। মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থস্থান, এবং আগরা, দিল্লী, আবুপাহাড়, জয়পুর, আজমীঢ় প্রভৃতি স্থানে এই রেলপথযোগে যাওয়া যায়। তুলা, তুলাদ্রব্য, বাজরা, জোয়ার এই পথের প্রধান রেলপথে যাতায়াতের দ্রব্য।

(৭) **আউধ ও ত্রিহুত রেলপথ** (O.T.R.)।—ইহা প্রধানতঃ গঙ্গার

উত্তরে বিহার ও উত্তর-প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে, এবং কাটিহার জংশন হইতে বরাবর গঙ্গার উত্তর দিক্ দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। ইহার এক শাখা গঙ্গা পার হইয়া কানপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বেনারস, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের সহিত ইহার সংযোগ আছে। উত্তর-ভারতে পণ্য এই পথে বাহিরে যায়। চিনি, ইক্ষু, তৈলবীজ ইহার চালানী দ্রব্য। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৯৫৭ মাইল।

(৮) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (G.I.P.R.)।—ইহা ভারতের সর্ব্বপ্রথম রেলপথ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেলপথ। ইহা উত্তরে এলাহাবাদ, কানপুর, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর, আগরা, মথুরা ও দিল্লী যোগ করিয়াছে। এই সকল স্থান হইতে বোম্বাই যাওয়া যায়। বোম্বাই হইতে ইহার প্রধান পথ তিনটি,—প্রথমটি গিয়াছে দিল্লী, দ্বিতীয়টি—নাগপুর, তৃতীয়টি—রায়চুর। বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ইহার গতিপথে অবস্থিত। তাই গম- ও কার্পাস-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ইহার পথ। সেজন্য কার্পাস তুলা, তুলার দ্রব্য ইহার পরিবহন-দ্রব্য। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৬১৭ মাইল। ভিক্টোরিয়া টারমিনাস হইতে কুরিয়া পর্য্যন্ত এই পথে প্রথম বিদ্যুৎ--শক্তিতে রেলগাড়ী চলে।

(৯) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ (S.I.R.)।—দক্ষিণ মান্দ্রাজের সমস্ত বন্দর ও প্রধান সহরের সহিত পরস্পরের যোগসাধন, এবং পণ্যবিতরণ ইহার কার্য্য। সুতরাং চা, কফি, রবার, তামাক, মশলা, নারিকেল, সুপারী, চীনাবাদাম, রেশমী ও পশমী বস্ত্র ও মৎস্য প্রভৃতি এই রেলপথে যাতায়াতের পণ্য। ইহার এক শাখা ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে সিংহল যাওয়া যায়। ইহার দৈর্ঘ্য ২৩৫০ মাইল।

(১০) মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাট্টা রেলপথ (M. & S. M. R.)।—ইহা মান্দ্রাজ হইতে দাক্ষিণাত্যের উত্তর-ভাগে অবস্থিত। ইহা উত্তর-পশ্চিম দিকে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কালিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভাগের ছোট-ছোট বন্দরগুলির সহিত অভ্যন্তর ভাগের যোগসাধন করিতেছে। মান্দ্রাজ ও কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই রেলপথ বিস্তৃত। সেজন্য ইহার পরিবহন-পণ্য প্রধানতঃ—কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের নারিকেল, কফি, মশলা ; মান্দ্রাজ অঞ্চলের বাজরা, রাগী, তৈলবীজ, তামাক, চীনাবাদাম, রেড়ীর বীজ, কাঁচা ও পাকা চামড়া, নেলোর অঞ্চলের অভ্র। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯৩৮ মাইল।

এগুলি ব্যতীত, বিকানীর (৮৮৩ মা.), যোধপুর (৭৩৮ মা.), হায়দারাবাদ (১৩৮৪ মা.) ও মহীশূর (৭৩৮ মা.) রাজ্যের রেলপথ আছে। এই সকল রাজ্যের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৭৫৬০ মাইল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চারিটি পার্ব্বত্য রেলপথ

আছে ঃ—(১) সাউথ ইণ্ডিয়া রেলপথের অংশ **নীলগিরি পর্ব্বত রেলপথ,** (২) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথের অংশ **ম্যাথেরান পাহাড় রেলপথ,** (৩) **দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ,** ও (৪) পাঞ্জাব রেলপথের অংশ **কাল্‌কা--সিমলা রেলপথ।**

পাকিস্তানের রেলপথ

১। **উত্তর-পশ্চিম রেলপথ।**—ইহার দৈর্ঘ্য ৫০২৬ মাইল। ইহার সহিত যোধপুর-হায়দরাবাদ রেলপথের ৩১৯ মাইল যুক্ত হইয়া এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য হইয়াছে ৫৩৪৫ মাইল। ইহাই পশ্চিম-পাকিস্তানের একমাত্র রেলপথ। করাচী বন্দরের সহিত ইহা যুক্ত। সেজন্য বৈদেশিক বাণিজ্য এই রেলপথেই চলে। কিন্তু সীমান্ত রক্ষার জন্য ইহার প্রযোজনীয়তা বেশী।

২। **ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ।**—ইহার দৈর্ঘ্য ১৬১৩ মাইল। ইহার এক অংশ পদ্মার পূর্ব্ব পারে, অপর অংশ পশ্চিম পারে। পূর্ব্বপারের অংশের সহিত চট্টগ্রাম বন্দরের যোগ আছে। কিন্তু পশ্চিম পারে কোন উল্লেখযোগ্য বন্দর নাই। তবে ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি পাট-বিক্রয়ের কেন্দ্রগুলি এই রেলপথে অভ্যন্তরের সহিত যুক্ত। অভ্যন্তরের বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য এই রেলপথেই চলে।

রেলপথ সম্বন্ধে নানাকথা

রেলপথ নির্ম্মাণে ভারতের স্থান।—নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, রেলপথের দৈর্ঘ্য (মাইল) হিসাবে পৃথিবীতে ভারতের স্থান ষষ্ঠ—

আ. যুক্তরাষ্ট্র	২,৩৭,৭৯৮	ফ্রান্স	৪০,৩৪৮
সো. রুশিয়া	৬৬,০০০	জার্ম্মানি	৩৬,২৫৬
ক্যানাডা	৪২,৯৭৯	ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৩৩,৯৮৪

রেলের পাটির ব্যবধানের শ্রেণীভেদ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এবং পাকিস্তানে যে-রেলপথ আছে, তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে। রেলপথের দুই পাটির ব্যবধান হিসাবে রেলপথ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—

১। প্রশস্ত মাপের (Broad Gauge) পথ— ব্যবধান—৫′ ৬″
২। মধ্যম মাপের (Metre Gauge) পথ— „ —৩′ ৩$\frac{3}{8}$″
৩। সঙ্কীর্ণ „ (Narrow Gauge) „ — „ —২′ ৬″

রেলপথের শ্রেণীভেদ।—যে-সমস্ত রেলপথের মোট উপার্জ্জন বার্ষিক ৫০ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ টাকা, তাহারা **প্রথম শ্রেণী**ভুক্ত ; যাহাদের আয় ১০ হইতে ৫০

লক্ষ পর্য্যন্ত টাকা, তাহারা **দ্বিতীয় শ্রেণী**ভুক্ত ; এবং যাহাদের উপার্জ্জন ১০ লক্ষের নিম্নে তাহারা **তৃতীয় শ্রেণী**ভুক্ত।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—

প্রথম শ্রেণীর রেলপথ—৩০২৩৭ মা.
দ্বিতীয় শ্রেণীর „ —২৬৫৩ মা.
তৃতীয় শ্রেণীর „ —১০৯৪ মা.

রেলপথ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য।—প্রধানতঃ তিন উদ্দেশ্যে রেলপথ বিস্তার করা হয়,—(১) বাণিজ্য ও শিল্প-বিস্তার, (২) দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ, ও (৩) দেশ—বিশেষতঃ সীমান্ত—রক্ষণ।

গাঙ্গেয় উপত্যকার রেলপথ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র রেলপথের মোটামুটি শতকরা ৫০ ভাগ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত। ইহার কারণ এই যে,—

(১) গাঙ্গেয় উপত্যকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত, নদনদী ও খনিত খালের জন্য কৃষিদ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়,—সেজন্য লোক-বসতি এখানে খুব ঘন। এই লোক-চলাচলের ও কৃষিদ্রব্য-চলাচলের জন্য এ-অঞ্চলে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বেশী।

(২) গাঙ্গেয় উপত্যকা হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যে সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত। সমতলক্ষেত্রে রেলপথ-বিস্তার সহজসাধ্য ও অল্প ব্যয়সাধ্য।

(৩) রেলপথ-বিস্তারের পূর্ব্বে গঙ্গা ও তাহার উপনদীগুলি অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চল বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হইয়াছিল।

(৪) উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ সহর ও নগর গঙ্গানদীর সন্নিধানেই অবস্থিত। সেজন্যও রেলপথের আবশ্যকতা এখানে বেশী।

(৫) গঙ্গা-উপত্যকার পার্শ্বেই ভারতের খনি-অঞ্চল ও শিল্প-অঞ্চল অবস্থিত। শাখাপথ দ্বারা ঐ অঞ্চল উপত্যকার রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে বলিয়া বন্দরে যাইবার সুবিধা হইয়াছে।

(৬) ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা এই সমতল গাঙ্গেয় উপত্যকার এক পার্শ্বেই অবস্থিত। এই হেতু গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে ও রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতের রেলপথ।—দক্ষিণ-ভারত মালভূমি,—ইহা সমতল নহে,—বন্ধুর ;—ইহার উচ্চতা পদে-পদে পরিবর্ত্তিত হয়, অভ্যন্তরভাগ হইতে সমুদ্রোপকূলে ও বন্দরে যাইতে হইলে পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। এ-অঞ্চলে কৃষিশস্য ও শিল্পদ্রব্য থাকিলেও, উহাদের শ্রীবৃদ্ধি উত্তর-ভারত অপেক্ষা কম। এই

সকল কারণে দক্ষিণ-ভারতে রেলপথ-বিস্তার সহজ নয়,—ইহা ব্যয়সাধ্য ;—**সমতল-ক্ষেত্রের মত সরল রেলপথ** এখানে দুর্লভ, এবং পর্ব্বতপথ **কাটিয়া** ও নানা **কৌশল** অবলম্বন করিয়া এখানে রেললাইন বসাইতে হয়।

রেলপথ-অঞ্চল (Zone)।—ভারতবর্ষে রেলপথ-বিস্তার সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় নাই। সাধারণতঃ বৃটেনের বাণিজ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়াই এদেশে রেলপথ-বিস্তার করা হইয়াছিল। এজন্য দেখা যায়, বন্দরের নিকটেই রেলপথের সমাবেশ বেশী, এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা আছে। এই সকল রেলপথের বিলিব্যবস্থা করারও অসুবিধা বিস্তর। রেলপথগুলির বিভিন্ন সত্তার জন্যও বিস্তর অসুবিধা ছিল। সেজন্য দেশের বিভিন্ন আইনসভা, বণিক্ প্রতিষ্ঠান এবং রেল-কর্ম্মচারিগণের সমিতি,—রেলপথগুলিকে মিলিত করিয়া কয়েকটি মাত্র রেলপথে পরিণত করিবার আবেদন করেন। এজন্য ১৯৩৬ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রেলপথের সমস্যা আলোচনার জন্য ওয়েজউড্ সাহেবের অধীনে একটি কমিটি বসান। সেই কমিটির কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে বর্ত্তমান ভারত গবর্ণমেণ্ট রেলপথ-সমস্যা সমাধানের জন্য আবার কমিটি নিয়োগ করেন। অনেক আন্দোলন ও আলোচনার পরে রেলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সম্মতিক্রমে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথগুলি ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছোট সীমাবদ্ধ অঞ্চল,—মোটামুটি ৫০০০ মাইল রেলপথ লইয়া গঠিত। আশা করা যায়—এইরূপ আঞ্চলিক বিভাগ বশতঃ পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পাইবে, পরিচালন-দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক আর্থনীতিক নির্ভরতা কমিয়া যাইবে।

রেলপথের আঞ্চলিক বিভাগ

(১) প্রথম অঞ্চল—**উত্তর রেলপথ**—ইহাতে আছে—(ক) সমস্ত পূর্ব্ব-পাঞ্জাব রেলপথ, (খ) ভূতপূর্ব্ব ই. আই. রেলপথের লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ ও এলাহাবাদ বিভাগ, (গ) যোধপুর ও বিকানীর রেলপথ, (ঘ) পশ্চিম রেলপথের দিল্লী-রেওয়ারি-ফজিলকা শাখা, (ঙ) বি. বি. সি. আই. রেলপথের গারুহি-হারসারু-ফরুকনগর শাখা। ইহার প্রধান আপিস **দিল্লী**।

(২) দ্বিতীয় অঞ্চল,—**পশ্চিম রেলপথ** (Western Railway)—ইহাতে আছে—(ক) বি. বি. সি. আই. রেলপথের আগরা হইতে কানপুর ব্যতীত মধ্যম মাপের রেলপথ, (খ) সৌরাষ্ট্র, (গ) জয়পুর, (ঘ) রাজস্থান ও (ঙ) কচ্ছ রেলপথ। ইহার সদর আপিস **বোম্বাই**।

(৩) তৃতীয় অঞ্চল—**মধ্য রেলপথ** (Central Railway)—ইহাতে আছে —(ক) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথ, (খ) ঢোলপুর স্টেট রেলওয়ে, (গ) নিজাম স্টেট রেলওয়ে, ও (ঘ) সিন্ধিয়া স্টেট রেলপথ। ইহার সদর আপিস **বোম্বাই**।

৫৮নং চিত্র
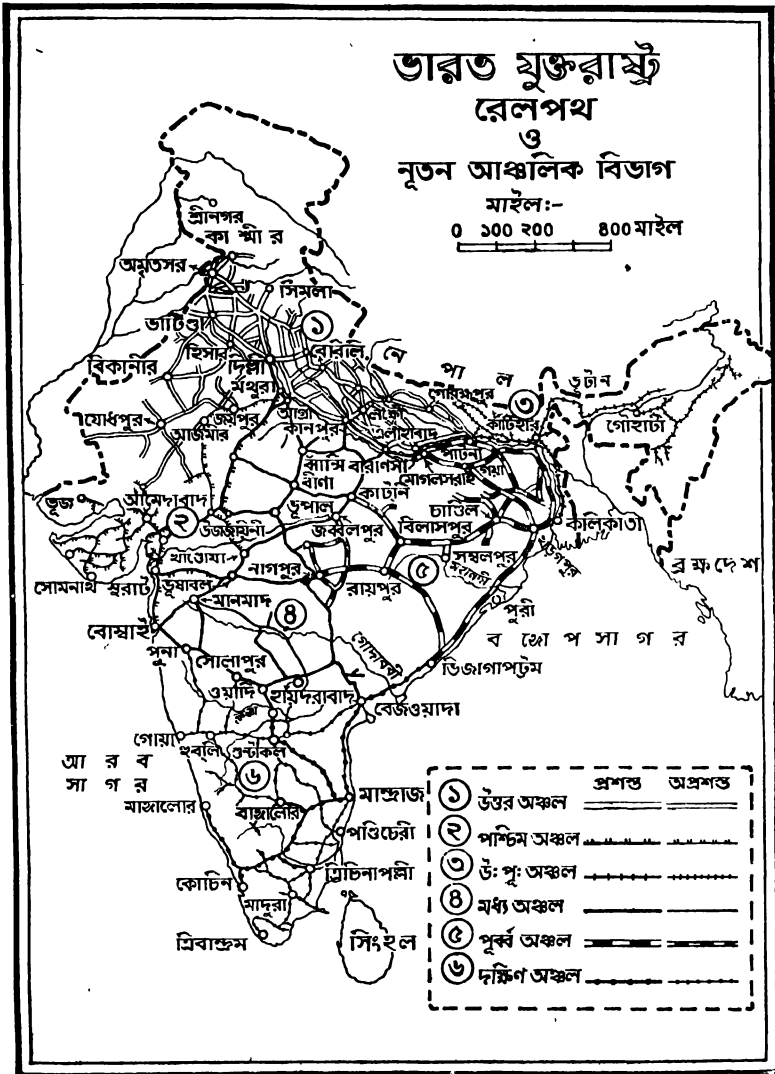
(৪) চতুর্থ অঞ্চল—**দক্ষিণ রেলপথ**—ইহাতে আছে—(ক) সাউথ ইণ্ডিয়ান

রেলপথ, (খ) মান্দ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলপথ, ও (গ) মহীশূর রেলপথ। ইহার সদর আপিস **মান্দ্রাজ।**

(৫) পঞ্চম অঞ্চল—**পূর্ব্ব রেলপথ** (Eastern Railway)—ইহাতে আছে—(ক) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের হাওড়া হইতে মোগলসরাই, (খ) বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সম্পূর্ণ অংশ ও (গ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শিয়ালদহ শাখা। ইহার সদর আপিস **কলিকাতা।** এই রেলপথ কলিকাতা ও বিশাখাপত্তন—এই দুই বন্দরের সহিত যুক্ত এবং লৌহ ও কয়লা খনি-অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত।

(৬) ষষ্ঠ অঞ্চল—**উত্তর-পূর্ব্ব রেলপথ** (North-Eastern Railway)—ইহাতে আছে—(ক) সমগ্র অযোধ্যা ও ত্রিহুত রেলপথ, (খ) সমগ্র আসাম রেলপথ, (গ) বি, বি. ও সি. আই. রেলপথের আগরা ফোর্ট হইলে কানপুর এবং মথুরা-বৃন্দাবন শাখা, ও (ঘ) দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ। ইহার সদর আপিস **গোরক্ষপুর।**

অঞ্চল বিভাগকালে লক্ষীভূত বিষয়।—অঞ্চল বিভাগকালে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে,—

(১) অঞ্চলটি যেন একটি সংহত অঞ্চল হয়।

(২) ইহার আযতন যেন খুব ছোট না হয়। মোটামুটি ৫০০০ মাইলের কম না হওয়াই উচিত; কারণ, প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রে রেলপথসংক্রান্ত কার্য্যে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী, উচ্চ অঙ্গের কারখানা ও গবেষণাগার প্রভৃতি রাখিয়া তাহা পোষণ করার ক্ষমতা যেন ঐ অঞ্চলের থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের রেলপথ,—চিত্তরঞ্জন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বিশেষতঃ ভারত-বিভাগের ফলে এদেশে রেলগাড়ী চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব হইয়াছিল। অভিজ্ঞ মুসলমান রেলকর্ম্মচারী পাকিস্তানে চলিয়া গিযাছিল, ১৯৩৮-'৩৯ সালের রেলযাত্রী অপেক্ষা ঐ সময়ে যাত্রী দ্বিগুণ হইয়াছিল, কিন্তু রেলগাড়ীর বহন-ক্ষমতা ১৪·৫% কমিয়া গিয়াছিল *। এজন্য দেশের মধ্যে যতদূর সম্ভব রেলসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং বিদেশে ৮৬৩ খানি ইঞ্জিনের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট উহাতেই নিশ্চিন্ত না থাকিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমায় চিত্তরঞ্জন নামক স্টেশনের অদূরে চিত্তরঞ্জন কারখানা খুলিয়াছেন (২৮১ পৃ.)। ইহাতে বৎসরে ১২০খানি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ও ৫০টি অতিরিক্ত বয়লার প্রস্তুত হইবে।

---

* The Industries of India—Burmah-shell Service.

টাটা লোকোমোটিভ কারখানা ও চিত্তরঞ্জন কারখানার প্রস্তুত ইঞ্জিন রীতিমত বাহির হইলে আর বিদেশ হইতে ইঞ্জিন আনিবার দরকার হইবে না বোধ হয়।

স্থলপথ

রাস্তার প্রয়োজনীয়তা।—দেশের পক্ষে রাস্তার প্রয়োজনীয়তার তুলনা নাই।—

(১) দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য দেশের মধ্যে সুরক্ষিত রাস্তার বিস্তৃতি প্রয়োজনীয়।

(২) কৃষিপ্রধান দেশেও রাস্তার প্রয়োজনীয়তা বেশী। তাহা না হইলে ফসল গৃহে বা বাজারে লওয়া সহজসাধ্য নহে।

(৩) শিল্পের উন্নতির জন্যও রাস্তাঘাটের বিশেষ দরকার। কারণ, তাহা না হইলে শিল্পের উৎপাদনস্থান ও বিক্রয়স্থানের মধ্যে যোগাযোগ থাকে না।

(৪) রাস্তাঘাট না থাকিলে কোন দেশেরই স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভব নহে।

(৫) জ্ঞানবিস্তারের পক্ষেও রাস্তাঘাট অতিশয় প্রয়োজনীয়।

(৬) সৈন্য-চলাচলের জন্যও রাস্তাঘাটের বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট।—ভারতবর্ষের সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা সভ্যতার সহচর। সেজন্য ভারতবর্ষে যে বহুপ্রাচীন কাল হইতেই রাস্তাঘাট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের বেদে, পুরাণে ও ইতিহাসে রাস্তাঘাটের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেকালের ভারতে রাস্তার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল, এক্ষণকার লোকবহুল ও কর্ম্মবহুল ভারতে উহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। তখন ভারতের এক-এক অঞ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। দূরস্থ অঞ্চলগুলির পরস্পরের সহিত যোগাযোগের কোন আবশ্যকতা ছিল না। ভারতের এই রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতাই তাহার শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎবর্ত্তিতার অন্যতম কারণ।

সম্রাট্ অশোকের সময়ে এবং বহু পরে পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে যে সুদীর্ঘ রাস্তাঘাট প্রস্তুত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। ভারতের বর্ত্তমান রাস্তাঘাট প্রকৃতপক্ষে মোগল ও পাঠান সম্রাট্গণের নির্ম্মিত রাস্তার পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে। লর্ড ডালহৌসির সময়ে রেলপথ ও স্থলপথ—দুইই নির্ম্মিত হইতে থাকে। তাহার পরেও রাস্তাঘাটের কিছু-কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রেলপথ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিলেও, রাস্তাঘাট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আবার জেলাবোর্ড ও লোকালবোর্ডের হাতে উহার ভার

দিয়া দায়মুক্ত ছিলেন। অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধকালে রাস্তাঘাটের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইল। রাস্তা আছে কিন্তু মোটর চলে না, এক রাস্তার সহিত আর এক রাস্তার
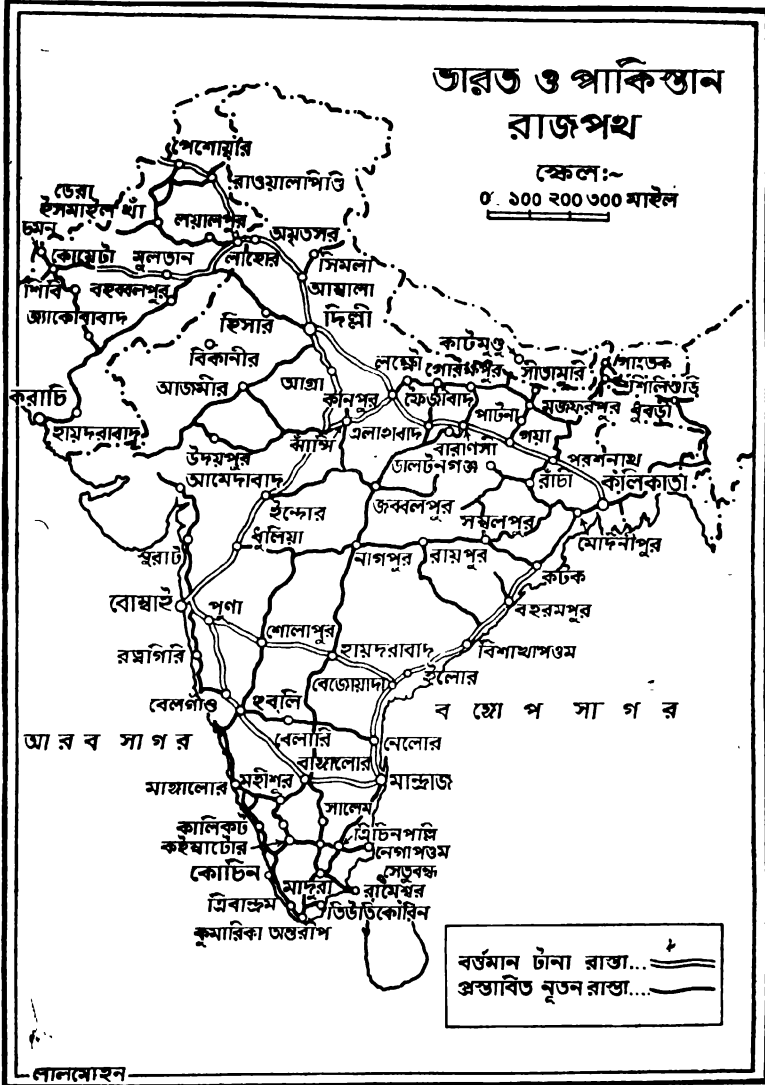
৫৭নং চিত্র

সংযোগ নাই, নদীর উপর সেতু নাই, শীতকালে যেখানে পথ আছে, বর্ষায় সেখানে পথের চিহ্ন নাই—এইরূপ নানা অসুবিধা পরিলক্ষিত হইল। সেজন্য যুদ্ধের সময় বহু

ব্যয়ে আবশ্যকীয় রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইল, এবং যুদ্ধান্তে রাস্তার উন্নতি করার দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল।

১৯২৮ সালের জয়াকর কমিটির উপদেশানুসারে প্রতি গ্যালন পেট্রলের উপর দুই আনা ট্যাক্স ধরিয়া ঐ টাকায় একটি কেন্দ্রীয় রাস্তা তহবিল (Central Road Fund) স্থাপিত হইল, এবং সেই তহবিল হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে রাস্তার জন্য অর্থসাহায্য করা হইতে লাগিল।

নাগপুর পরিকল্পনা।—১৯৪৩ সালে নাগপুরে যে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সমস্ত রাস্তা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় ;—(১) জাতীয় রাজপথ (National Highways), (২) প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় রাজপথ (Provincial or State Highways), (৩) জেলা রাস্তা, (৪) গ্রাম্য রাস্তা।

(১) জাতীয় রাজপথ।—এই রাস্তা প্রাদেশিক রাজধানী, বড়-বড় সহর, বন্দর, বিভিন্ন স্থানীয় ও রাষ্ট্রবহির্ভূত রাস্তার যোগসাধন করিবে। প্রদেশে প্রদেশে রাস্তার ইহাই হইবে যোগসূত্র,—মূল শিরা। সৈন্য-চালনার ইহাই হইবে প্রধান পথ। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিবে।

(২) প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় রাজপথ।—প্রদেশের অন্তর্গত প্রধান-প্রধান স্থান ও রাস্তা ও জাতীয় রাজপথের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-সাধন করাই ইহার কার্য্য। ইহা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শাসনাধীন।

(৩) জেলা রাস্তা।—ইহা উৎপাদন-ক্ষেত্র, বিক্রয়স্থল, জেলার প্রধান স্থানগুলির ও নিকটবর্ত্তী জেলাগুলির সদর-স্থানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ইহা জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীন।

(৪) গ্রাম্য রাস্তা।—গ্রামের মধ্যে চলাচলের, ও গ্রামের চারিদিকের গন্তব্য স্থানের সুবিধার জন্য এই রাস্তা নির্ম্মিত হয়।

ভারতের রাস্তাঘাট।—১৯৪৫ সালের হিসাব অনুসারে অবিভক্ত ভারতে—

পাকা রাস্তা	১০৫,৩৭০ মা.
কাঁচা রাস্তা	২১২,৪২৩ মা.
মোট	৩১৭,৭৯৩ মা.

—ইহার মধ্যে **জাতীয় রাজপথ** ৪টি,—**(১) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড**—কলিকাতা হইতে বেনারস, এলাহাবাদ, দিল্লী ও পেশোয়ার হইয়া খাইবার গিরিপথের সঙ্গে জামরুদ পর্য্যন্ত দীর্ঘ। কলিকাতা হইতে অমৃতসর পর্য্যন্ত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত, অবশিষ্ট পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে। **(২) কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ, (৩) মান্দ্রাজ**

হইতে বোম্বাই, ও (৪) **বোম্বাই হইতে দিল্লী** পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ। এই চারিটি পথের মোট দৈর্ঘ্য ৫,০০০ মাইল।

রাস্তার দৈর্ঘ্যের হিসাবে ভারতের স্থান

আ. যুক্তরাষ্ট্র	১০০৯,০০০ মা.
ফ্রান্স	৪০৫,০২৮ মা.
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৩১৭,৭৯৩ মা.
যুক্তরাজ্য	১৭৯,২৯০ মা.

পাকিস্তানের রাস্তাঘাট :(পাকা ও কাঁচা)

পশ্চিম-পাকিস্তান	৩৫,০০০ মা.
পূর্ব্ব-পাকিস্তান	২০,০০০ মা.
মোট	৫৫,০০০ মা.

বিভিন্ন দেশের রাস্তার দৈর্ঘ্যের তুলনা।—রাস্তার দৈর্ঘ্য হিসাবে বিভিন্ন দেশের তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক বর্গমাইলে—

পাকিস্তান	·১৬ মা.
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	·২৬ মা.
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১·০০ মা.
জার্ম্মানি	১·২০ মা.
ফ্রান্স	১·৯০ মা.
যুক্তরাজ্য	২·০০ মা.
জাপান	৩·০০ মা.

গাড়ী।—কাঁচা ও পাকা—উভয় রাস্তার উপর দিয়া গরুর গাড়ী ও ঘোড়া বা উটের গাড়ী চলে, এবং পাকা রাস্তার উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলে। ১৯৪৮ সালে—মোটর গাড়ী ছিল বৃটিশ ভারতে—১৭৮,৬৯৮, এবং দেশীয় রাজ্যে—৫৬,৩৩২ ;—মোট ২৩৫০৩০। গরুর গাড়ী ছিল বৃটিশ ভারতে ৬,২৮৪,০৪১, এবং দেশীয় রাজ্যে ২,৪২২,৩১১ মোট—৮,৭০৬,৩২২ খানি।

বঙ্গদেশে পরিবহন-ব্যবস্থা।—বঙ্গদেশ নদীমাতৃক নিম্নভূমি। সেজন্য এখানে রাস্তাঘাট ভাল প্রস্তুত হইতে পারে নাই। রাস্তা করিতে হইলে পুনঃপুনঃ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাস্তার সংযোগ রক্ষা করিতে হয়। সেজন্য রাস্তা-নির্ম্মাণ বহু ব্যয়সাধ্য। আবার দক্ষিণে সুন্দরবন ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল অত্যন্ত নিম্নভূমি

এবং ঘনঘন নদী খাল ইত্যাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। বর্ষাকালে এখানে অনেক রাস্তাই ডুবিয়া যায়। এই সকল কারণে এখানে ভাল রাস্তাঘাট হয় নাই। কেবল কয়েকটি ব্যবসায়-স্থল, বড়-বড় সহর এবং মহকুমা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই রাস্তাঘাট প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাকারাস্তার সংখ্যাও কম। এতদ্ব্যতীত, কিছুদিন পূর্ব্বেও লোকের আর্থনীতিক অবস্থা খারাপ ছিল। সেজন্য তাহাদের সহরে বা বিদেশে যাতায়াতের প্রয়োজনও কমও ছিল। এদেশে যে রেলপথ ছিল,—কলিকাতাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কলিকাতার সহিত ব্যবসায়স্থল, ও খনি-উৎপাদন-স্থানের যোগ সাধন করিয়াই রেলপথগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য পর্য্যন্তও জলপথে হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান পণ্য পাটও রেলপথে পশ্চিমবঙ্গে আনা সুবিধাজনক নহে। তবে বহুদূরে যাতায়াতের জন্য রেলপথের বিস্তার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিমান-পথ

পূর্ব্বকথা।—১৯১১ সালে বৃটিশ এয়ারোপ্লেন কোং সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী পাঠাইয়া ভারতে প্রথম বিমান-পথে ভ্রমণের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। ইহার পূর্ব্বে কখনও-কখনও বিমানে ভ্রমণের চেষ্টা হইলেও ভারতে বিমান-ভ্রমণের ইহাই প্রথম আয়োজন। ঐ বৎসরেই বিমান-পথে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ডাক বিমানে প্রেরিত হয়, এবং ঐ বৎসরেই বিমানপথে যাত্রী উঠিয়াছিল। ভারতের প্রথম বিমান-যাত্রী সার সেফ্‌টন ব্রাঙ্কার।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্র ২টি বে-সরকারী কোম্পানি ছোট-ছোট ব্যোমযান চালাইত। প্রতিবারে মাত্র ৩ হইতে ১৪ জন যাত্রী বহন করিত। বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রই ছিল তাহাদের নামিবার স্থান। কিন্তু ইহার পরে প্রথম মহাযুদ্ধে অন্যান্য অনেক বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেরও উন্নতি দেখা দিল ;—এবং ১৯২০ সালে ভারতে আকাশ-পথে ডাক প্রেরিত হইল। ইহার পরে ১৯২৭ সালে এদেশে বে-সরকারী আকাশযাত্রা বিভাগ (Civil Aviation Department) স্থাপিত হইল, এবং ১৯২৯ সালে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সাপ্তাহিক আকাশ-যান চলিতে লাগিল।

ইহার পরে ১৯৩১ সালে ভারতে আকাশ-পথের ও আকাশ-যাত্রার বীজ বপন করা হইল ;—ভারতে কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী ও করাচী—এই চারিস্থানে আকাশ-বন্দর স্থাপিত হইল। ১৯৩২ সালে ভারতের অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য প্রথম আকাশ-যান চলিতে লাগিল,—এবং করাচী হইতে কলম্বো, এবং করাচী হইতে লাহোর ব্যোমপথে যাত্রী চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে আকাশ-পথের বিপুল উন্নতি হইল—সমগ্র ভারতে আকাশ-পথ ছাইয়া ফেলিল, বহু আকাশ-বন্দর প্রস্তুত করা হইল,—ব্যোমযান চালাইবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী বহু সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিল,—এবং বে-সরকারী আকাশ-পথ-যাত্রার কোম্পানিগুলি দেশরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এই সময়েই হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট লি. নামে এক কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম আকাশযান-নির্ম্মাণশিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। যুদ্ধান্তে দেখা গেল আকাশ-বন্দর ও আকাশ-পথে ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে; এবং যুদ্ধের উদ্বৃত্ত বিমান ক্রয় করিয়া বহু কোম্পানি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে বিমানপথ হিসাবে ভারতের স্থান—**পঞ্চম**। ১৯৩৮ সালে মাত্র ৫,১৯০ মা., এবং ১৯৩৯ সালে ৫,২৬৪ মা. আকাশপথ ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে

বিমানপথের মোট দৈর্ঘ্য	২২,০৯২ মা.
নির্দ্দিষ্ট বিমানপথ	২৭টি
যাত্রিসংখ্যা	৩,৪২,০০০

যুদ্ধের পূর্ব্বে আকাশযান-কোম্পানিগুলি খরচ চালাইতে পারিতেন না,—খরচের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতেন। এক্ষণে যাত্রী ও মাল বহন করিয়াই খরচ চলিয়া যাইতেছে।

ভারত ও বিমানপথ।—(১) ভারত মহাদেশ-প্রতিম সুবিস্তৃত দেশ, সুতরাং বিমান-চলাচলের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী।

(২) পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে ভারতবর্ষ এমন স্থানে অবস্থিত যে, আন্তর্জাতিক আকাশপথে চলিতে ভারতের উপর দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কারণ, পৃথিবীর এই অংশের উত্তরভাগে বরফাচ্ছন্ন শীতপ্রধান সাইবেরিয়া, এবং দক্ষিণে বিশাল মহাসমুদ্র।

(৩) বৎসরের সমস্ত সময়ই ভারতে আকাশযান চালনার উপযোগী। এখানে শীতকাল আকাশযান চালনার আদর্শ কাল।

(৪) ভারতে বক্‌সাইট ও কাষ্ঠ এত প্রচুর পাওয়া যায় যে, অনায়াসেই আকাশযান প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

বিমানযানের উপযোগিতা।—বিমানযানে যাতায়াতে দুইস্থানের দূরত্ব কমিয়া যায়। সপ্তাহের পথ একদিনে যাওয়া যায়। ভারত হইতে লণ্ডনে যাইতে জলপথে ১৪ দিন লাগে কিন্তু আকাশপথে ৩৬ ঘণ্টা লাগে। দুইস্থানের দূরত্ব কমিয়া যাওয়ায় বাণিজ্যের প্রসারের এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের সুবিধা হইয়াছে।

ভারতে বিমানচালক কোম্পানী

এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলির যান বিমানপথে যাতায়াত করিতেছে :—

(১) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ।—(ক) দিল্লী—শ্রীনগর ; (খ) দিল্লী—লাহোর ; (গ) দিল্লী—যোধপুর—করাচী ; (ঘ) দিল্লী—কলিকাতা ; (ঙ) কলিকাতা—রেঙ্গুন ; (চ) কলিকাতা—কাঠমাণ্ডু।

(২) ডালমিয়া-জৈন এয়ারওয়েজ।—দিল্লী—অমৃতসর—শ্রীনগর।

(৩) জুপিটার এয়ারওয়েজ।—দিল্লী—নাগপুর—বিশাখাপত্তন—মান্দ্রাজ।

(৪) এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া)।—(ক) কলিকাতা—ঢাকা ; (খ) কলিকাতা—গৌহাটি—ডিব্রুগড় ; (গ) কলিকাতা—ভুবনেশ্বর—বিশাখাপত্তন—মান্দ্রাজ—বাঙ্গালোর ; (ঘ) গৌহাটি—দিল্লী।

(৫) ভারত এয়ারওয়েজ।—(ক) কলিকাতা—পাটনা—কাশী—লক্ষ্ণৌ—দিল্লী ; (খ) কলিকাতা—গয়া—এলাহাবাদ—দিল্লী ; (গ) কলিকাতা—রাঁচি—পাটনা ; (ঘ) কলিকাতা—রেঙ্গুন—ব্যাঙ্কক ; (ঙ) কলিকাতা—গৌহাটি—তেজপুর।

(৬) এয়ার ইণ্ডিয়া।—(ক) বোম্বাই—কলিকাতা ; (খ) বোম্বাই—দিল্লী ; (গ) বোম্বাই—আমেদাবাদ—জয়পুর—দিল্লী ; (ঘ) বোম্বাই—করাচী ; (ঙ) বোম্বাই—আমেদাবাদ—করাচী ; (চ) বোম্বাই—মান্দ্রাজ ; (ছ) বোম্বাই—হায়দারাবাদ—মান্দ্রাজ—কলম্বো ; (জ) মান্দ্রাজ—বাঙ্গালোর—কোয়েম্বাটুর—কোচিন—ত্রিবান্দ্রম।

(৭) অম্বিকা এয়ার লাইন্‌স্।—(ক) বোম্বাই—বরোদা—আমেদাবাদ—যোধপুর , (খ) বোম্বাই—রাজকোট—আমেদাবাদ ; (গ) বিকানীর—অমৃতসর।

(৮) ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ এয়ার লাইন্‌স্।—(ক) বোম্বাই—নাগপুর—কলিকাতা ; (খ) নাগপুর—হায়দারাবাদ—বাঙ্গালোর—মান্দ্রাজ ; (গ) নাগপুর—জব্বলপুর—এলাহাবাদ—কানপুর— লক্ষ্ণৌ।

(৯) এয়ার সার্ভিসেস্ অব্ ইণ্ডিয়া। (ক) বোম্বাই—ভবনগর—আমেদাবাদ ; (খ) বোম্বাই—গোয়ালিয়র—দিল্লী ; (গ) বোম্বাই—জামনগর—ভুজ—করাচী ; (ঘ) জামনগর—মর্ভি ; (ঙ) বোম্বাই—জামনগর—ভুজ ; (চ) বোম্বাই—পোরবন্দর—জামনগর ; (ছ) জামনগর—আমেদাবাদ।

(১০) ডেকান এয়ারওয়েজ।—(ক) দিল্লী—ভূপাল—নাগপুর—হায়দারাবাদ—মান্দ্রাজ ; (খ) হায়দারাবাদ—বাঙ্গালোর ; (গ) হায়দারাবাদ—বোম্বাই।

ভারতের বৈদেশিক বিমানপথ

১। প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজ

২। ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন

৩। ট্রান্স-ওয়ার্লড্ এয়ারলাইন্স্

৪। রয়েল ডাচ্ (K. L. M.) এয়ার-লাইন্স্

৫। কোয়ান্টাস্ এম্পায়ার এয়ারওয়েজ

৬। এয়ার ফ্রান্স
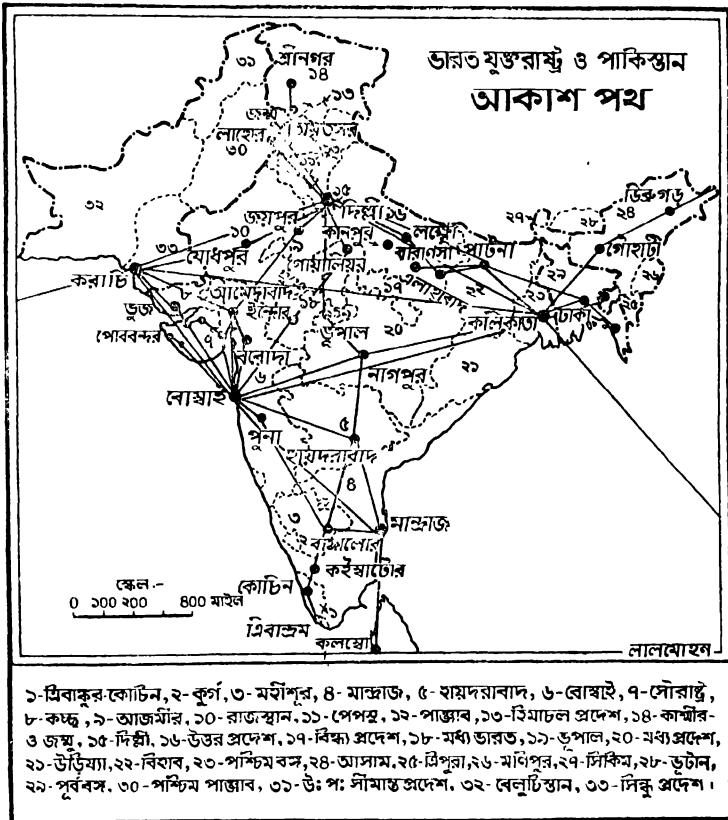
৬০নং চিত্র

উল্লিখিত কয়েকটি নিয়মিত বিমানপথের পরিচালক কোম্পানি ব্যতীত আরও কয়েকটি কোম্পানি বিমান চালনার কাজও করিতেছে।

পাকিস্তানের বিমানপোত

ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ।—(ক) করাচী—লাহোর—পেশোয়ার—কোয়েটা—করাচী ; (খ) কোয়েটা—লাহোর ; (গ) করাচী—দিল্লী—ঢাকা—কলিকাতা ; (ঘ) কলিকাতা—চট্টগ্রাম—আকিয়াব—রেঙ্গুন ; (ঙ) ঢাকা—চট্টগ্রাম।

পাকিস্তানের সহিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-চলাচল সম্বন্ধে এক চুক্তি হইয়াছে যে, ভারত পাকিস্তানে ১০টি বিমানপথ পাইবে, এবং এখানকার পয়েণ্ট অনুযায়ী পাকিস্তান ভারতে ৯টি বিমানপথ পাইবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।—বিমানপথ-সম্পর্কীয় উন্নতির জন্য ভারত সরকার একটি দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ১১৫টি বিমানঘাটি ও অবতরণকেন্দ্র নির্ম্মিত হইবে এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি সৈন্যচলাচলের পক্ষে উপযোগী করা হইবে।

জলপথ—বাণিজ্যপথ

রেলপথ বা আকাশপথের সহিত তুলনায় জলপথে পণ্য- বা যাত্রি-পরিবহন সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পব্যয়সাধ্য, এবং সুবিধাজনক। সেজন্য জলপথে পরিবহন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়,—পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ বাণিজ্য জলপথেই হইয়া থাকে।

জলপথ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন,—(১) নদীপথ, (২) খালপথ, (৩) উপকূলপথ, (৪) সমুদ্রপথ।

(১) নদীপথ

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নদীপথে পরিবহন চলিতেছে। ভারতে বহু নদী থাকিলেও উত্তর-ভারতের **গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধু** এই তিনটিই সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যবাহী নদী। এই তিন নদী গ্রীষ্মে বরফগলা জলে পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসরই নৌ-চালনের উপযোগী। ইহাদের মধ্যে সিন্ধুর প্রধান অংশ এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত।

গঙ্গানদীর মোহানা হইতে কানপুর পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্রে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত নৌ-চলাচল সম্ভব। গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা ও ঘর্ঘরা নদীর প্রায় সমস্ত অংশেই নৌ-চলাচল সম্ভব। গোমতী ও গণ্ডক প্রভৃতি নদীরও অনেক দূর পর্য্যন্ত নৌ-পরিবহন হইয়া থাকে।

সিন্ধুনদের আটক পর্য্যন্ত নৌ-বাহন হয়। ইহার শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা উপনদীতে সমস্ত বৎসরই নৌ-চলাচল হয়।

দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলি পার্ব্বত্য নদী—বর্ষাকালে ইহাদের স্রোত প্রবল হয়, গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় বা জলবিরল হয়। সেজন্য এই অঞ্চলে নদীগুলি নৌ-বাহনের বিশেষ উপযোগী নহে। ইহাদের মোহানার নিকটবর্ত্তী অংশে মাত্র নৌবাহন চলে।

জলপথের দৈর্ঘ্য।—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের জলপথ দীর্ঘতম, কিন্তু আয়তন হিসাবে ন্যূনতম। যেমন—

দেশ	জলপথের দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রতি বর্গমাইলে (মাইল)
ভারতবর্ষ	২৬,০০০	১·৬
ফ্রান্স	৫,৩৬১	২·৫
জার্ম্মানি (সম্পূর্ণ)	৪,৭৪৫	২·৬
গ্রেট বৃটেন	২,৭০০	৩·০

ভারতবর্ষের জলপথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও, ইউরোপ বা আমেরিকার নদীগুলিতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য যে-সকল সুবন্দোবস্ত আছে, ভারতবর্ষে তাহার কিছুই নাই।

(২) খালপথ

ভারতে খালপথে নৌ-চলাচলের যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তাহা বিশেষ নগণ্য। মোটামুটিভাবে ভারত ও পাকিস্তানে নৌ-বাহনের জন্য ১৫,০০০ মা. কাটাখাল আছে। নৌ-বাহনের জন্য নিম্নলিখিত খালগুলি উল্লেখযোগ্য :—বঙ্গদেশে—ইস্টার্ণ ও সার্কুলার খাল, ও মেদিনীপুর খাল; উত্তরপ্রদেশে—হরিদ্বার হইতে কানপুর পর্যন্ত গঙ্গাখাল, আগরা খাল; উড়িষ্যায়—উড়িষ্যা কোস্ট খাল; মান্দ্রাজে—বাকিংহাম খাল, গোদাবরী খাল, পশ্চিমঘাট খাল, কৃষ্ণা খাল প্রভৃতি। দক্ষিণ-ভারতে খালের দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১,৯০০ মাইল।

নদীগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমানে ভারত-সরকার কর্তৃক বহুবৃত্তিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। পূর্ব্বে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) উপকূলপথ

সমগ্র ভারতবর্ষের উপকূল প্রায় ৪,০০০ মা.। তন্মধ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল প্রায় ২,৫০০ মা. দীর্ঘ। এই দীর্ঘ উপকূলপথে পরিবহনের কোন বাধা নাই (১২পৃ. দেখ)।

কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সময় উপকূল-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। উপকূলস্থ বন্দরগুলিরও উন্নতির কোন চেষ্টা হয় নাই।

ভারতের উপকূল-বাণিজ্য নগণ্য নহে। উপকূলের এক স্থান হতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত যে বাণিজ্য, তাহাকেই উপকূল-বাণিজ্য বলে। উপকূলে প্রায় ২ কোটি টন কয়লা, লবণ, তেল প্রভৃতি পরিবাহিত হয়—পশ্চিম-উপকূলেই প্রায় ১৫ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে, এবং ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যে-যাত্রী যাতায়াত করে তাহার সংখ্যাও ৫ লক্ষের কম নহে।

এই উপকূল-বাণিজ্য দুই উপায়ে চলিত—(১) দেশী নৌকাদ্বারা, এবং (২) বাষ্পীয় পোতদ্বারা। বাষ্পীয় পোত প্রধানতঃ বিদেশী কোম্পানী-পরিচালিত;—দেশী কোম্পানী-পরিচালিত বাষ্পীয় পোত খুব কমই আছে।

দেশী নৌকা—বড় জোর ১০০ টন মাল বহন করিতে পারে। এই সকল নৌকা পাইল ভরে চলে ও মাঝিদের দ্বারা পরিবাহিত হয়। ইহারা এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে **অপেক্ষাকৃত সস্তায়** মাল ও যাত্রী বহন করে। জাহাজে আমদানি ও রপ্তানি মাল নামানো ও উঠানোর কাজ ইহারা করিয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম-উপকূল অপেক্ষা পূর্ব্ব-উপকূলে এইরূপ নৌকার চলাচল বেশী। ভারতে মোটামুটি ৮৭ কোটি টাকার উপকূল-বাণিজ্য হইয়া থাকে। নিম্নের হিসাবে নৌকার সংখ্যা ও পরিবাহিত মালের ওজন দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উপকূল-বাণিজ্য নগণ্য মনে করিবার কারণ নাই।

উপকূল-বাণিজ্য *

সাল	রপ্তানি বাণিজ্য		আমদানি বাণিজ্য	
	নৌকার সংখ্যা	যত সহস্র টন	নৌকার সংখ্যা	যত সহস্র টন
১৯৪৪—৪৫	৫৬,৭৮০	১৬০১	৪৭,৩৪৬	১১২৬
১৯৪৫—৪৬	৮২,৩০৬	২২৫১	৯০,৬৮৪	২০২২
১৯৪৬—৪৭	৭৩,৬৫০	১৮৬৯	৮১,৬৫৩	১৭৫৮
১৯৪৭—৪৮	৬৮,৩৪১	১৭৯৫	৭৯,৯৯৯	১৭১৬

উপকূল-বাণিজ্য-বৃদ্ধির ফল।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারত সরকার ভারতের পোত-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণকল্পে এক কমিটি নিয়োগ করেন। সেই কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দিগের দ্বারা হইবে, এবং ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন যে, উপকূল-

* *Indian & Pakistan Year Book*, 1950

-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহাতে উপকূল শত্রুহাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হইবে;—অন্তর্বাণিজ্যের উন্নতি হইবে,—এদেশের লোকের জলপথে বাণিজ্যের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে ও ক্রমশঃ বহির্বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়িবে। জলপথে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলেই জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্পেরও উন্নতি হইবে। উপকূল-বাণিজ্যের উন্নতি হইলে সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসায়ও বৃদ্ধি পাইবে।

(৪) সমুদ্রপথ

অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত ও পাইলভরে চালিত জাহাজে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের চাপে যে এদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জাহাজ-নির্ম্মাণশিল্প উঠিয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই (২৭৮ পৃ.)
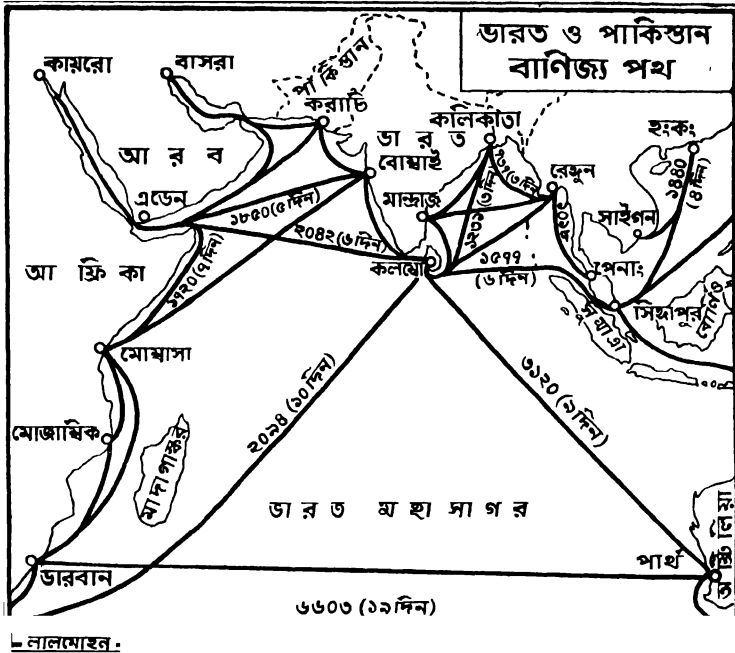
৬১নং চিত্র

বলিয়াছি। আরও বলিয়াছি যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃটিশস্বার্থ-সহায়ক ও ভারতীয় বণিক্স্বার্থের বিরোধী কঠোর আইন এদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্যের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এদেশে দুইটি প্রধান বৃটিশ কোম্পানির অধীনে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাদের একটি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানি

(B. I. S. N. Co.), এবং অপরটি পেনিনসুলার ও অরিয়েণ্ট কোম্পানি (P. & O. Co)। দুই-একটি ভারতীয় কোম্পানি মধ্যে-মধ্যে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের লগুড়াঘাতে তাহারা অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ১৯১০ খৃঃ অব্দে মি. জে. এন. টাটা বেঙ্গল স্টীম্ ন্যাভিগেশন কোম্পানি ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যপথ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলে ইহাদেরই চাপে পিষ্ট হইয়া গেল। ক্রমশঃ প্রথম মহাযুদ্ধ আসিল, এই সময়ে ১৯১৬ সালে উপরি-উক্ত দুইটি বৃটিশ কোম্পানি মিশিয়া এক হইল এবং আরও শক্তিশালী হইল। এই সময়েই ভারতীয়গণের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুনরায় প্রবল হইল।

ভারতের উপকূল-বাণিজ্য বিশেষ অর্থকর। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৩২০ পৃ.)। আবার ভারতবর্ষে যে বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য হয়, তাহাতেও প্রায় ২ কোটি টন মাল এবং ২ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে,—এবং পৃথিবীর সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ অষ্টম স্থান অধিকার করে।* এই অর্থপ্রসূ বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়গণ প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল।

১৯২০ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়া ন্যাভিগেশন কোম্পানী ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্রে স্থান করিয়া লইবার দৃঢ়সংকল্প লইয়া রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত যে বৈদেশিক বাণিজ্যে ও পরে বাণিজ্য-জাহাজ-নির্ম্মাণে কিঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়াছিল, এখানেই তাহার সূত্রপাত।

দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশ কোম্পানী সিন্ধিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্যপথ হইতে সরাইবার জন্য তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা প্রথমে শুল্কহ্রাস-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল, তৎপরে সিন্ধিয়া কোম্পানীকে খরিদ করিয়া লইবার জন্য বহু অর্থের প্রলোভন দেখাইল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে সিন্ধিয়া কোম্পানীর বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তাহারা হঠিয়া গেল না। অবশেষে ১৯২৪ খৃঃ অব্দে ঐ কোম্পানি ৭৫,০০০ টন মাল বহনের অনুমতি পাইল। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট-ছোট ভারতীয় কোম্পানি পশ্চিম-উপকূলে বৃটিশ কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পিষ্ট হইতেছিল। তাহাদের কয়েকটি সিন্ধিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীন হইল, এবং কঙ্কণ উপকূলের কয়েকটি কোম্পানিও ইহার পরে সিন্ধিয়ার সহিত একীভূত হইল এবং ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিল। এই যুদ্ধকালে ভারতীয় কোম্পানির জাহাজগুলি গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া লইলেন এবং দেখা গেল, ভারতে এই সময় ভারতীয় জাহাজের

* মাননীয় বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী কে. সি. নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

মাল-বহনের ক্ষমতা মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন অর্থাৎ পৃথিবীর টনের মাত্র ৩·২ শতাংশ ছিল। যুদ্ধকালে অনেকগুলি জাহাজ নষ্ট হইল,—যেগুলি ফেরত পাওয়া গেল তাহাদেরও সংস্কার করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইল। কিন্তু এই যুদ্ধকালে ইহা অনুভূত হইল যে, এদেশীয়দিগকে সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখিলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। সেজন্য ১৯৪৫ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত রি-কনস্ট্রাক্‌শন পলিসি নামে এক কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৪৭ সালে ইহা স্থির হইল যে,—

(১) পাঁচ হইতে সাত বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ২০ লক্ষ টন বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবে ;

(২) সমস্ত উপকূল-বাণিজ্য এদেশীয় কোম্পানীর হস্তগত হইবে ; এবং

(৩) নিকট ও দূর বাণিজ্যের উপযুক্ত অংশ এদেশীয় কোম্পানীকে দিতে হইবে।

ইহার ফলে ইতিমধ্যেই ৩½ লক্ষ টনের বাণিজ্য এদেশীয় কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে। কয়েকটি দূর বাণিজ্যপথেও এদেশীয় কোম্পানীর বাণিজ্য-পোত চলিতেছে, —মালবাহী জাহাজ ২ খানি চলিতেছে যুক্তরাজ্যে ও ইউরোপের অন্য অংশে,—১খানি চলিতেছে আমেরিকায়,—যাত্রিবাহী ১খানি চলিতেছে যুক্তরাজ্যে। কিন্তু এই সময়ে এক নূতন বিপদ্ দেখা দিল ; কোম্পানি-গঠন ও -চালনার জন্য উপযুক্ত মূলধনের অভাব ঘটিতে লাগিল। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে,—সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে দুই-তিনটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়া নিজেরা তাহার ৫১ শতাংশ অংশ খরিদ করিবেন, এবং অবশিষ্ট ৪৯ অংশ জনসাধারণ ও যে-কোন দেশী কোম্পানীকে কিনিতে দিবেন।

পৃথিবীর বাণিজ্যে ভারতের স্থান।—এক্ষণে পৃথিবীর বাণিজ্যে **২ কোটি টন মাল** ও **২ লক্ষ যাত্রী** বহন করা হয় এবং সমগ্র সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে **অষ্টম স্থান** অধিকার করে। জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প সম্পর্কে ভারতের মালবহন ক্ষমতা ও পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের স্থান সম্পর্কে পূর্ব্বে (২৭৯ পৃ.) যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে।

১৯৪৮ সালে পৃথিবীর বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশ এইরূপ

(পৃথিবীর মোট টন ৮,০২,৯২,০০০ টন)

আ. যুক্তরাষ্ট্র	৩৬·৩	হলণ্ড	৩·৪
যুক্তরাজ্য	২২·৫	ইতালী	২·৬
নরওয়ে	৫·৩	জাপান	১·৩
ফ্রান্স	৩·৫	জার্ম্মানি	০·৫

ভারত যুক্তরাষ্ট্র ০·৪

সমুদ্র-বাণিজ্যের অন্তরায় ও প্রতিকার।—এদেশে সমুদ্র--বাণিজ্যে উন্নতি করিবার চেষ্টাকার্য্যে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পেও বহু চেষ্টা হইতেছে।

(১) জাহাজ-নির্ম্মাণ।—জাহাজ-নির্ম্মাণ না করিতে পারিলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ সহজ নহে। এদেশে জাহাজ-নির্ম্মাণক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্তু সেখানে ছোট-ছোট জাহাজ নির্ম্মিত হইত, এবং তাহার শিল্পী ও সরঞ্জাম ইংলণ্ড হইতে আসিত। সিন্ধিয়া ন্যাভিগেশন কোম্পানিই এদেশে বড়-বড় জাহাজ-নির্ম্মাণের ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা সফল হইলে এককালে ৮ খানি বড় জাহাজ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

(২) দক্ষ কর্ম্মচারী শিল্পী।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (২৭৯ পৃ.) বাণিজ্য--জাহাজ চালাইবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী ও শিল্পী ভারতে বেশী নাই, এবং সেজন্য ১৫ বৎসর পূর্ব্বে "ডফবিন" নামে একখানি শিক্ষক-জাহাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাতে শিক্ষানবিশ লওয়া হয়। এক্ষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত কম যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বাণিজ্য-জাহাজ গঠন করিতে হইলে এখনও বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। সেজন্য ভারত সরকার নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন, এবং আশা করা যায় আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে একশত উপযুক্ত কর্ম্মচারী ও একশত ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাইবে।

(৩) নাবিক বা খালাসী (Crew)।—বাণিজ্য-জাহাজ-গঠনের তৃতীয় অভাব—নাবিক সম্পর্কে। ইহার কথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি (২৭৯ পৃ.)। এদেশে খালাসীর অভাব নাই। কিন্তু এদেশীয় খালাসী বর্ণজ্ঞানহীন অশিক্ষিত, সেজন্য তাহারা বর্ত্তমানযুগে বিশেষ উপযোগী নহে। আবার, এদেশীয় খালাসীদিগের জন্য বন্দরে বন্দরে অন্য দেশের খালাসীদিগের ন্যায় সচ্ছন্দতা লাভের কোন বন্দোবস্ত নাই। এজন্য ভারত সরকার খালাসীদিগের জন্য সাধারণ শিক্ষা, ও ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং যাহাতে এই চাকুরী গ্রহণে লোকে আগ্রহ করে, সেই উদ্দেশ্য ইহার জন্য নানা সুখ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বন্দর ও নগর

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের বন্দরগুলির নামোল্লেখ ১৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে (১নং চিত্র)। এখানে বন্দরগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া হইল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর

কান্দালা—কচ্ছ উপসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি পোতাশ্রয়। করাচী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই পোতাশ্রয়টিকে বড় বন্দরে পরিণত করা স্থির হইয়াছে। প্রবেশপথের চড়া দূরীভূত করিয়া পলি-উত্তোলন-কার্য্যের সুচারু ব্যবস্থা রাখিলে ইহা একটি উচ্চ অঙ্গের বন্দর হইবে। দিল্লী হইতে ইহার দূরত্ব করাচী অপেক্ষা কম, এবং ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে খনিজ-সম্পদ্ বাড়িবার বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের যে-অংশ করাচী বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল, তাহা সহজেই এই বন্দরের এলাকাধীন হইতে পারিবে।

বেদি—নবনগরের প্রধান বন্দর—জামনগরের নিকটেই অবস্থিত। জাহাজগুলি কচ্ছ উপসাগরের মুখে এবং স্টিমারগুলি বন্দর হইতে দূরে কচ্ছ উপসাগরের মধ্যে নঙ্গর করে।

ওখা—কাথিওয়ার উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এখানে সমস্ত স্টিমারই যাইতে পারে। বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এবং ইহা বর্ত্তমান কালের উপযোগী সুখসুবিধার অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্র হইতে বন্দরে যাইবার রাস্তা অত্যন্ত বক্র ও বিপদ্‌সঙ্কুল; এবং নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশনও দূরে অবস্থিত। ইহারই দক্ষিণে করাচী-বোম্বাই পথের স্টিমার থামিবার স্থান ও হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দ্বারকা অবস্থিত।

পোরবন্দর—এক্ষণে বৈদেশিক বাণিজ্য কিছুই হয় না। ইহা সিমেণ্ট প্রস্তুত করার ও সিমেণ্ট-রপ্তানি করার কেন্দ্র।

ভবনগর—কাম্বে উপসাগরের মুখ হইতে অভ্যন্তরে মাহী নদীর মুখ পর্য্যন্ত যে-দূরত্ব, ইহা তাহার অর্দ্ধেক দূরত্বে পশ্চিমকূলে একটি খাড়ির ভিতর অবস্থিত। ছোট-ছোট স্টিমার ইহার ভিতরে যাইতে পারে, এবং বড়-বড় জাহাজ বন্দর হইতে আট মাইল দূরে নঙ্গর করে; বন্দর হইতে মালবাহী ছোট-ছোট নৌকা সেখানে মাল বহন করে। ভূতপূর্ব্ব বরোদা স্টেট রেলপথের একটি শাখা এখানে আসিয়াছে।

সুরাট—সমুদ্র হইতে ১৪মা. দূরে কাম্বে উপসাগরের মধ্যে তাপ্তী নদীর মুখে অবস্থিত। অতীতকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বড় বন্দর ছিল, এবং তূলা প্রভৃতি এই পথে রপ্তানি হইত। সেজন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহার অবনতির জন্য বোম্বাই বন্দরের উন্নতি হইয়াছে।

বোম্বাই—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কলিকাতার পরেই দ্বিতীয় সহর ও বন্দর,—ভারতের মধ্যে ইহা ধনসম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত,—ইহা উত্তরে সালসেট নামক বৃহত্তর একটি দ্বীপের সহিত যুক্ত এবং শেষোক্ত দ্বীপটি প্রধান ভূ-ভাগের সহিত যুক্ত হইয়াছে, এবং বোম্বাই-বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ ও গ্রেট্ ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা রেলপথ ইহাকে দেশের অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ইহা একটি পোতাশ্রয়,—কোলাবার দক্ষিণদিকস্থ প্রবেশপথ ব্যতীত অন্য সকল দিকেই সুরক্ষিত পোতাশ্রয়টি প্রায় ১৪ মা. লম্বা, এবং ৪ হইতে ৬ মাইল চওড়া,—ইহা ২২ হইতে ৪০ ফিট্ গভীর। যে-কোন আকারের জাহাজ এখানে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, ও নিরাপদে থাকিতে পারে। তাই ইহা ভারতের সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। ইহা ইউরোপ হইতে নিকটতম পোতাশ্রয়,—ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি সুবৃহৎ,—রেলপথে যুক্ত,—রেলপথ পশ্চিমঘাট অতিক্রম করিয়া ইহাকে অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভারতের সর্ব্বপ্রধান, এবং এককালে ইংলণ্ডের অধিক প্রয়োজনীয় তূলার উৎপাদনস্থান ইহারই সন্নিকটে অবস্থিত। তাই ইহারই উপরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ তূলার ডিপো অবস্থিত,—ইহার আয়তন ১২৭ একর। তূলা, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির রপ্তানি এই পথেই হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে কাচদ্রব্য, ধাতুদ্রব্য, মোটরগাড়ী, মশলা, রেশম, পশম, রেয়ন প্রভৃতি আমদানি-দ্রব্য প্রধানতঃ এখানেই আসে।

৬২নং চিত্র

মর্ম্মুগাও—পর্ত্তুগীজ অধিকারে পাঞ্জিম বা নব-গোয়ার ৫ মাইল দক্ষিণে মর্ম্মুগাও উপদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে এই বন্দরটি অবস্থিত। বোম্বাই, হায়দারাবাদ ও মহীশূরের বাণিজ্যদ্রব্য এই পথে রপ্তানি করা হয়। তূলা, চীনাবাদাম, নারিকেল ও ম্যাঙ্গানিজ প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

কারওয়ার—কালী নদীর মুখে পতনোন্মুখ পোতাশ্রয়। মর্ম্মুগাও রেলপথে সংযুক্ত হওয়ার পর হইতে ইহার দ্রুত পতন হইতেছে।

মাঙ্গালোর—ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথের এক প্রান্তের শেষে অবস্থিত। ২০০ টন পর্য্যন্ত জাহাজ ইহার ভিতরে থাকিতে পারে। এখান হইতে চা, মরিচ, কফি, চন্দনকাঠ, রবার প্রভৃতি রপ্তানি হয়, এবং লাক্ষাদ্বীপ হইতে নারিকেল-সংক্রান্ত দ্রব্য এই স্থান হইতে বিক্রীত হয়।

তেল্লিচেরি—মাঙ্গালোর হইতে ৯৪ মাইল দক্ষিণে ও কালিকট-মাঙ্গালোর রেলপথের উপর অবস্থিত। স্টিমারগুলি প্রায় তুই মাইল দূরে নঙ্গর করিয়া থাকে। যখন এই অঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মৌসুমি বায়ুপ্রবাহকালে বন্ধ হয়, তখনও এই বন্দরে কাজ চলে। চা, কফি, চন্দনকাঠ, মরিচ, আদা, নারিকেল, দারুচিনি এখানকার রপ্তানি-দ্রব্য, এবং যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য, খেজুর, চাউল প্রভৃতি আমদানি-দ্রব্য।

মাহি—ফরাসী অধিকারে একটি ছোট বন্দর।

কালিকট—তেল্লিচেরি হইতে ৪২ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সমুদ্র অগভীর। সেজন্য প্রায় ৩ মা. দূরে জাহাজ দাঁড়াইয়া থাকে, ও ছোট-ছোট নৌকা দ্বারা জাহাজে মাল যাতায়াত করে। চা, কফি, নারিকেল, মরিচ, আদা, রবার, তূলা, চীনাবাদাম—এখানকার রপ্তানি-দ্রব্য।

কোচিন—কালিকটের ৯০ মা. দক্ষিণে কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রে অবস্থিত। মান্দ্রাজ স্টেটের মধ্যে মান্দ্রাজের পরেই ইহা দ্বিতীয় বন্দর। ইহার পার্শ্বেই এক বিল আছে;—তাহাতে কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর স্টেটে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। এডেন হইতে ইহার দূরত্ব বোম্বাই অপেক্ষা ৩০০ মা. এবং কলম্বো অপেক্ষা ২৪২ মা. নিকটতর। সেজন্য ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই বন্দরের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

আলেপ্পি—কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ইহা কোচিন হইতে ৩৫ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। কাঁচা মাল আদানপ্রদানের এখানে সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়া, নানাপ্রকারের নারিকেলের ছোবড়া-জাত দ্রব্য, মরিচ, আদা প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

কুইলন—কুইলন-ত্রিবান্দ্রম রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে জাহাজ প্রায় $\frac{3}{4}$ মা.

দূরে থাকে। প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য—নারিকেল, নারিকেল-সংক্রান্ত দ্রব্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি।

তুতিকোরিন—মান্দ্রাজ স্টেটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে অবস্থিত। মান্দ্রাজ ও কোচিনের পরে ইহা এই স্টেটের তৃতীয় বন্দর। সাউথ-ইণ্ডিয়ান রেলপথের ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্ত। এখানে জল অগভীর, তাই জাহাজ প্রায় ৫মা. দূরে নঙ্গর করে। এখান হইতে সিংহল দ্বীপে চাউল, ডাল, লঙ্কা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। অন্য **রপ্তানি-দ্রব্য**—তূলা, চা প্রভৃতি। ধনুস্কোটি বন্দর খুলিবার পরে সিংহলের সহিত ইহার আদানপ্রদান কমিয়া গিয়াছে।

ধনুস্কোটি—সাউথ-ইণ্ডিয়ান রেলপথের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে রামেশ্বর দ্বীপের উপর শেষ স্টেশন। ইহা পক্‌প্রণালী ও মান্নার উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে সিংহলের তালাইমান্নার যাইতে স্টিমারে মাত্র ২ ঘণ্টা লাগে, এবং এখান হইতে প্রত্যহ ভারত ও সিংহলের মধ্যে স্টিমারে যাত্রী যাতায়াত করে।

নাগাপত্তম্—কারিকাল হইতে ১৩ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা নদী ও খাল দ্বারা মান্দ্রাজের তামাক-উৎপাদক অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। জাহাজগুলি প্রায় দুই মাইল দূরে দাঁড়ায়, এবং নৌকাযোগে জাহাজে মাল যাতায়াত করে। ইউরোপ হইতে স্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্টে যে ডাক যায়, তাহা দূরত্ব পরিহারের জন্য বোম্বাই হইতে রেলপথে নাগাপত্তম্ আসে, ও সেখান হইতে স্টিমারে পেনাং ও সিঙ্গাপুর যায়। তূলা, তামাক, শাকসব্জী প্রভৃতি ইহার রপ্তানি-দ্রব্য। সিংহলের রবার ও চা-ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য এখান হইতে শ্রমিকেরা সর্ব্বদা যাতায়াত করে।

কারিকাল—ফরাসী অধিকারে একটি বন্দর। এখান হইতে সিংহলে চাউল রপ্তানি হয়, এবং স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির তৈল নিকটস্থ বৃটিশ অধিকারে পাঠানো হয়। চাউল, সুপারী ও দেশলাই প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

কুড্ডালুর—কুড্ডালুর-ধনুস্কোটি রেলপথের উপরে অবস্থিত, পুরাণো সহর এবং তাহার সহিত রেলশাখার দ্বারা সংযুক্ত। স্টিমার এখানে এক মাইল দূরে দাঁড়ায়। চাউল ও ডালকলাই লইয়া ইহার উপকূল-বাণিজ্য চলে।

পণ্ডিচেরি—মান্দ্রাজ হইতে ১০৪ মা. দক্ষিণে কুড্ডালুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে ফরাসী অধিকারে একটি বন্দর এবং চীনাবাদাম রপ্তানির বড় কেন্দ্র। প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—আস্ত চীনাবাদাম, কাপড়, আম, হাড়ের গুঁড়ার সার, পেঁয়াজ। প্রধান **আমদানি-দ্রব্য**—তূলা, সুপারী, সিমেণ্ট।

মান্দ্রাজ—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্য অংশের পূর্ব্ব-উপকূলে ভারতের তৃতীয় বন্দর। কিন্তু ইহা একটি কৃত্রিম বন্দর। এখানে কোন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ছিল না,—

জাহাজ তরঙ্গতাড়িত উপকূল সন্নিধানে থাকিত, এবং তীর হইতে নৌকা করিয়া জিনিষ-পত্রের ও যাত্রিগণের জাহাজে যাতায়াত চলিত। তৎপরে তীর হইতে সমুদ্রমধ্যে দুইটি দেওয়াল গাঁথিয়া ২০০ একর স্থান ঘিরিয়া লইয়া এখানে একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহার ভিতর ৩১২ ফিট্ জলের ভিতর ডুবিয়া থাকে এমন ১৪ খানি জাহাজ থাকিতে পারে। দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ এই বন্দরে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। মান্দ্রাজ ও সাউথ-মাহারাট্টা রেলপথ ও সাউথ ইণ্ডিয়া রেলপথ এই বন্দরের সর্ব্বত্র, সমস্ত জাহাজঘাট ও গুদাম-ঘরের মধ্যে রেলপথদ্বারা যোগস্থাপন করিয়াছে। এই বন্দরে প্রধান **আমদানি-দ্রব্য**—চাউল, কয়লা, তেল, কাগজ, জমির সার, কাষ্ঠ, চিনি, রং, চামড়া রং করার দ্রব্য, ধাতুদ্রব্য, কাচদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রেলপথ-সংক্রান্ত দ্রব্য, সিমেণ্ট, চামড়া, মদ্য, মশলা, দেশলাই, তূলা, মোটরগাড়ী, সাইকেল, তূলার দ্রব্য, পাটদ্রব্য, সাবান প্রভৃতি এবং প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—চীনাবাদাম, চামড়া, পেঁয়াজ, তামাক, তূলা, কফি, খইল, জমির সার প্রভৃতি।

মসলিপত্তন—কৃষ্ণানদীর ব-দ্বীপে প্রধান বন্দর, এবং কলিকাতা-মান্দ্রাজ রেলপথের বেজওয়াদা স্টেশনের সহিত একটি শাখাপথদ্বারা সংযুক্ত। এখানে বড়-বড় জাহাজগুলি ৫ মাইল দূরে থাকে। নৌকাযোগে জাহাজের সহিত সংস্রব রক্ষিত হয়। কিন্তু ঝড়বাতাসের সময়ে সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে। প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—চীনাবাদাম, রেড়ি, খইল প্রভৃতি।

কোকনদ—মান্দ্রাজ হইতে ২৭০ মাইল উত্তরে গোদাবরী নদীমুখের উত্তরে অবস্থিত। এখানে জাহাজ ৬-৭ মাইল দূরে থাকে, এবং ছোট-ছোট স্টিমার জাহাজ হইতে মাল লইয়া কোকনদ খালের উপর গঠিত জাহাজঘাটে মাল লইয়া আসে এখানে প্রায় ৪২টি জেটি হইতে জাহাজে মাল চালান দেওয়া হয়। প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—তূলা, চীনাবাদাম, রেড়ি, ধান ও চাউল। **আমদানি দ্রব্য**—কেরোসিন, ধাতুদ্রব্য।

ভিজাগাপত্তন বা **বিশাখাপত্তন**—কোকনদ হইতে ১০৫ মা. উত্তরে অবস্থিত, এবং ভূতপূর্ব্ব মান্দ্রাজ ও সাউথ মহারাট্টা রেলপথ এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সঙ্গমস্থল ওয়ালটেয়ার-এর সহিত ২ মাইল দীর্ঘ শাখাপথ দ্বারা সংযুক্ত। একটি ছয় বর্গমাইল জলাভূমি পরিষ্কার ও গভীর করিয়া, এবং সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়া এই পোতাশ্রয় ও বন্দর প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা এক্ষণে বড় বন্দর বলিয়া পরিচিত। ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে মধ্যপ্রদেশের অরণ্য, কৃষি ও খনিজ সম্পদ্ রহিয়াছে। ভিজিয়ানাগ্রাম ও রায়পুর রেলপথ খুলিবার পর হইতে মধ্য প্রদেশের সহিত ইহার যোগসাধন হইয়াছে। সম্প্রতি এখানে জাহাজনির্ম্মাণ-স্থান স্থাপিত হওয়ার জন্য ইহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ

আরও উজ্জ্বল। ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য—ম্যাঙ্গানিজ, হরীতকী, সরিষা, খইল, কাষ্ঠ। প্রধান আমদানি-দ্রব্য—খাদ্যদ্রব্য, কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি।

বিমলিপত্তন—ওয়ালটেয়ার হইতে ২২ মা. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। রপ্তানি-দ্রব্য—পাট, হরীতকী, চীনাবাদাম, তিল প্রভৃতি। আমদানি-দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এখান হইতে রেঙ্গুনে বিশাখাপত্তন পর্য্যন্ত যে স্টিমার চলে, তাহা এখানে থামে। পূর্ব্বে এই পথে রেঙ্গুনে শ্রমিক যাইত।

গোপালনগর—বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বহরমপুর স্টেশন হইতে ১০ মা. দূরে অবস্থিত। বিদেশী আমদানি-দ্রব্য সিংহল, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন বন্দরে নামাইয়া স্থানীয় উপকূল-বাণিজ্যপথে সর্ব্বশেষে এখানে আসে। সেজন্য এখানকার আমদানি-দ্রব্য বেশীদিন স্থায়ী হওয়া দরকার।

বালেশ্বর—এককালে উড়িষ্যার একমাত্র বড় বন্দর ছিল, এবং ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দীনেমার ও পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। এখানে তখন লবণের ব্যবসায় প্রবল ছিল। তখন এখানে মান্দ্রাজ হইতে চাউল, এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ হইতে কড়ির চালান আসিত। এই কড়ি তখন ক্ষুদ্র মুদ্রা ছিল,—ছোট-ছোট কেনাবেচায় ইহাই ছিল মুদ্রা। কলিকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি হইলে,—১৮৮৬ সালের দুর্ভিক্ষের পরে ভিন্নভিন্ন প্রদেশের সহিত সংযোগ-সাধনের সুব্যবস্থা হইলে,—গবর্ণমেণ্ট লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় তুলিয়া দিলে—এবং যে-বুড়াবালাং নদীর উপর ইহা অবস্থিত তাহা মজিয়া গেলে, বালেশ্বরের অবনতি ঘটে। এখন বালেশ্বর অতীতের স্মৃতিমাত্র।

চাঁদবালি—বৈতরণী নদীর উপর অবস্থিত ছোট বন্দর। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে স্টিমারে এখানে আসিয়া পুরীতীর্থে যাইতে হইত। এখনও কলিকাতার সহিত ইহার স্টিমার-সংযোগ আছে, এবং কলিকাতা হইতে চাউল, লবণ, কেরোসিন, কাপড় ও পাটদ্রব্য এখানে আসে। কিন্তু ইহা হৃতগৌরব।

কটক—এখান হইতে চাঁদবালি খালপথে স্টিমার যাতায়াত করে, এবং সেখান হইতে কলিকাতার সহিত তাহার সংযোগ আছে।

পুরী—এই বন্দরে এখন বিশেষ কোন আমদানি-রপ্তানি নাই। তবে অতীতের চিহ্নস্বরূপ এখনও এখানে একটি আলোকস্তম্ভ আছে,—সমুদ্রে ১০ মা. দূর হইতে তাহা দেখা যায়।

কলিকাতা—ভারতবর্ষের প্রধান সহর, এবং ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইহা পশ্চিমবঙ্গ স্টেটের রাজধানী। ইহা হুগলী নদীর উপর নদীমুখ হইতে ১২০ মা. দূরে অবস্থিত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, হুগলী নদীর ১ ঘন

ফুট জলে ১'১ ঘনইঞ্চি শক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এবং প্রতি বৎসরে প্রায় ৬ কোটি ঘন গজ পলিমাটি হুগলীর জলে প্রবাহিত হয়। সেজন্য হুগলী নদীতে চড়া পড়ে। হুগলী হইতে সাগর পর্য্যন্ত নদীপথে অনেকগুলি চড়া আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রধান। এই দীর্ঘ পথটি এই চড়া প্রভৃতির জন্য বিপদসঙ্কুল। এই সকল চড়া, বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে ৪০ মা. পর্য্যন্ত পথের চড়াসকল, সময়-সময় স্থান পরিবর্ত্তন করে। জেম্‌স্ ও মেরী নামক জাহাজ এইরূপ এক চড়ায় বাধিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে। সেই জন্য সেই বিপজ্জনক চড়াটি এখনও জেম্‌স্ ও মেরী চড়া নামে খ্যাত। এই সকল কারণে এই নদীর পলিমাটি পরিষ্কার করিয়া ও চড়াগুলি কাটিয়া দিয়া রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই বন্দরের অধ্যক্ষ পোর্ট কমিশন সর্ব্বদাই সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অধীনে তলকর্ষিণী (dredger) নিযুক্ত রাখিয়াছেন, এবং সর্ব্বদাই এই চেষ্টা চলিতেছে যেন জাহাজের চলিবার পক্ষে কোন অসুবিধা না হয়। যে-সকল জাহাজের চলিবার পক্ষে ২৭ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন, তাহা এই পঙ্কোদ্ধারের ফলে সহজেই সকল সময় জোয়ারে আসিতে পারে। কিন্তু যে-সকল জাহাজের ৩০ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন তাহাদিগকে তেজকোটালের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং কলিকাতা বন্দরে আসিতে কতকগুলি জাহাজকে সাধারণ জোয়ারের জন্য এবং কতকগুলি জাহাজকে তেজকোটালের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। এজন্য জাহাজ চালানো হিসাবে ইহা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য নদী। তলকর্ষিণী দ্বারা প্রতি বৎসর প্রায় ৭ কোটি ঘন গজ মাটি হুগলীগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলা হয়, এবং তাহাতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বন্দরে আগচ্ছমান জাহাজ নদীমুখ হইতে পোর্ট কমিশনারগণের নিযুক্ত এক পথপ্রদর্শক--জাহাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে নদীপথে অগ্রসর হয়। পথনির্ণয়ের সুবিধার জন্য নদীমধ্যে বয়া ও দীপবর্ত্তিকা সন্নিবেশিত আছে। এই সকল কারণে **এই বন্দর রক্ষা করিতে বহু ব্যয় করিতে হয়।**

প্রথমে এই বন্দর কাশীপুর হইতে খিদিরপুর গার্ডেন রীচ পর্য্যন্ত ৯ মাইল দীর্ঘ ছিল, পরে খনিজ তৈল রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য দক্ষিণে বজবজ পর্য্যন্ত আরও ১৬ মাইল এবং সর্ব্বশেষে উত্তরে কোন্নগর পর্য্যন্ত আরও ৯ মাইল বর্দ্ধিত হয়। এই দীর্ঘপথে নদীতীর কাপড়, কাগজ, চট প্রভৃতির কলে ও কারখানায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এখন বড়-বড় জাহাজ কলিকাতার নূতন সেতুর উত্তরে যাইতে পারে না।

একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে যে-সকল ডক, জেটি, মালগুদাম, এবং জাহাজ-যাতায়াতের ও মাল তুলিবার ও নামাইবার সুখ ও সুবিধা থাকা দরকার, তাহা সমস্তই এই বন্দরে আছে।

জাহাজ-খাল পরিকল্পনা।—জাহাজ-যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য

ডায়মণ্ডহারবার হইতে খিদিরপুর ডক পর্য্যন্ত একটি খাল কাটিয়া সেই খালে কলিকাতায় সহজে জাহাজ যাতায়াতের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে **সুবিধা** এই যে,—(১) কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত হুগলী নদীর চড়া পরিষ্কার করার খরচ বাঁচিয়া যাইবে, (২) সমুদ্র হইতে কলিকাতার দূরত্ব কমিয়া যাইবে, ও কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত সহজ হইবে, এবং এই খাল-অঞ্চল হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহ লইয়া দুই পার্শ্বে বহুদূর শিল্প বাড়িবে; কিন্তু **অসুবিধা** বিস্তর,—(১) চড়া পরিষ্কার না রাখিলে, হুগলী নদী ক্রমশঃ মজিয়া যাইবে এবং হুগলীর স্রোতোবেগ কমিয়া যাইবে। (২) রূপনারায়ণ, দামোদর, অজয়, ও ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি উপনদীগুলি যে পলিমাটি হুগলীতে আনিয়া ফেলে, হুগলীর স্রোতের বেগ কমিয়া গেলে, সে-মাটি সহজেই হুগলী-গর্ভে জমিয়া ইহা শীঘ্র-শীঘ্র মজিবার সহায়তা করিবে। (৩) হুগলী মজিয়া গেলে এবং মধ্যে-মধ্যে উচ্চ চড়ার সৃষ্টি হইলে, নদী শীর্ণকায় হইবে। তখন বর্ষাকালে উপনদীগুলির জল নদীতে পড়িলে, কলিকাতায় বন্যা হইবার সম্ভাবনা। (৪) দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর মুখে যদি চড়া পড়ে, তবে দামোদর- ও মোর-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে পারে।

জাহাজ-খাল কাটানোর দিক্ হইতেও অন্য বিশেষ অসুবিধা আছে;—(ক) যে-স্থানের উপর দিয়া খাল কাটানো হইবে, তাহা কলিকাতার উপকণ্ঠ;—ইহা জনবহুল—এই স্থানের উপরে খাল কাটিলে এখানকার গৃহহীন লোকদিগের পুনর্ব্বসতি করানো এক বৃহৎ ব্যাপার;—(খ) ইহা কলিকাতার সন্নিকটে শস্যশালী স্থান;—এখানে উৎপন্ন ফল, শস্য ও দুগ্ধাদি কলিকাতার লোকের নিত্য-প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সুতরাং এই স্থানে চাষ-আবাদ না হইলে কলিকাতার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া এই পরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয় নাই,—হইবে কিনা সে-সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে।

৬৩নং চিত্র

কলিকাতা এখনও ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। তাহার কারণ এই যে, (১) পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং বিশাখাপত্তন বন্দরের উন্নতি বশতঃ ইহার **পশ্চাদ্ভূমি** কমিয়া গেলেও এখনও ইহা **বহুদূর-বিস্তৃত**। (২) ইহা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা জন-বহুল, এবং শস্য- ও শিল্প-বহুল সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত। (৩) ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়লাক্ষেত্র কলিকাতা হইতে ১৩০ মা. মাত্র দূরে অবস্থিত বলিয়া জাহাজের আবশ্যকীয় কয়লা এখান হইতে লইতে হয়। (৪) বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও আসামের আমদানি ও রপ্তানি বহুলাংশে

এই পথে হইয়া থাকে। (৫) কাঁচা পাট, পাটদ্রব্য, চা, চামড়া, তৈলবীজ, চাউল, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি—ইহার প্রধান-প্রধান রপ্তানিদ্রব্য। ভারতে প্রস্তুত কাঁচা লৌহের (pig iron) কতকাংশ এই পথে রপ্তানি হয়। (৬) ইহার প্রধান আমদানিদ্রব্য—চাউল, কাপড়, লবণ, পেট্রোলিয়ম, যন্ত্রপাতি, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি।

তুলনার জন্য নিম্নে কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দরের ১৯৫০ সালের চারি মাসের আমদানি- ও রপ্তানি-মূল্যের পরিমাণ দেওয়া হইল।

	১৯৫০ সালের আমদানি (লক্ষ টাকা)				১৯৫০ সালের রপ্তানি (লক্ষ টাকা)			
	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন
বোম্বাই	১৮৯৯	২৬১৫	৩২০৯	২৭৪০	১২৯০	১০১৬	১২৩৫	৬৯২০
কলিকাতা	৯২০	৮৬২	১০০	১১০	১৮৬৭	১৬৪৯	১৩৮৬	১৭১৪

পাকিস্তানের বন্দর

করাচী—পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বন্দর,—ইহা ইউরোপ হইতে ভারতের নিকটতম বন্দর,—ইহা পশ্চিম-পাকিস্তানের সিন্ধুদেশে অবস্থিত। ভারতবিভাগের পর হইতে ইহার গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহা সিন্ধুনদের মুখে প্রস্তরবহুল দ্বীপরক্ষিত বন্দর। মানোরা দ্বীপ ও প্রধান ভূখণ্ডের মধ্যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া তরঙ্গ রোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা জেটি, ডক ও সর্ব্বপ্রকার সুবিধা-সমন্বিত প্রথম শ্রেণীর বন্দর। ইহার পশ্চাদ্ভূমি বহুবিস্তৃত। পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানিদ্রব্য ও আমদানিদ্রব্য যাতায়াত করিবার ইহাই একমাত্র পথ। রপ্তানি-দ্রব্য—গম, যব, তুলা, চাল, ডাল, তৈলবীজ, পশম, চামড়া, হাড় প্রভৃতি। প্রধান আমদানি-দ্রব্য—কার্পাসদ্রব্য, পশমদ্রব্য, চিনি, যন্ত্রপাতি, লৌহদ্রব্য, খনিজদ্রব্য, প্রভৃতি।
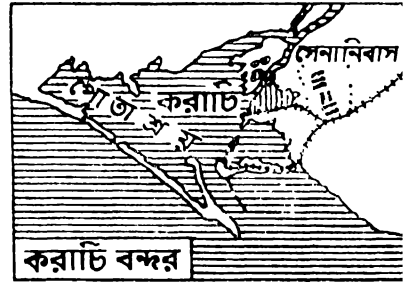
৬৪নং চিত্র

চট্টগ্রাম—পূর্ব্ব-পাকিস্তানে কর্ণফুলী নদীমুখ হইতে ১০ মা. অভ্যন্তরে অবস্থিত। যদিও ইহা বহুকাল হইতে বাণিজ্যস্থান, কিন্তু আসামবেঙ্গল রেলপথ না হওয়া পর্য্যন্ত

ইহার বহির্ব্বাণিজ্য কিছুই বাড়ে নাই। তাহার পর হইতে ইহা আসামের ও তদানীন্তন উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের রপ্তানি-স্থান হয়।' বঙ্গবিভাগের পর হইতে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ হইয়াছে। এখন ইহা আসামের বা ত্রিপুরার বন্দর নহে। সেজন্য ইহার ক্ষতি হইয়াছে,—পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য পাট এই বন্দরে আনিবার কোন সরাসরি রেলপথ নাই। যাহা হউক, এই বন্দরের উন্নতি করিয়া ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং সেজন্য কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ভারতযুক্ত-রাষ্ট্রের নগরাদি

ত্রিপুরা—

আগরতলা।—ত্রিপুরার রাজধানী। এখানে ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তুলা ও আরণ্য দ্রব্য প্রভৃতির বাজার আছে। এখানকার তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ।

মণিপুর—

ইম্ফাল—মণিপুরের রাজধানী। ইহা আসাম ও ব্রহ্ম-সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইহার রাজনীতিক মূল্য অত্যন্ত বেশী। ধান্য এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য, এবং এখানকার তাঁতদ্রব্য প্রধান শিল্প। **ডিমাপুর** হইতে গো-যানে এখানে আসা যায়।

আসাম—

শিলং—ইহা আসামের মনোহর পার্ব্বত্য প্রদেশে ৫হা. ফিট্ উচ্চে অবস্থিত রাজধানী। গৌহাটি হইতে শিলং যাইবার জন্য সুন্দর মোটর চলাচলের রাস্তা আছে।

গৌহাটি—ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আসামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও বাণিজ্যপ্রধান সহর। এই স্থানেই আসামের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, তেজপুর, শিবসাগর, ও ডিব্রুগড় প্রভৃতি আসামের সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলি ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় নদীতীরে অবস্থিত,—এগুলিই আসামের প্রধান বাণিজ্যস্থান,—চা, কাষ্ঠ ও ধান্য প্রভৃতির ব্যবসায়স্থল।

চেরাপুঞ্জি—খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত,—জলগর্ভ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখানে প্রতিহত হইলে, এখানে বৎসরে প্রায় ৫০০ই. বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চল অন্যতম কমলালেবু-উৎপাদন-স্থান।

ডিগবয়—সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র পেট্রলিয়ম-উৎপাদন-অঞ্চলে অবস্থিত পেট্রলিয়ম-উৎপাদন-স্থান।

শিলচর—দক্ষিণ-পূর্ব্ব আসামে বরাক নদীর উপত্যকায় কাছাড়ে অবস্থিত। চা ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ের বিখ্যাত স্থান।

পশ্চিমবঙ্গ—

দার্জ্জিলিং—৭০০০ ফি. উচ্চে হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দর শৈল-সহর ও গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এই অঞ্চলে অনেক চা-এর বাগান আছে। এখান হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাইবার রাস্তা আছে, ও এই পথে কাষ্ঠের ব্যবসায় চলে। ইহার পূর্ব্বে—

কালিম্পং—তিব্বতের সহিত ভারতের পশমের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এই অঞ্চলে **কার্সিয়াং** চা-উৎপাদন-স্থল।

শিলিগুড়ি—দার্জ্জিলিং অঞ্চলে যাইবার প্রবেশদ্বার। এখান হইতে ছোট রেলপথে দার্জ্জিলিং যাইতে হয়। কাষ্ঠ, চা, কমলালেবু প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।

জলপাইগুড়ি—তেরাই অঞ্চলে অবস্থিত আর একটি চা-এর উৎপাদন-স্থল।

বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ জেলার রাজধানী,—রেশম, রেশমী বস্ত্র, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য ও তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

বৰ্দ্ধমান—বৰ্দ্ধমান জেলার প্রধান সহর এবং ধান্য ও চাউলের ব্যবসায়স্থল।

আসানসোল ও **রাণীগঞ্জ**—পশ্চিমবঙ্গের কয়লা-অঞ্চলে অবস্থিত এবং কয়লা--রপ্তানির প্রধান স্থান। কয়লা অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চলে নানা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রাণীগঞ্জে কাগজের কল ও মৃৎশিল্পের কারখানা আছে। আসানসোল-অঞ্চলে লৌহশিল্প ও এ্যালুমিনিয়ম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে একটি বড় স্টেশন।

চন্দননগর—পূর্ব্বে ফরাসী-অধিকারভুক্ত ছিল,—এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে। হুগলী নদীর উপরে ইহা একটি ব্যবসায়স্থল।

বিহার—

পাটনা—বিহারের রাজধানী—গঙ্গা, গণ্ডক ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা একটি ব্যবসায়স্থল ও হিন্দুরাষ্ট্রের রাজধানী। রেলপথ-বিস্তারের পরে ইহার ব্যবসায় কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পাটনা হইতে এত চাউল রপ্তানি হইত যে, একপ্রকার মোটা চাউল সর্ব্বত্র "পাটনাই চাউল" বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার সহরতলী বাঁকিপুর ও দিনাপুরে সেনানিবাস আছে।

ভাগলপুর ও **মুঙ্গের**—গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া দুইটিই ব্যবসায়স্থল। ভাগলপুরের রেশমদ্রব্য বিখ্যাত। মুঙ্গেরে মুসলমান আমলের একটি প্রাচীন দুর্গ আছে।

রাঁচী—ছোটনাগপুর-মালভূমিতে অবস্থিত বিহার-গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। রাঁচী

খৃস্টান মিশনারীদিগের একটি বড় কর্ম্মভূমি। ইহারই সন্নিকটে **হাজারিবাগে** অভ্রের খনি আছে।

গয়া—পাটনার দক্ষিণে হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থল। এখানে পাথরের জিনিস ও কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ডালমিয়ানগর—এখন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়স্থল ও শিল্পপ্রধান—ইহা শোণ নদীর উপরে অবস্থিত। এখানে চিনির, সিমেণ্টের ও কাগজের কল আছে। চূণাপাথরের অঞ্চল বলিয়া এখানে চূণ ও সিমেণ্ট তৈয়ার হয়। ইহারই সন্নিকটে রোটাস নামক স্থানে শেরশাহের প্রসিদ্ধ রোটাস গড় আছে,—এবং সেখানে এখন রোটাস সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

ঝরিয়া—ধানবাদ মহকুমায় অবস্থিত কয়লা-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল। ইহারই নিকট সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

জামশেদপুর—সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা। ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, চূণাপাথর ও উড়িষ্যার লৌহ বিশেষ দূরবর্ত্তী নহে বলিয়া এই অঞ্চলেই এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

গিরিধি—কয়লা ও অভ্রের জন্য বিখ্যাত।

উড়িষ্যা—

কটক—মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী ও সর্ব্ববৃহৎ সহর—এখনও রাজধানীর অধিকাংশ কাজকর্ম্ম এখানেই হয়। তাঁতশিল্প, গালা ও শিং-এর ও হাতীর দাঁতের দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। রাস্তাপথ, নদীপথ, খালপথ ও রেলপথ দ্বারা ইহা নানা স্থানের সহিত সংযুক্ত। সেজন্য ইহা একটি বড় বাণিজ্যস্থান।

ভুবনেশ্বর—হিন্দুর বড় তীর্থস্থল এবং এক্ষণে উড়িষ্যার রাজধানী।

পুরী—হিন্দুদিগের আর-একটি তীর্থস্থল। ইহা পূর্ব্বে একটি বন্দর ছিল, এখন ইহার বন্দর-খ্যাতি লোপ পাইয়াছে। ইহাও একটি বাণিজ্যস্থল।

মান্দ্রাজ—

ভিজাগাপত্তন, বা **বিশাখাপত্তন**—উন্নতিশীল বন্দর।

কোকনদ, মসলিপত্তন, পণ্ডিচেরী, কাড্ডালুর, কারিকাল, নাগাপত্তন, ধনুস্কোটি ও **তিউতিকোরিন** ও **কালিকট**—মান্দ্রাজ রাষ্ট্রের বন্দর। ইহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মসলিপত্তনে ১৬২০ খৃ-অব্দে ইংরাজেরা প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। পণ্ডিচেরী ও কারিকাল পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত স্থান। কালিকটে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। এখানে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়।

বেজওয়াদা—উন্নতিশীল সহর ও বড় রেলওয়ে স্টেশন।

পলিকট্—মান্দ্রাজের ৩০ মা. উত্তরে পলিকুট্ হ্রদের নিকট পলিকট্ নামক স্থানে ওলন্দাজেরা ভারতে প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।

সালেম—এখানে লৌহখনি ছিল ও ইস্পাত প্রস্তুত হইত;—কিন্তু এক্ষণে তাহা হয় না। ইহার নিকটে ম্যাগনেসিয় ও লিগ্‌নাইট কয়লা আছে। ইহা কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত।

মাদুরা, ত্রিচিনোপল্লী ও **তাঞ্জোর** প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত হিন্দুমন্দির আছে। মাদুরার অনেক মন্দির কারুকার্য্যের জন্য সুবিখ্যাত। ইহাকে "দক্ষিণের কাশী" বলে। লোকসংখ্যায় মান্দ্রাজের পরেই ইহার স্থান। ত্রিচিনোপল্লী—চুরুট-তৈয়ারির কেন্দ্রস্থল। এখানে ৩০০ ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপরে সুন্দর একটি মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণে **ডিণ্ডিগাল** চুরুটের কারখানার জন্য বিখ্যাত। তাঞ্জোর—ধান্য-উৎপাদন-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

কইম্বাটুর—নীলগিরি পর্ব্বতের পাদদেশে একটি উন্নতিশীল স্থান,—কৃষি-অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে গবর্ণমেণ্টের কৃষি-কলেজ, কৃষিশিক্ষাক্ষেত্র এবং বনবিজ্ঞান-কলেজ আছে। ইহা সুপারী ও কার্পাসের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। অদূরে পায়কারা জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় বলিয়া ইহার শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে।

উতকামন্দ বা **উটি**—মান্দ্রাজ স্টেটের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। ইহা দার্জ্জিলিং-এর ন্যায় পর্ব্বতোপরি ৭ হাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহা, এবং **কুন্নুর, ওয়েলিংটন** ও **কোদাইকানাল** স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। কোদাইকানালে সূর্য্যরশ্মি দেখিবার মানমন্দির আছে।

মহীশূর—

বাঙ্গালোর—মহীশূরের রাজধানী—সমুদ্র-সমতল হইতে ৩০০০ ফিট্ উচ্চ। নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রানিট পাথরের প্রাচুর্য্য থাকাতে, এখানকার গবর্ণমেণ্ট আফিস প্রভৃতি ইহাতে গঠিত হইয়াছে,—সেজন্য সেগুলি দেখিতে অতিসুন্দর। এখানে তুঁতের চাষ প্রচুর হয়, এবং সেজন্য ইহা রেশম-উৎপাদন-স্থান। এখানে চন্দনকাষ্ঠের বড় ব্যবসায় আছে;—তাছাড়া, এখানে কার্পাস ও পশমদ্রব্যের কারখানা আছে, এবং কার্পেট প্রস্তুত করা হয়।

শ্রীরঙ্গপত্তন—এখানে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের দুর্গ আছে।

কোলার—হায়দার আলির জন্মস্থান ও ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণখনি এই স্থানে অবস্থিত। শিবসমুদ্রম্ নামক স্থানে কাবেরী নদী হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া

এখানকার স্বর্ণখনিতে খনির কাজ চলে। ভারতের ৯৫ শতাংশ স্বর্ণ এই খনি হইতে পাওয়া যায়।

ভদ্রাবতী—মহীশূরের একটি বড় শিল্পপ্রধান স্থান, এবং ভারতের দ্বিতীয় প্রধান ইস্পাত-শিল্পের স্থান; জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া এখানে কারখানা চালানো হয়। এখানে লৌহ ও ইস্পাতের, কাগজের, ও সিমেণ্টের কল আছে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—

ত্রিবান্দ্রম—রাজধানী—ইহা এখানকার রাজবাড়ী, মন্দির ও দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বিশেষ শিল্পপ্রধান স্থান। নারিকেলের নানা ব্যবসায় এখানে বিশেষ প্রচলিত।

হায়দারাবাদ—

হায়দারাবাদ—হায়দারাবাদের রাজধানী—লোকসংখ্যায় এই সহর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ। ইহা হিন্দুপ্রধানস্থান হইলেও বহুকাল ইহার শাসনকর্তা নিজাম-উপাধিক মুসলমান হওয়াতে এখানে মস্‌জিদ প্রভৃতি বেশী—এবং এখানে তুর্ক, আরবীয়, পাঠান ও পারসিক মুসলমানের বাস বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার হোসেন সাগর ও মির আলম নামক জলাশয় হইতে জল সরবরাহ হয়। ইহা ব্যবসায়-স্থল, কিন্তু এখানে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। তুঙ্গভদ্রা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

ঔরঙ্গাবাদ—হায়দারাবাদের দ্বিতীয় প্রধান সহর। কার্পাস অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে কাপড়ের কল আছে।

বোম্বাই—

বোম্বাই—বোম্বাই স্টেটের রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

আমেদাবাদ—তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহা একটি মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল, এবং তখন ইহা কার্পাস, রেশম, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও কাষ্ঠ সম্পর্কিত দ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ইহার সে-সকল ব্যবসায়ের কোন চিহ্ন নাই। এক্ষণে ইহা কার্পাস-সূত্র, কার্পাস-বস্ত্র ও কার্পাস-সংক্রান্ত অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করার অন্যতম প্রধান স্থান, এবং কার্পাস-দ্রব্য সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি কারখানায় এই স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে চামড়া ও কাগজও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বরদা—ভূতপূর্ব্ব বরদা রাজ্যের রাজধানী, এবং বিশেষ উন্নত সহর। বহু

হিন্দু মন্দির ও বৃহৎ-বৃহৎ আফিস-বাড়ী, লাইব্রেরী, প্রাসাদ, হাসপাতাল,—**স্কুল ও কলেজ** প্রভৃতিতে এই স্থান একটি অট্টালিকা-পুরী। ভূতপূর্ব্ব দেশীয় রাজার চেষ্টায় বর্ত্তমান কালের বহু শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

পুণা—ইহা পশ্চিম-ঘাটের উপর ১৮০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে অবস্থিত—বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের বর্ষাকালের রাজধানী। এখানে বড় সৈন্যাবাস ও গবর্ণমেণ্টের হাওয়া-আফিস আছে। ইহার উত্তর-পশ্চিমে—

মহাবলেশ্বর—বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

দক্ষিণে **শোলাপুর, বেলগাঁও, ধারওয়ার** ও **হুব্‌লি** তুলা-উৎপাদনের, তুলা-ব্যবসায়ের ও কার্পাস-শিল্পের কেন্দ্রভূমি।

মধ্য-প্রদেশ—

নাগপুর—মারহাট্টা-বংশীয় ভোঁসলা রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানকার কৃষ্ণ মৃত্তিকায় প্রচুর তুলা জন্মে, সেজন্য এখানে কাপড়ের ও তুলার দ্রব্যের কল আছে। ইহা ব্যবসায়-প্রধান স্থান, এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও বিশাখাপত্তনের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত বলিয়া ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

জব্বলপুর—ই. আই. আর. ও জি. আই. পি. রেলপথদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নর্ম্মদা-তীরে মার্ব্বেল পাথরের পাহাড় আছে। নর্ম্মদা সেই পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়া সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ওয়ার্দ্ধা, ওয়ারোরা, চন্দা, হিঙ্গনঘাট—বাণিজ্যের, বিশেষতঃ তুলার বাণিজ্যের, জন্য বিখ্যাত,—ইহা একটি তুলা-অঞ্চল, এবং এখানে তুলা ছাড়াইবার, সূতা পাকাইবার ও কাপড় প্রস্তুত করিবার মিল আছে। এই অঞ্চলে খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায় ;—**ওয়ারোরা**তে কয়লার ও **চন্দা**তে লৌহের খনি আছে।

মধ্য-ভারত—

গোয়ালিয়র ও **ইন্দোর**—এই দুই স্থানেই গম, ছোলা, ইক্ষু, সর্ষপ, তুলা প্রভৃতি জন্মে,—খনিজ দ্রব্যও এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। তাই এখানে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে ;—কার্পাসবস্ত্র ও সূতা-প্রস্তুতের কল, চামড়ার কারখানা, কাচের ও মৃৎপাত্রের কারখানা প্রভৃতি এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাজস্থান—

যোধপুর, বিকানীর ও যশল্মীর—প্রসিদ্ধ জিপ্‌সাম-উৎপাদক-স্থান। এখানকার জিপ্‌সাম লইয়া সিন্ধ্রি কারখানায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হয়। কয়লা, উল্‌ফ্রাম প্রভৃতিও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

উত্তর-প্রদেশ—

লক্ষ্ণৌ—পূর্ব্বে অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী ছিল, এক্ষণে ইহা এই প্রদেশের দ্বিতীয় সহর ও রাজধানী। মুসলমান রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা মস্‌জিদ, গোরস্থান, ও নবাবদিগের নানা প্রাসাদ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এবং এখনও রহিয়াছে। এখানে প্রাচীনকাল হইতেই স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও হাতীর দাঁতের ব্যবসায় আছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের অন্য কয়েকটি স্থান যেমন বর্ত্তমান-বিজ্ঞানসম্মত উচ্চশ্রেণীর শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে, লক্ষ্ণৌ তাহা পারে নাই। তবে ইহা কৃষিদ্রব্য-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল।

এলাহাবাদ—উত্তর-প্রদেশের রাজধানী ছিল, এবং এখনও ইহাতে কতকাংশে রাজধানীর কার্য্য হয়। ইহা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সেজন্য প্রাচীনকাল হইতেই ইহা উন্নতিশীল স্থান ও হিন্দুদিগের তীর্থ। এখানেই সময়ে-সময়ে মাঘমেলা হইয়া থাকে।

কানপুর—এক্ষণে উত্তর-প্রদেশে শিল্পে ও বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে এখানে সিপাহীগণ কর্ত্তৃক নৃশংস ইংরাজ-হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাহার পরে এই অঞ্চল শাসনে রাখিবার জন্য এই স্থানে একদল সৈন্য সন্নিবেশিত হয়। এই স্থানে শিল্পবৃদ্ধির ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। প্রধানতঃ, এই সৈন্যদিগের প্রয়োজনেই এখানে চর্ম্মশিল্প ও পশমশিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে ক্রমশঃ এই স্থান এত উন্নতি লাভ করে, এবং লোকসংখ্যা এত বাড়িতে থাকে যে, এখানে বহু প্রকার শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। চর্ম্মদ্রব্য, পশমীদ্রব্য, কার্পাসদ্রব্য, পাটদ্রব্য, চিনি ও তেল প্রভৃতির কল এখানে অনেকগুলি আছে। এখানে চর্ম্ম রং করা হয়, এবং সতরঞ্চি ও গরম বস্ত্রের জন্য এই স্থান সবিশেষ বিখ্যাত। ইহা উত্তর-ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে স্থাপিত,—কলিকাতা ও বোম্বাই—এই উভয় স্থানের সহিতই ইহার মাল আমদানি ও রপ্তানি চলে,—উত্তরের ও উত্তর-পশ্চিমের পশম-উৎপাদন-স্থল হইতে পশম-আমদানিও এখানকার পক্ষে সুবিধাজনক। প্রকৃতপক্ষে ইহা সমগ্র ভারতের একটি শিল্পোপজীবী নগর।

আগ্রা—বর্ত্তমানকালে উত্তর-প্রদেশের অন্যতম শিল্পপ্রধান স্থান,—এখানে দ্রুত শিল্পোন্নতি হইতেছে। ইহা কিছুদিন মোগল রাজত্বের রাজধানী ছিল। সেই সময়ের

মোগল-স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ অনেক অপূর্ব্ব প্রাসাদ এখানে এখনও জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে;—তন্মধ্যে শাহ্‌জাহান-নির্ম্মিত তাজমহল প্রধান। বর্ত্তমানকালে ইহা এই অঞ্চলের শস্য-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল। এখানে কাপড়ের কল আছে, এবং ইহা সতরঞ্চি, কার্পাসদ্রব্য, গালিচা ও চামড়া-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ডেরাডুন—হিমালয় ও শিবালিক পর্ব্বতের মধ্যে যে-উপত্যকা আছে, সেই উপত্যকায় মুসৌরি নামক স্বাস্থ্যকর শৈলসহরে যাইবার পথে ইহা অবস্থিত। এক্ষণে এখানে গবর্ণমেণ্টের বন-বিভাগ ও জরিপ-বিভাগ অবস্থিত।

নাইনিতাল, রাণীক্ষেত, আলমোরা ও মুসৌরি—হিমাচল-প্রদেশে স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস।

হরিদ্বার বা **হরদ্বার**—গঙ্গানদী পর্ব্বত হইতে যেখানে সমতল ভূমিতে পড়িতেছে, ইহা সেখানেই অবস্থিত অন্যতম প্রধান হিন্দু তীর্থস্থান।

সাহারানপুর—ই. আই. রেলপথের শেষ স্টেশন ও যমুনাখাল-ইঞ্জিনিয়ারিং-বিভাগের প্রধান আফিসের অবস্থিতি-স্থান।

মীরাট—বহু পুরাতন সহর,—এখানে অশোকের স্তম্ভ আছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পরে এখানে সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই সৈন্যগণের প্রয়োজনে এখানে ক্রমশঃ শিল্প সৃষ্টি হইতে থাকে। এক্ষণে ইহা উন্নতিশীল, শিল্প-প্রধান স্থান।

বেরিলি—সীমান্তপ্রদেশ-রক্ষার জন্য মোগল আমলে এখানে সেনানিবাস স্থাপিত হয়, এবং এক্ষণে সেই প্রয়োজনেই ইহা সৈন্যবাহিনীর আবাস-স্থান।

রুড়কি—পূর্ব্বে হরিদ্বারের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি গ্রাম মাত্র ছিল। গঙ্গার খাল খননের পর ইহার শিল্পসমৃদ্ধি হইয়াছে। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিখ্যাত।

মোরাদাবাদ—পিতল, টিন, এনামেল ও লৌহ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

আলিগড়—মাখন প্রভৃতি দুগ্ধদ্রব্যের ও তালা, ছুরি প্রভৃতি লৌহদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারত-বিভাগের পর ইহা এখন সার্ব্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে।

মির্জ্জাপুর—পশমী গালিচার ও পিতলদ্রব্য-নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত। তদ্ভিন্ন গালার দ্রব্য, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহদ্রব্য এবং মৃন্ময় দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়।

বনারস বা **বারাণসী** বা **কাশী**—ইহা গঙ্গাতীরে হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থান ও প্রাচীন সহর। ইহা একটি শিল্প-প্রধান স্থান;—এখানে তেলের কল, চিনির কল, ময়দার কল আছে। এখানকার রেশমীদ্রব্য ও পিতলদ্রব্যও বিখ্যাত।

পূর্ব্ব-প্যাঞ্জাব—

অমৃতসর—শিখধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ও বাণিজ্যস্থান। এখানে একটি সরোবরের মধ্যে শিখমন্দির স্থাপিত। কথিত হয়, ঐ সরোবরে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাই ইহার নাম অমৃত"সর" অর্থাৎ সরোবর। ইহা একটি উন্নতিশীল বাণিজ্যস্থান ও শিল্পস্থান;—রেশমবস্ত্র, কৃত্রিম রেশমবস্ত্র, পশমীদ্রব্য, গালিচা প্রভৃতি এখানকার শিল্পদ্রব্য।

লুধিয়ানা—পশমীদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত,—কাশ্মীরী শাল, অন্য পশমীদ্রব্য ও কার্পাসদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার পাগড়ীর কাপড় বিখ্যাত।

সিমলা—৭২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত শৈলাবাস। ইহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস ও বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের রাজধানী।

আম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর ও **অমৃতসর** প্রভৃতি স্থানে সীমান্ত-রক্ষার জন্য সৈন্যাবাস আছে।

কাশ্মীর—

শ্রীনগর—কাশ্মীর-উপত্যকায় বিতস্তা নদীতীরে তুষারশীর্ষপর্ব্বত-বেষ্টিত কাশ্মীরের রাজধানী। তিব্বত, পাঞ্জাব প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইবার বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহাও একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানকার শাল ও কার্পেট বিখ্যাত। এক্ষণে এখানে রেশম-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার কাষ্ঠদ্রব্য ও তাম্রদ্রব্য উৎকৃষ্ট।

জম্মু—দক্ষিণভাগে বহির্হিমালয়ের পাদদেশে কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী। কাশ্মীরের এই একমাত্র সহরে রেলপথের যোগ আছে। ইহা শস্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

লে—কাশ্মীর হইতে কারাকোরম গিরিপথ দিয়া মধ্য-এশিয়ায় যাইবার পথে অবস্থিত লাডকের সহর। ইহা কয়েকটি বাণিজ্যপথের মিলনস্থান। শীতের পরেই এখানে বাজার বসে, সেজন্য এখানে এই দুই অঞ্চলের ব্যবসায়িগণ মিলিত হইয়া পশম ও কার্পেটের সহিত চিনি ও খাদ্যশস্যের আদান-প্রদান করে। ইহা সমুদ্র-সমতল হইতে ১১ হাজার ফিট্ উচ্চ পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতম সহর।

দিল্লী—পাঞ্জাব প্রদেশের সীমার মধ্যে যমুনাতীরে অবস্থিত। ১৯১২ খৃঃ অব্দে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে আসিলে দিল্লী ও তাহার উপকণ্ঠ একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত হয়। যে-জল-বিভাজিকা উচ্চভূমি সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকাকে পৃথক্ করিয়াছে, দিল্লী তাহারই উপর অবস্থিত। সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়া পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়া

গঙ্গার সমৃদ্ধিশালিনী অববাহিকার দিকে আসিতে হইলে দিল্লী-অঞ্চল দিয়া আসিতে হয়। কারণ, ইহার দক্ষিণে থারমরু ও আরাবল্লী পর্ব্বত রহিয়াছে বলিয়া সেদিক্ দিয়া অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক নহে। এই পথের রক্ষণার্থে বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে দিল্লী রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরের সন্নিকটেই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এবং পাঠান ও মোগল-বংশের রাজধানী ছিল। মোগল ও পাঠান স্থপতিবিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শন এখনও এখানে বর্ত্তমান আছে। এই সকল বিভিন্ন রাজত্বের ধ্বংসস্তূপের উপর ইংরাজেরা নূতন দিল্লী গঠন করিয়া বৃটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। সে-রাজত্বেরও অবসান হইয়াছে। এক্ষণে দিল্লী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী।

পাকিস্তানের নগর

পশ্চিম-পাঞ্জাব—

লাহোর—ইরাবতী নদীতটে পশ্চিম-পাঞ্জাবের রাজধানী। পূর্ব্বে ইহা এই অঞ্চলের শস্য-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল। এখানে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই;—কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যের লেস্ ও কার্পাসদ্রব্য এখানে কিছু-কিছু উৎপন্ন হয়।

শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি ও **আটক** সীমান্ত-রক্ষার জন্য সৈন্যনিবাস।

মুলতান—পশ্চিম-পাঞ্জাবের দক্ষিণভাগে একটি প্রাচীন বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। আফগানিস্তান হইতে বাণিজ্যপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়িগণ আফগানিস্তান হইতে ফল, হিং ও মশলাদি আনিয়া এখানে বিক্রয় করে, এবং ফিরিবার সময়ে চিনি, খাদ্যদ্রব্য, ও বস্ত্রাদি লইয়া যায়। ইহা গম, তুলা, তৈলবীজ ও চিনি প্রভৃতি সংগ্রহের ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

লায়ালপুর—রেচনা-দোয়াবে অবস্থিত একটি বাণিজ্যস্থান। পূর্ব্বে ইহা শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে একটি জনবিরল গ্রাম ছিল। পাঞ্জাবে খাল কাটিয়া শস্যচাষের উন্নতি হইলে ইহা শস্যসংগ্রহ-কেন্দ্র ও বাণিজ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—

পেশোয়ার—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী। আফগানিস্তান হইতে পাঞ্জাবে আসিবার একটি পথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। সেজন্য ইহা একটি বাণিজ্যস্থান। সীমান্ত-রক্ষার জন্য এখানেও সেনানিবাস আছে। এইরূপ,—

চিত্রল, কোহাট ও **বন্নুতে** সীমান্ত-রক্ষার জন্য সেনানিবাস আছে। এবং

ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ গোমাল গিরিপথের নিম্নে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র।

বেলুচিস্তান—

কোয়েতা—৫৫০০ ফিট্ উচ্চে সীমান্ত বাণিজ্যস্থান। সীমান্ত-রক্ষার জন্য এখানে সৈন্যসমাবেশ করা আছে, এবং রেলপথ দ্বারা পাঞ্জাবের সহিত ইহা সংযুক্ত।

সিন্ধুপ্রদেশ—

করাচী—সমগ্র পাকিস্তানের ও সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী,—পশ্চিম-পাকিস্তানের একমাত্র বন্দর। পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের তুলা- ও গম-রপ্তানির বন্দর।

হায়দারাবাদ—সিন্ধুনদের মুখের কাছে অবস্থিত, এবং রেলপথ ও রাজপথের সংযোগস্থল। সেজন্য ইহা বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

পূর্ব্ববঙ্গ—

ঢাকা—বুড়ীগঙ্গাতীরে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এখানকার সূক্ষ্মবস্ত্র, শঙ্খদ্রব্য, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্য বিখ্যাত। এই স্থানে 'মস্‌লিন' নামে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মসূত্রে প্রস্তুত বস্ত্র হইত;—তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিং, সিরাজগঞ্জ—পাটের ব্যবসায়ের, এবং **রঙ্গপুর** তামাকের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

গোয়ালন্দ—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলনস্থলে ব্যবসায়স্থল, এবং পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিবার রেলপথের দ্বারস্বরূপ।

শ্রীহট্ট—সুরমা নদীতীরে কমলালেবু ও বেতের দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

চাঁদপুর—মেঘনা-তটে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থল।

চট্টগ্রাম—পূর্ব্ববঙ্গের উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও বন্দর। কলিকাতার জন্য এই বন্দরের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে আসাম, ত্রিপুরা ও পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশের আমদানি-রপ্তানি এই পথে হইত; কিন্তু তাহার পরে পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে ইহার উন্নতিসাধন আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করার জন্য কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্য

প্রত্যেক দেশেরই বাণিজ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) **বহির্ব্বাণিজ্য** ও (২) **অন্তর্ব্বাণিজ্য**। দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিদেশ হইতে আনয়ন- এবং বিদেশের প্রয়োজনীয় ও দেশের পক্ষে অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্যের বিদেশে প্রেরণ-জনিত যে বাণিজ্য, তাহাকে বলা হয় **বহির্ব্বাণিজ্য**। আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রয়োজনবোধে যে-আদানপ্রদান, তাহাকে বলা হয় **অন্তর্ব্বাণিজ্য**। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে রাজনীতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়। সেইসময় হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহির্ব্বাণিজ্য, তাহার পূর্ব্বে ছিল অন্তর্ব্বাণিজ্য। এইরূপ পাকিস্তানের সহিত ভারতের এখনকার বাণিজ্য বহির্ব্বাণিজ্য, ভারতবিভাগের পূর্ব্বে ছিল অন্তর্ব্বাণিজ্য।

বহির্ব্বাণিজ্য

অতি প্রাচীনকালে—হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালেও—নিকটবর্ত্তী বিদেশের সহিত ভারতের কিছু-কিছু বহির্ব্বাণিজ্য চলিত। এই বাণিজ্য নদীপথে নৌকাযোগে চলিত, সুতরাং এই বাণিজ্য সুদূরগামী ছিল না। পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত ভারতের সংস্রব ঘটিলে এই বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে বাষ্পীয় পোতের সৃষ্টি হইলে যাতায়াতের নানা সুবিধা ঘটে। তাহাতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইংরাজ রাজত্বকালে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে সুয়েজ যোজক সুয়েজখালে পরিণত হইলে, ইউরোপ হইতে ভারতের দূরত্ব কমিয়া যায়, মাল যাতায়াতের মাশুলও কমিয়া যায়,—এবং তাহাতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত,—বিদেশে, বিশেষতঃ ইংরাজের দেশে, প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানির ও ঐ সকল দেশের শিল্পদ্রব্য আমদানির দেশ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ- বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালে, বিদেশ হইতে যুদ্ধসংসৃষ্ট দ্রব্য আমদানি অসম্ভব হইলে, এদেশে শিল্পসৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। সেজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে কিছু-কিছু শিল্পোন্নতি হইলেও ঐ মহাযুদ্ধকালে নানাদিকে শিল্পের প্রসার হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পরে ভারত স্বাধীন হওয়ায় এদেশে নানাক্ষেত্রে শিল্পোন্নতি হইয়াছে, এবং নানাভাবে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র শিল্পহিসাবে উন্নতিশীল দেশ। তবে এক্ষণে শিল্পোন্নতির বাধা এই যে,—(১) পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ঘটিয়াছে, সেজন্য দেশে সকল দ্রব্যেরই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। (২) যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় গ্রেট বৃটেন ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধের জন্য বহু টাকা খরচ

করিয়াছিল। সেজন্য বৃটেনের নিকট ভারতের বহু স্টার্লিং পাওনা আছে। এই স্টার্লিং-ঋণ ভারতবর্ষ ইচ্ছামত পাইতেছে না, একটা হিসাবমত পাইতেছে। সেকারণে সে শিল্পের জন্য ইচ্ছামত উন্নতি করিতে পারিতেছে না। (৩) গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশ গত যুদ্ধের ফলে এরূপ হীনবল হইয়াছে যে, ইচ্ছামত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। সেজন্য ভারতও শিল্পসহায়ক যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত আমদানি করিতে পারিতেছে না। (৪) আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে ডলারের প্রয়োজন। সেজন্য ভারতকে আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে, আমদানির উপর কড়া নজর রাখিতে হইয়াছে, এবং রপ্তানি-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ডলার সঞ্চয় করিতে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাটদ্রব্যের টন প্রতি শুল্ক ছিল ৩২৲, কিন্তু যুদ্ধের পরে ১,৫০০৲ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল। এক্ষণে পাটদ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় শুল্কও ২৫০৲ টাকায় নামিয়াছে। (৫) ভারত-বিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্যশক্তি স্বভাবতঃ কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অর্থপ্রসূ পণ্য পাট, ও তূলা প্রভৃতির রপ্তানি-শক্তি এখন দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য—পাটদ্রব্যের জন্য ভারতকে এক্ষণে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। (৬) মুদ্রামূল্যের মান-হ্রাসের ফলে ভারতের ক্ষতি হইয়াছে ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ১৯৫২ সালের বাজেট-বক্তৃতায় মোটামুটি স্বীকৃত হইয়াছে।

বহির্ব্বাণিজ্যক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে প্রত্যেক বিভাগের মোট মূল্য ঠিক দেওয়া আছে, কিন্তু উহার অন্তর্গত পণ্যদ্রব্যের প্রধান প্রধানগুলি মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

তালিকা নং ১*

	১৯৪৯-৫০ সালে (লক্ষ টাকা)		১৯৫০-৫১ সালে (লক্ষ টাকা)	
প্রধান-প্রধান পণ্যদ্রব্য	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
১। **খাদ্য, পানীয় ও তামাক (মোট)**	**১২২৭৬**	**১১৭৭৬**	**১০৬৬৭**	**১৩২৯৫**
মাছ	২০	১৯১	২২	২৩৭
ফল ও শাকসব্জী	৬৯১	৭৯২	৯৫০	১০৮৬
শস্য, ডাল, ময়দা	**৯৯৫৩**	৪	**৮০২৬**	৪
মশলা	৩৫৪	১৯১৯	৫৪৯	২৪৪৮
চিনি	০	৪২	০	১৫
চা	১	৭২৪৩	৪	৭৮০৮
তামাক	২৪১	১৩৬২	২৭৬	১৪৭৮

* Eastern Economist, 20-7-51

	প্রধান-প্রধান পণ্যদ্রব্য	১৯৪৯-৫০ সালে (লক্ষ টাকা) আমদানি	রপ্তানি	১৯৫০-৫১ সালে (লক্ষ টাকা) আমদানি	রপ্তানি
২।	**শিল্পের উৎপাদন-দ্রব্য (মোট)**	**১৪৪২৯**	**১১১৮৬**	**১৮৯৩২**	**১৩৯৮৮**
	কয়লা	০	৪২১	০	৩৩৬
	অন্য অ-ধাতু খনিজ	২৭০	৭৩৫	২৯৫	৯৯২
	কাঁচা ও পাকা চামড়া	৩৪	৬৯৮	৪৭	৯৩৫
	তৈল	৫৯১৮	৮৭৯	৫৯২৭	২১৪৫
	কাগজের উপাদান	১৪	৩৮	৪০	৬৭
	স্বাভাবিক রবার	১৭	১	৩০০	১৯
	বীজ	১৯৬	১৪৯১	২২৮	১৭২০
	কাঁচা ও বাজে (waste) তুলা	৬৩২৩	১৮৮১	১০০৭৬	১৭৩২
	কাঁচা ও বাজে পাট	২	২৩৬২	৭	২২২৫
	কাঁচা ও বাজে রেশম	২১	৪	২৩৭	১৪
	ঐ পশম	৩০৩	৪২৯	৫৫৮	৮৮৪
	কাষ্ঠ	২৩২	৫৯	২৭৯	৭২
৩।	**সম্পূর্ণ বা আংশিক শিল্পদ্রব্য (মোট)**	**২৮৮৬৫**	**২৫৩৩৭**	**২৫৮২৫**	**৩১১৪৫**
	রাসায়নিক দ্রব্য ঔষধাদি	১৬১৩	২১২	১৯২৯	৪০১
	রং	১১১০	১৯৬	১৪৫৯	১৯২
	ইলেকট্রিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি	১৩০৭	৪	৯৩৮	১
	কাচদ্রব্য ও মৃৎদ্রব্য	২৫০	১৩	৮৪	১৬
	চর্ম্মদ্রব্য	৭১	**২০৯৯**	৫৬	**২০৪৩**
	যন্ত্রপাতি	**১০৫৫২**	৫১	**৮৪৩৯**	৬২
	লৌহদ্রব্য	১৩৭০	১৫৯	১৭৬৪	১৩৮
	অন্য ধাতুদ্রব্য	১৮১৬	৮২	২৭৭৪	১৪৭
	কাগজ জাতীয় দ্রব্য	৯৭০	২৪	১০৪০	৩৩
	রবার দ্রব্য	৩১	১০২	৩২	১৭৭
	গাড়ী	২৩৪৫	৭৫	২৩৯২	৬৭
	কার্পাস-সূত্র ও -দ্রব্য	১৮৪০	**৭৪৭৪**	২৩৫	**১৩৪৫৩**
	পাট-সূত্র ও -দ্রব্য	৪	**১২৭৫২**	৮	**১১৪৮৯**
	রেশম ঐ	৩২	২৯	১৬	৩৭
	পশম ঐ	৫৯৭	৩৭৬	১৬৪	৬০৫
	অন্য বয়নসূত্র	১৬০৫	২৫৭	১৫৬৪	২৮৭
৪।	**জন্তু-জানোয়ার**	**১১**	**৩১**	**৮**	**৩৪**
৫।	**ডাক-বিভাগের দ্রব্য**	**৪৬৭**	**১৮৭**	**২১২**	**২২৪**
	মোট	**৫৬০৫১**	**৪৮৫১৯**	**৫৬১৪৫**	**৫৮৬৮৯**
					+১৪১৬

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায়,—

২নং তালিকা

	১৯৪৯-৫০ সালে (লক্ষ টাকা)	১৯৫০-৫১ সালে (লক্ষ টাকা)
আমদানি	৫৬০৫১	৫৬৫৪৫
রপ্তানি	৪৮৫১৯	৬০১০৫
মোট বাণিজ্য-মূল্য	১০৪৫৭০	১১৬৬৫০
বাণিজ্যের লাভ-লোকসান	−৭৫৩২	+৩৫৬০

উপরি-উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯৪৯-৫০ সালে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী। সুতরাং ঐ বৎসর ব্যবসায়ে লোকসান হইয়াছিল। পরের বৎসর রপ্তানি-মূল্য বেশী হওয়ার জন্য বাণিজ্যে লাভ হইয়াছে। রপ্তানি-মূল্য আমদানি-মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে দেশের পক্ষে লাভজনক। ব্যবসায় লাভজনক হইলে আমদানি ও রপ্তানির বিয়োগফলের পূর্ব্বে একটি যোগচিহ্ন (+) এবং ক্ষতিজনক হইলে একটি বিয়োগ চিহ্ন (−) দেওয়া হয়।

১নং তালিকা হইতে আরও দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালে আমদানি ও রপ্তানির ন্যূনতা ও আতিশয্য নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

৩নং তালিকা (ক)

মোট মূল্যের শতাংশ হিসাবে আমদানি- ও রপ্তানি-দ্রব্য ১৯৪৯-৫০

	আমদানি লক্ষ টাকা	মোট আমদানির যত শতাংশ	রপ্তানি লক্ষ টাকা	মোট রপ্তানির যত শতাংশ
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক বিভাগে	১২২৭৬	২১·৯০	১১৭৭৬	২৪·২৭
২। শিল্পের উপাদান-দ্রব্যে	১৪৪২৯	২৫·৮৪	১১১৮৬	২১· ০
৩। সম্পূর্ণ বা আংশিক শিল্পদ্রব্যে	২৮৮৬৫	৫১·১৪	২৫৩৩৭	৫২·২২

৩নং তালিকা (খ)

মোট মূল্যের শতাংশ হিসাবে আমদানি- ও রপ্তানি-মূল্য ১৯৫০-৫১

	আমদানি লক্ষ টাকা	মোট আমদানির যত শতাংশ	রপ্তানি লক্ষ টাকা	মোট রপ্তানির যত শতাংশ
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক বিভাগে	১০৬৬৭	১৮·৮৮	১৩২৯৫	২২·৬৫
২। শিল্পের উপাদান-দ্রব্যে „	১৯৮৩২	৩৫·০৭	১৩৯৮৮	২২·১৩
৩। সম্পূর্ণ বা আংশিক শিল্পদ্রব্যে „	২৫৮২৫	৪৫·৬৭	৩১১৪৫	৫৩·০৬

এক্ষণে ১নং ও ৩নং (ক) ও (খ) তালিকা হইতে ইহা অনুমান করা সহজ যে, ১৯৪৯-৫০ সাল অপেক্ষা ১৯৫০-৫১ সালে **শিল্পদ্রব্যের** আমদানি কমিয়াছে, রপ্তানি বাড়িয়াছে ;—শিল্পের উপাদানদ্রব্য হিসাবে কাঁচামালের রপ্তানি কমিয়াছে ও আমদানি বাড়িয়াছে ; এবং ফল, শাকসব্জী, শস্য, ডাইল, চা, মশলা প্রভৃতি খাদ্য, এবং পানীয়, ও তামাক জাতীয় দ্রব্যের আমদানি কমিয়াছে।

১নং তালিকায় আমদানি-র হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়,—তূলার আমদানি বিশেষ বাড়িয়াছে, রেশম, পশম প্রভৃতিরও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু যন্ত্রপাতির ও তূলাদ্রব্যের আমদানি কমিয়াছে।

রপ্তানি হিসাবে দেখা যায়,—তূলাদ্রব্যের রপ্তানি বাড়িয়া ৭৪ কোটি হইতে ১৩৪ কোটি হইয়াছে। অন্য যে-সকল দ্রব্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে তাহাদের নাম,—কাঁচা চামড়া, তৈল, মশলা, কাঁচা পশম প্রভৃতি। কিন্তু কাঁচা পাটের ও পাটদ্রব্যের রপ্তানি কমিয়াছে।

উপরি-উক্ত আমদানি-রপ্তানির বিবরণ হইতে দেখা যায়, বর্ত্তমানে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যন্ত্রপাতি ও খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক। ভারত-বিভাগের ফলে তাহার খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য সে খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী। তদ্ভিন্ন দেশে শিল্পের উন্নতির যে-সকল পরিকল্পনা হইতেছে তাহার জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতির আমদানি দরকার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভারতবর্ষে তিনটি বন্দর প্রধান,—কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ। এই তিনটি বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি হইতে কিরূপ দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, বা ঐ সকল স্থানের জন্য কিরূপ দ্রব্যের আমদানি করিতে হয় তাহা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য।—ভাবত হইতে প্রায় ৫২টি বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত আমদানি- ও রপ্তানি-ব্যবসায় আছে। উহাদের মধ্যে প্রধান-প্রধান কয়েকটির নাম ও ১৯৫০-৫১ সালের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

আমদানি- ও রপ্তানি-কারক

প্রধান কয়েকটি বিদেশী রাজ্য*

রাজ্যের নাম	আমদানি—কোটি টাকা		রপ্তানি—কোটি টাকা	
	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
যুক্তরাজ্য	১৪৯	১২২	১১৮	১৩২
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র	৮৮	১১৬	৮১	১১২
ইরান	৩২	৩৬	৪	৫
অস্ট্রেলিয়া	৩৪	৩৩	২৬	৩০
মিশর	৩৯	৩২	৮	৫
ব্রহ্মদেশ	১২	১৯	১৪	২২
ক্যানাডা	১২	১৮	১১	১৪
কেনিয়া	১৫	১৮	৬	৬
ইতালী	১৩	১৫	৫	১২
ফ্রান্স	৩	১১	৫	৮
জার্ম্মানি	৬	১১	১০	১১
জাপান	২০	১০	৫	৮

ভারত ও যুক্তরাজ্য

১৯৫০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত হিসাবমত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি ১৩২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, এবং যুক্তরাজ্য হইতে আমদানি ১২২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং ঐ বর্ষে যুক্তরাজ্যের সহিত বাণিজ্যে ৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা পাওনা হইয়াছে। যুক্তরাজ্য হইতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্টার্লিং পাওনা রক্ষা করিতে হইতেছে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭৮১ কোটি টাকা স্টার্লিং পাওনা আছে মাত্র।

১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে দেখা যায়,—ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ১১৮ কোটি টাকা এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে রপ্তানি ১৪৯ কোটি টাকা। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই বাণিজ্য ক্ষতিজনক (unfavourable) হইয়াছে, এবং যুক্তরাজ্যের নিকট ভারতের দেনা হইয়াছে ৩১ কোটি টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরেও যুক্তরাজ্যের সহিত বাণিজ্যে ভারতের দেনা হইয়াছিল ৫৪ কোটি টাকা। যুদ্ধকালে ভারত হইতে যুদ্ধের জন্য দ্রব্যাদি

* Records and Statistics—Quarterly Bulletin of the Eastern Economist Vol. 2, No. 2.

ক্রয় করা হইয়াছিল ও লোকজন লওয়া হইয়াছিল। সেজন্য ইংলণ্ডের নিকট যাহা পাওনা হইয়াছিল, তাহা (Sterling balance) ইংলণ্ডের নিকট জমা আছে। এই জমা টাকা হইতে ভারতের দেনা শোধ করিতে হয়। ক্রমশঃ এই পাওনা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টার্লিং পাওনা ছিল—১,৭৩৩ কোটি টাকা।

এক্ষণে যুক্তরাজ্য হইতে মোটামুটি **আমদানি-দ্রব্য**—যন্ত্রপাতি, গাড়ী, জাহাজ, আকাশযান, লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য, মৃন্ময় ও কাচদ্রব্য, লৌহ ব্যতীত অন্য ধাতুদ্রব্য, ছুরি, কাঁচি, ইলেকট্রিক সংক্রান্ত দ্রব্য, তূলার সূতা, রেশম, কৃত্রিম রেশম, পশমদ্রব্য, ঔষধাদি, রাসায়নিক দ্রব্য, রং, কাগজ ও তৎজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি।

ভারত হইতে যুক্তরাজ্যে প্রধান-প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—চা, তামাক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি অ-লৌহ খনিজ পাথর, কাঁচা ও নষ্ট তূলা, কাঁচা ও নষ্ট পশম, কম্বল, কাঁচা পাট, পাট-দ্রব্য, কাঁচা ও পাকা চামড়া, পশমী দ্রব্য, নারিকেলের ছোবড়া, তেল, রজন প্রভৃতি।

ভারত ও পাকিস্তান

ভাবত-বিভাগের ফলে অর্থনীতিক্ষেত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ১লা মার্চ্চ পাকিস্তান ভারতের পক্ষে বিদেশী রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। সেজন্য ঐ সময়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এক বৎসরের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে মোটামুটি এইরূপ স্থির হয় যে, ভারত পাকিস্তানকে মোটামুটি কার্পাস বস্ত্র, কার্পাস সূত্র, পাটদ্রব্য, কয়লা ও লৌহদ্রব্য দিবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে পাকিস্তান ভারতকে কাঁচা পাট, তূলা এবং গম ও তৈলবীজ প্রভৃতি খাদ্যশস্য দিবে। দুই দেশের মধ্যে যে আদানপ্রদান চলিবে তাহা ব্যবসায়িগণের দ্বারা হইবার কোন বাধা নাই। তবে যে-সকল দ্রব্য সম্বন্ধে দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ নাই, কিন্তু রপ্তানি সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ আছে, সে-সকল দ্রব্যের রপ্তানি সম্পর্কে ব্যবসায়িগণকে নিজ-নিজ দেশের গবর্ণমেণ্ট হইতে লাইসেন্স বা আদেশপত্র লইতে হইবে। অন্যতঃ যে-সকল দ্রব্য সম্পর্কে দেশের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় বা বিদেশে চালানের জন্য কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, সেই সকল দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিতে কোন বাধা নাই,—তাহার জন্য কোন আদেশ--পত্রেরও দরকার নাই। আমদানি ও রপ্তানি হিসাবে এই দুই দেশ পরস্পরের উপর যে নির্ভরশীল তাহা দুই দেশই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে, এবং দুই দেশের একই শুল্কপ্রথা এবং সম্ভব হইলে একই অর্থনীতি হইবার আলোচনা চলিতেছে।

পাকিস্তান ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির **মাসিক গড়** হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

মাসিক গড় হিসাব

(ক) আমদানি

পণ্য	১৯৪৮ সালে লক্ষ টাকা	১৯৪৯ সালে লক্ষ টাকা	১৯৫০ সালে লক্ষ টাকা
ফল ও শাকসব্জী	১৯	১৬	৯
সুপারি	১৮	৮	১৯
চামড়া	১২	৫	১৪
তূলার বীজ	৩৫	২৬	২২
কাঁচা তূলা	·০২	৬	×
কাঁচা পাট	৫৯২	২০৮	২১২

(খ) রপ্তানি

পণ্য	১৯৪৮ সালে লক্ষ টাকা	১৯৪৯ সালে লক্ষ টাকা	১৯৫০ সালে লক্ষ টাকা
ফল ও শাকসব্জী	১১	১৪	১১
মশলা	১৫	৯	১
তামাক	৩২	৩৯	২৪
চিনি	১৫	৬	১
কয়লা ও কোক	৬	৩৮	·৪
উদ্ভিজ্জ তৈল	২৮	৫১	১৭
বয়ন-শিল্পদ্রব্য	৪২	২৯	২১
ঔষধাদি	×	৮	৩

মাসিক গড় হিসাবে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ বাণিজ্য হইয়াছে :—

বৎসর	মোট আমদানি লক্ষ টাকা	মোট রপ্তানি লক্ষ টাকা	বাণিজ্যফল
১৯৪৮	৭০৮	২৫৩	—৪৫৫
১৯৪৯	৩২১	২৯৪	— ১৭
১৯৫০	২৯০	১২৫	— ৬৫

সুতরাং বাণিজ্য হিসাবে ভারতের নিকট পাকিস্তানেরই পাওনা হইতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য—ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যসূত্রে জড়িত কয়েকটি দেশের বাণিজ্য-ফল নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বাণিজ্য-ফল*

মাসিক গড়

(লক্ষ টাকা)

(দ্রষ্টব্য—রপ্তানি-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে + চিহ্ন ও আমদানি-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে (–) ঋণ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।)

	১৯৩৮ সালে	১৯৪৮ সালে	১৯৪৯ সালে	১৯৫০ সালে
কমনওয়েল্‌থ-সংস্পৃষ্ট দেশ—				
যুক্তরাজ্য	+৮২	—৩,৫১	—৪,৮৯	+৮
অস্ট্রেলিয়া	+৮	—৬২	+১৯	—৯০
পাকিস্তান	×	+৯৯	—১৪	+৭৮
সিংহল	+৩৫	+৭৬	+১,০২	+১,১৫
ক্যানাডা	+১১	+৭	—৩২	+১৮
কমনওয়েল্‌থ-বহির্ভূত অন্য কয়েকটি দেশ—				
আ. যুক্তরাষ্ট্র	+২১	—২,৮২	—২,৪৭	+৭
মিশর	—১১	—১,৫৪	—৩,১৪	—১,৬৬
ইরান	—২১	—১,৫৫	—২,১৩	—২,৭৪
ব্রহ্মদেশ	—৯৬	—৮৩	—৫৪	+১,২৮
ইতালী	+৪	—১,১৩	—৯২	—২০
ফ্রান্স	+৩৯	+৪১	—১৭	—২১
বেলজিয়ম	+১৩	—৪	+২৪	?
সুইজর্লণ্ড	—১৪	—৪৬	—৫৭	—৪৪

বাণিজ্য দ্রব্য।—ভারত হইতে পাকিস্তানে **রপ্তানি-দ্রব্য**—কয়লা ও কোক, কাঁচা লৌহ, ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ, ফেরো-সিলিকন, টিনের চাদর, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, এলুমিনিয়ম দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য এলুমিনা প্রভৃতি, শক্ত ও নরম কাঠ, সিমেণ্ট, কাগজ, সর্ষপ ও তিসি তৈল, ক্লোরিন, রবার টায়ার ও টিউব প্রভৃতি, কার্পাসদ্রব্য, পাটদ্রব্য ও গালা প্রভৃতি। পাকিস্তান হইতে ভারতে **আমদানি-দ্রব্য**—কাঁচা তুলা, কাঁচা পাট, ও চামড়া।

আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র।—এই দুই দেশের বাণিজ্যে **রপ্তানি-দ্রব্য**—পাটদ্রব্য, চা, মশলা, গালা, পশম, কার্পেট, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র

* Records and Statistics—Quarterly Bulletin of the Eastern Economist. —Vol. 3. No. 3

ও চামড়া প্রধান। **আমদানি-দ্রব্য** প্রধানতঃ—কলকব্জা, মোটরগাড়ী, শস্যাদি, খনিজ তৈল, রবার দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য।

অস্ট্রেলিয়া ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র।—এই দুই দেশের বাণিজ্যে **রপ্তানি-দ্রব্য**—পাটজাত দ্রব্য, চা, তৈলবীজ, লৌহ, ও ইস্পাতদ্রব্য, এবং **আমদানি-দ্রব্য**—গম, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফল ও ধাতুদ্রব্য। অস্ট্রেলিয়ার রপ্তানি গমের ৬০ **ভাগ ভারতে** আসে।

ভারতের স্থলপথে বাণিজ্য

স্থলপথে ভারতের বাণিজ্য পাকিস্তান, নেপাল, তিব্বত, আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশের সহিত চলিয়া থাকে। আফগানিস্তানের সহিত বাণিজ্য পাকিস্তানের উপর দিয়া, এবং অন্য দেশগুলির সহিত কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি দেশের উত্তর-ভাগের গিরিপথ দিয়া, চলে। ভারতের এই স্থলবাণিজ্য মোটামুটি সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যের $\frac{১}{২০}$ অংশ মাত্র।

বাণিজ্যপথ—(১) আসামের লেডো সহর হইতে হুকং (Hukong) উপত্যকার মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের লাসিও অতিক্রম করিয়া চুংকিং পর্য্যন্ত একটি পথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ইহার ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে।

(২) **জৈলেপ** গিরিপথ (Jailep La—৩নং চিত্র)—চমলহরি পর্ব্বতের দক্ষিণে ও সিকিমের পূর্ব্বে অবস্থিত। এই পথে তিব্বত হইতে পশম, লবণ, স্বর্ণ, কস্তুরী প্রভৃতি এদেশে আসে, এবং চিনি, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি সেদেশে যায়। ইহাই উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের **পশম**-পথ।

(৩) **নীতিপথ** (৩নং চিত্র)—উত্তর-প্রদেশে অবস্থিত;—গাড়োয়াল হইতে এই পথে তিব্বত যাওয়া যায়।

(৪) কাশ্মীর হইতে (ক) **পানগং হ্রদপথে** লাসা, এবং (খ) **কারাকোরাম** ও **মুজটাগ** পথে মধ্য-এশিয়া যাওয়া যায়।

(৫) পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম ভাগে, (৩নং চিত্র) হিমালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী শাখার উপর অবস্থিত খাইবার, কুরম, টোচি, গোমাল ও বোলান গিরিপথে আফগানিস্তান ও ইরান হইতে ভারতের সহিত বাণিজ্য চলে।

এই সকল গিরিপথে চাউল, ঘি, কাঁচা পশম, রেশম, সোহাগা, হিং প্রভৃতি দ্রব্য আমদানি হয়, এবং বস্ত্রাদি, লবণ, চিনি, ধাতুদ্রব্য রপ্তানি হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লোকসংখ্যা ও লোকবসতি

লোকগণনা—১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা জম্মু- ও কাশ্মীর-বাসী, এবং আসামের পার্ব্বত্য জাতি বাদে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৬২৪ ;—ইহা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ১৫·১ অংশ। লোকসংখ্যা হিসাবে পৃথিবীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান—**দ্বিতীয়** ;—**প্রথম স্থান** অধিকারের সম্মান লাভ করিয়াছে—চীনদেশ ; সেখানে পৃথিবীর ১৯·৪ শতাংশ লোক বাস করে। কিন্তু চীনদেশের পরিমাণ-ফল ৪৪ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমাইল, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পরিমাণ-ফল ১১ লক্ষ ৭৬ হা. ৮৬১ বর্গমাইল,—মোটামুটি চীনদেশের এক-চতুর্থাংশ। এই হিসাবে চীনদেশের প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির ঘনত্ব—১০২, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের—৩০৩। সুতরাং লোক-পালনের সমস্যা চীন অপেক্ষা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বেশী। এই সঙ্গে আরও কয়েকটি দেশের প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির ঘনত্ব তুলনা করিলে দেখা যায় :—

যবদ্বীপ	—৮২৫	জার্ম্মাণি	—৫০৫
বেলজিয়ম	—৭০০	ইতালী	—৩৯৬
হলণ্ড	—৬৫৯	পাকিস্তান	—২০৭
জাপান	—৫৭৯	ফ্রান্স	—১৯৩
যুক্তরাজ্য	—৫৩৭	আ. যুক্তরাষ্ট্র	—৫০

ভূতপূর্ব্ব লোকগণনা ও লোকবৃদ্ধি—নিম্নে কয়েকটি লোকগণনার তুলনামূলক হিসাব প্রদর্শিত হইতেছে। ১৯৫১ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লোকগণনা-কালে ভূতপূর্ব্ব ভারতবর্ষের যে-অংশের লোকগণনা করা হইয়াছিল, অন্য-অন্য বৎসরের লোকগণনার অঙ্ক, হিসাবমত সেই অংশেরই প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতের লোকগণনার ফল

সাল	লোকসংখ্যা কোটি	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
১৯৫১	৩৫·৬৯	+১৩·৪
১৯৪১	৩১·৪৮	+১৪·৩
১৯৩১	২৭·৫৫	+১১·০
১৯২১	২৪·৮১	—০·৩
১৯১১	২৪·৯০	+৫·৮

১৮৭২ সালে এদেশে প্রথম লোকগণনা হয়। ১৯৩১ সালে ১৮৭২ সালের সংখ্যার উপর শতকরা ১০ অংশ বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ সাল ব্যতীত প্রতি লোকগণনায় লোকসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৩১ হইতে ১৯৫১ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে যে-বৃদ্ধি, তাহা ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের বৃদ্ধির তিন গুণ। ১৯৫১ সালে বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, তবে বৃদ্ধির হার কিছু কমিয়াছে। ভারত-বিভাগের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে লোক-বিনিময় হইয়াছে, গৃহহারা হইয়া লোকে যেরূপ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছে,—তাহাতে ১৯৫১ সালের লোকগণনার অঙ্ক, সবিশেষ তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও, কতদূর নির্ভুল হইয়াছে তাহা বলা কঠিন।

পৃথিবীতে যে-সকল দেশে অত্যধিক লোকবৃদ্ধি হয়, ভারত তাহাদের অন্যতম। এই অত্যধিক লোকবৃদ্ধিই ভারতের দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া কেহ-কেহ অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু এখনও ভারতের স্বাভাবিক সম্পদের যে সবিশেষ সদ্ব্যবহার হয় নাই, তাহা অকুণ্ঠিতভাবে বলা যাইতে পারে। ভারতের স্বাভাবিক সম্পদের ব্যবহার আরও বাড়াইলে, শিল্পের যথোপযুক্ত উন্নতি ঘটিলে, ভারতের এ-দারিদ্র্য যে দূরীভূত হইবে তাহা সহজেই বলা যায়। লোকবসতির ঘনত্ব ভারত অপেক্ষা অনেক দেশে বেশী আছে। তাহারা যদি শ্রীসম্পন্ন ও শক্তিমান্ জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে ভারতেরই বা সে সৌভাগ্য হইবে না কেন।

১৯৫১ সালের লোকগণনার ফল

স্টেট	লোকগণনা		১৯৪১ সালের উপর যত শতাংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস	প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির ঘনত্ব
	১৯৪১	১৯৫১		
১। আসাম	৭,৫৯৩,০৩৭	৯,১২৯,৪৪২	+২০·২	১৬৮·৮
২। পশ্চিমবঙ্গ	২১,৮৩৭,২৯৫	২৪,৭৮৬,৬৮৩	+১৩·৫	৮৪০·৯
৩। বিহার	৩৬,৫৪৫,৫৭৫	৪০,২১৮,৯১৬	+১০·১	৫৭১·৬
৪। উ. প্রদেশ	৫৬,৫১৬,৬২২	৬৩,২৫৪,১১৮	+১১·৯	৫৬২·১
৫। পাঞ্জাব	১২,৫৯৩,৬২৮	১২,৬৩৮,৬১১	+ ০·৪	৩৩৭·৬
৬। মধ্যপ্রদেশ	১৯,৬৩১,৬১৫	২১,৩২৭,৮৯৮	+ ৮·৬	১৬৩·৬
৭। বোম্বাই	২৯,৫০৬,৯৬৮	৩৫,৯৪৩,৫৫৯	+২১·৮	৩১১·০
৮। মান্দ্রাজ	৪৯,৮৪৭,৫০৮	৫৬,৯৫২,৩৩২	+১৪·৩	৪৪৫·৭
৯। উড়িষ্যা	১৩,৭৬৭,৯৮৮	১৪,৬৪৪,২৯৩	+ ৬·৪	২৪৪·৬
১০। রাজস্থান	১৩,২৮২,১০৫	১৫,২৯৭,৯৭৯	+১৫·২	১১৯·১
১১। পে. প. স্ব.	৩,৪২৪,০৬০	৩,৪৬৮,৬৩১	+ ১·৩	৩৪৩·৫
১২। সৌরাষ্ট্র	৩,৪৩০,৮৯২	৪.১৩৬,০০৫	+২০·৫	১৯৬·৪
১৩। মধ্যভারত	৭,১৫১,৫০২	৭,৯৪১,৬৪২	+ ১·১	১৭০·০
১৪। হায়দ্রাবাদ	১৬,৩৩৮,৫৩৪	১৮,৬৫২,৯৬৪	+১৪·২	২২৬·৬
১৫। মহীশূর	৭,৩২৯,১৪০	৯,০৭১,৬৭৮	+২৩·৮	৩০৮·০
১৬। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন	৭,৪৯২,৮৯৩	৯,২৬৫,১৫৭	+২৩·৬	১০১২·০
১৭। হিমাচল প্রদেশ	৯৩৫,৩৫৯	৯৮৯৪৩৭	+ ৫·৮	৯৩·৩
১৮। দিল্লী	৯১৭,৯৩৯	১,৭৪৩,৯৯২	+৯০·০	৩০৩৮·৩
১৯। আজমীঢ়	৫৮৮,৯৬০	৬৯২,৫০৬	+১৭·৫	২৮৫·৬
২০। বিলাসপুর	১১০,৩৩৬	১২৭,৫৬৬	+১৬·৪	২৮১·৬
২১। বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩,৩৫৩,০১৯	৩,৫৭৭,৪৩১	+ ৬·৭	১৪৫·৪
২২। ভূপাল	৭৮৫,৩২২	৮৩৮,১০৭	+ ৬·৮	১২১·১
২৩। কচ্ছ	৫০০,৮০০	৫৬৭,৮২৫	+১৩·৪	৬৭·১
২৪। কুর্গ	১৬৮,৭২৬	২২৯,২৫৫	+৩৫·৫	১৪৩·৯
২৫। মণিপুর	৫১২,০৬৯	৫৭৯,০৫৮	+১৩·১	৬৭·২
২৬। ত্রিপুরা	৫১৩,০১০	৬৪৯,৯৩০	+২৬·৭	১৬০·৫
২৭। আন্দামান ও নিকোবর	৩৩,৭৬৮	৩০,৯৬৩	− ৮·৩	৯·৯
২৮। সিকিম	১২১,৫২০	১৩৫,৬৪৬	+১১·৫	৪৯·৪
মোট	৩১৪,৮৩০,১৯০	৩৫৬,৮৯১,৬২৪	+১৩·৪	৩০৩,২

লোকসংখ্যার আলোচনা—উপরি-উক্ত তালিকা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তর-প্রদেশে,—তাহার পরে ক্রমান্বয়ে—মান্দ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে।

(২) ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যার উপরে শতকরা হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে—দিল্লীতে (৯০%)—তৎপরে যে-সকল দেশে শতাংশ বেশী তাহাদের নাম ক্রমান্বয়ে—কুর্গ (৩৫.৫%), ত্রিপুরা (২৬.৭%), মহীশূর (২৩.৮%), ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (২৩.৬%), বোম্বাই (২১.৮%), সৌরাষ্ট্র (২০.৫%), ও আসাম (২০.২%)।

(৩) লোকবসতির ঘনত্ব হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (১০১২.০), তৎপরে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমবঙ্গ (৮৪০.৯), বিহার (৫৭২.৫), উত্তর-প্রদেশ (৫৬২.১), মান্দ্রাজ (৪৪৫.৭) ইত্যাদি।

লোকসংখ্যা ও লোকবসতির মানচিত্রের সহিত বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মানচিত্রের (৬৫নং চিত্র) বহুলাংশে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় ;—

(ক) খাদ্যের সচ্ছলতাই লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ। বৃষ্টিবহুল সমতল ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হয় বেশী, তাই লোকসংখ্যা বেশী, এবং সমতলভূমি নদীর উপত্যকাভূমি হইলে লোকবসতি অত্যন্ত বেশী হয়। এজন্য গঙ্গার উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতি বেশী এবং লোকবসতি ঘন। ১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতির ঘনত্ব ছিল—৭১৯, বিহারের—৫১৯, ও উত্তরপ্রদেশের—৫০১। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের আগমনহেতু লোকবসতি অত্যন্ত ঘন হইয়াছে। পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে যে পাঞ্জাবী অধিবাসীরা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে, তাহারা সমস্ত ভারতে, বিশেষতঃ দিল্লীতে বাস করিতেছে। সেজন্য পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের লোকসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধিও বেশী হয় নাই, এবং লোকবসতির ঘনত্বও বেশী নহে।

আসামের এক অংশ ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় অবস্থিত হইলেও, ইহা জঙ্গলবহুল ও পর্ব্বতাকীর্ণ স্থান ; সেজন্য এখানে লোকসংখ্যা বেশী নহে। আবার পশ্চিমঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্রোপকূলে বৃষ্টিবহুল সমতল ক্ষেত্রে লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী।

ইহার নিম্নেই পূর্ব্ব- ও পশ্চিম-উপকূলের—মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের জেলাগুলিতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব।

অন্ততঃ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাত কম। সেজন্য সেখানে লোকবসতিও কম।

ভারত যুক্ত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান
লোকবসতির ঘনত্ব
(প্রতি বর্গমাইলে)
সঙ্কেত
0 - ১০০
১০০ - ৩০০
৩০০ - ৫০০
৫০০ - ৮০০
৮০০ - তদুর্দ্ধ
0 ১০০ ২০০ ৪০০
মাইল
ভারত যুক্ত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত
সঙ্কেত
0″ - ১০″
১০″ - ২০″
২০″ - ৫০″
৫০″ - ১৫০″
১৫০″ - তদুর্দ্ধ
0 ১০০ ২০০ ৪০০
মাইল
বৃষ্টিপাত ও লোকবসতির
সম্বন্ধ বিচার
শ্রীঅ:
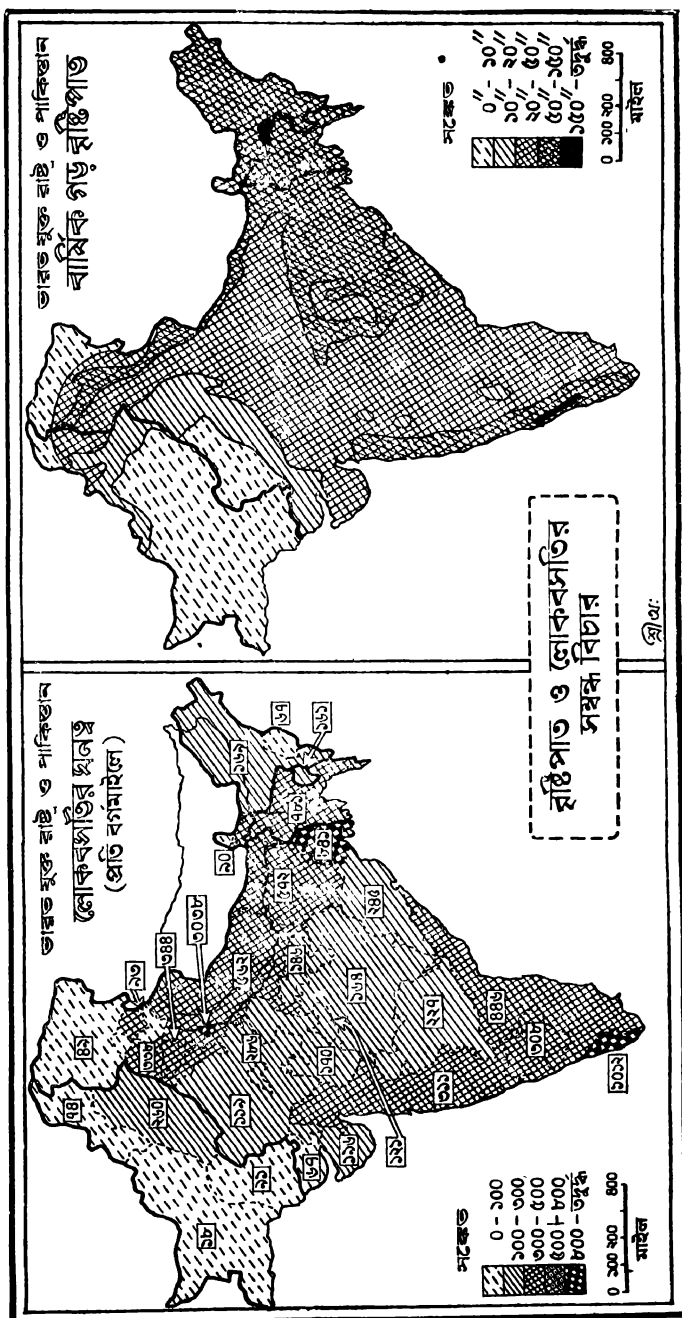
৮৫নং চিত্র

(খ) জলসেচ দ্বারা কোন স্থানে শস্যবৃদ্ধি হইলে সেখানে লোকবৃদ্ধি হয়। উত্তর-প্রদেশ ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে জলসেচের জন্য কতকাংশে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) কোন স্থান বৃষ্টিবহুল না হইলেও যদি শিল্পবহুল হয়, অর্থাৎ খনিজ শিল্প বেশী থাকে এবং নানা সর্জ্জন-শিল্পের সৃষ্টি হয়, তবে সেই সকল স্থানে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধি সাধারণতঃ অস্থায়ী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাদ্যবহুল স্থানই লোকবহুল হয়। কিন্তু এই সকল শিল্পকেন্দ্রিক স্থানে শিল্পবৃদ্ধি হইলে অর্থবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু খাদ্য বাড়ে না। অর্থের দ্বারা বিদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করা যায় বলিয়া এখানে বেশী লোক বাস করিতে পারে। শিল্পকারণে বিহারের সিংহভূম ও মানভূম অঞ্চলে, বঙ্গদেশের আসানসোল অঞ্চলে, বোম্বাই, ও মহীশূর প্রভৃতি স্থানে লোকবসতি বেশী।

ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন—খুব ছোট স্টেট, কিন্তু কৃষিতে ও অন্য শিল্পে বিশেষ উন্নত দেশ। সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখানে শিক্ষিত লোকের শতকরা অঙ্ক বেশী। এখানে খৃস্টান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব বেশী, এবং বহু প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্রোপকূলের এই দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য চলিতেছে। সেজন্য শস্য ও শিল্পসমৃদ্ধ এই দেশের লোকসংখ্যার ঘনত্বও বেশী।

গ্রামবাসী ও নগরবাসী।—ভারতবর্ষে গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকের অনুপাত এইরূপ :—

সাল	নগরবাসী	গ্রামবাসী
১৯২১	১১'৩	৮৮'৭
১৯৩১	১২'১	৮৭'৯
১৯৪১	১৩'৯	৮৬'১

উপরি-উক্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রামে বাস করিবার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে, এবং সহরে বাস করিবার লোক বাড়িতেছে। ইহার কারণ এই যে,—

(১) মানুষের খাদ্যসমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর হইতেছে। গ্রামে উপার্জ্জন কমিয়া যাইতেছে। সেজন্য লোক ক্রমশঃ সহরের দিকে চলিতেছে।

(২) সহরে নানাপ্রকার শিল্পসৃষ্টি হইতেছে, অথবা শিল্পসৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন সহর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল স্থানে অর্থের জন্য লোক আকৃষ্ট হইতেছে।

(৩) মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মনে সহরবাসের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগিয়াছে। এক্ষণে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের শিক্ষালাভ না করিলে চলে না। এখনও গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষালাভ সম্ভব হয় নাই। সেজন্যও লোকে সহরে আসিতেছে।

সহরের আমোদ-প্রমোদ ও সৌখীন জীবনও অনেককে প্রলুব্ধ করিয়া সহরে আনিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যে আরও নূতন-নূতন সহরের সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সহর।—সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রতি ১ লক্ষ ও তদধিক লোকযুক্ত সহরের সংখ্যা এইরূপ :—

উত্তর-প্রদেশ—১৬	পাঞ্জাব—৩	মধ্যপ্রদেশ—২
বোম্বাই—৮	মধ্যভারত—৩	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—২
প. বঙ্গ—৬	মহীশূর—৩	আজমীড়—১
বিহার—৫	রাজস্থান—৩	মণিপুর—১
মান্দ্রাজ—৪	সৌরাষ্ট্র—৩	

সকল সহরেই ১৯৪১ সাল অপেক্ষা ১৯৫১ সালে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। কেবল ভারত-বিভাগের ফলে তিনটি সহরে কমিয়াছে,—অমৃতসর ১৮%, বিকানীর ৭·৭%, শাজাহানপুর—৫%।*

পাকিস্তান

পাকিস্থানের ১৯৫১ সালের লোকগণনার যে ফল বাহির হইয়াছে, তদনুসারে পাকিস্তানের লোকসংখ্যা—৭ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৭ হাজার। দেশভেদে লোকসংখ্যা এইরূপ :—

দেশ	লোকসংখ্যা (হাজার)
পূর্ব্ববঙ্গ	৪১,৯৩২
পাঞ্জাব ও বহব্বলপুর	২০,৬৩৭
উ. প. সী. প্রদেশ	৫,৮৫৬
সিন্ধু ও খয়েরপুর	৪,৯২৫
বেলুচিস্তান ও দেশীয় রাজ্য	১,১৫৪
করাচী রাজধানী	১,১২৩
মোট	৭৫,৬২৭

১৯৪১ সালের লোকগণনার পর ১৯৪৭ সালে যে ভারত-বিভাগ হয়, তাহাতে বহু লোক স্থান ত্যাগ করিয়া ভারতে গিয়াছে ও ভারত হইতে আসিয়াছে। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনহেতু ১৯৪১ সালের লোকগণনার সংখ্যার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহাতে আনুমানিক সংখ্যা ৮০,২৬০ হাজার বলিয়া ধরা হইত। এই আনুমানিক

* *Hindusthan Year Book 1952.*

হিসাবে লোকসংখ্যা কিছু কমিয়াছে। কিন্তু ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুসারে পাকিস্তানের অন্তর্গত অংশের লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৩ লক্ষ ৩০ হাজার। সমগ্র পাকিস্তানে শতকরা ৮৫'৯ জন মুসলমান, ১৪'১ জন অ-মুসলমান ;—তন্মধ্যে ১২'৯ জন হিন্দু। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে শতকরা ৭৬'৮ জন মুসলমান ও ২৩'২ জন অ-মুসলমান।

শেষ

পরিশিষ্ট—১

প্রশ্নাবলী

উপক্রমণিকা

ভারত ও পাকিস্তান

1. Describe the influence of natural boundary on the economic condition of India.

2. Describe in brief the economic consequence of the partition of India.

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভৌগোলিক বিবরণ

1. Describe the coast line of India, and shew how far it is helpful to sea-bourne trade.

2. In a coasting voyage from Kandla to Calcutta name the chief ports of the Indian Union and point out how far their hinterland contributes to their development.

3. Why are the Ganges and the Indus flowing in the opposite direction? How are the basins of these two rivers separated?

4. Describe the trade-routes between (1) Indian Union and the adjacent countries, and (2) Pakistan and the adjacent countries.

5. Describe India into natural regions. Account for the climate, the production and industries of each region.

(Cal. Inter. '29, '33 ; W. B. C. S. '49).

6. Give an account of the economic geography of the Ganges basin. (Cal. Inter. '34).

7. Compare the north-east and north-west of India proper in respect of (*a*) physical features, (*b*) means of communication, (*c*) climate, (*d*) agricultural production, (*e*) condition affecting production. (Cal. Inter. '41, '44).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু

1. Account for the variety in the distribution of rainfall in India, and shew its effects on chief products. (Cal. Inter. '31, '41).

2. Give an account of the distribution of rainfall in India. Indicate the relation between rainfall and crop-production.
(Pat. Int. Com. '47).

3. Contrast the windward side and the leeward side of the Western Ghats, and describe the important products of each side.
(Cal. Int. '27, '30).

4. Write a short note on the climate of the Deccan Peninsula and show clearly the effect on agricultural production of the region.
(Cal. B. Com. '29).

5. What are the monsoons? Describe briefly their effect on the economic conditions of India. (Cal. I. Com. '31).

6. "Probably there is no other single group of weather phenomena which is so far-reaching in its effects as the Indian monsoon."—Explain. (Cal. B. Com. '25, '47).

7. "The monsoon is our great friend and formidable foe."—How far do you agree with the statement? Give reasons.
(Pat. I. Com. '47).

8. Give reasons why there are two rainy seasons in the south-eastern coastal region of India.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও অরণ্য-সম্পদ্

1. Divide India into natural vegetation regions and give a short description of them, shewing their relation with the rainfall of the country.

2. What are the chief forest areas of India? Mention the important Indian forest products and the chief industries dependent upon them. (Cal. B. Com. '25, '31).

3. On a sketch map of India show the region with important timber resources. How are these utilised at present? Discuss the prospects of increasing exports of Indian timber to the world's markets. (Cal. B. Com. '40).

4. Give an account of the forest products of India, and state where they are found. (Cal. I. Com. '42).

5. Is India rich in forest products? Mention the regions where these are available and their principal uses. (Cal. I. Com. '46).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জলসেচ

1. Describe the various methods of irrigation in India, mentioning the regions where each is practised.
(Cal. I. Com. '27, '32, '37, '40).

2. Discuss, with a sketch map, the distribution of various types of irrigation works in India. (Cal. B. Com. '32, I. Com. '34).

3. Give a short sketch of the irrigation system in India, and discuss the value of irrigation works for (*a*) production, and (*b*) trade.
(Cal. I. Com. '29).

4. "The Punjab is the province where the irrigation on the largest scale is carried on."—Account for this and describe the irrigated areas in other parts of India. (Cal. I. Com. '30).

পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম পরিচ্ছেদ

পশু-পক্ষি-পালন, প্রাণিজ শিল্প

1. Name some best breeds of cattle. Draw a map of India and shew thereon in which parts they are found. Give reasons.

2. What are the different kinds of cattle foods and what kinds of fodder and of grasses available in different parts of India?

3. On a sketch map of India shew the important regions of wool production, together with the centres of imported wool. Where is Indian wool mainly consumed? (Cal. B. Com. '41).

4. What are the important conditions for the development of fishing industry? Do you think that Bengal and Assam possess such facilities? (Cal. I. Com. '46 and '48).

5. Examine the present position and the future prospects of the fishing industry in West Bengal. (W. B. C. S. '49).

6. Write short informative accounts of two of the following :

(a) Irrigation in India. (See Ch. 4). (b) Sources of fish supply in India. (c) Importance of sericulture in India's commerce.

(Cal. I. Com. '45).

অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদ

মৃত্তিকা, কৃষিকার্য্য, কৃষিজ পণ্যদ্রব্য

1. What are the chief causes of soil-erosion? And what are their remedies?

2. On a sketch-map of India, show the important regions of production of food-grains. How is it that acute shortage of food-stuffs is felt in many parts of the country? (Cal. B. Com. '43).

3. Account for the present prosperity of Indian tea industry. Who are principal consumers of Indian tea? (Cal. I. Com. '27, '33).

4. What are the economic effects of the exports of oil-seeds from India? To what countries are the seeds exported? (Cal. I. Com. 27). And to what uses are they put there? (Cal. I Com. '27, '33, '46). Name the important oil-seeds, describing the areas where they are grown. (Cal. I. Com. '33, '46).

5. Explain the general distribution of the cotton crop in India. Describe the means advocated for improving the crop in (a) quality, and (b) quantity. (Cal. I. Com. '29, '31).

6. To what extent does India possess the conditions necessary for the production of sugar? In what parts is sugar grown?

(Cal. I. Com. '29).

7. Describe the Indian trade in (a) raw jute, and manufactured jute. What are its present prospects? (Cal. I. Com. '29).

8. Draw a map of India showing the regions where cotton, jute, silk and wool (Cal. I. Com. '30, '41), sugar-cane, tea and coffee (Cal. I. Com. '48) are produced.

9. Why is cotton produced in the Deccan—but not so much in Bengal, wheat in the United Provinces—but not so much in Madras, rice in Burma—but not in the Punjab, tea and coffee in the Nilgiris, but only tea in the Himalayas? (Cal. I. Com. '30).

10. Examine and estimate the importance of the following agricultural products in India—(a) wheat, (b) rice, (c) maize, (d) cotton, (e) jute. (Cal. I. Com. '32).

11. What are the chief areas in India, where tobacco and silk

are produced? Describe the climatic conditions which favour their growth. (Cal. I. Com. '32).

12. Examine the importance of *any four* of the following crops in India—(*a*) cotton, (*b*) ground-nut, (*c*) jute, (*d*) linseed, (*e*) rice, (*f*) wheat. (Cal. I. Com. '34).

13. Discuss the conditions favouring the growth of (*a*) jute, (*b*) oil-seeds, (*c*) coffee, (*d*) sugar-cane. Indicate the places where they are grown in India. (Cal. I. Com. '36).

14. Give an idea of wheat, cotton, and jute-belt of India. State briefly the climatic conditions necessary for the production of these commodities. (Cal. I. Com. '43).

15. What are the uses of jute? How it it that jute is produced only in India? (Cal. I. Com. '44).

16. Briefly narrate the conditions favourable for the growth of rice and wheat. What parts of India are best suited for the production of these crops? (Cal. I. Com. '44).

17. Name the two important fibres produced in India. Give an account of the condition favourable for their large scale production and their manufacture and finished products. (Cal. I. Com. '45).

18. What parts of Northern India have more lands under the plough? Are there any geographical reasons for this? And where, within these generally arable areas, are the different main crops produced? (Cal. I. Com. '46).

19. Discuss the conditions favourable for production of jute. Name the principal buyers of Indian Jute and Jute Manufacturers. (Cal. I. Com. '47).

20. The Punjab produces more wheat than rice, but Bengal more rice than wheat. Why? (Cal. I. Com. '47).

21. "The entire jute mill industry is in the Dominion of India, but the Dominion has got approximately 25% of the total jute area of undivided India." Suggest the steps to be taken for increasing the production of jute in the Dominion of India. (Cal. I. Com. '48).

22. On a sketch-map of Bengal—

(*a*) Shade the principal jute-growing areas.

(*b*) Locate the Industrial towns.

(*c*) Indicate the main waterways connecting Calcutta with E. Bengal.

(*d*) Mark the main roads and railways, connecting Calcutta with northern and western Bengal.

(*e*) Locate at least four important river-ports.

একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খনিজ সম্পদ, শক্তির উৎস

1. Draw a map of coal and iron deposits of Bengal, Bihar and Orissa, and Central Provinces, locating in it the principal places of their occurence. (Cal. I. Com. '29).

2. Carefully estimate the oil resources of India.
(Cal. I. Com. '32).

3. Draw a map of India, shewing the principal mineral resources. (Cal. I. Com. '33, '34, '37, '39, '43, '47). Give an account of their commercial exploitation. (Cal. I. Com. '34, '39 ; B. Com. '32).

4. Estimate the iron resources of India. Show how far these are located near the coal-bearing regions in India. (Cal. I. Com. '36).

5. State the places in India where the following are found:— Manganese, Copper, Mica and Salt. Also mention their commercial uses. (Cal. I. Com. '44).

6. "India is the leading mica exporting country of the world and is likely to remain so." Examine the statement.
(Cal. I. Com. '45).

7. Name the chief sources of power in India other than coal. Where are they located? What are their present uses and future possibilities? (Cal. I. Com. '27).

8. What are India's sources of power? To what extent is she using them and for what purposes? (Cal. I. Com. '30, '41).

9. Discuss the development of water power in India.
(Cal. I. Com. '35, '37).

10. Analyse the geographical conditions suitable for the development of Hydro-electric power. How far are these conditions in existence in India? (Cal. I. Com. '45).

11. How is it that in India most of the Hydro-electric installations are located in the Deccan? Discuss the factors which should be present by the development of Hydro-electric power.
(Cal. I. Com. '47).

12. In a sketch-map of India, shew the regions producing Coal, Manganese and Mica, and the principal railway stations which handle these minerals. (Cal. I. Com. '49).

13. What do you know of the hydro-electric development of Northern India? What are the sources from which power is obtained there, and to what use is the supply of power mainly put?
(Cal. B. Com. '30).

14. Discuss the resources of India for development of Hydro-electric project. Do you think it would be wise to develop such projects in the regions possessing coal? (Cal. B. Com. '48).

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প

1. What are the possibilities regarding the Sugar-Industry in Bengal? Give reasons. (Cal. I. Com. '38, '40, '43).

2. Do you think India can develop Shipbuilding Industry profitably? If so, what, in your opinion, should be the ideal place for locating this industry? Give your reasons. (Cal. I. Com. '41).

3. Describe the present position of the Indian Tea Industry. Do you share the view that the industry should pay more attention towards development of internal market? (Cal. I. Com. '41).

4. It is said that the different provinces of India, those producing Jute, have derived the greatest advantage out of the present war. Do you agree with this view? If so, give reasons.
(Cal. I. Com. '41).

5. The present war, it is said, has afforded opportunities for establishment of new industries in India. In your opinion, which industry has got the greatest possibilities? (Cal. I. Com. '42).

6. State briefly the present condition of the Indian Paper Industry. Name the indigenous raw materials used for manufacturing paper, and mention where they are found. (Cal. I. Com. '42).

7. What are the principal Cottage Industries of Bengal? Give a short account of three such industries. (Cal. I. Com. '43).

8. Mention the names of three industrially advanced Indian States and give an outline of industrial activities of each of them.
(Cal. I. Com. '44).

9. Name three principal industries of Bengal. State very briefly the circumstances which favoured their development.
(Cal. I. Com. '45).

10. Do you think that India possesses all the advantages for the developments of Automobile Industries? (Cal. I. Com. '45).

11. Draw a sketch-map of India, indicating areas having a large raw cotton production and the more important places where Cotton

Mills are located. Also comment on such location of the Cotton Industry. (Cal. I. Com. '46).

12. What do you understand by the "Localization of Industries"? Illustrate your answer by any two important Indian Industries. (Cal. I. Com. '47).

13. State briefly the reasons why Cotton Mills have not been established in Assam. (Cal. I. Com. '47).

14. India's Sugar Industry is of recent growth. Mention the factors for its development and the provinces where Mills are located. (Cal. I. Com. '47).

15. Discuss the importance of Jute Industry in the economic life of Western Bengal. (Cal. I. Com. '48).

16. Name the more important places in India where Cotton Mills have been established, and state the reasons for selection of these places. (Cal. I. Com. '48).

17. "The entire jute mill industry is in the Dominion of India, but the Dominion has got approximately 25% of the total jute area of undivided India." Suggest the steps to be taken for increasing the production of jute in the Dominion of India. (Cal. I. Com. '48).

18. What are the essential raw materials for the manufacture of cement? State the places where this industry is at present located in India and discuss its possibilities. (Cal. I. Com. '49).

19. What special advantages has Bombay Presidency for the establishment of Cotton Mills? Do you think Bengal and Orissa are not proper places for the development of Cotton Textile Industry? (Cal. I. Com. '49).

20. State briefly the nature of industrial development that has taken place in India as the result of the present war and why? (Cal. B. Com. '42).

21. Describe the present position of chemical industry in India. In what direction is expansion possible in this industry? (Cal. B. Com. '43).

22. To what extent is the industrialization of India retarded by the lack of adequate supply of machine tools and power plants? State the present position of these industries in the country? (Cal. B. Com. '44).

23. Answer any two of the following:

(a) How would you account for the fact that the silk industry

has declined in Bengal but continues to develop in Kashmir and Mysore?

(b) What geographical factors have determined the distribution of the woollen industry in India?

(c) What is the future of the paper industry in India?

(Cal. B. Com. '46).

24. India's Steel Industry requires expansion. Besides Bihar and West Bengal which other provinces can offer facilities of Iron and Steel Works? Give your reasons. (Cal. B. Com. '49).

25. Mention two industries which East Bengal can establish with advantage. (Cal. B. Com. '49).

26. Examine critically India's position for developing her key industries, especially explaining the importance of localisation of industries in this connection. (Cal. B. Com. '50).

27. Indicate the future of automobile and air-craft industries in India, mentioning the suitability of areas where they are intended to be started. (Cal. B. Com. '50).

28. Discuss the geographical as well as the economic factors favouring the growth and development of sugar industry (both beet and cane), giving an idea of the present position of sugar industry in India. (Cal. B. Com. '50).

29. Eastern Pakistan produces jute and West Bengal manufactures this, so that the condition of jute is in a very anomalous position. What satisfactory measures would you suggest to cope with this anomaly? (Cal. B. Com. '50).

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরিবহন-ব্যবস্থা

1. Draw a map of India showing the air-routes with principal air-ports. (Cal. I. Com. '40).

2. For development of communication facilities in India, would you favour extension of Railways or construction of roads, or both? Give your reasons. (Cal. I. Com. '40).

3. Draw a map of India showing the more important railway system and the places of industrial importance served by them. (Cal. I. Com. '42).

4. Of the three types of transport, namely, road, river and railway, which one would be suitable for Bengal and why? (Cal. I. Com. '42).

5. Give a brief account of the different industrial activities which you will notice while travelling by rail from Digboi to Delhi via Calcutta by the shortest route. (Cal. I. Com. '43).

6. Mention four important Railway systems of India and the provinces served by them. Also mention two important industrial towns on each such Railway system. (Cal. I. Com. '44).

7. Mention the principal airways of the world. Discuss the position of India in respect of air transport. (U. P. Board I. Com. '45).

8. You propose to go by rail from Amritsar to Jamshedpur via Delhi and Nagpur. State the Railway systems over which you will travel and the commercial importance of these places.

(Cal. I. Com. '47).

9. Give an idea of the railway route which you would suggest for linking up Assam with Calcutta without passing through Pakistan. (Cal. I. Com. '48).

10. Discuss the part played by the Railways for commercial development of India. Do you think India should now pay more attention to the construction of roads and waterways than railways? (Cal. I. Com. '49).

11. There is a move for establishing (*a*) automobile, (*b*) aviation and (*c*) shipbuilding industries in India. What are the short-comings in the way of successfully developing these industries and how can these be removed? (Cal. B. Com. '41).

12. Discuss the adequacy of transport facilities in North-Eastern India (Bengal and Assam) in normal times and also in an abnormal period like the present one. What in your opinion, is the remedy to the apparent defects? (Cal. B. Com. '43).

13. Describe the changes that have taken place in recent years in the localisation of the ship-building industry of the world. What is India's share in the Industry? (Cal. B. Com. '43).

14. Describe the main land routes from India towards the Middle East, the U. S. S. R. and China, organised since the outbreak of the present war. Will these routes be of any benefit to India's foreign trade in normal times? (Cal. B. Com. '43).

15. On a sketch map of India, show the principal air routes

both trunk and feeder in operation with the country. What new development do you expect in this sphere after the war? •

(Cal. B. Com. '43).

16. Describe the principal air-routes now in operation in India. Do you think India offers facilities for the further development of air transport? (Cal. B. Com. '47).

17. Has there been recently any change in the policy of the Government of India towards coastal shipping? Discuss the importance of coastal shipping to a country. (Cal. B. Com. '51).

18. What advantages will there be in the grouping of Indian Railways as has been decided by the Government?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বন্দর ও নগর

1. Discuss the importance of the following:—Tuticorin, Colombo, Ludhiana, Cawnpore, Digboi, Ahmedabad, Moradabad and Murshidabad. (Cal. I. Com. '40).

2. Both Madras and Calcutta have got much in common. But why one is more prosperous industrially and commercially than the other? Explain. (Cal. I. Com. '41).

3. Account for the importance of the following:—Jamshedpur, Vizagapatam, Jubbalpur, Patna, Tuticorin, Nagpur, Benaras, Chittagong, Dibrugarh, Ambala, Surat, Asansole and Bangalore.

(Cal. I. Com. '42, '48).

4. Indicate the hinterlands of the ports of Karachi, Bombay, Vizagapatam, Chittagong and Calcutta. Also state the principal articles which are exported from these ports. (Cal. I. Com. '44).

5. Discuss the importance of the following:—Lahore, Bombay, Dacca, Karachi, Shillong, Moradabad, Bangalore, Ahmedabad, Jodhpur, Rawalpindi, Jubbalpore, Jharia, Amritsar, Lucknow, Dehra Dun, Dibrugarh, Naraingunge, and Kalimpong. (Cal. I. Com. '33, '39, '43, '47).

6. Name the important ports you would touch on your voyage from Karachi to Chittagong in a coastal steamer. Also state the articles usually exported from these ports. (Cal. I. Com. '44).

7. Discuss the commercial importance of any five of the follow-

ing :—Kalimpong, Dibhugarh, Cawnpore, Karachi, Lahore, Jharia, Vizagapatam, and Nagpur. (Cal. I. Com. '45).

8. Does Calcutta possess advantages for being situated in the river Hooghly? Give an idea of the hinterland of this port and the principal articles of export and import. (Cal. I. Com. '46).

9. Name four ports of importance which a ship may touch on a coastal voyage from Bombay to Calcutta. Also state the principal articles exported from these ports. (Cal. I. Com. '48).

10. State the reasons for the growth of any five of the folloging :—

Calcutta, Bangalore, Digboi, Asansole, Jubbalpore, Kalimpong, Cawnpore, Surat, Cuttack, Benaras. (Cal. I. Com. '49).

11. It is said that Calcutta is one of the most expensive ports in the world. Do you share this view? State also your views on the proposal for connecting the port of Calcutta with the sea by a "Ship Canal". (Cal. B. Com. '47).

12. How is the importance of the port of Calcutta likely to be affected by the development of Chittagong and Chalna?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্য

1. Discuss the trend of India's exports to the U. S. A. What are India's imports from that country? Discuss the possibilities of expansion of this trade. (Cal. B. Com. '39, '41, '42, '43).

2. Mention briefly principles behind the various "Controls" over the foreign trade of India and discuss their effect on the economic life of the country. (Cal. B. Com. '43).

3. What are the main items of trade between India and South Africa? Do you think that the decision of the Govt. of India to stop trading with south Africa will be to India's disadvantage? (Cal. B. Com. '47).

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লোকবসতি

1. What combination of causes account for the concentration of population in the Ganges Valley? (Cal. I. Com. '28, '32).

2. India has a population of about 320 millions. Analyse the factors which determine the irregular distribution of this vast population. (Cal. I. Com. '34).

3. What are the reasons for the remarkable density of population in certain parts of India? (Cal. I. Com. '40, '42).

4. On a sketch map of India draw the areas of greatest and least density of population. Also state briefly why the distribution of population is so irregular in India. (Cal. I. Com. '45).

Cal.—I. Com.—1951

1. Draw a sketch-map of the pre-partitioned India, showing therein the relief and inland waterways.

2. Where and under what geographical conditions do the main crops of India grow?

3. Show how the distribution of the different types of forests is controlled by rainfall in India? What are the principal forest products in this country?

4. Write an account of the development of the water power resources in India and discuss the benefits of such development on our economic life.

5. Estimate carefully the coal and petroleum resources of India and locate the principal mines on a sketch-map.

6. Examine the present position of the Indian sugar industry. Why is the industry mainly concentrated in the Uttar Pradesh and Bihar?

7. What are the raw materials for the following industries and where and to what extent are they found in India?

(*a*) Chemical, (*b*) Iron and steel and (*c*) Paper.

8. What are characteristic features of the foreign trade of India? What changes have taken place in the items of our exports and imports after the partition?

9. Write short explanatory notes on *any one* of the following :—

(*a*) Factors for the localization of the cotton textile industry in Southern India.

(*b*) Distribution of population in Northern India.

10. Write an account of the economic geography of West Bengal with particular reference to its Jute Industry.

Cal.—I. Com.—1952

1. Draw a full page map of India prior to partition and indicate therein the following :—

(*a*) Jute growing regions, (*b*) Cotton manufacturing centres, and (*c*) Petroleum producing areas.

2. Divide India into rainfall regions and show the relationship between the rainfall distribution and the main agricultural crops.

3. Indicate the influence of irrigation on the development of agriculture in the unpartitioned Punjab.

4. What are the uses to which the following minerals are put and where are they found in India :—

(*a*) Copper, (*b*) Mica, (*c*) Manganese, and (*d*) Bauxite?

5. Discuss the present position and the future prospects of the paper industry in India.

6. Account for the localization of iron and steel industry at Jamshedpur. What other places in India are suited for the future development of this industry?

7. Describe briefly the main features of the Indo-Pakistan trade at present.

8. Give a short account of the proposed plans for the development of roads, railways and waterways of India. Which of these should receive immediate attention.

9. Examine the causes of food-shortage in India and explain how the deficiency is sought to be made good at present.

10. What are major and minor ports in India? Give some examples of each. What steps are proposed to be taken for the development of ports in India?

Cal.—B. Com—1952

1. How far would it be correct to say that Calcutta is one of the most expensive ports in the world? State the advantages, if any, in connecting the port of Calcutta with the sea by a "ship canal".

2. Of the jute and the cotton textile industries, which is the more beneficial for the Indian Union and why? Describe the present position of the industry you select.

3. Give an estimate of the Indian coal and iron ore resources. What are your suggestions for the better preservation and utilization of these resources?

4. What are the commodities for which Pakistan and the Indian Union are dependent on each other? Discuss the nature of the trade between the two countries.

5. Analyse the importance of cottage industries in the economy of the Indian Union. Discuss the measures that should be adopted for their revival.

এই পুস্তক-প্রণয়নে ব্যবহৃত
সাময়িক পত্রিকা, বর্ষপঞ্জী ও গ্রন্থাবলী

1. Record of Statistics (Quarterly Bulletin of the Eastern Economist).
2. The Eastern Economist—(Printed and Published at the Hindusthan Times Press for the Eastern Economist Ltd., New Delhi).
3. Journal of Commerce and Statistics—Issued by the Bureau of Commercial Intelligence and Statistics, Bombay.
4. Indian Minerals—Geological Survey of India, Calcutta.
5. Monthly Abstract of Statistics—Published by the Manager of Publications, Government of India, Delhi.
6. Indian Forest Statistics.
7. Indian Food Statistics.
8. Area and Yield of Principal Crops in India.

   N. B.—The above three are published by the Ministry of Food and Agriculture.
9. Area and Yield of Principal Crops of Pakistan 1949-50 and 1950-51 as supplied by the Ministry of Food and Agriculture, Government of Pakistan.
10. Amrita Bazar Patrika Supplements.
11. Statesman's Supplements.
12. Hindusthan Standard Supplements.
13. আনন্দবাজার পত্রিকা
14. যুগান্তর
15. Our Lifelines (A Dunlop House Publication).
16. Statesman's Yearbook.
17. Hindusthan Yearbook.
18. The Indian and Pakisthan Yearbook.
19. Asia (L. Dudley Stamp).
20. Asia (Lyde).
21. ভারতের পণ্য—শ্রীকালীচরণ ঘোষ
22. Industrial and Commercial Geography (J. Russel Smith and M. Ogden Phillips).
23. Economic Geography (Clarence Filden Jones, Ph.D. and Gordon Gerald Drakenwald, Ph.D.).

24. Introductory Economic Geography (Lester E. Klimm, Otis P. Starkey and Norman E. Hall).
25. College Geography (Earl C. Case and Daniel R. Bergsmark).
26. Economic Geography of Asia (Daniel R. Bergsmark).
27. Economic Consequence of Divided India (C. N. Vakil).
28. Economic and Commercial Geography (A. Das Gupta).
29. A Handbook of Commercial Information of India (Government of India).
30. The Punjab—Past and Present.
31. India (M. Nazir and V. S. Mathur).
32. Agricultural Geography of the Deccan Plateau of India (Simkins).
33. Indian Economics (G. B. Jather and S. G. Beri).
34. National Planning Committee Series (Published by Vora & Co., Edited by K. T. Shah).
35. Location of Industries in India (T. R. Sharma).
36. The Common Commercial Timber of India and Their Uses (H. Trotter)
37. লাক্ষার চাষ (পি. এম. গ্লোভার ও শ্রীগিরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—নামকুম ল্যাক্ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত)
38. Industries of India (Burmah Shell).
39. The Harnessed Giant—The Story of Iron and Steel (Published by the Tata Iron and Steel Co. Ltd.).
40. Tea from India—Issued by the Tea Bureau.
41. Tea Propaganda in India (W. H. Miles).
42. ভারতীয় চায়ের অভিযান (Indian Tea Market Expansion Board).
43. বৈষয়িক ভূগোল (শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু)
44. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল (শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)
45. ভারতের খনিজ—শ্রীরাজশেখর বসু (বিশ্বভারতী)
46. Minerals Yearbook 1949—Prepared by the staff of the Bureau of Mines.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই পুস্তকে স্থানে-স্থানে বন্ধনীর মধ্যে (পৃ. ২৩৯ পৃ.)—এইরূপ লেখা আছে (১৫৯ পৃ. দেখ)। ইহার অর্থ—পৃথিবী খণ্ডের ২৩৯ পৃ. দেখ।